চতুরঙ্গ

সম্পাদক
শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ

শারদীয় সংখ্যা · ১৩৬৯

56·3
201/66

সা সিনহা
গদের সৌন্দর্যসাবান
র তরফ থে
পূজার শুভেচ্ছা

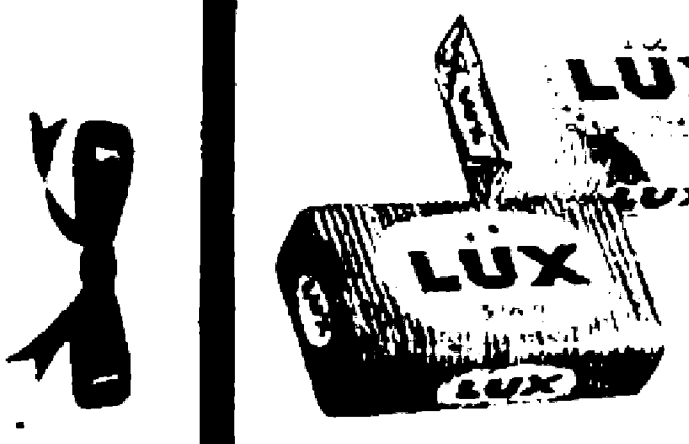

CENTRAL LIBRARY

রবীন্দ্র সঙ্গীত

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী (ঠাকুরতা)
কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত

JNG 6145 | আমার মনের মাঝে যখন তুমি এলে দলে

বিরূপদ দাস
কথা ও সুর
সলিল চৌধুরী

JNG 6135 | মম মন্দির গন্ধী (পল্লী গীতি)
JNG 6135 | আজো ঘরে ঐ

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কথা ও সুর
সলিল চৌধুরী

JNG 6136 | আমার এ জীবনে (আধুনিক)
JNG 6136 | পাগল হাওয়া ঐ

অখিল বন্ধু ঘোষ
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - শিল্পী

JNG 6134 | না হয় মন দিও (আধুনিক)
JNG 6134 | আজি চাঁদিনী রাতি তো ঐ

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় (বম্বে)

JNG 6140 | ওরে ও শাপলা ফুল (আধুনিক)
JNG 6140 | প্রতিদিন আমি ঐ

অপরেশ লাহিড়ী
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

JNG 6137 | এই পৃথিবী (আধুনিক)
JNG 6137 | আশ্চর্য প্রদীপ ঐ

সলিল ঘোষ
কথা - প্রবীর ঘোষ - শ্যামল গুপ্ত
সুর - প্রবীর ঘোষ

JNG 6129 | গানে আমার (আধুনিক)
JNG 6129 | সারা বেলা ঐ

অতু ভট্ট
কথা ও সুর
রবীন্দ্রনাথ

JNG 6138 | জয় যাত্রায় যাও গো
JNG 6138 | যখন বিশ্বে মহাকালে

গীতা সেন
কথা - গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সুর - শিল্পী

JNG 6142 | যদি কেবলই (আধুনিক)
JNG 6142 | ভোরাইকির দিন ঐ

সলিল মিত্র
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - রথু মুখোপাধ্যায়

JNG 6144 | বকুল বকুল মেয়ে
JNG 6144 | ফুল ফুল গন্ধবেলা

সলিল মিত্র
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - রথু মুখোপাধ্যায়

JNG 6146 | হেমন্তে কেয়ার খোঁজ (আধুনিক)
JNG 6146 | ঘুম ঘোরে ঐ চাঁদ ঐ

বটুক নন্দী
ইলেকট্রিক গীটার

JNG 6143 | বিশ সাল বাদ কাশ্মীর
JNG 6143 | ছায়না টাউনের ঐতিহ্য

উত্তর রায়
JNG 6146 | কৌতুক কণিকা
JNG 6146 | রিটিশ এই অধিকার
১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড

বন্ধু গুহ
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - রথু মুখোপাধ্যায়

JNG 6147 | বন্ধু আলেয়া (আধুনিক)
JNG 6147 | ও পাখী আলোর গানে ঐ

রবীন সাহা
ইলেকট্রিক গীটার
JNG 6125 | ঐ
সুর - ফিল্মস

লীলা ঘটক
কথা - পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর - ভূপেন হাজারিকা

JNG 6129 | ঝটিক ভুলে (আধুনিক)
JNG 6129 | সাগরের তীর বালুচর ঐ

JNLX - 1001
JNG - 10051-56
রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য
ফাল্গুনী

টিল্মস প্রোডাকশন
সঙ্গীত - আলী আকবর খাঁ
কণ্ঠে শ্রীঅরুন্ধতী ঠাকুরতা

JNG 6133 | সমরণে যে রই রই
JNG 6133 | ইতলা কি বেণুর বাঁশরে

লং প্লেয়িং ও অটোকাপলিং রেকর্ড

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
VERSITY

সুন্দর শ্রীমণ্ডিত
কেশের জন্য

প্রত্যেকের উচিত সবসময়ই একটি
ভাল কেশ তৈল ব্যবহার করা।
তৈলের কথা বলতে গেলে
প্রথমেই মনে পড়ে
কোকোলার নাম। ভাল
কেশ তৈল হিসেবে
কোকোলা সারাবিশ্বে
এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের
অধিকারী।

কোকোলা

সর্বাধিক জনপ্রিয় কেশ তৈল

কলেশ অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা—৩৪

ADC

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সাহিত্য

কালান্তর	ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে প্রথম গ্রন্থভুক্ত। মূল্য ৫·৫০
খৃষ্ট	খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রবন্ধ ও ভাষণ। মূল্য ২·৫০
গীতাঞ্জলি	শতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে প্রচারিত সুলভ সংস্করণ। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১·২৫
ছেলেবেলা	সচিত্র। মূল্য ৬·৫০
জীবনস্মৃতি	বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় ও চব্বিশখানি চিত্র-যুক্ত সংস্করণ। মূল্য ১২·০০
নৈবেদ্য	শতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে প্রচারিত সুলভ সংস্করণ। মূল্য ০·৭৫
পল্লী-প্রকৃতি	পল্লী সমস্যা ও সংগঠন সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী। মূল্য ৪·৫০
বিচিত্রা	রবীন্দ্র রচনা-সংকলন। মূল্য ৭·০০, শোভন ৮·৫০
বিসর্জন	নারী-ভূমিকা বর্জিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মূল্য ০·৫০
বীথিকা	পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৩·৭৫, সচিত্র শোভন সংস্করণ মূল্য ৬·৫০
বীরপুরুষ	কবিতাটির উপহার উপযোগী গ্রন্থরূপ। মূল্য ১·০০
ভারতপথিক রামমোহন রায়	পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৩·০০
রক্তকরবী	নূতন সংযোজন যুক্ত সংস্করণ। গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। মূল্য ২·৩০
লেখন	রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। মূল্য ৪·০০, ১০·০০
শেষ সপ্তক	পরিবর্ধিত সচিত্র সংস্করণ। মূল্য ৪·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০
স্ফুলিঙ্গ	৬২টি নূতন কবিতা সংযোজিত। মূল্য ৩·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৫·৫০

পত্রধারা

চিঠিপত্র ৭	সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বোর্ড বাঁধাই ৪·৩০
ছিন্নপত্রাবলী	ছিন্নপত্র গ্রন্থের পূর্ণতর সংস্করণ। মূল্য ১০·০০, কাপড় বাঁধাই ১২·৫০

বিশ্বপথী রবীন্দ্রনাথ

জাপান-যাত্রী	প্রাসঙ্গিক রচনা ও গ্রন্থপরিচয়-যুক্ত। মূল্য ৪·০০, বাঁধাই ৫·৫০
জাভা-যাত্রীর পত্র	তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী। সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বাঁধাই ৪·৫০
পথের সঞ্চয়	সচিত্র। মূল্য ৪·০০, বাঁধাই ৬·০০
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি	১৯২৪ সালে বিদেশ যাত্রাকালীন ডায়ারি। সচিত্র। মূল্য ৩·০০, বাঁধাই ৪·৫০
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	প্রথম ইংলণ্ড গমন ও প্রবাস যাপনের বিবরণ। মূল্য ৪·৫০, বাঁধাই ৬·০০
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি	একত্র দুই খণ্ড। প্রাথমিক খসড়া-সংবলিত। মূল্য ৫·০০, বোর্ড বাঁধাই ৬·৫০
রাশিয়ার চিঠি	সচিত্র। মূল্য ৩·৫০, বাঁধাই ৪·৫০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শরৎচন্দ্রের সমস্ত শ্রেষ্ঠ—ছোট উপন্যাস, বড়গল্প ও নির্বাচিত প্রবন্ধ একত্রে ও ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে।

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট রঙীন ছাপা, বহুবর্ণ আর্টপেপারে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য—তিন টাকা মাত্র (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর যাহারা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা শীঘ্র লিখুন, অল্প কয়েক খণ্ড মাত্র আছে।

নিয়মিত গ্রাহক হইলে
গ্রাহক হইবে—
প্রকাশিত পুস্তকগুলি অর্ডারমাত্র
২৫ নয়া পয়সা করিয়া পাইবেন।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শারদীয় অমৃত বিশেষ সংখ্যা ১৩৬৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১১
কবিতা	[illegible]	১১
কালে ফিরে যাওয়া [illegible]	শ্রীপ্রফুল্লকুমার [illegible]	১৩
নিঃসঙ্গ প্রার্থনা [illegible]	শ্রীবুদ্ধদেব [illegible]	২০
পতাকা পাগলা [illegible]	বনফুল	২৬
ঐশ্বর্যের গৃহ [illegible]	শ্রীসুধাংশু [illegible]	২৮
বংশী কুলাঙ্গনা [illegible]	শ্রীপ্রেমেন্দ্র [illegible]	৩৩
হরিবল মিয়া খালিরুল বিবি ও গুলাব টাট্টু [illegible]	শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৯
অনিমিত্ত উপন্যাস।	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪৫-১৮৮	
বিষ্ণুপুরের ঘরাণার ধ্রুপদ [illegible]	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৮৯-১৯৯
রেখা রোমাঞ্চ [illegible]	শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার	২০৩

ঐশ্বর্যের প্রাথমিকার্থে সমস্ত প্রকৃতি
যখন মধুময় হ'য়ে ওঠে [illegible]
মার্কিন এজাক্স সাহিত্যে আপনার
ঘরোয়া পরিবেশও সুরভি হো[illegible]

murphy radio

মুর্ফি রেডিও-র একমাত্র পরিবেশক:

দেবসন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • পাটনা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

মনে রাখবেন, 'মাজদা ল্যাম্প' অনেক বেশী উজ্জ্বল ও টেকসই'

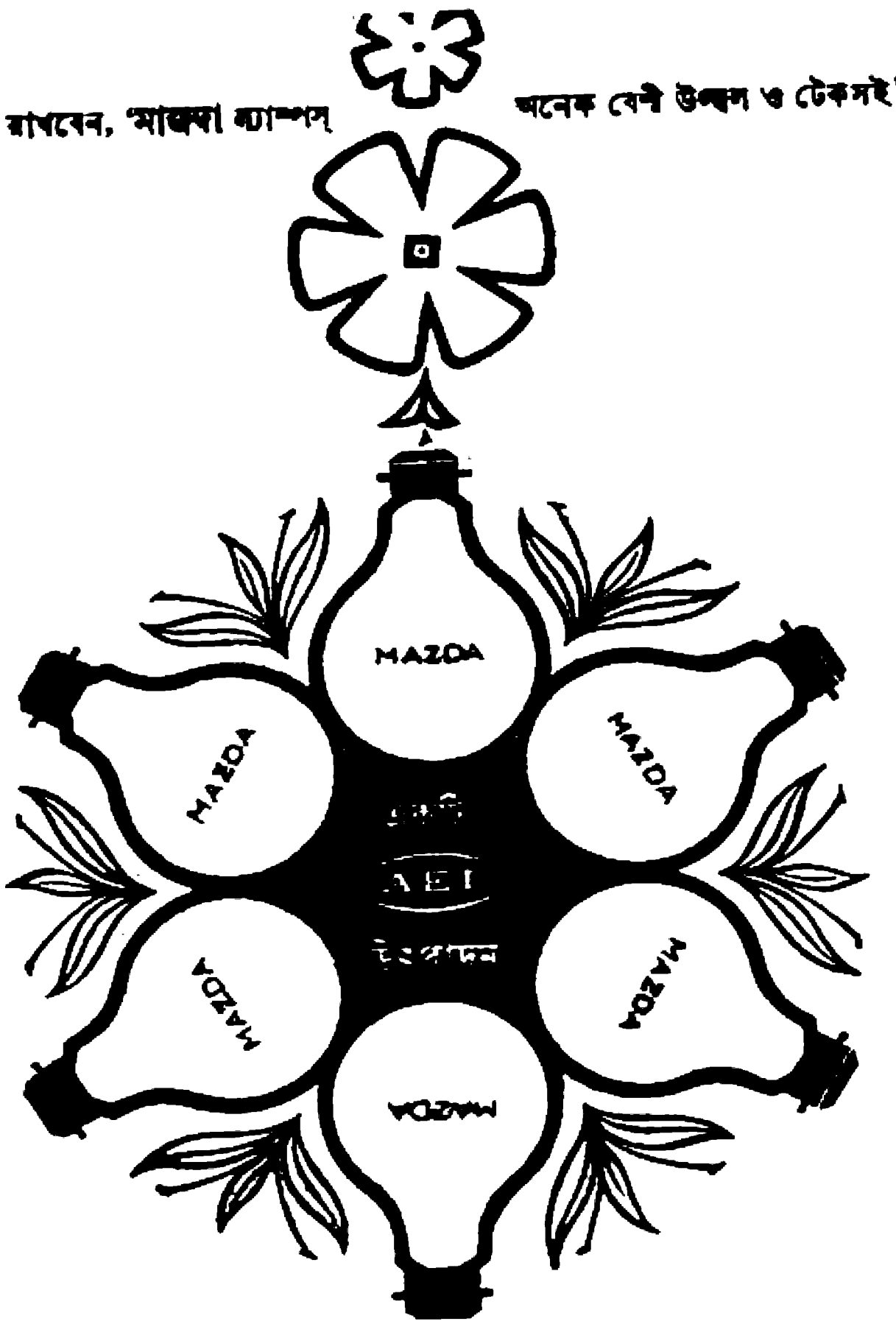

মাজদা ল্যাম্প দিয়ে
পূজো উজ্জ্বল করে তুলুন

সকল পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত

সহোদর ভাতার

রবি-তর্পণ ৩·০০

রবীন্দ্রনাথের উপদেশে নাটিকা, কথিকা, কবিতা ও গান

ও

পনেরো আগষ্ট ২·০০

দেশাত্মবোধক নাটক

প্রাপ্তিস্থান :

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

'তাসের ঘর', তমলুক, মেদিনীপুর

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বন্ধু, ভগবান ও যম (গল্প)	শ্রীমনোজ বসু	১১৭
কবিতা	... ...	১২১-১২৮

শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীঅমিয় দে, শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদ রায়, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীউমা দেবী, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীআলোক সরকার, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাম বসু, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়, শ্রীঅরবিন্দ গুহ, শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকণী রায়, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীকবিতা সিংহ, শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র রায়।

এবার পূজায়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস • কলম্বিয়া

রেকর্ড নির্বাচন প্রতিযোগিতায়

১০৩ টি পুরস্কার

এবার পূজায় ২৩ খানি "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ড বেরিয়েছে, বিস্তারিত তালিকা ডীলারদের দোকানে পাবেন। সেই রেকর্ডগুলি হতে আপনার পছন্দ অনুসারে ছয়খানি রেকর্ড বেছে দিয়ে আপনিও একটি মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারেন। প্রতিযোগিতার প্রবেশপত্র বিনামূল্যে ডীলারদের দোকানে বা সরাসরি গ্রামোফোন কোম্পানী হতে পেতে পারেন। প্রবেশপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর '৬২।

দ্বিতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. এডায়েস্ট-৯
ট্রানসিসটর ৪-ব্যাণ্ড রেডিওগ্রাম

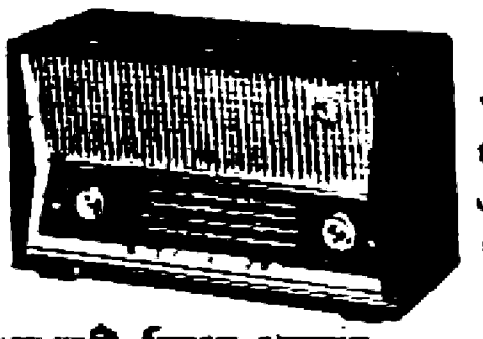

প্রথম পুরস্কার
এইচ. এম. ভি রেডিও
মডেল ৫২৬১
এ.সি/ডি. সি

তৃতীয় পুরস্কার
এইচ. এম ভি. পার্শী
৪-স্পীড রেকর্ড-প্লেয়ার
এটাচ্‌ড এ. সি. অথবা
ড্রাইব্যাটারি
চালিত।

আরও একশতটি বিশেষ পুরস্কার
বিস্তারিত নিয়মাবলী ও প্রবেশপত্র অনুমোদিত এইচ. এম. ভি - কলম্বিয়া ডীলারের দোকানে পাবেন।

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ : কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : দিল্লী

স্নিগ্ধ আনন্দঘন দিনের স্বপ্ন সত্যি হোক

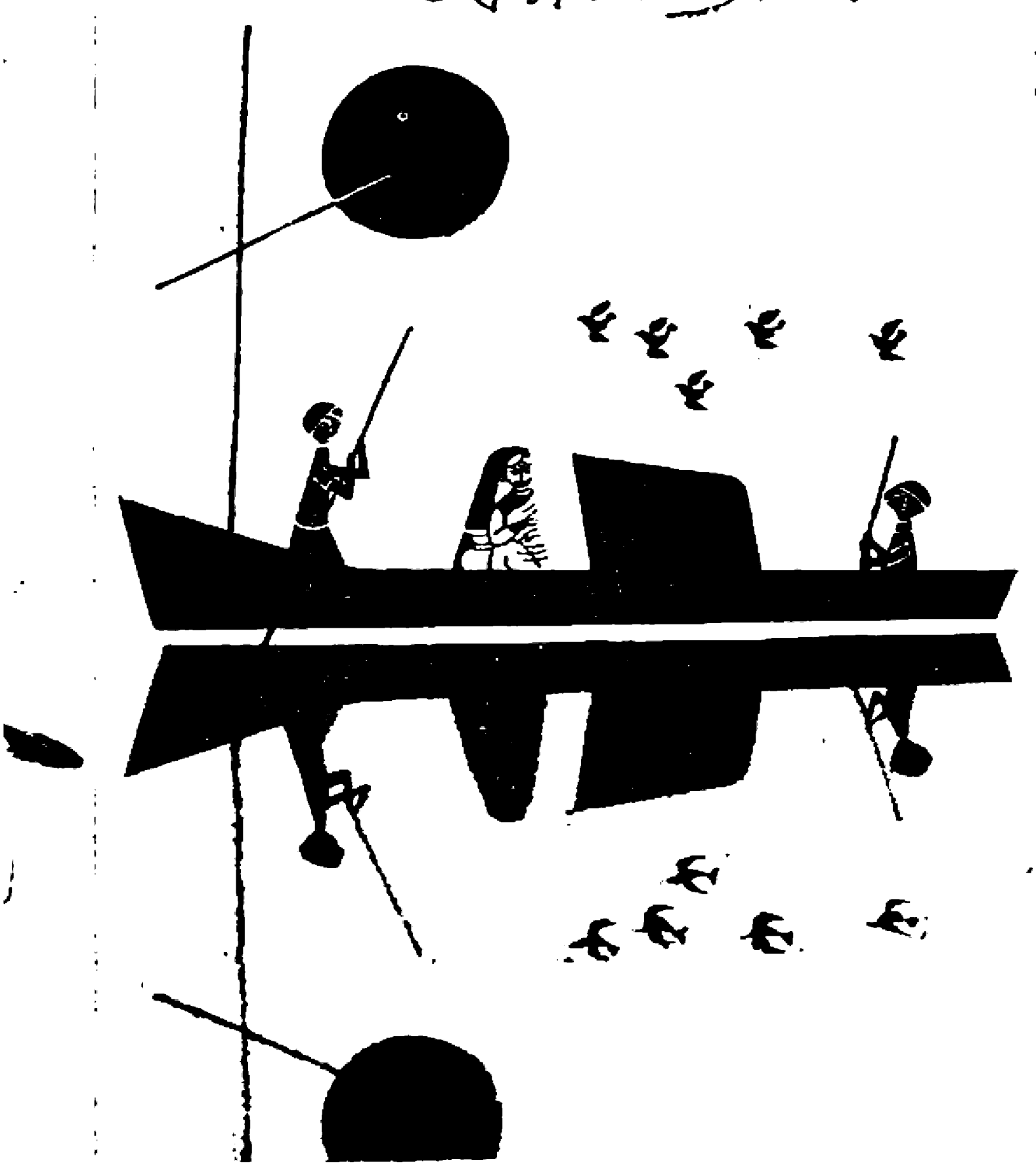

আকাশের আগুন-জ্বর
যেবে দেখেছিলে
—ধান বিল সব
শুষে নিল, মাঠের
এক কণা সবুজও
অবশিষ্ট রাখল
না। সেই খাপা
আকাশের মুখে
আবার কে কালি
লেপে দিল—
শ্রাবণের বুকে এত
কান্না ছিল কে
জানত? এবার
দেখো তো,
পেঁজা তুলোর মেঘে
একাকার আকাশ,
বহুমতী নদীর
বুকে ছায়াটিও
কাঁপেনা!
শরৎ এসেছে! সঙ্গে
নিয়ে এসেছে
স্নিগ্ধ, আনন্দ-ঘন
দিনের স্বপ্ন।
ভরে হবে সেই স্বপ্ন
সত্যি হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

রাজশেখর বসু—সংকলিত

বঙ্গভাষার প্রাঞ্জলম অভিধান

চলন্তিকা ৮·৫০

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ১৯ সং

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

৩·৫০

পরশুরাম—বিরচিত

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প	৩·০০
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প	৩·০০
ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প	৩·০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প	৩·০০
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প	২·৫০
হনুমানের স্বপ্ন	২·৫০
গড্ডলিকা	৩·০০
পরশুরামের কবিতা	২·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বসুন্ধরা (উপন্যাস)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	১৩০-১৭০
আধুনিক কবিতা (প্রবন্ধ)	শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৭১
ফোন (গল্প)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ...	১৭৭
ব্যর্থ তপস্যা (গল্প) ...	শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী ...	১৮১
মহারাণী (গল্প)	শ্রীবিমল মিত্র	১৮১
প্ল্যানচেটের ফলাফল (গল্প) ..	শ্রীপরিমল গোস্বামী ...	১১৭
পার্থিব (গল্প)	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী ...	১২১
চতুর্থকোণ (গল্প)	শ্রীনরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ...	২০৪
ছায়া (গল্প)	শ্রীশৈলজা মজুমদার ...	২১০
একটি নেপথ্য নাটক (গল্প) ...	শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২১৩
চলচ্চিত্রের শিল্প-অনুভূতি (প্রবন্ধ) ...	শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ...	২১৭
আলোচনাচক্র (আলোচনা)	শ্রীঅমরেন্দ্রবন্ধু মুখোপাধ্যায় ...	২২১

GRAM : "STANSEWCO"

PHONE : 33-3497

ভাল ও মজবুত সেলাইয়ের জন্য

"কাঁচি" ও "টেক্কা" মার্কা

সুতা ব্যবহার করুন

প্রস্তুত কারক:-

স্টাণ্ডার্ড সুইং থ্রেড কোং

৩নং পুর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট, কলি:-১

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

সোভিয়েত ইউনিয়নে

রবীন্দ্রনাথ

বহুদিন বহুর আগে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত পরিভ্রমণকালে সে দেশে তাঁর বিভিন্ন ভাষণ আলাপ আলোচনার অনুলিপি তাঁর উচ্ছ্বাসে লেখা সে দেশের কবিদের কবিতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিঠিপত্র এবং অজস্র ফোটো-সংগ্রহের অভিনন্দনলিপির সমাবেশ। প্রসঙ্গ ছবি ॥ ৩·৮৭

বর্ণনায় প্রবাসের আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য হচ্ছে। মনে কোনো দ্বিধার লেশই নেই। একেবারে মুক্ত প্রাণে। আপামরসাধারণ সকল মানুষকেই এরা সমান করে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

—রবীন্দ্রনাথ

মুখ চিরায়ত সাহিত্য

হেনরিক ইবসেন
কলাক ১·৫৬
বড় ও ছোট গল্প ১·৭৫

টুর্গেনিভ
বাবুদের বাসা ১·১৯
শিকারীর রোজনামচা ২·৮১

দস্তয়েভস্কি
লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ৩·৫৭

বঙ্কিমচন্দ্র
রাধ মুরকার ০·৭৫

ম্যাকসিম গর্কির আত্মকাহিনী মূলের দেশী

আমার ছেলেবেলা ১·৫০
পৃথিবীর পথে ২·৫১
পৃথিবীর পাঠশালায় ১·৫০

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
ইশতেহার প্রসঙ্গে
১·৫০

কার্ল মার্কস
ভারত চীন হালের কালপঞ্জী
* ৩·৮৭

ভি. আই. লেনিন
প্রাচ্য জনগণের মুক্তি আন্দোলন
১·১২

সোভিয়েত ইউনিয়ন : আজ ও আগামীকাল ১·৩৬

বিজ্ঞানের বই
• পৃথিবী ও আকাশ ৩·৩৫ • সূর্যের নতুন সোভিয়েত আবিষ্কার ০·২৫ • শুভ পরমাণু ৩·৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ ১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি ১৩
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা—৯

দি ফিনিস্ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশন

হেলাসিন্‌কি, ফিনল্যাণ্ড

১,৩০০,০০০ টন ফিন্ দেশীয় কাগজের বিক্রয় প্রতিষ্ঠান

FINLAND

এজেণ্টস্ :

জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিমিটেড

বম্বে — মাদ্রাজ — কলিকাতা — নিউদিল্লী

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

দিনান্তের রঙ

দাম—সাড়ে ছয় টাকা

অন্যান্য সাম্প্রতিক প্রকাশন

বুদ্ধদেব বসুর

জাপান জর্নাল

দাম—৩·৫০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন প্যালেস্টাইন

দাম—৬·০০

ডঃ নীহাররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সঙ্গীত ও সাহিত্য

দাম—৭·০০

অতুলানাথ চক্রবর্তীর

ভারতে শাক্ত সাধনা

দাম—৭·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিঃ-৭৩

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
নিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গে	(আলোচনা) ...	শ্রীঅমলেন্দু বসু	২২৭
অপরূপ কথা	(আলোচনা) ...	শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়	২৩১
যোগাযোগ	(গল্প)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মিত্র	২৩৭
সেকালের সাহিত্য ক্ষেত্র	(আলোচনা)	শ্রীঅমলেন্দু বসু	২৬৫
হীরের আংটী	(গল্প)	শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য	২৬৮
স্বিচারিণী	(গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়	২৭১
রঙবেরঙ	(গল্প)	শ্রীইন্দু বসু	২৭৪
বিকার	(গল্প)	শ্রীসৈয়দ চৌধুরী	২৭৭
পাহাড়ের রঙ	(গল্প) ...	শ্রীসুধাংশু ঘোষ	২৮২

অংশগ্রহণে : শ্রীশৈলেন চক্রবর্তী শ্রীঅমলেন্দু বসু শ্রীঅরুণ বসু শ্রীইন্দু বসু শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুধাংশু ঘোষ শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য।

দাম : আড়াই টাকা

আলো হাসির উৎসব

আলোর রোশনাই···হাসি-ভরা উজ্জ্বল মুখগুলো···
আতসবাজী···সব মিলিয়েই তো উৎসব।
এমনি দিনের অপেক্ষায় থাকে সকলেই। আবার
এই দিনগুলি আরও উজ্জ্বল করে তোলার
জন্যে সকলেই পছন্দ করেন OSRAM —যে বাতিটি
আলোর জীবন ও উৎস।

Osram

আশ্চর্যজনক লাইফ

একটি GEC সামগ্রী

দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোং অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

BEC/G/261

শারদীয়

অমৃত

১৩৬৭

আশ্বিন মাস, বাতাসের মুখ ফিরেছে কিন্তু আকাশ এখনও মেঘমুক্ত নয়। অসময়ের বর্ষা, জলধারা ঢেলে শ্রাবণের ভর দোঁহরে, বিদায় নিতে যেন অনিচ্ছুক এ-কথা জানিয়ে দিচ্ছে। ওদিকে সেই বর্ষার মেঘ মাঝে মাঝে ঠেলে সরিয়ে, উজ্জ্বল নীল আকাশের জানলা খুলে সোনালী রৌদ্রকিরণের স্নিগ্ধ স্পর্শে ধরণীর সিক্তশ্যামল মুখে এক ঝলক হাসি ফুটিয়ে, অদূরে শরৎ যেন জানিয়ে দিচ্ছে, "আমি এসেছি, আমি এসেছি।

আকাশের এই আচ্ছন্ন ভাব সাধারণজনের মনের অবস্থারই মত। চতুর্দিকে শোনা যায় অভাব-অনাটনক্লিষ্ট জনগণের অনুযোগযুক্ত দাবীদাওয়ার চিৎকার। এবার বর্ষার জল পর্যাপ্ত হয়নি, সময় মত বারিষণও হয়নি, সুতরাং চাষী গৃহস্থের মনে দুশ্চিন্তা রয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে গৃহস্থ-সাধারণের মনে খাদ্য মূল্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা।

তবু সকল বিক্ষোভ অশান্তির কোলাহল ভেদ করে, এই মেঘ-ঢাকা আশ্বিনের দূরন্ত বাতাসে ভেসে আসছে সেই দূরের বাঁশিতে ধ্বনিত আগমনীর সুর, যার জন্য বাংলার নরনারী, আবালবৃদ্ধবণিতা, উতলা মনে ব্যাকুল-হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে আছে সারা বছর। সাড়া পড়ে গেছে ঘরে ঘরে, সকলের মনে, সেই দূরের বাঁশির রণনে। কয়েকদিনের মত অভাব-ক্লিষ্ট বাঙালী-গৃহস্থ তার নিরানন্দ জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশার চিন্তা মুছে ফেলে, অনাবিল আনন্দের পুলক উপভোগ করে, উৎফুল্ল হয়ে যাবে আনন্দময়ীর আগমনে।

মাগো, দুর্গতিনাশিনী! তোমার সন্তানদের সকল দুর্ভোগ দুর্দশা যেন দূর হয়ে যায় তোমার প্রসন্ন-উজ্জ্বল মুখের জ্যোতিতে। তুমি তো চৈতন্যরূপিণী, তোমার সন্তানদের অন্তরে চেতনা দাও, মুক্ত কর তাদের আত্মঅবিশ্বাস ও দায়িত্ব-বিস্মৃতির মোহবন্ধন থেকে। তোমার আশীর্বাদে তাদের এই ক্ষণিকের আনন্দ যেন চিরকল্যাণে পরিণত হয়, মা কল্যাণময়ী।

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা

॥ ১ ॥

বরফঢালা উত্তর বাতাসএ,—
ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙানো,—
কুয়াসাতে ভারি,
এরি তলায় এ কাচমহল,—
ঠুন্‌কো ভারি পল্‌কা
একেবারেই হাল্কা,—
যেন পরীস্তানের ময়ূর-পংখী পাল্সিটি,
সায়র-নীল ছায়ার ঘোর ধরা
বুদ্বুদ একটি যেন সাতরঙা।
পাল্‌তোলা কাচের ঢাকনিদেওয়া রঙমহল—
রঙন ফুলের রেণুমাখা কাচ-পাখনা মৌমাছির
ছেড়ে যাওয়া মৌচাকটির প্রায়,—
—শূন্য পড়ে আছে ভাঙা বাগানে ॥

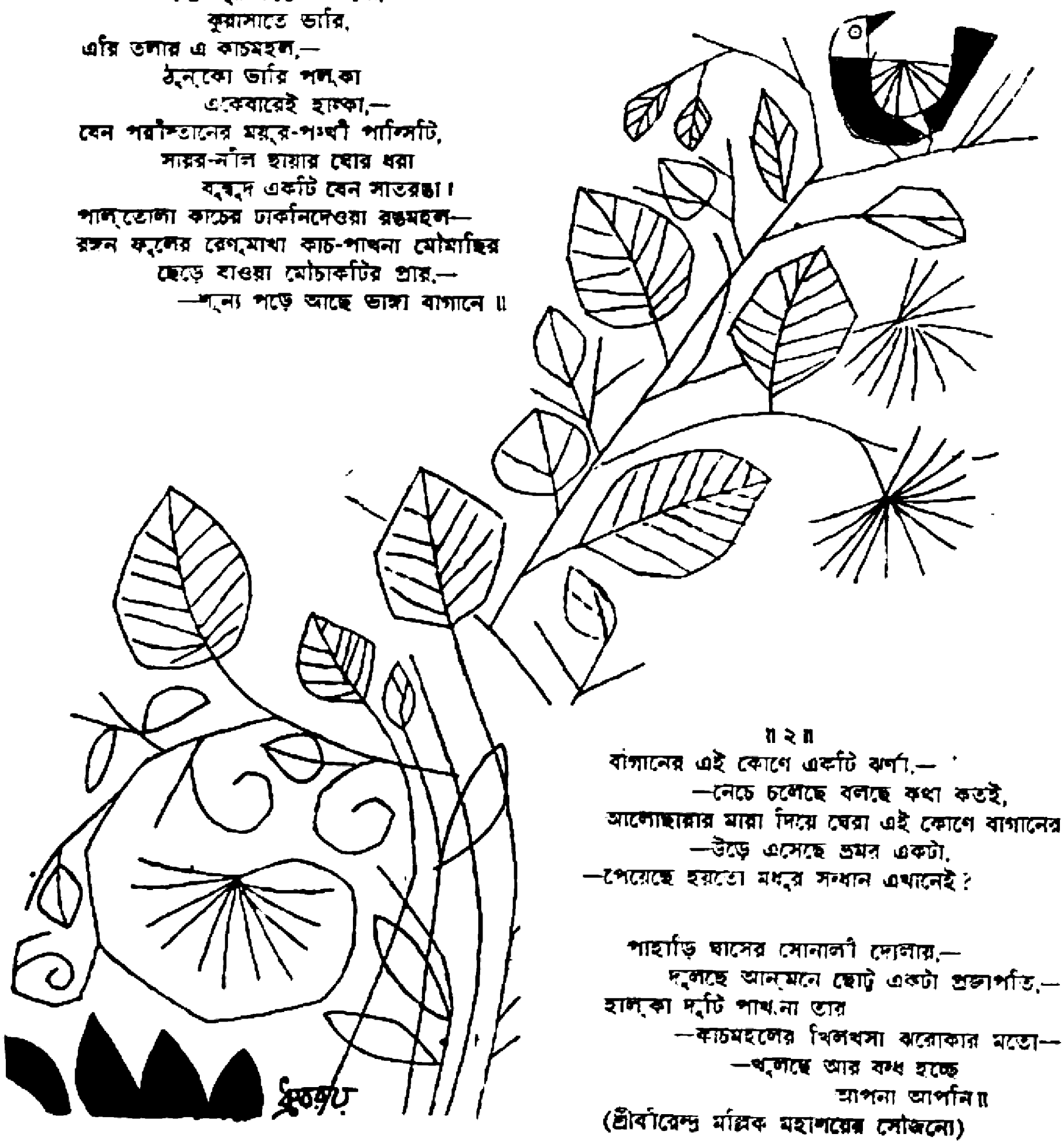

॥ ২ ॥

বাগানের এই কোণে একটি ঝর্ণা,—
—নেচে চলেছে বলছে কথা কতই,
আলোছায়ার মায়া দিয়ে ঘেরা এই কোণে বাগানের
—উড়ে এসেছে ভ্রমর একটা,
—পেয়েছে হয়তো মধুর সন্ধান এখানেই?

পাহাড়ি ঘাসের সোনালী দোলায়,—
দুলছে আন্‌মনে ছোট্ট একটা প্রজাপতি,—
হাল্‌কা দুটি পাখ্‌না তার
—কাচমহলের খিলখসা ঝরোকার মতো—
—খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে
আপনা আপনি ॥

(শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সৌজন্যে)

কালে ফিরে যাওয়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

"রানীদি" বলে ফটকের কাছ থেকে ডাক দিয়ে সাড়া পেলেন না বিজয়মাধব। বারান্দায় উঠে জুতো ঠক ঠক করে গলা খক খক করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বাইরে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে একনজরে দেখে নিলেন দৃশ্যটা।

মালীর এক হাতে ছেঁড়া কাগজের টুকরি আরেক হাতে দেশলাই। সুলক্ষণ সেই টুকরিতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বার করে আনছেন টুকরোর পর টুকরো। পরীক্ষা করে দেখছেন, মাথা নাড়ছেন, আবার ঢোকাচ্ছেন, আবার মাথা নাড়ছেন, এক আধবার খুশি হয়ে সাজিয়ে রাখছেন টেবিলের উপর। অবশেষে মালীর হাত থেকে টুকরিটা কেড়ে নিয়ে মেঝের উপর উপুড় করলেন তিনি। ছেঁড়া কাগজের গাদার ভিতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগলেন টুকরোর পর টুকরো। দুটো একটা টুকরো তাঁকে খুশি করে। সাজিয়ে রাখেন। বেশির ভাগ তাঁকে নিরাশ করে। সরিয়ে রাখেন।

"আসতে পারি?" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকে পড়লেন বিজয়মাধব।

"আরে! আরে। কী মনে করে?" সাগত জানালেন সুলক্ষণ।

"কই, রানীদি কোথায়? এসেছি একটা খবর দিতে।" আহ্লাদে ফেটে পড়ার মতো মুখ বিজয়ের। যেন দিগ্বিজয় করেছেন।

"রানী কলকাতা গেছেন। পরশু ফেরবার কথা। তার পর? খবরটা কী

বিজয় তো বিজয়বার্তা শোনাতেই এসেছিলেন। বললেন, "নাতি হয়েছে।"

সুলক্ষণ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করতে হলো। ছেলের ঘরের নাতি। ভাবা, কত বড় একটা সৌভাগ্য।

"কিন্তু ব্যাপার কী, বলুন দেখি, দাদা? এত ছেঁড়া কাগজ নিয়ে করছেন কী? সোনাদানা কিছু ভুল করে ফেলে দিয়েছিলেন বুঝি কাগজের টুকরিতে?" বিজয়মাধব বললেন রসিকতা করে।

"সোনাদানা কোথায় পাব, ভাই!" মৃদু হাসলেন সুলক্ষণ। "তবে তার চেয়ে কম দামীও নয়। জানেন তো বিয়োগান্ত পুরোনো চিঠিপত্র জমতে দেন না। ছুনী জন্মাবার অগ্নিদেবতাকে অর্পণ করেন। আমিও মাঝে মাঝে পুরোনো চিঠিপত্র

নিয়ে বসি, অকুলি রাখবার সেফটিল রাখি, সেফটিল না রাখলেও চলে সেফটিল ছিঁড়ে ফেলি। পার্টিশনের সময় অনেক দরকারী চিঠি বা প্রিয় চিঠিও পুড়িয়ে ফেলে এসেছি। কাল রাত্রে মনে হলো যে পার্টিশনের পূর্ববঙ্গের চিঠিপত্র এখনো কিছু কিছু রয়েছে। কী হবে ভেবে! যুগটাই যখন শেষ হয়ে গেছে। মিছে মায়া!" সুলক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

"বুঝেছি। পূর্ববঙ্গের মায়া কাটিয়েছেন।" বিজয় বললেন, "তাহলে কেন আবার ঘাঁটাঘাঁটি করছেন? একটা জিনিস ভুলতে কতক্ষণ লাগে? ভেলো আবার জোড়া দিতে কে জানে কতকাল!"

"তাই তো দেখছি। সকালে উঠে মনে হলো কাজটা ভালো করিনি। অন্তত একখানা চিঠি বার করে তুলে রাখা উচিত ছিল। অতীতের সাক্ষী হিসেবে। সেখানা যে কোন্‌খানা তাও মনে পড়ল। ওদিকে দলটিকে বলা হয়ে গেছে বাগান নিয়ে গিয়ে নিরাপদে জ্বালিয়ে দিতে। সেও ঠাকুরের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে এসে টুকরিতে হাত দিয়েছে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভস্ম হয়ে যাবে পঁচিশ বছরের সঞ্চয়। এখন আমি করি কী? আমি তো বিনোদা নই। আমার মায়া আছে।" সুলক্ষণ করুণ স্বরে বললেন। আর জোড়া দেওয়া টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বুঝেছি। খুঁজে খুঁজে জোড়া দিচ্ছেন।" বিজয় অনুকম্পার সঙ্গে হাসলেন।

"জোড় মিলছে আবার মিলছে না। ফাঁক ভরছে আবার ভরছে না। উল্টো পিঠের লেখা সামনের পিঠের লেখার থেকে হুবহু করে সাজাতে হচ্ছে। বার বার নতুন করে সাজাচ্ছি। আরো অনেকগুলো টুকরো আছে এই গাদার ভিতরে। লেগে থাকলে মিলে যাবে সব কটাই। কিন্তু সারা দিনটাই হয়তো মাটি হবে। তাই তো ভাবছি, ইজ ইট ওয়ার্থ ইট?" সুলক্ষণ গাল হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

"তা আমি কী করে বলব?" বিজয়বাবু দুষ্টু হাসি হাসলেন। "প্রেমপত্র হয়ে থাকলে আলবৎ ওয়ার্থ ইট। এই তো তার সুযোগ। রানীদি বাড়ী নেই।"

"আপনিও যেমন!" সুলক্ষণ রঙ্গিন হয়ে বললেন, "বিবাহিত পুরুষের প্রেম পড়বে কে? তবে, হাঁ, একখানা চিঠি একবার এসেছিল বটে। গৃহিণীকে দেখাই। তাঁর মুখটি লক্ষ্য করে চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলি। ভয়ে ভয়ে ছিঁড়ে। এখনো মেখানা নয়।"

"তা হলে", ভদ্রলোক নিরুৎসাহ করে বিদায় নিলেন, "নট ওয়ার্থ ইট।"

"এই হলো আপনার মূল্যবোধ!" সুলক্ষণ হেসে বললেন, "প্রেমপত্র ছাড়া আর কোনো পত্রের কোনো মূল্য নেই—ইন দি লং রান!"

বিজয়মাধব একটু অপ্রস্তুত হলেন। "চলিল টলিল হলে রাখবেন বইকি। মনে হচ্ছে এভিডেন্স হিসেবে দাম আছে। একটু আগেই তো বলছিলেন অতীতের সাক্ষী।"

"আরে, না, না। সেরকম কিছু নয়। সাধারণ একখানা চিঠি। কারো কাছে কোনো দাম নেই তার। তবু কমদামী নয়। কিন্তু এখন এই গন্ধমাদন ঘেঁটে বিশল্যকরণী বার করা কি আমার কাজ! সামনে যা সাজিয়েছি তার থেকে মোটা-মুটি একটা অন্দাজ হয় কী ছিল চিঠি-খানাতে। প্রত্যেকটি শব্দ পুনর্গঠন করা যায় না, প্রত্যেকটি বাক্যও না। তবু মোটের উপর একটা আইডিয়া তো হয়। বাকীটা", সুলক্ষণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতে পারি।"

বিজয়মাধব বিজয়ীর মতো বললেন, "হতো যদি প্রেমপত্র তা হলে আজ আপনি এত সহজে হাল ছেড়ে দিতেন না, যখন জানেন যে প্রত্যেকটি বাক্য—প্রত্যেকটি শব্দ—ওই স্তূপের ভিতরেই রয়েছে। যৌথবন্ধনের স্তূপে যেমন থাকে দশ আর-আশিক্য।"

চা এসে পড়ল। মলাটকে ইঙ্গিত করতেই সে আবার ছেঁড়া কাগজ টুকরিতে পুরে দেশলাই দিয়ে পোড়াতে নিয়ে চলল। শুধু একটি কি দুটি টুকরো সুলক্ষণ কুড়িয়ে নিয়ে কাছে রাখলেন। স্মারকরূপে।

"হাঁ। আমাদের স্মৃতিরও ধরন এই। পঁচিশ বছরের পুরোনো ঘটনার একটা কি দুটো টুকরো মনে থাকে বা কেউ মনে পড়িয়ে দেয়। আর সব থাকে অবচেতনের ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে। সেসব পোড়ানো যায় না। ইচ্ছে করলে খুঁজে খুঁজে সাজানো যায়। কিন্তু কার অত সময় আছে। কদিনের পরমায়ু। তা হলে মূল্যই বা কতটুকু। মূল্য সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সেইজন্যে ওই দুটি একটি টুকরোর সাহায্যে বাকীটা কল্পনা করে নিতে হয়। উপায় নেই। বড় বড় ঐতিহাসিকদেরও পদ্ধতি এই।" সুলক্ষণ হালকা করে বললেন, "আফটার অল, কী আসে যায়!"

[illegible] বিজয়মাধব বললেন, "পঁচিশ বছর পুরে যে ঘটনা ঘটেছে?"

"হাঁ। তখন আমার বয়স কম। সে সময় কুমিটোয়।" সুলক্ষণ নির্লিপ্তভাবে বললেন, "এখন সেটা পূর্ব পাকিস্তানে। ইচ্ছে করলেও অবাধে যেতে পারিনে।"

"যদি ইচ্ছে করে আপনার!" অবাক হলেন ভদ্রলোক। "আমি তো আর ওমুখো হতেই চাইনে, দাদা। কোন্ মুখে যাব! আমি যে এখন এলিয়েন। যা একটা পোশাওয়ারী কি আফ্রিদিও নয়। সর্বস্ব গেছে, তার জন্যে আমার আফসোস নেই। পূর্ববঙ্গ আমার কাছে পূর্বজন্মের স্মৃতি।" বিজয়মাধব মনে মনে সেদিকের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"অনেকদিন পর্যন্ত একটা অনির্দেশ্য ব্যথা অনুভব করেছি।" সুলক্ষণ ধীরে ধীরে বললেন, "ব্যথাটা মনের। তবু দেহের ব্যথার মতোই তার বোধ। একটু একটু করে উপলব্ধি করলুম যে, ওটা আসলে একপ্রকার হোমসিকনেস। পূর্ববঙ্গের জন্যে।"

"আপনার বাড়ী কী পূর্ববঙ্গে?" জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

"না। পূর্ববঙ্গে নয়। সেইখানেই তো রহস্য।" আপন মনে বলতে লাগলেন সুলক্ষণ। "একটু একটু করে ধরতে পারলুম যে, আমার হোমসিকনেসটা দেশের জন্যে নয়। কালের জন্যে। দেশে ফিরে যাওয়া হয়তো বা একদিন সম্ভব হবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে যাকে দেখতে চাই তাকে দেখতে পাব না। যাকে দেখতে পাব তাকে দেখতে চাইব না। কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারছিনে, ভাই।"

"বুঝেছি। আপনার হোমসিকনেসটা দেশের জন্যে নয়, একটা বিশেষ সময়ের জন্যে, তো অতিক্রম করে এসেছেন।" বিজয়মাধব চিন্তা করে বললেন।

"কিংবা বলতে পারেন আমার হোম-সিকনেসটা দেশের জন্যে, সে দেশ কোনো একটা দেশ নয়, কালের একটা বিন্দু।" সুলক্ষণ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন।

"আমার পক্ষে একটু বেশি গভীর।" হাসলেন বিজয়বাবু।

"দেশ যেমন সত্য কালও তেমনি সত্য, এটা যদি মেনে নেন তবে অত গভীর মনে হবে না। যেটার প্রতি সবচেয়ে আকর্ষণ সেইটেকেই তো লোকে হোম বলে। আমার টান সেইরকম একটা বিন্দুর উপরে, কিন্তু সেটা স্পেসের নয়, টাইমের। সেটাকে আমি রেখে এসেছি বৃন্দাবনে। আর সেখানে ফিরে যেতে পারছিনে। তবু ইচ্ছে করে কালের সেই বিন্দুকে দেখব সেই বিন্দুতে গিয়ে

ডাব নিতে। ওহ, তুমি আছো তো? জানি সাড়া মিলবে না। কেননা, সেই স্থান থাকলেও সেই কাল আর নেই। দেশে ফিরে যাওয়া কালে ফিরে যাওয়া নয়। শুধু ইচ্ছে করে কালে ফিরে যেতে। দেশের সঙ্গে জড়িয়ে।" একটা জটিল ওড়কে যতদূর পারা যায় সরল করে বললেন সুলক্ষণ।

বিজয়মাধব আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এতে ভালো লেগেছিল কুষ্টিয়া! কিন্তু কেন, বলুন তো দেখি? আমি তো ও পথ দিয়ে অসংখ্যবার যাওয়া আসা করেছি। একটা কাপড়ের কলের চিমনী ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব দেখিনি।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সুলক্ষণ। "ফিলিস্টিন আর কাকে বলে!"

বিজয়মাধবও পাল্লা দিয়ে হাসলেন। "কী মোহিনী জানো, সখা, কী মোহিনী জানো! মোহিনী মিলের সাইরেন কি এতই ভালো লেগেছিল!"

খানিকক্ষণ হাসাহাসির পর সুলক্ষণ স্মৃতির অতলে ডুব দিলেন। বিজয়মাধব জাল পেতে বসে থাকলেন। কান পেতে।

(২)

"কুষ্টিয়ায় বদলি হয়েছি শুনে আমিও উৎসাহ বোধ করিনি।" বলতে শুরু করলেন সুলক্ষণ। "কুষ্টের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ছিল। বন্ধুরা ভয় দেখিয়েছিলেন যে নির্ঘাত ম্যালেরিয়ায় ধরবে। কিন্তু ওখানকার চার্জ নিয়েই দেয়ালজোড়া মানচিত্রের উপর যেই চোখ রাখলুম অমনি আমাকে হাতছানি দিল পদ্মা। তার শাড়ীর নীল পাড় আমার চোখে সুরমা এঁকে দিল। পদ্মা! পদ্মা! ওঃ! সমস্ত উত্তর সীমান্তটা জুড়ে পদ্মা। ওঃ! কতখানি পদ্মা! কতখানি চওড়া নীল পাড়! কী করব আমি অতখানি নীল পাড় নিয়ে! অতখানি পদ্মা নিয়ে! এ যে আমার কল্পনার অতীত। শহরটা পদ্মার ধারে নয়, গোরাই নদীর ধারে। পদ্মার ধারে হলে আমি আদালতের কাজে মন দিতে পারতুম না। পদ্মার ধারে বসে আপিস করতুম।"

বিজয়মাধব বললেন, "কবির খেয়াল।"

"শুনলুম ওখানে এক সাহেব কোম্পানীর একটা লঞ্চ আছে। কল করলুম। কথাবার্তার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম লঞ্চ পেতে পারি কি না। পদ্মায় টুর করা একান্ত আবশ্যক। ডিরেক্টার বললেন লঞ্চখানা ইনশিওর করার সময় অঙ্গীকার করতে হয়েছে যে কোম্পানীর নিজের লোক সঙ্গে না থাকলে ধার কিংবা ভাড়া দেওয়া চলবে না। হতাশ হতে হলো। মহকুমার আর কারো লঞ্চ ছিল না। সরকারী লঞ্চের জন্যে কলকাতায় চিঠি লিখলে কালেক্টার ও কমিশনারের জোর সুপারিশ ছাড়া ফল হতো না। কেনই বা তাঁরা সুপারিশ করবেন? কী এমন এমারজেন্সী? মহকুমা হাকিমেরা লঞ্চের হকদার নন। হাউসবোটের খোঁজ নিতে হলো। পাওয়া গেল। কিন্তু ওটা পদ্মার যাবার মতো করে তৈরি হয়নি। যায়ওনি। কাজেই আমার পদ্মায় বেড়ানো হলো না। যা হলো তা পদ্মার তীরে তাঁবু ফেলা। মহকুমার যে নদীর দৈর্ঘ্য তিশ মাইল কি তারও বেশি তার তীরে শক্ত মাটি ও ফাঁকা জায়গা প্রচুর নয়। জুনিয়াদহ বলে একটা নামকরা গ্রামে উপযুক্ত ঠাঁই মেলে।"

"সেখানে রানীদিকে নিয়ে যাননি?" জানতে চাইলেন বিজয়।

"নিশ্চয়। আমার আনন্দের ভাগ তাঁকে না দিলে কাকে দেব? বাচ্চারাও সঙ্গে ছিল। লোক লস্কর। সুইস কটেজ তাঁবু। সপরিজনে পদ্মাতীরে বাস। পদ্মাও আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আশেপাশের ইউনিয়নগুলোর থেকে আহ্বান আসে। সকালে বিকেলে সাইকেলে চড়ে ঘুরে আসি। রাত কাটে তাঁবুতে। বেশ চলছিল, কিন্তু গোলাপেও কাঁটা থাকে, নন্দনকাননেও সাপ থাকে।"

বিজয়মাধব চমকে উঠলেন। "আ! আ!"

"আমি তো কিছুই টের পাইনি। মনের আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছি। চিৎ সাঁতার কাটছি পদ্মার বুকে। রোজ কাটি। কাটতে এমনিতেই ভালো লাগে। পদ্মার বুকে তো পরম সৌভাগ্য। এমন সময়—না, আপনি সহ্য করতে পারবেন না।"

বিজয়মাধব আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "ডুবে গেলেন?"

"হা হা!" হেসে বললেন সুলক্ষণ, "সাঁতার আমি পাটনার গঙ্গার আধখানা অবধি করেছি। একদিন আধদিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।"

"তা হলে কী! বলুন, বলুন। খুলিয়ে রাখবেন না।" বিজয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"একটা গোলগোল কানে এলো। চেয়ে দেখি গৃহিণী ছুটোছুটি করছেন। বাদল চিৎকার করছে। ভাবলুম একটা কিছু অনর্থ ঘটেছে ডাঙাতেই। প্রাণপণে ডানা দুটোকে চালাই। পৌঁছে যাই তীরে। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে শুধোই, কী হয়েছে, বাদল? বাদল আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি ডাঙায় উঠে আবার শুধোই, কী হয়েছে, বাদল?" সুলক্ষণ হাসলেন।

"বাদলটি কে?" বিজয়বাবু প্রশ্ন করলেন। "আপনার ছেলে?"

"আমার চাপরাশি। রূপ দেখে মনে হয় বাইশ তেইশ বছর বয়সের নওজোয়ান। নাম শুনে হিন্দু। বহুবখানেক পরে আবিষ্কার করলুম ওর ছেলেরই বয়স বাইশ তেইশ হবে। হয়ে মুরারে! মুসলমান।" সুলক্ষণ হাসতে হাসতে বললেন, "তখনকার দিনে স্বিজাতিতত্ত্ব ছিল না। বাদলের পরনে ধুতী, মুখে দাড়িগোঁপ নেই।"

"ওদিকে অনর্থটা কী ঘটল বললেন না যে?" বিজয়বাবু উদ্দীপন।

"আগে শুনলে আমার হাত পা ভয়ে কাঠ হয়ে যেত, আমি সাঁতরাতে পারতুম না, অবশ হয়ে ভূমীরের মুখে পড়তুম!" সুলক্ষণ সহজভাবে বললেন।

"কুমীর!" ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠলেন।

এর পরে সুলক্ষণ বললেন তাঁর গভীরতর উপলব্ধির কথা। কুষ্টিয়া হলো লালন ফকিরের দেশ। এখনো সে ধারা মিলিয়ে যায়নি। বাউল ফকিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেটা একটা পরম লাভ। সমসাময়িকের ঊর্ধ্বে তাঁদের স্থিতি। তাঁদের দেখে হিন্দু মুসলমানের ভেদবুদ্ধি জাগে না। ওসব লেবেল তাঁদের জন্যে নয়। "মানুষ" বলে একজনের অস্তিত্বই তাঁরা মানেন। এই মানুষে আছে সেই মানুষ।

"আনন্দেই ছিলুম আমরা সেখানে। সকলের সঙ্গে মিশেছি, সবাইকে ভালোবেসেছি। সকলের ভালোবাসা পেয়েছি।" সুলক্ষণ তন্ময় হয়ে বলতে লাগলেন, "ছোটখাটো আলপিনের খোঁচা যে না খেয়েছে যে তাই মনে থাকবে এত কাল! মানুষ কি এ জগতে এসেছে তুচ্ছ কথা নিয়ে জীবন ভোর করে দিতে! তার চেয়ে ঢের বড় কথা আমি সাঁতারের বাংলাদেশকে দেখেছি, বাঙালীকে দেখেছি, দেখেছি বাংলাদেশের হৃদয়স্বরূপ পদ্মাকে, বাঙালীর হৃদয়স্বরূপ বাউল বৈষ্ণবদের। রস যাকে বলে তা আমি আস্বাদন করেছি। পৃথিবীতে তারই জোরে আমরা দাঁড়াব। তারই জোরে কবিগুরু নোবেল প্রাইজ জয় করে এনেছিলেন। হাঁ, শিলাইদহেও কতবার গেছি। কুঠিবাড়ীতে থেকেছি।

পূজার আনন্দোৎসবে

লক্ষ্মী ঘি

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

পটচিত্রে বসন্তের পূজা-ঐতিহ্যমণ্ডিত চন্দ্রকান্ত বাদ্য খুঁটি-এর বিখ্যাত
রাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশের [illegible]

কিন্তু পদ্মা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। মাঝখানে চর ও ঝোপঝাড়।"

(৩)

"আপনি কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিলেন," বিজয়মাধব বললেন, "ছেঁড়া চিঠির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। কবেকার চিঠি তা তো বুঝলুম। কিন্তু কার চিঠি? কী ছিল সে চিঠিতে? অবশ্য গোপনীয় হয়ে থাকলে বলতে হবে না আমাকে।"

"না, না। গোপনীয় নয়।" সুলক্ষণ আশ্বাস দিলেন। "আস্ত থাকলে আপনাকে দেখাতেও পারতুম। এই ছুটো টুকরো দেখে আপনি কতটুকু বুঝবেন? মেয়েলি হাতের লেখা। হাঁ। একটি মেয়ের লেখা।"

বিজয়মাধবের চোখে হাসির ছটা। "কেমনি? বলেছিলুম কি না! প্রেমপত্র?"

"না। প্রেমপত্র নয়। কিন্তু পট-ভূমিকাটা আরো একটু বিশদ করা দরকার।" সুলক্ষণ বলতে লাগলেন, "সন্ত্রাসবাদের যুগ তখন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু দুই শিবিরের মনো-মালিন্য সমান তীব্র। বোধহয় আরো তীব্র। কারণ সন্ত্রাসবাদীরা হেরে গেছে। আর ইংরেজরা পরাজিতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক রোষেরবাদ, যাতে তারা আর মাথা তুলতে না পারে। এটা শুধু তরুণের আঘাত না করে তারা হিন্দুসমাজকেই আঘাত করেছে। হিন্দু-সমাজের প্রতিবাদটা গিয়ে লেগেছে মুসলমান সমাজের মনে। মুসলমানরা ভাবছে হিন্দুরা কেমন হিংসুটে, আমরা কিছু পেলে তাদের গা জ্বালা করে। তারা যে পেয়ে এসেছে দেড়শ' বছর ধরে তার বেলা! বাংলাদেশের কথা লেখে আমি তার নাম দিই 'হার্টব্রেক হাউস'। অহরহ আমাকে বাধা দিত তার অপ্রকৃতিস্থতা। আমার চোখের সামনেই ভাবের দিক দিয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল আমার দেশ। ক্ষেত প্রস্তুত হচ্ছিল তখন থেকেই বারো বছর পরে যা ফলল সেই ফসলের। সোনার বাংলা অবশেষে মুকুল প্রসব করল। যখনকার কথা বলছি তখন প্রসবযন্ত্রণার অনেক দেরি, কিন্তু গর্ভযন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেছে। শুধু বোঝা যাচ্ছে না সেটা কিসের পূর্বাভাস।"

বিজয়মাধব বললেন, 'আমি তো ধরে নিয়েছিলুম ওটা ইংরেজের চাল-বাজি।"

"ছেড়ে দিন ওসব ইতিহাসের উপরে।" সুলক্ষণ উদাসীনের মতো বললেন, "শুধু মনে রাখলেই হবে যে, বাংলাদেশ বলে যে সত্তাটি ছিল সেটি দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়াল 'হার্টব্রেক হাউস'। কারো মনে সুখ রইল না। চারদিকে এমন অপার্থিবের সৌন্দর্য! যাকে অমর করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আপনার লোকের মতো থাকছে না, পরের মতো হয়ে যাচ্ছে। একে অমর করে রেখে কে? এটা কি অমর করে রাখার মতো জিনিস? এই হার্টব্রেক হাউসে বাস করে কে কী সৃষ্টি করতে পারে যা অমর হবে? এক যদি পদ্মাকে নিয়ে, পল্লীপ্রকৃতিকে নিয়ে, বাউলদের নিয়ে পড়ে থাকি তো অমর সৃষ্টি সম্ভবপর। আর নয়তো নরনারীপ্রেম নিয়ে।"

"আমরা পাঠকরা লেখকদের এসব সমস্যার ধার ধারিনে।" বললেন বিজয়-মাধব।

"আপনারা ছেলেমানুষ, মাথা নেই। কিন্তু ভেবে দেখবেন আমি কোনখান থেকে সে খবরে আপনাদের কাজ নেই।" সুলক্ষণ একটু হাসলেন। "না থাকাই ভালো। আমার তখন সব খেয়েও চিত্তপ্রসাদ নেই। একটা প্রশ্ন বাধা আমাকে ভিতরে ভিতরে অপ্রসন্ন করে

আপনার লাবণ্যের রেমী

প্রসাধন

কোল্ড ক্রীম, স্নো, পাউডার, হেয়ার অয়েল, সাবান এবং ব্রিলিয়ানটাইন ও পোমেড ইত্যাদি

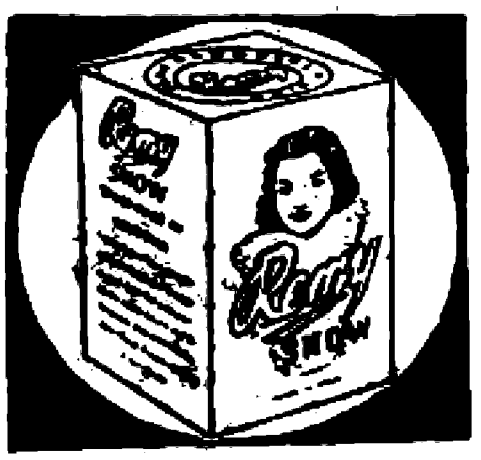

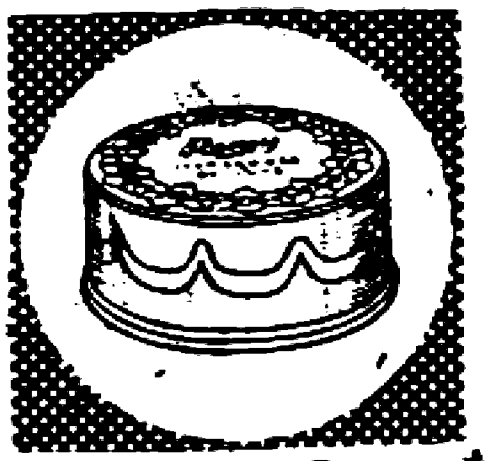

একমাত্র পরিবেশক:
এ. ভি. আর. এ. এণ্ড কোং বোম্বাই ২ - কলিকাতা ১ - মাদ্রাজ ১

রাখে। বিশেষ ভাষ্যে উপরে নয়। লাম্ভরের মতো আমারও মটো হলো—

"I strove with none, for
none was worth my strife.
Nature I loved and,
next to Nature, Art:"

এই যখন আমার মনের অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন আমার নামে একখানি চিঠি এলো। খুলে দেখি উপরে লেখা আছে 'সেনসর্ড' ও 'পাশ' করা হয়েছে।"

বিজয়বাবুর চক্ষু চড়কগাছ। "আপনার চিঠি সেনসর করে! এতবড় ধৃষ্টতা!"

"না করে উপায় কী? ওটাই জেলখানায় নিয়ম।" সুলক্ষণ মুচকি হাসলেন।

"বলেন কি! জেল থেকে চিঠি!" বিজয়বাবু স্তম্ভিত।

"যেমন তেমন জেল নয়। স্পেশাল জেল। নামটা স্মরণ নেই। খুব সম্ভব হিজলী। সেনসর করেছিলেন কমান্ডান্ট কি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট। ইংরেজীতে। চিঠিখানা কিন্তু বাংলায় লেখা। কোনোখানে কাটাকুটির চিহ্ন ছিল না। বোধহয় আপত্তিকর শব্দ বা বাক্য ছিল না। লেখিকা—" সুলক্ষণ আবার মুচকি হাসলেন।

"লেখিকা!" বিজয়বাবু শুনে থ।

"লেখিকা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। কোনো দিন তাঁর নামটা পর্যন্ত শুনিনি বা দেখিনি। আপনাকে আমি তাঁর পদবী বলব না। নাম মণিকা। আর যা আপনি জানতে চাইবেন তা আমারও অজানা। কত বয়স। কুমারী না সধবা না বিধবা। করেদী না ডেটিনিউ। কোন্ মামলার সঙ্গে জড়িত। না নিছক সন্দেহের সূত্রে গ্রেপ্তার। তবে এটা ঠিক যে তিনি সন্ত্রাসবাদী বলে গণ্য। জেলটা সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দী বা বন্দিনীদের। ওখানে অহিংসাবাদীদের রাখা হতো না।" সুলক্ষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আমি ভাবছি কোন্ মণিকা। দত্ত? ঘোষ? চট্টোপাধ্যায়? আমিও তো এককালে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগ রেখেছি। তবে জড়িয়ে পড়িনি। আমার মটো হলো ধরি মাছ না ছুঁই পানী।" বিজয়মাধব হো হো করে হাসলেন।

"পরদী আমি আপনাকে বলছিনে, ভাই। আমার কাছে ওই জিনিসটি আশা করবেন না। পাছে টের পান সেই ভয়েই তো মালীকে ডেকে ঝুড়িটা চালান করে দিলুম। এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কে জানে হয়তো হাতের লেখাও আপনার চেনা। তবে সে ক্ষেত্রে আমার আপত্তি নেই। চান দেখতে যে কটা টুকরো বাঁচিয়েছি? নিন। দেখুন।" সুলক্ষণ বাড়িয়ে দিলেন।

"না। চিনতে পারছিনে। চেনা কি সম্ভব পঁচিশ বছর বাদে? তা ছাড়া আমি যাঁদের কথা ভাবছি তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি ছিল না।" বিজয়বাবু ফিরিয়ে দিলেন।

চিঠিখানা রাজনীতিবর্জিত। নিছক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে ভরা।" সুলক্ষণ স্মৃতির সলিলে ডুব দিলেন। "এত ভালো মেয়ে, সাহিত্য এত ভালো বোঝেন, তবু বন্দিনী! আমার বই তিনি পড়েছেন। আরো পড়তে চান। কাহিনীটা শেষ না করে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। নায়ক নায়িকার কি মিলন হবে? কেন আমি অমন নিষ্ঠুর? মিলনের তো বাধা তেমন কিছু নেই। কাহিনীটা কি বানানো? না সত্যিকার? সত্যি ওরা আছে নাকি? বাকী খণ্ডগুলো যেন আমি চটপট লিখে ফেলি। তাঁর নিজের শরীর ভালো নয়। যদি না বাঁচেন তা হলে আফসোস থেকে যাবে।"

"এইবার বুঝেছি কোন্ মণিকা।" বিজয়মাধব বিজয়ীর মতো ভঙ্গীতে তাকালেন। ও মণিকা ঘোষ। যার কালাজ্বর হয়েছিল।"

"উঁহু। হলো না। হলো না।" হেসে মাথা নাড়লেন সুলক্ষণ।

"তা হলে মণিকা দত্ত। যার হয়েছিল অ্যানিমিয়া।" আঁধারে ঢিল ছুঁড়লেন বিজয়বাবু। "অ্যানিমিয়া থেকে দাঁড়ায়—"

"নেতি। নেতি। তা হলে বাকী থাকেন মণিকা চট্টোপাধ্যায় তো? আমি আগেভাগেই বলে রাখছি যে তিনিও নন।" সুলক্ষণ বিজয়কে পরাজয় করলেন।

"তা হলে কে? যাক, আপনি বলে যান। বাকীটা শুনি। আর কি কি ছিল চিঠিতে? ইংরেজের অত্যাচারের কোনো সাঙ্কেতিক আভাস? আপনার কাছে কোনো সাঙ্কেতিক প্রশ্ন? ভাষাটা সোজা বাংলা না একটু ঘোরালো?" ঠেরা করলেন বিজয়।

"অতি সহজ ও সরল বাংলা। কোনো হলচাতুরী নেই। ভাবতে অবাক লাগে ইংরেজরা কোন্ দোষে বন্দী করতে গেল অমন একটি নিরীহ মেয়েকে। কি ওঁর অপরাধ? নিশ্চয়ই কেউ ভুল খবর দিয়েছে। এমনও হতে পারে যে তিনি সরল বিশ্বাসে কাউকে আশ্রয় দিয়েছেন বা নিষিদ্ধ বইপত্র রেখেছেন। আমার কী! তবু মনে হলো আমিও তো গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখে বলতে পারি যে, মেয়েটি ভালো। তাঁর কেসটা যেন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। যেন তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।" সুলক্ষণের স্বর করুণ হয়ে এলো।

"লিখলেন তা হলে অমন একখানা চিঠি?" অধীর হলেন বিজয়মাধব।

"শুধু বদ্ না লিখ। লিখলে হয়তো আমাকেই কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হতো কেন আমার সন্ত্রাসবাদীদের উপর এত দরদ। তাঁরা হয়তো বিশ্বাসই করতেন না যে আমার দরদটা বিশুদ্ধ মানবিক। কে জানে হয়তো খুব খারাপ রেকর্ড তাঁর। হয়তো রিভলবার রাখাঢাকার ব্যাপার। পুলিশে তো আমার শত্রু বড় কম ছিল না। কেন ওদের হাতে একটা হাতল দিই?" সুলক্ষণ আপনার হয়ে জবাবদিহি করলেন।

"বুঝেছি।" বিজয়বাবু বাধা করলেন, "আপনার মটো চাচা আপনা বাঁচা। ছেড়ে দিন বড় বড় বুলি। তারপর?"

"তারপর সুযোগের অপেক্ষায় রইলুম। যদি কোনো ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, যার কাছে কথাটা পাড়া যায়। ওদের মধ্যে উদারচরিতের অভাব ছিল না। যাঁদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। দু'পক্ষে একটা কমন গ্রাউন্ডও তো ছিল। ফাসিজমের উপর ঘৃণা। হিটলার দিন দিন উদ্ধত হয়ে উঠছিল।" সুলক্ষণের মনে পড়ে যাচ্ছিল সে কথা।

বিজয়মাধব অধৈর্য হয়ে বললেন, "মণিকার চিঠির জবাব দিলেন? না তার বেলাও চাচা আপনা বাঁচা?"

"দিলুম বইকি।" সুলক্ষণ হেসে বললেন, "তার বেলা ধরি মাছ না ছুঁই পানী। যাতে সেনসর না হয় সেইজন্যে অতি সন্তর্পণে লিখলুম। পুরোদস্তুর সাহিত্যিক চিঠি। লিখলুম, লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের উপর লেখকের জোর খাটে না। তারা পুতুলখেলার পুতুল নয়। তারা স্বাধীন মানুষ। তারাই লিখিয়ে নেয়, লেখককে স্বাধীনতা দেয় না। তারা যদি মিলতে না চায় আমি কি করে মেলাব? জোর করে? ওরা যখন বিদগ্ধ পাঠকের দরবারে নালিশ করবে তখন আমি যে হেরে যাব। তার চেয়ে ওদের খুশিমতো ওদের বাঁচতে দেওয়াই ভালো নয় কি? মিলবে না হয়তো, কিন্তু বাঁচবে। ওরা যদি বাঁচে তো ওদের ভিতর দিয়ে আমিও বাঁচব। বোন, আপনাকেও বাঁচতে হবে। কাহিনী যত দীর্ঘ হবে তার চাইতেও দীর্ঘ হবে আপনার জীবন। আরো, আরো দীর্ঘ।"

"এই? আর কিছু নয়?" বিজয়বাবু নিরাশ হলেন।

"না। আর কিছু নয়। তিনি আমার কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। আমিও তাঁর কাছে একটা মেসেজ পাঠালুম। এর চেয়ে বেশি হলে হয়তো মেসেজটাই পৌঁছত না। পৌঁছল যে, তাই বা কেমন করে বলি? পরে আর কোনো চিঠি পাইনি। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে কোথাও যেন পড়েছিলুম ওই নামের একটি মহিলার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তিনিই কি না অনুসন্ধান করিনি। রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটে। নতুন নতুন সমস্যার উদয় হয়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, তারই মাঝখানে এক সময় আগস্ট মাসের বিদ্রোহ। মণিকাকে আমি ভুলে যাই। অনেক, অনেক বছর পরে সেকালের এক রাজবন্দিনীর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করি তিনি চিনতেন কি না মণিকা বলে কোন রাজবন্দিনীকে। পদবীটাও বলি। তিনি চিনতেন। তখন আমি জানতে চাই মণিকা এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন। ভদ্রমহিলা তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। মণিকা কবে মারা গেছে! টি বি হয়েছে দেখে ওরাই ছেড়ে দেয়। সারে না। দিন দিন বেড়ে যায়।" সুলক্ষণের কণ্ঠ রোধ হলো আবেগে।

"সত্যি! বড় দুঃখের বিষয়।" সমবেদনা জানাতে গেলেন বিজয়।

"ভদ্রমহিলার ধারণা খবরটা যথাকালে আমার কানে পৌঁছেছে। মণিকা নাকি আমার কথা বলতেন। চিঠিও নাকি লিখেছিলেন আমাকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন আমার ধারাবাহিক উপন্যাসের পরিণতি। কাহিনীটার শেষ জেনে যেতে পারলেন না। সত্যি, এর মতো দুঃখের বিষয় কী হতে পারে!" সুলক্ষণের কাছে।

বিজয়মাধবকে এবার চিন্তান্বিত মনে হলো। সুলক্ষণ গাঢ়স্বরে বলতে লাগলেন, "একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলুম। কার লেখা মনে নেই। অন্ধকার রাত্রে অকূল সমুদ্রবক্ষে জাহাজরা চলেছে। কোথাকার এক জাহাজ কোথাকার এক জাহাজকে দূর থেকে সিগনাল করে। সিগনালের উত্তরে সিগনাল পায়। তার পর দুই জাহাজ দুই দিকে অদৃশ্য হয়।"

এর পর নীরবতা।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করলেন বিজয়-মাধব। "আমি জানি এ কোন্ মণিকা।"

"আপনি তাঁকে জানতেন? সত্যি?" উদ্ভাসিত হলেন সুলক্ষণ।

"জানব না? মণিকা সরকার আমার নিজের স্কুলের ছাত্রী। বেঁচে থাকলে আমারি বয়সী হতো। বিয়ে হয়ে থাকলে এতদিনে তারও নাতি হয়ে থাকত। আহা, বেচারি!" বিজয়বাবুর চোখে নাতি না হওয়াটাই বেচারিত্ব।

এবার স্বীকার করতে হলো সুলক্ষণকে। "কিন্তু এত যদি জানেন তবে এটাও আশা করি জানেন কেন তাঁর বিয়ে হলো না, কেন ওঁকে আটক করা হলো।"

"জানি বইকি।" বিজয়মাধব এবার শ্রোতা নন, বক্তা। "তবে খুঁটিনাটি বলতে পারব না। ততদিনে সেও আর আমার নিজের স্কুলের ছাত্রী নয়, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে অধ্যাপনা উপলক্ষে মধ্যভারতে। শুনেছি যার সঙ্গে ওর বিয়ের সব ঠিক ছিল সে ছেলেটা পুলিশে চাকরি নেয়। তাও স্পেশাল ব্রাঞ্চে। মণিকা বেঁকে বসে। তার আগেই সে সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্বাসভাজন হয়েছে। দলভুক্ত না হোক। বিয়ে করলে তার জানা সীক্রেট তার স্বামী যেমন করে হোক বার করে নিতই। তার কাছ স্বামীর হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু সন্ত্রাস-বাদীদের বিপদ আর মণিকা বেচারির প্রাণসংশয়। ওরাই তাকে খতম করত। এত কথা না বলে সে শুধু বলে সে দেশের জন্যে চিরকুমারী হতে চায়।"

এবার শোনার পালা সুলক্ষণের। তিনি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

"ওর বাবারও সন্ত্রাসবাদী পুলিশের পক্ষে ওকেও সন্দেহ করা স্বাভাবিক। ওর বরই ওকে ধরিয়ে দেয়। মণিকা ওকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিল তার এক জায়গায় কী একটা বেফাঁস উক্তি ছিল। কোথায় কী যেন লুকোনো রাখার সঙ্কেত। প্রত্যাঘাত পুরুষ সেটা উপর-ওয়ালাদের দেখিয়ে প্রতিশোধ নেয়। হতাশপ্রেমিকের কীর্তি। তার পরে কীর্তিমান অন্য একজনকে বিয়ে করে।" বলতে বলতে বিজয়ের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

"তার পর?" বিজয়মাধবই শেষ করলেন, "তারপর সন্ত্রাসবাদীরাও প্রতি-শোধ নেয়। বরাবরের মতো ইনভ্যালিড বানিয়ে দেয়। তাতে মণিকার কী! সেও তো শুকিয়ে করে পড়ে।"

PARK CORNER COMMERCIAL COLLEGE

2/1, Raja Naba Kissen Street,

Calcutta - 5.

BEST FOR TYPEWRITING & SHORTHAND

অপূর্ব সুযোগ (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ পর্যন্ত)

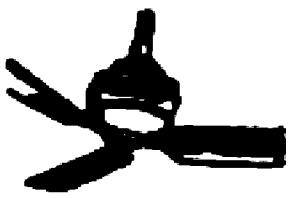

মার্কনী ফ্যান

কোন বাড়তি খরচ নেই

৯টি মাসিক কিস্তিতে দিন

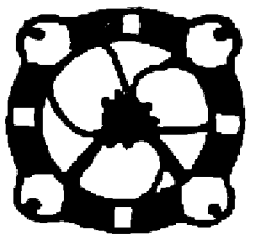

মার্কনী ইলেকট্রিক্

করপোঃ (প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

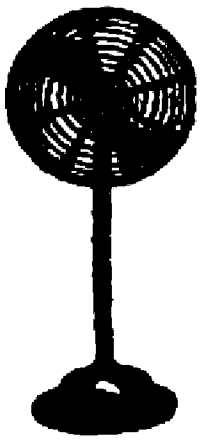

নিঃসঙ্গ মার্কিন

বুদ্ধদেব বসু

নিঃসঙ্গ এ-দেশের মানুষ। সব ছেলের স্বামী ছেলে না, অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকেন; আর তরুণদের মধ্যে সম্প্রতি যদিও প্রজননস্পৃহতা দেখা যাচ্ছে, প্রৌঢ় দম্পতিরা অনেকেই নিঃসন্তান। আর সন্তানের সঙ্গেও, আমাদের অর্থে, ঘনিষ্ঠতা এদের অভিপ্রেত নয়; শিশুদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর তা ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা করা হবে, কিন্তু আমরা যাকে আদর বলি, সেটা নিষিদ্ধ। নিচের ঘর থেকে ভেসে আসছে বয়স্কদের হাস্যালাপ, পানভোজন ও নৃত্যগীতের শব্দ, আর বিনিদ্র শিশু একা শুয়ে-শুয়ে ভাবছে কখন তার সুগন্ধি মা তাকে ঘুমের আগে চুমু খেয়ে যাবেন—এই ছবিটি পশ্চিমী সাহিত্যের ততটাই অঙ্গ, যতটা শরৎচন্দ্রে মাতৃস্নেহের কেনিলতা। মনস্তত্ত্বশীরা এটাকে হয়তো নিষ্ঠুর বলবেন, কিন্তু এইভাবে লালিত প্রতীচ্য মানুষই আধুনিক জগতের স্রষ্টা ও বিজেতা, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। অবশ্য মার্কিন দেশের অন্যতম প্রবাদ এই যে পিতামাতারা সন্তানের সেবায় জনাই বেঁচে থাকেন, শিশুদের যত্ন বলতে যা বোঝায় তা এখানে ত্রুটিহীনভাবে বিধিবদ্ধ, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে এমনও ধারণা হ'তে পারে যে, অষ্টবর্ষীয় পীট অথবা জুলিয়ার ইচ্ছা অনুসারেই মা-বাবারা বেছে নেন কোনো বিশেষ মার্কার ভট্টা অথবা মোটরগাড়ি। কিন্তু এই সব-কিছুরই পিছনে আছে সেই নিষ্কম্প শৃঙ্খলা, যা সারা প্রতীচ্যের জীবনধর্ম; সন্তান যাতে সুস্থ, সক্ষম ও স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে, সব প্রযত্ন প্রথম থেকে সেই দিকে ধাবিত। মা-বাবার সঙ্গে বেশি মেলামেশার স্থান নেই এই ব্যবস্থায়; শিশুশ্রেণীরা বড়ো হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে, বা যদি বাড়িতেও থাকে, দিনমান তাদের স্কুলেই কেটে যায়; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটির অনেকখানি দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে অর্পিত হয়েছে। ছুটিতে পুনর্মিলনও নিয়ম হিশেবে ধ'রে নেয়া যায় না, কেননা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পও অগুনতি। এ-ই হ'লো শৈশবকালীন বিধান; তারপর সন্তান যেই যৌবনে পা দিলে, তখনই মা-বাবার সঙ্গে তার বসবাস ফুরোলো। যদি সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তা হ'লে, অবিবাহিত হ'লেও, সে আলাদা থাকবে; আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে চায়, তা হ'লেও তাকে অন্য কোনো শহরে পাঠানো সুপিতার কর্তব্য। পুত্রকন্যা সাবালক হ'লেই সব অর্থে স্বতন্ত্র হ'লো, স্বীকৃত হ'লো তাদের স্বাধীন সত্তা; তারপর যা থাকে তা স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ, কিন্তু আমাদের ধরনে সংসক্তি কল্পনাতীত। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার অভাবে এমনও হ'তে পারে যে ছেলেমেয়েদের স্নেহের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়; আর সেইজন্যই, আজকাল অনেকে বলছেন, এ-দেশে কৈশোরক অপরাধপ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তেমনি, বন্ধনহীন ব'লেই, এরা বেরিয়ে পড়তে পারে খেয়ালখুশিমতো পৃথিবীর পথে, কোনো সজল চোখ বা নির্ভরশীল আত্মীয় এদের পিছনে টানে না, কেউ যদি চায় ব্রেজিলে বা বালীদ্বীপে অবসিস্ট জীবন কাটাতে, সেই ইচ্ছে চরিতার্থ করার হাজা কোনো বাধা নেই। শুধু আর্থিক হিশেবে নয়, মনের দিক থেকেও স্বাধীন এরা। 'যে যার পায়ে'—এই হ'লো প্রতীচ্যের মূলনীতি।

যে-কোনো সমাজে সব ব্যবস্থা পরস্পর-সম্পৃক্ত। প্রতীচ্যের অন্যান্য লক্ষণ চিন্তা করলে মুহূর্তে বোঝা যায় কেন এখানে স্বনির্ভরতা অতিশৈশব শিক্ষণীয়। পার্থিব জীবনে কৃতী হ'তে হ'লে ঐ গুণটি চাই, সাহসও প্রয়োজন। এক ইংরেজ কবি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন লণ্ডনে, তাঁর কিশোর পুত্র সেখানে উপস্থিত। আমি লক্ষ করলুম, পিতা একটু বিশেষ যত্ন নিয়ে পুত্রকে খাওয়ালেন—'ওটা আর-একটু নাও, ওয়াইনটা বরং আর না-খেলে, ট্রেনে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে পাবলিক স্কুলে পড়ে, এখনই ফিরে যাবে সেখানে —আর ওদের স্কুলে খাওয়া খুব খারাপ।' 'তা-ই নাকি?' 'ব্যাপারটা হ'লো —ছেলেবেলায় যারা কষ্ট করে, তারাই বড়ো হ'য়ে স্থাপন করে উপনিবেশ, আমাদের পাবলিক স্কুলগুলিতে এই ধারণা এখনো চলছে,' ব'লে একটু হাসলেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা। তাঁর এই কথাটিতে আমি অনুভব করলুম প্রতীচ্যের চরিত্রের এমন একটি দিক, যা আমাদের পরিচিত হ'লেও স্মরণযোগ্য। তিন ভাই-বোনের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায়, আর-একজন ভারতে, আর বোন বিয়ে ক'রে চলে গেছে মিশ্চিয়ানে—এদের পক্ষে সামান্য এ-রকম ঘটনা। পরস্পরে ক-বার দেখা হয় জীবনে? বা বৃদ্ধ পিতামাতা ক-বার দেখতে পান সন্তানদের? কিন্তু প্রত্যেকে যে সম্পন্ন জীবন পেয়েছে সেটাই বড়ো কথা, এবং তার জন্য অন্য দিকে ত্যাগ করতে এদের আপত্তি নেই।

প্রথম যখন পিটাসবার্গে গিয়েছিলুম, কলেজের এক কর্মিণী আমার নির্দেশমতো কিছু বাসনপত্র আমাকে দিতে এলেন। 'ঠিক আছে সব?' 'মনে তো হচ্ছে।' 'আর-কিছু দরকার হ'লে বলবেন—You must speak up. এ-দেশে শোনা যে-সব উক্তি আমার মনে গ্রথিত হ'য়ে আছে, এটি তার অন্যতম। কেউ কোনো প্রয়োজন অনুমান ক'রে নেবে না—সে-রকম সময় কারো নেই, অত্তোসও নেই —সব একেবারে খোলাখুলি বলতে হবে। মার্কিনীরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল, এদের পক্ষে দেখাশোনা মানেই আহারে নিমন্ত্রণ, ব্যবসায়িক নিয়োগও অনুষ্ঠিত হয় লাঞ্চে, বা অন্তত পানশালায় বা কফিখানায়। পক্ষান্তরে, কোনোরকম বিশৃঙ্খলা যা ঘটাতে পারে, তা কেউ কল্পনায় স্থান দেবে না; দিনের প্রতিটি ঘণ্টা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে স্বল্প অতিথেয়তার জন্যও অগ্রিম ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাড়িতে অবেলায় কোনো অতিথি এলে তাকে যে-কোনোরকমে মুড়ো ভাত ফুটিয়ে দেয়া—এটা হয়তো বঙ্গমহিলাদের পক্ষে এখনো অসাধ্য হয়নি কিন্তু এখানে তা সম্ভবপরতার পরপারে; নির্দিষ্ট সময়

পৌঁছয়ে গেলে, অতিথি অভুক্ত কিনা তা জিগেস করাও অবান্তর; তাঁকেই মুখ ফুটে বলতে হবে তিনি বুভুক্ষু, তখন কোনো আহারস্থলের নিশানা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ উদারতার অভাব নয়, অনম্য বিধিবদ্ধতা। মার্কিনীরা যাকে বলে 'টাইট শেডিউল', মানে, নিবিড় কর্মসূচি, তা এখানে অনেকেরই নিত্যসঙ্গী; হঠাৎ এক ঘণ্টা সময় ফাঁকা পাওয়া গেলে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসার উপায় নেই, বা আগে কিছু না-জানিয়ে কোনো প্রিয়-জন কখনো টোকা দেবে না দরজায়; বাড়িতে কাউকে খেতে বলতে চাইলে কুড়ি দিনের আগে কোনো তারিখ পাওয়া নাও সম্ভব হ'তে পারে। সকলেই এত-দূর পর্যন্ত ব্যস্ত ও সচল যে সব-কিছুই আয়োজিত ও প্রত্যাশিত হওয়া চাই, কোনো স্থান নেই দৈনন্দিন জীবনে আকস্মিকের।

এবং এদের সমাজে প্রতিযোগিতাও তীব্র। অবশ্য জীবিকার জন্য কাউকেই ভাবতে হয় না, কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হ'লে, বা বন্ধু পেতে হ'লে, বা এমনকি বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের দিক থেকে, সব সময় থাকতে হবে সজাগ, সচেষ্ট ও উদ্যোগী। যে-মানুষ লাজুক, বা যেশি আত্মসচেতন, বা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে যার স্বভাব, তাকে 'পেছিয়ে' পড়তে হয়। মেয়েদের কাগজে প্রশ্ন বেরোয়, 'আমার বয়স ষোলো, চেহারা মোটামুটি ভালো, কিন্তু এখনো আমার কোনো ছেলে-বন্ধু জুটলো না। আমার কী করা উচিত?' উপদেশদাত্রীর উত্তর : 'তুমি বোধহয় অমিশুক, ছেলেদের সামনে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকো, তাদের কথা-বার্তায় যোগ দিতে পারো না। তোমাকে এই সংকোচের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে।' ধরনটা রোরোপেও একই, কিন্তু ইলেণ্ডে এখনো একটি শ্রেণী জন্মসূত্রে কিছু সুবিধে পেয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে মনোহরভাবে লাজুক হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমেরিকার শ্রেণীভেদহীন উন্মুক্ত সমাজে প্রতিযোগিতার আয়তন এমন বিপুল যে তার প্রভাব খুব অল্প লোকই কাটাতে পারে। সব মিলিয়ে মনে হয় যে মার্কিনী সমাজ দক্ষ ও গুণী-জনের পক্ষে উত্তম, কেননা তাঁরা অন্যদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত, তাঁদের জন্য দিকে-দিকে দরজা খোলা রয়েছে; কিন্তু যারা সাধারণ লোক—আর তারাই অসংখ্য,—তারা সমস্ত জৈব তৃপ্তির অধিকারী হ'য়েও এড়াতে পারে না নিঃসঙ্গতা, আর হয়তো ভিতরে-ভিতরে এক ধরনের ব্যর্থতাবোধ।

এর স্পষ্টতম ছবি মেয়েদের জীবনে দেখা যায়। আধুনিক প্রতীচীর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো নিঃসঙ্গ নারী। দামি হেন্তোরাঁয় মহিলা এসেছেন প্রকাণ্ড কুকুর নিয়ে, জন্তুটিকে সোফার উপর পাশে বসিয়ে নিজেও খাচ্ছেন তাকেও খাওয়াচ্ছেন,—বা নেহাৎই সময় কাটাবার জন্য তিন প্রৌঢ়া নিঃশব্দে বসে আছেন পার্কের বেঞ্চিতে—য়োরোপের রাজধানীগুলিতে এ-রকম দৃশ্য বিরল নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটিও আমেরিকায় যেন চরমে পৌঁচেছে। বিয়ে হয়নি, বা বিধবা বা পতিবিচ্ছিন্না, বা সধব হয়েও আর্থিক সাচ্ছল্যবশত অনেক-খানি অবসর যাঁদের আছে—এমন মেয়েরা এই দেশের নাগরিকসংখ্যার একটি অগোণ অংশ। এঁরা ছিলেন না সেই কবির কল্পনায়, যাঁর প্যারিসে নানা ধরনের নিঃসঙ্গতা বিরল এক-একটি পুষ্পের মতো বিকশিত; এঁরা বিশেষভাবে এই শতকের সৃষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এঁরা ছড়িয়ে আছেন, ভালো-ভালো হোটেলে ও অ্যাপার্টমেন্টে; জানলা থেকে দেখা যায় টস্ট নদী বা প্রশান্তসাগর; ঘরে আছে কাশ্মীরি কার্পেট, ফ্রেসডেনের চীনেমাটি, রুশীয় খুন্ট; ভাঁড়ারে আছে কালো, সবুজ, জুঁইগন্ধি ও গোলাপগন্ধি চা, এবং বাছা-বাছা হিস্পানি ও ফরাশি মদিরা; আছে বলতে গেলে সবই, কিন্তু চরিতা বা মনের কোনো অবলম্বন নেই। নিঃসন্তান, বা সন্তানেরা বড়ো হ'য়ে দূরে সরে গেছে, কিন্তু পেয়েছেন স্বামী অথবা পিতার, গৃহকর্ম বা উপার্জনের দায়িত্ব নেই; ফ্যাশনের অনুশীলন, বিবিধ বিনোদ, মাঝে-মাঝে য়োরোপে বা জগৎ-জোড়া ভ্রমণ—এ-সবের পরেও উদ্বৃত্ত থাকে সময়। এই অবস্থার সার্থকতা খুঁজে পান শুধু তাঁরা, যাঁরা গুণী বা দায়িত্বশালিনী বা কোনো আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত; এ-রকম কোনো-কোনো মহিলা আমার পক্ষে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। কিন্তু অন্যেরা—যাঁরা নিছক পার হ'য়ে সংগীত অথবা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন, বা চেষ্টা করেন 'বুদ্ধিজীবী' হ'তে, তাঁদের যেননা জানি না কোনো মার্কিনী কবি ব্যঙ্গ করেছেন কিনা। এঁরা স্থাপন করেন প্রতি জনপদে মহিলা-ক্লাব; কথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে বক্তৃতা শোনেন ট্যাং শিল্প, সমোয়া দ্বীপের সমাজব্যবস্থা, মধ্য-প্রাচীর ইতিহাস ও ভারতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ে; যেমন তৃপ্তিহীন এঁদের জ্ঞানের পিপাসা, তেমনি জ্ঞানের সিঁড়ি-দুয়ানিগুলো এঁদের জীবনে অর্থহীন। এঁরা অনেকেই কবিতা লেখেন, নিজের খরচে বই ছাপান, স্থানীয় কোনো মফস্বলি কাগজে হয়তো এঁদের সচিত্র জীবনীও বেরোয়; কিন্তু কবিতা লেখার চেষ্টা থেকে এঁদের বিরত করার মতো কোনো হিতৈষী বন্ধু এঁদের জোটে না। যে-কোনো প্রকার বুদ্ধিজীবী চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এঁদের; যে-কোনো প্রকার খ্যাতিমানের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার চেষ্টায় এঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে থাকেন। এঁরা স্বাভাবিক শিকার সেই সব সাহিত্যিকদের, যাঁদের বিবেকের বালাই অল্প এবং জীবিকার নিশ্চয়তা নেই। সে-রকম যোগাযোগ ঘটলে, ক্ষতিস্বীকার ক'রেও, এঁরা তবু একজন মানুষের সঙ্গলাভ করেন। কিন্তু তাও সব সময় ঘটে না; তখন থাকে দিনে পাঁচবার আহার, তা হজম করার জন্য পদচারণা ও সমুদ্রস্নান, সচিত্র পত্রিকাগুলোর পাতা ওল্টানো, যেখানে যা-কিছু 'ঘটছে' সাধ্যমতো সেগুলোতে যাওয়া, নতুন বেশবাস, নতুন গৃহসজ্জা—এই সব। কেউ যাতায়াত শুরু করেন হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে, কেউ হন বুডঘাক স্টাইনারের ভক্ত; কেউ বা শিক্ষা নিতে যান জেন তত্ত্বে। কিন্তু অবশেষে সেই নিরবলম্ব নিজের কাছেই ফিরে আসতে হয়।

ন্যু ইয়র্কে, যেদিন এপ্রিল ছাড়িয়ে মে রৌদ্দুর, পার্কের বেঞ্চিগুলো ভুখায় ভ'রে যায়। বৃদ্ধও থাকেন, কিন্তু আমার চোখে যে-ছবি আছে তাতে মহিলাদেরই আধিক্য। দেখে মনে হয় না এঁদের অবস্থা সচ্ছল, গায়ের কোটটি যেন পুরোনো, খুব সম্ভব সস্তা পাড়ায় এক-খানা মাত্র ঘরে এঁদের বাসা। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে মন্তব্য বিস্ময় করেন এঁরা—তারা দূরে আছে—ক্রিস-মাসেও সব সময় দেখা হয় না; হয়তো স্বামীদের কথাও ওঠে এক-আধবার—সম্ভবত তাঁরা আরো দূরে। প্রকৃতির দান এই রৌদ্রটুকু এঁরা প্রগাঢ়ভাবে ভোগ করেন, কিন্তু আবার হয়তো ছায়া ক'রে আসে, বাড়লো হয় বাতাস—তখন উঠে মন্থর পায়ে এঁরা যে যাঁর বাড়ি ফেরেন—সেখানে আছে রান্না, খাওয়া, খাওয়ার পরে বাসন ধুয়ে রাখা : আর-কিছু নেই।

সেবারে যখন জাহাজে যাচ্ছি ন্যু ইয়র্ক থেকে লণ্ডন, ভোজনশালায় আমার স্থান পড়েছিলো একটি পাঁচ-আসনের টেবিলে। অন্য চারজনের মধ্যে সকলেই মার্কিনী, সকলেই মহিলা, ষাট থেকে তিরিশের মধ্যে তাঁদের বয়স। জাহাজের প্রথা অনুসারে এঁরা নিজ-নিজ নাম বললেন আমাকে, আমাকে বিনিময় করতে হ'লো। এঁরা উঠছেন পড়ন্ত বেলায়

খুশিতে, এক ঝাঁক পাখির মতো আওয়াজ ক'রে কথা বলছেন, এত আনন্দ শুধু সম্ভ্রমণে বেরিয়েছেন বলে নয়, পরস্পরকে বন্ধু পেয়েছেন ব'লে। খুব সম্ভব কণিকের বন্ধুতা—হয়তো রোমেতে পৌঁছেই বিস্মিত হয়ে পড়বেন এঁরা, স্বদেশে ফিরে আর দেখা হবে না, কিন্তু—স্পষ্ট বোঝা গেলো—এই পাঁচটি দিন থেকে এঁরা যতটা সম্ভব সখ্যসুখ নিংড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। খেতে-খেতে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন আমার উদ্দেশে : আমার অনতিদীর্ঘ উত্তরে এঁরা নিরাশ হলেন তা আমার চোখ এড়ালো না। এঁদের আগ্রহ সত্ত্বেও আমি পারলাম না এঁদের সঙ্গে মিশে যেতে—কেননা এঁদের আলাপের যেগুলো বিষয় আমি তাতে স্বভাবত অনুৎসুক,—কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত-মতো ব'সে রইলুম। পরের দিন আমার মনে হ'লো যে আমার অনুজ্জ্বল উপস্থিতি এঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে;—কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে এক কোণে একলা একটি টেবিল নিলুম।

মানুষের কাছে মানুষের মতো বাঞ্ছনীয় আর-কিছু নেই। আমাদের দেশের যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে—আর তাতে মঙ্গল হয়নি আমি তা কিছুতেই বলবো না—কিন্তু এখনো প্রায় সকলেরই আছে একটি আত্মীয়মহল, তা সব সময় প্রীতিকর না-হ'লেও অন্ততপক্ষে নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক। তাছাড়া, সমাজের তত ধরাকাট নেই ব'লে, কিছু-না-কিছু বন্ধু-বান্ধব, অন্তত শহরগুলিতে, অধিকাংশেরই জুটে যায়; সন্ধ্যা নয়, পার্টি নয়, বিশুদ্ধ আড্ডা এখনো সম্ভব আমাদের মধ্যে। প্রবীণ মহিলারা, মাসি-পিসি বিদিমার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে প্রচুর মানসিক তৃপ্তি আহরণ করেন তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, আমরা যা সহজে পাই, আর পাই ব'লে যার মূল্যও হয়তো বুঝি না, তা প্রতীচীর জনসাধারণের পক্ষে অনেক সময়ই দুর্লভ। অসংখ্য সন্ধ্যা ও কলাকেন্দ্র, হাজার রকমের ক্লাব, বিচিত্র ও বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি—অনেকের পক্ষে এগুলোই উপায়, যার দ্বারা মানুষের সংসর্গলাভ ঘটতে পারে। অর্থব্যয় ক'রে এগুলোতে যোগ দিলে, কোন বন্ধুলাভের আশা আর সুদূরপরাহত থাকে না। নু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাশে আসতেন দুই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া; কয়েক-দিন তাঁদের লেখকদের পাশাপাশি আসনে বসিয়ে হঠাৎ হতে, হতভাগা না-পড়া পড়ুয়াদের আর বেশি দুর্ভাগ্যবিধির করছেন নিজেদের কথা; তারপর একদিন ক্লাশের পরে তাঁরা উৎফুল্ল মুখে আমাকে জানালেন যে তাঁরা আজ রাত্রেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন—আর ফিরবেন না। আমি মনে-মনে তাঁদের মিলিত জীবনকে শুভ কামনা জানালুম।

বিবাহ হ'লো : বর-কন্যা উভয়েরই বয়স ষাট, সত্তর বা এমনকি আশি পেরিয়ে গেছে,—এই কথাটা কলকাতায় ব'সে শুনতে হঠাৎ খুব অবাক লাগে, কিন্তু অল্প একটু তলিয়ে দেখলেই এর অর্থ বুঝতে দেরি হয় না। এ-সব বিবাহের উপলক্ষ্য—আর-কিছু নয়, শুধু একজন সঙ্গী পাওয়া, একজন মানুষ, যার সঙ্গে কথা বলা যাবে, ঝগড়া করা যাবে, বিনিময় করা যাবে সুচিন্তিত ও বিবিধ বিষয়ে মতামত, বেরোনো যাবে সিনেমায়, বা রেস্তোরাঁয়, বা দেশভ্রমণে। একজন সারাক্ষণের সঙ্গী, যার জন্য সকালে উঠে তৈরি করা যাবে ব্রেকফাস্ট, বা দোকানে গিয়ে পছন্দ করা যাবে জামা-কাপড়, বা যার হাতে হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকা যাবে পার্কে, জুন মাসের সুদীর্ঘ সন্ধ্যায়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ দম্পতিরা এ-দেশে পরস্পরনির্ভর বা পরস্পর-সম্পূর্ণ—আর এ থেকে তাঁরাও বাদ যান না যাঁরা যৌবনে বিবাহ করেছিলেন এবং একবারের বেশি করেননি। পারিবারিক জীবনে ব্যাপ্ত নেই ব'লে, এঁরা মনের দিক থেকেও একে অন্যের অনন্য অবলম্বন হ'য়ে পড়েন; পুত্রকন্যা পরিজনের সঙ্গে যে-পরিমাণে সম্বন্ধ হয় শিথিল, ঠিক সেই পরিমাণে নিবিড় থাকে দাম্পত্য। নিতান্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ধরনের সংলিপ্তি এখানে নিয়ম, আমরা তাতে এখনো অনভ্যস্ত আছি। আমাদের দেশে প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পটভূমিকায় পর্যবসিত হন, রঙ্গমঞ্চ অধিকার ক'রে নেয় পুত্রকন্যা ও তাদের সম্পৃক্তজনেরা; প্রতীচ্য মানুষের মনে হতে পারে আমাদের দাম্পত্য জীবনে ঘনিষ্ঠতা নেই, আর আমরা হয়তো এদের ব্যবহারে দেখতে পাই আতিশয্য। আসল কথা, এসব বিবাহের মূল কথা হ'লো পারস্পরিক সঙ্গদান ও সঙ্গলাভ, আর আমাদের—সংসারযাত্রা। এদের মধ্যে, বিবাহ যতদিন টিকে থাকে, ততদিন তার আদর্শ হ'লো ঐকান্তিকতা; কর্মস্থলে ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সর্বদা একত্র থাকা বিধেয়; কখনো-কখনো, এমনকি, বিচ্ছেদ হ'য়ে যাবার পরেও, প্রাক্তন দম্পতি বন্ধু হিশেবে সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেন। আর আমাদের বিবাহ প্রথম থেকেই বহুজনবেষ্টিত ও বহু কর্তব্যে জটিল, তার একটিমাত্র অংশ হ'লো দাম্পত্য জীবন। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে, যেমন সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি, তেমনি বিবাহের প্রতি, এদের মনোভাব যৌবনোচিত, যৌবনের প্রকাশে কোনো সংকোচ নেই এদের, এবং তাকে দীর্ঘায়িত করায় জন্যও এরা অনবরত প্রয়াসী; আর আমাদের জীবন-নাট্যে একটির বেশি অঙ্ক জোড়ে না যৌবন, আর তখনও তার গোপনতাকেই মনোজ্ঞ ব'লে ধরা হয়।

যাকে বলছি যৌবনোচিত মনোভাব তারই সঙ্গে সঙ্গে সম্পৃক্ত এদের তৃপ্তিহীন নূতনত্বপ্রীতি। নতুন ছেড়ে নতুনতরো আকর্ষণে এরা বিপুলবেগে অনবরত ধাবমান। সমাজটা বেশি ভালো না-ই বা হ'লো, সেটা যে আনকোরা, তা-ই যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীর বছর-বছর হালচাল বদলাচ্ছে, যাঁরা ফ্যাশনের তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান, সেই মেয়েরা দেখা দিচ্ছেন কোনো ঋতুতে পিঙ্গল এবং অন্য কোনো ঋতুতে হয়তো নীলবর্ণ কেশদাম নিয়ে। হেনরি মিলার আক্ষেপ ক'রে বলেন, সারা আমেরিকায় এমন কোনো গৃহস্থ নেই, যে বলতে পারে—'ঐ চেয়ারে আমার পিতামহ বসতেন।' যাকে আমরা প্রকৃত বাংলায় 'আত্মা' বলি, সেই ভাবটি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত; জিনিশ একটু পুরোনো হ'লেই ফেলে দেয় এরা, না-দিয়ে উপায়ও থাকে না, কেননা জীবনযাপনে সমকালী-নের দাবি অমোঘ, বাড়িতেও জায়গা অল্প, এবং আজকেউ ওয়াশিংটনে আছে ব'লে পরের সপ্তাহে যে ফ্লরিডায় চলে যাবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অগত্যা অনেক স্মৃতিচিহ্ন জঞ্জাল-স্তূপে বিলীন হ'য়ে যায়। নু ইয়র্কে যে-রকম বেগে নূতন অট্টালিকা নির্মিত হয় তা ভারতবাসীর পক্ষে চমকপ্রদ; আমাদের চোখের সামনে একটা বারোতলা একশো ফ্ল্যাটের বাড়ি চার মাসে প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কিন্তু এগুলোকে স্থান দেবার জন্য যে-সব পুরোনো বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়, তার মধ্যে অনেক ছাকে স্মৃতিজড়িত বা যশস্বীর সুহাগে ভরা :—গ্রীনিচ গ্রামের যে-সব সেকেলে বাড়িতে উনিশ ও প্রথম-বিশ-শতকী বিখ্যাত লেখকরা বাস ক'রে গেছেন, তার কয়েকটিমাত্র টিকে আছে এখনো, অন্য-গুলোর ভূমিতে উঠেছে উচ্চ, উজ্জ্বল ও আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-ভবন। এডগার পো-র কুটিরের উল্লেখ দেখছি তথা-পুস্তিকায়, কিন্তু নু ইয়র্কে হুইট-ম্যানের কোনো স্মরণিক আছে ব'লে জানতে পারিনি। কোথায় সেই পরিত্যক্ত বাড়িগুলো যেখানে যুবক একদা আড্ডা

নিতেন? সেই রেস্তোরাঁ, যেখানে তাঁর হাওয়েলস-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়? সেগুলো নেই ব'লে ধ'রে নিচ্ছি, কেননা থাকলে তার আওয়াজ শোনা যেতো। এই তথ্যগুলো মনে রাখলে আর অবাক লাগে না, যখন দেখা যায় এই বন্দরশহর সেলে ছোটোখাটো মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেই—বা কোথায় আছে তা আবিষ্কার করা গবেষণাসাপেক্ষ। প্র· ব· র একপাটি জুতোর বন্ধনী ছিঁড়ে গেলো, তার সংশোধন কর্ম হিশেবে আর্কাঙ্কিংকর, কিন্তু—অথবা সেইজন্যেই—কাছাকাছি সব ক-টা সম্ভবপর দোকানে ঘুরেও নিষ্ফল হ'তে হ'লো। সিগারেটের লাইটার কোথাও সারানো যায় কিনা, সে-বিষয়ে সন্ধান ক'রেও আমি ব্যর্থ হয়েছি; সারাতে চাই শুনে সদালাপী সিগারেট-বিক্রেতাটি বরং একটু অবাক হ'য়ে তাকিয়েছে আমার দিকে। 'সারিয়ে কী হবে? এটার দাম বড়োজোর দেড় ডলার—ফেলে দিয়ে আর-একটা কিনুন না।' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম না যে কথাটা দেড় অথবা পাঁচ ডলার নিয়ে নয়, জিনিশটি আমি টোকিওতে কিনেছিলুম, একটি বৈদেশিক স্মৃতি হিশেবে আরো কিছুদিন ব্যবহার করতে পারলে মন্দ লাগতো না। জড় বস্তুর সঙ্গেও ব্যবহারের দ্বারা এক ধরনের আত্মীয়তা জন্মে—অন্তত আমাদের তা-ই মনে হয়—একটি পুরোনো কলমের মেরামতে আমরা যতটা অর্থব্যয় করি তা দিয়ে হয়তো নতুন দুটো কেনা যেতো—কিন্তু জিনিশটা যে পুরোনো ব'লেই বেশি মূল্যবান, এই কথাটা সাধারণ মার্কিনী মানসের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনীর পরিবর্তন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে কিছুটা বেশি প্রচলিত, হয়তো তারও একটা কারণ এই নূতনের সম্মোহন ও স্মৃতির প্রতি অনাসক্তি। তারুণ্যই মার্কিন দেশের জীবনধর্ম।

পরম ভালো বা পরম মন্দ ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই; সবই আপেক্ষিক; সব প্রথা, ব্যবস্থা ও মনোভাব সর্বাংশীণ প্রয়োজনেরই অনুগামী, এবং এমন কোনো সমাজও নেই, যাতে কালোচিত পরিবর্তন না ঘটে। আমাদের সমাজও যে-ভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে মনে হয় আমার এই তুচ্ছ লেখাটা কোনো শত-কান্তিক বাঙালি তরুণের চোখে পড়লে তিনি হয়তো কৌতুক বোধ করবেন। তাতে আমার অনিকেত আত্মা ক্ষিপ্তক্ষুণ্ণ হবে না, সে-কথা এখনই জানিয়ে রাখছি। তারুণ্য আমাকে আকর্ষণ করে, আমাদের দেশে তার [illegible] বিরুদ্ধে আত্মবিক্রয় অতি বিচিত্র ভার প্রকাশ। 'বৃদ্ধ' শব্দটি এদের কথাভাষা থেকে নির্বাসিত হয়েছে, বড়ো জোর এরা 'সাবালক' বা 'বয়স্ক' অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছয়। পিটার্সবার্গে এক নিমন্ত্রণে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম; তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'I was young then,' কিন্তু তক্ষুনি, এক সেকেণ্ড মাত্র থেমে আবার বললেন, 'I mean—younger,' অথচ বয়স তাঁর নিঃসন্দেহে উত্তরপঞ্চাশ, বেশ রজতস্পৃষ্ট; জীবনের এই পর্যায়ে আমরা সবং কিছুটা ঝুঁকি ক'রে বলি যে আমাদের 'বয়স হয়েছে'। আমাদের মুগ্ধ না-হ'য়ে উপায় থাকে না, যখন দেখা যায় সপ্ততি বা অশীতি-বর্ষীয়রা অশ্বারোহণে ও বেশভূষায় তাঁদের পৌত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে-ছেন; দাঁড়াচ্ছেন যথাসম্ভব সোজা হ'য়ে, সূক্ষ্ম বলিরেখাযুক্ত নয়নে ফুটিয়ে তুলছেন চটুলতা, মোহন হাসো বিকশিত করছেন তাঁদের উজ্জ্বল ও কৃত্রিম দশন-পংক্তি, ভ্রূবিলাস, পরিহাস ও বহুভাষণ, যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত ক'রে যাচ্ছেন। 'বার্ধক্যে সুখী হ'তে হলে এশিয়াতে জন্মানো উচিত', এ-রকম কথা প্রতীচ্যবাসীরা মাঝে-মাঝে বলে থাকেন, এবং সুখ মানে যদি প্রশান্তি হয়, বা স্নেহের তৃপ্তি, বা মানসিক নির্ভরলাভ, তাহলে—দারিদ্র্য সত্ত্বেও, আমাদের সেলে শাশুড়ি-পুত্রবধূর আবহ-মান বিবাদ সত্ত্বেও, এই কথাটা স্বীকার্য হ'তে পারে। যাঁরা বয়সে বড়ো তাঁরা শুধু ঐ কারণেই শ্রদ্ধেয়, যে-কোনো লোকের চুলের রং বদল হ'লে তার একটি আলাদা সম্মান প্রাপ্য হয়, এই সংস্কার—যা অদূর অতীতে য়োরোপেও ছিলো আর আমরা এখনো কাটাতে পারিনি—

শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত

স্বয়ং শিক্ষা গ্রন্থমালা

হিন্দী শিক্ষার জন্য

১। LEARN HINDI Yourself (English Medium) ৩·০০

২। রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ (বাংলার মাধ্যমে) ২·০০ ১০ম সংস্করণ

৩। রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ (অসমীয়ার মাধ্যমে) ২·২৫

৪। হিন্দী-বাংলা কথোপকথন শিক্ষা (৩য় সংস্করণ) ১·০০

৫। হিন্দী-বাংলা-অসমীয়া-ইংরাজী শব্দবোধ ১·০০

৬। প্রারম্ভিক হিন্দী শিক্ষা (৩য় সংস্করণ) ০·৫০

৭। রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা (১ম ভাগ হইতে ৫ম ভাগ)

বাংলা শিক্ষার জন্য

৮। LEARN BENGALI Yourself English Medium) 3rd Edition ২·৫০

৯। বাংলা ভাষা প্রবেশ ১·৫০ (হিন্দীর মাধ্যমে) ৩য় সংস্করণ

১০। বাংলা ভাষাপ্রবেশ (গুজরাটীর মাধ্যমে) যন্ত্রস্থ

১১। বাংলা সাহিত্য পাঠ ১ম ও ২য় ভাগ অসমীয়া শিক্ষার জন্য

১২। অসমীয়া পরিচয় (হিন্দীর মাধ্যমে) ১·৭৫

১৩। আমার জীবন কাহিনী মহাত্মা গান্ধীর আত্মকাহিনীর কিশোর সংস্করণ ২·২৫

১৪। আচার্য বিনোবা (বিধুভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত) (২য় সংস্করণ) ২·৫০

দাসগুপ্ত প্রকাশন

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

আর্কিনদেশে তার প্রতিষ্ঠা নেই। এখানে বাস করে তিন স্তরের মানুষ : শিশু, সদাতরুণ ও স্থায়ী তরুণ, আর শেষোক্ত স্তর দুটি সমাজের চোখে নির্ভেদ। ফলত, যত বড়ো হবে, তত কঠিন চেষ্টা করতে হয় যৌবনের প্রচ্ছদ টিকিয়ে রাখতে; সেটা আয়ুষ্প্রদ নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাতে অন্য দিক থেকে এটুকু লাভ হয় যে লোকেরা, কখনোই নিজেদের 'বৃদ্ধ' ভাবে না বলে, হয়তো মনের দিক থেকে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে না, প্রকৃত পতনে এগিয়ে দেয় না নিজেকে। আমরা যেমন, দেহে নয়, মনোধর্মে, কিছুটা অকালেই বার্ধক্যদশায় উপনীত হই, হ'তে ভালো-বাসি—যা অন্তত এক পুরুষ আগেও তা-ই ছিলো আমাদের লোকাচার—এখানে তেমনি প্রতিজ্ঞা উঠছে উদ্যত হ'য়ে : 'না, হারবো না হার, শেষ পর্যন্ত সতেজভাবে বেঁচে থাকবো।' এই ভাবটিও পুণী-জনের পক্ষে যত অনুকূল, সামান্যের পক্ষে তা নয়। এক বিশিষ্ট মহিলার কথা শুনলুম, যাঁর চার স্বামীর মধ্যে একজন ছিলেন জর্মান কবি, আর-একজন ইটা-লিয়ান গীতস্রষ্টা, অন্য দু-জনও খ্যাতি-মান ফরাশি ও মার্কিন। তিনি বৈধব্য-দশায় সম্প্রতি আশি পেরিয়েছেন, এবং জীবনসম্ভোগের ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাঁর এখনো অক্ষুণ্ণ। একবার কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, 'যে-কোনো হাবা মরে বেঁচে পারে, বেঁচে থাকতে হ'লে ঘটে বুদ্ধি চাই!' এই মহিলা—জর্জ সাঁ-র যুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী—এঁকে আধু-নিক প্রতীচ্য মানসের পরাকাষ্ঠা বললে ভুল হয় না।

কিন্তু এর পিছনে একটি তিমিরবর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে, তা—মৃত্যুভয়। মৃত্যু-ভয় কার বা নেই, কিন্তু বহু-যুগ, অনেক আগে থেকে, সেই অনিবার্য পরিণামের বিরুদ্ধে দেয়ালের পর দেয়াল তোলার চেষ্টা —তা এই দেশের ও যুগের একটি নতুন জনোদ্ভাস। এঁরা অনেকে আহার করেন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতে; দুগ্ধপানে বন্ধুকদের রুচি ও ক্ষমতা আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছে; মেয়েরা কেউ-কেউ ওজন-বৃদ্ধির প্রথমতম লক্ষণেই, স্বাদু ও স্বাভাবিক আহার ত্যাগ ক'রে চার বেলা গলাধঃকরণ করেন একটি টিনে-পোরা পদার্থ—যাতে স্নেহগুণ একেবারেই নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য সব উপাদান নাকি অক্ষুণ্ণ। সেবারে দেখেছিলুম, প্রায় এমন কোনো সাবালক স্ত্রী বা পুরুষ নেই যিনি সিগারেট খান না, কিন্তু সকলেই কর্কটরোগের সঙ্গে এই অভ্যাসের সম্বন্ধ নিয়ে ভাবিত; এবারে, সেই সম্বন্ধ 'প্রমাণ' হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকেই দেখি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন—আর কারো-কারো হয়তো তিরিশ বা চল্লিশ বছরের অভ্যাস ছিলো! প্রায় অতি-মানবিক এই সংযম ও মনোবল—আমি অভিভূত, অনুকরণে অক্ষম ব'লে, শতমুখে এর প্রশংসা না-করে পারি না; এবং এমন অনুমানও সংগত যে পরবর্তী গবেষণার ফলে এই মত যদি বাতিল হ'য়ে যায়, যা তাতে দেখা দেয় সংশয়, তাহ'লে তখনই সিগারেটের কর্টাত আবার আকাশে ঠেকবে। হোক বিজ্ঞান, হোক বিজ্ঞাপন—কোনো স্বাস্থ্য-সম্মত নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলার মার্কিনীদের জুড়ি নেই জগতে। নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও আয়ু সকলেরই কাম্য, তা অর্জনের প্রয়াসও সাধু, কিন্তু এ-দেশে কারোরই কি এ-কথাটা কখনো মনে হয় না যে 'মারের সাবধান নেই'?

জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—বিশেষত মৃত্যু—এই বিষয়গুলো আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু সাহিত্য বা উপন্যাস, জীবনে তা অনুচ্চারিত: কবিরা যে-ভীষণ পাতালে বার-বার অবতরণ করেছেন তাকে তথ্য হিশেবেও স্বীকার করা শিষ্টাচার নয়। সামাজিক জীবনে নিষিদ্ধ এ-সব বিষয়, পারতপক্ষে শব্দ-গুলো কেউ মুখে আনে না। যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই, এই ভান সার্বিক-ভাবে স্বীকৃত; কখনো কেই গুণ্ঠন ছিন্ন হ'লে সাধারণ মানুষ কী-ভাবে সাড়া দেয় তার একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। একটি ছোটেরো খাবারের দোকান ছিলো আমাদের হোটেলের পাশেই, একদিন সেখানে গিয়ে শুনি, দোকানি তার এক বাঁধা খদ্দেরকে একটি মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে।

'Remember that big burly fellah who used to drop in here for bottles of Guiness—that big hulk of a guy? He has *kicked the bucket*! You know, I met his wife round the corner—near the bank—and you know what she told me? "My man has *popped off*!" "You know, my ole man has *popped off*!" She said, "It's Guiness did it." That big hulk of a fellah who used to drop in here—remember? He has *kicked the bucket*!'

পর-পর তিন খদ্দেরকে খবরটা জানালে লোকটি—একই ভাষায় ও ভঙ্গিতে; আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনেছিলুম। সে যে বার-বার কথাটা বলছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তার বেদনা, কিন্তু বেদনাপ্রকাশের এই ভাষা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত। লোকটি অবশ্য শিক্ষিত নয়, কিন্তু কল-কাতার কোনো ক্ষুদ্র দোকানদার অনেক-দিন ধ'রে দেখা কোনো মানুষের মৃত্যু বিষয়ে তুলনীয় ভাষার কথা বলছে, তা কল্পনা করা শক্ত। কলকাতায় বরং অনেক-বার দেখেছি, রাস্তায় যখন মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, কোনো বস্তিবাসিনী, চলা থামিয়ে জোড়হাতে নমস্কার করেছে সেই দেহকে—এটাকে কেউ-কেউ হয়তো কুসংস্কার বলবেন, কিন্তু এতে অন্তত এই বোধটুকু প্রকাশ পায় যে মৃত্যু এক মহান আবির্ভাব—শুদ্ধের, রহস্যময়, দেবতার মতো।

অনেকদিন আগে ইভলিন ওয়া-র একখানা উপন্যাস পড়তে শুরু করে-ছিলুম। হলিউডের এক প্রবীণ চিত্রনাট্য-লেখক আপিশে গিয়ে দেখলে তার চাকরি গেছে, তখনই বাড়ি এসে আত্মহত্যা করলে, লোকেরা খবর পেয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করতে এলো। এতখানি ঘটনা প্রথম দু-তিন পৃষ্ঠায় বেশি জায়গা জোড়েনি, তারপর অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলো মার্কিনী মরণ-শিল্পের সানুপুঙ্খ বর্ণনা। কেমন ক'রে মৃতদেহকে সাজায়, অঙ্গরাগালেপনে ক'রে তোলে মনোহর, ফিরিয়ে আনে বৃদ্ধার তরুণী রূপ, অপসৃত করে জরার চিহ্ন, রোগের চিহ্ন, যাতনার ছায়া, ফুটিয়ে তোলে মুখে এমন প্রফুল্লতা যে মৃত ব'লে আর মনেই হয় না—পাতার পর পাতা এ-সব বিবরণ বিস্তারিত দেখে আমি, স্বীকার করছি, উপন্যাসটি শেষ করার উৎসাহ পাইনি। কিন্তু তার সাহায্যে আমি প্রথম জেনে-ছিলুম যে আমেরিকায় যে-সব নতুন শব্দের উদ্ভব হয়েছে তার একটি হলো 'mortician' Beautician' mortician' —রূপশিল্পী, শবশিল্পী : বলতে গেলে একই পেশা, শুধু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'মক্কেল' হলেন—সপ্রাণ বনিতারা নন, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মৃতেরা। কিন্তু এই শিল্পীদের অভিধানে 'মৃত' শব্দের অস্তিত্ব নেই, এঁরা তাকে বলেন 'প্রিয়জন'—'the loved one'—এমনি আরো অনেক পরিভাষা বা ছদ্মভাষা রচিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুকে একেবারে মুছে ও মোলায়েম ক'রে তোলা, এই ঘটনায় স্বভাবত যারা শোকার্ত হ'তে পারে, তাদের মনে এমন একটি মোহসঞ্চার, যেন এ-তে কষ্টের কোনো কারণই নেই। একবার ক্যালি-ফর্নিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্-এ ভ্রমণ করে-ছিলুম; পথে যে-কটা গ্রাম বা ছোটো শহর পড়লো, সর্বত্র দেখলুম, যেমন অনিবার্যভাবে মুদিখানা ও ড্রাগস্টোর

আছে, তেমনি শোভা পাচ্ছে শর্বাশল্পীর ফলকচিহ্ন।

লস এঞ্জেলেসের এক প্রান্তে একটি বিখ্যাত, কুখ্যাত ও বিশাল গোরস্থান আছে, তার নাম 'ফরেস্ট লন' বা কানন-প্রান্তর। 'মৃত্যু নেই—' এই মোহ অথবা অভিনয়কে কতদূর পর্যন্ত টেনে নেয়া যেতে পারে, এই স্থানটি তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এটি চোখে দেখার চেষ্টা আমি করেছিলুম; কিন্তু স্থানীয় লোকেরাও সকলে তার পথ চেনে না; দু-বার রাস্তা ভুল করে, মাপ দেখে-দেখে, আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে যখন পৌঁছলেন, তার একটু আগে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে যেটুকু আভাস পেলুম তাতে মনে হলো, এর যে-সব জমকালো বর্ণনা পড়েছি তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো গরমিল নেই। বাইরে থেকে, বা ভিতরে গিয়েও, হঠাৎ কারো মনে হবে না এটি গোরস্থান : বন, বীথিকা ও জলাশয়, কৃত্রিম পাহাড় ও রমণীয় মর্মর-মূর্তি—যেন এক প্রমোদ-উদ্যান ছড়িয়ে রেখেছে অমলিন—কোথাও ফোয়ারার কলস্বর, কোথাও বা অদৃশ্য যন্ত্রে নিঃসৃত হচ্ছে সুকোমল সংগীত, যেন পরলোকের পরপার থেকে। গান হয়তো বলছে : 'এই যে, কেমন আছো তোমরা? আমি ভালো আছি, তোমাদের সঙ্গেই আছি—তোমরা ভালো থেকো।' কোথাও এমন কিছু নেই যা আশা ও সুখভোগের পক্ষে উৎসাহজনক নয় : ভয় থেকে, দুঃখ থেকে, আঘাত থেকে অতি যত্নে বহু দূরে সরিয়ে মৃত্যুকে যেন মিশিয়ে দেয়া হয়েছে জীবনের অন্যান্য সাধারণ, সহনীয়, এবং এমনকি উপভোগ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। যারা মাটির তলায় চলে গেছে তারা যে সেখানে বেশ 'ভালো আছে', তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে, কিন্তু যারা আসে 'প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে' তারা যাতে সুখী ও তৃপ্ত মনে ফিরে যেতে পারে, বসতে পারে প্রফুল্লভাবে ডিনারে, তারই জন্য এই বিপুল আয়োজন। এই গোরস্থানে ভূমি অগ্নিমূল্য; চিত্রতারকা ও অন্যান্য ধনীরা অগ্রিম তা কিনে রাখেন, তাঁদের অন্তিম বাসস্থানও 'শ্রেষ্ঠ' হওয়া চাই। অবশ্য এই ধরনের দ্বিতীয় কোনো গোর-স্থান আছে ব'লে আমি শুনিনি, বরং আমার মুখে 'ফরেস্ট-লন'-এর উল্লেখ শুনে অনেকেই হেসে বলেছেন—'ও, হলিউডের সেই পাগলামি! ও-সব ছেড়ে দিন!' শর্বাশল্পীরের প্রাদুর্ভাবও, আমার যতদূর ধারণা, ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোথাও নেই অথবা প্রবল নয়; অন্তত নিউ ইয়র্কে ঘোরাঘুরি ক'রে ও-রকম একটিও ফলকচিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। সমগ্র মার্কিনীদের বিষয়ে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে, তবে মৃত্যু বিষয়ে বিশেষ একটি মনোভাব—যা এই দেশেই উদ্ভূত হয়েছে—তার চরম ব্যঞ্জনা হিশেবে 'ফরেস্ট-লন' উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক নিমন্ত্রণে এসেছি আমরা; গৃহস্বামী বুদ্ধিজীবী, বন্ধুবৎসল ও গুণগ্রাহী। পার্ক এভিনিউর দশতলায় তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট; ঘরে আছে খাঁটি ভেনেশীয় আসবাব, ষোলো শতকের মূল ইটালিয়ান ছবি; অতিথিদের মধ্যে আছেন জর্মান কবি, নামজাদা মার্কিনী সমাজ-তত্ত্ববিদ, কোটিপতী প্রোঢ়া, বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী, এবং অন্য অনেক বিশিষ্ট জন। কিছুক্ষণ আগে উত্তম ডিনার খাওয়া হয়েছে; এখন কনাক বা কির্শ বা বেনেডিক্টিন, হাভানা চুরোট, সোনামুখ সিগারেট—আর গল্প-গুজব। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ আবৃত্তি করছেন কবিতা, কেউ নতুন কোনো শিল্পীর সুখ্যাতি করছেন, কোথাও বা কথা হচ্ছে দাড়ির সৌন্দর্য ও অসুবিধে বিষয়ে। এর মধ্যে গৃহস্বামী হঠাৎ একজন অতিথিকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। এক মিনিট পরে ফিরে এলেন অতিথিটি, কিন্তু তারপর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না, স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন একবার 'গুড-নাইট' পর্যন্ত উচ্চারণ না-করে। আমরা শুন-লুম, তাঁর টেলিফোন এসেছিলো শিকাগোর এক হাসপাতাল থেকে; তাঁর কন্যার সেখানে একটু আগে মৃত্যু হয়েছে : তাঁরা এখনই শিকাগোর প্লেন ধরবেন।

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দ রইলো ঘর; এক টুকরো মেঘ দেখা দিতে-দিতেই মিলিয়ে গেলো। তারপর আবার শুরু হলো কথাবার্তা—কবিতা নিয়ে, আল-জেব্রার সমস্যা নিয়ে, সাম্প্রতিক ভারতে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি, যেন কারোরই মন স্পৃষ্ট হয়নি বিষাদে, সব আছে সুস্থ ও অটুট। এটাই সভ্য আচরণ, সব দেশে, যেখানেই আধুনিক সভ্যতা প্রভাবশালী, সেখানেই এই রকম হতে হতো; আর এটাই যে সভ্য আচরণ নয় তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। অন্তত এর ব্যতিক্রম ঘটানো সন্ন্যাসী না-হ'লে সম্ভব নয়।

উৎসব মুখরিত

দিনে

নন্দ এণ্ড দত্ত

অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী

১১/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট · কলিকাতা-১২ · ফোন : ৩৪-৪৭৬৫

CENTRAL LIBRARY

পতানু পাগলা

বনফুল

আমার ছেলেবেলায় পতানু পাগলা মণিহারী গ্রামে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রাণী ছিল। 'প্রাণী' কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আকৃতিতে মনুষ্য হইলেও আচার ব্যবহারে সে পশুর মতোই ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, ঝাঁকড়া ঘন ভ্রূদুটি যেন ঝুঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ দুইটির ভিতর কি আছে। টিকোলো নাক। থুতনি নাই বলিলেই হয়। মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁপ দাড়ি, মুখে সর্বদা একটা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সর্বদাই যেন সে একটা মজা দেখিতেছে। মজাটা যে কিসের তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারিত না। হয়তো দূরে একটা ছাগল চরিতেছে, পতানু তাহার দিকে হাসি মুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হয়তো হাসির বেগ বাড়িয়া গেল, তখন মুখে হাত চাপা দিয়া খুক্‌খুক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

পতানুর মা আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার মুখে তাহার পাগলামির আদি ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। তাহার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বছর তখন তাহাকে 'রংরুটে' ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখনকার দিনে বিদেশে কাজ করিবার জন্য এদেশ হইতে লোক চালান দেওয়া হইত। এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া রিক্রুটিং অফিসাররা তাহাদের নিকট হইতে টিপসই লইয়া তাহাদিগকে কখনও সিংহলে, কখনও বোর্নিয়ো, কখনও বা আর কোথাও চালান করিয়া দিত। প্রায় এসব কুলি আর বাড়ি ফিরিত না। পতানু কিন্তু বছর দশেক পরে ফিরিয়াছিল। এমন অবস্থায় ফিরিয়াছিল যে তাহার মাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। মাথায় চুল নাই, অথচ একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আসিয়া প্রথমেই সে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আঙুল দিয়া সভয়ে কেবল বলিয়াছিল, 'চুপ'। আর কোনও কথা বলে নাই, খাইতে দিলে খায় নাই পর্যন্ত। কোণে উবু হইয়া বসিয়াছিল সমস্ত রাত। তাহার পর-দিন সকালে তাহাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সাতদিন সে গা ঢাকা দিয়া রহিল। কোথায় গেল কেহই কোন পাত্তা করিতে পারিল না।

অষ্টম দিন রাত্রে গ্রামের চৌকিদার রহমন পাহারা দিতে বাহির হইয়া হঠাৎ 'ভূত' 'ভূত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নায়েব মশাইয়ের বাড়িতে উঠিয়া পড়ে।

নায়েব মশাই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রহমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"কি ব্যাপার রহমন?"

"ভূত হুজুর। স্বচক্ষে দেখলাম। ওই প্রকাণ্ড গামহার গাছ থেকে নামল। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে নাংগো—"

সেই রাত্রেই পতানু ধরা পড়িল আবার। দিনের বেলা সে বড় গামহার গাছের মগডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে, গভীর রাত্রে চুপি চুপি নামিয়া আসিত।

সকলের পরামর্শ অনুসারে ইহার পর পতানুকে বাঁধিয়া রাখা হইল। বেশী দিন নয়, মাত্র দুইদিন বাঁধিয়া রাখার পর পতানু গোপ, দার্শনিক

হইয়া গেল। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। সে হৃদয়ঙ্গম করিল—লোহাবি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। বিদ্রোহ করে লাভ নেই। ইহার পর হইতে তাহার মুখের হাসিটা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখনও সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে একটা ন্যাকড়া তাহার কোমরে জড়ানো থাকিত বটে, কিন্তু প্রায়ই থাকিত না। থাকিত কেবল দড়িটা।

সে উঁচু জায়গায় উবু হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের বাড়ির সামনে যে হাট বসিত, সেই হাটতলার পূর্ব ও পশ্চিম কোণটা বেশ উঁচু। আর একটা উঁচু জায়গা ছিল পোস্টাফিসের সামনে, আর একটা পীরবাবার পাহাড়ের কাছে। ইহারই কোনও একটাতে পতান্ ভোর বেলা আসিয়া বসিত। বসিয়া আপন মনেই হাসিয়া যাইত। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিত, তাহার পর উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা উঁচু জায়গায় গিয়া বসিত। সেখানেও ওই, কিছু একটা দেখিয়া হাসি। হয়তো একটা ছেঁড়া কাগজ, বা একটা ছেঁড়া জুতা। এইসব দেখিয়াই খুশিতে মশগুল হইয়া থাকিত পতান্।

আর সে পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

একদিন কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিল। পতান্ গোয়ালা পোস্টাফিসের সামনে উঁচু জায়গাটায় বসিয়া ধাড়ি সার দোকানের দিকে চাহিয়াছিল। ধাড়ি সা হালুয়াই, মানে ময়রা। সে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। একটু পরেই স্টীমারের যাত্রীরা এদিক দিয়া যাইবে, তাহার সদাভাজা 'পুরি'র একটিও পড়িয়া থাকিবে না। ধাড়ি সা রোজই ইহা করে, পতান্ও রোজই বসিয়া দেখে। কিন্তু সেদিন পতান্র মনস্তত্ত্বে কি যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল জানি না, সে সোজা উঠিয়া ধাড়ি সার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আমার লুচি খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে লুচি দাও—"

ধাড়ি সা তো অবাক।

বলিল, "ভাগ পাগলা! লুচি খাবি? পয়সা আছে?"

পতান্র পয়সা ছিল না সত্য, কিন্তু যাহা ছিল তাহা পয়সার চেয়ে প্রবল। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাহার।

সে সোজা দোকানে উঠিয়া গেল ও বারকোশশুদ্ধ লুচিগুলো নামাইয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া খাইতে লাগিল। ধাড়ি সা বাধা দিতে গিয়া পড়িয়া গেল প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া। তাহার পর সে চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পতান্কে সহজে কাবু করা গেল না। সে সমস্ত লুচিগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া মিষ্টান্নও খাইতে লাগিল। তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া সহজে কেহ তাহার নিকট ভিড়িল না।

সে খাইতে খাইতে চোখ পাকাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"খবরদার"—

তাহাকে পুলিসে যখন হাসপাতালে লইয়া আসিল তখন তাহার হাতে ও কোমরে দড়ি। শোনা গেল, পতান্ ধাড়ি সার দোকানের পরাত দিয়াই কয়েকটি লোককে জখম করিয়াছে। আমার বাবাই তখন হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সে যুগে উন্মাদ পাগলের যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি করিলেন। ব্যবস্থাটি বড় ভয়ানক। পতান্কে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া চার-পাঁচ জন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে ধরিয়া রহিল। বাবা একটা মোটা গুণ ছুঁচ দিয়া তাহার ঘাড়ের মাংসে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া একটা মোটা সুতা পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বদমায়েসি করলেই সুতোটা ধরে টানবে।" ভয়ানক চিকিৎসা। এই চিকিৎসার গুণেই কিন্তু পতান্র দুর্দান্ত ভাবটা কাটিয়া গেল। কিছুদিন আর সে ঘরের বাহির হইল না। মাসদুই পরে দেখিলাম আবার একদিন সে হাটতলার উঁচু জায়গাটায় উবু হইয়া বসিয়া আছে। ঘাড়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতাটাও আর নাই। ভাবিলাম তাহার সহিত গিয়া একটু কথা বলি। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। পতান্ কানে হাত দিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—

"ডাক্তারবাবু রিন্ডাইন্।"

রিনডাইন? এ আবার কি ভাষা।

পতান্ ক্রমাগত বলিয়া চলিল—"ডাক্তারবাবু রিনডাইন, ডাক্তারবাবু রিনডাইন, ডাক্তারবাবু রিনডাইন।" যতক্ষণ দম রহিল ততক্ষণ বলিল।

আমি আর আগাইতে সাহস করিলাম না। পরে দেখিলাম এই 'রিনডাইন' শব্দটা পতান্কে পাইয়া বসিয়াছে। রোজই সে কোথাও না কোথাও বসিয়া 'রিনডাইন' করিতেছে। তবে নামটা রোজ এক নয়। কোন দিন ডাক্তারবাবু রিনডাইন, কোন দিন দারোগাবাবু রিনডাইন, কোন দিন বা নায়েববাবু রিনডাইন।

কিছুদিন পরে একটা পাগলা মহিষের উপদ্রবে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহিষটা কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা গেল না। সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উন্মত্ত ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইত তাহাকেই আক্রমণ করিত। মহিষ বাহির হইয়াছে রব উঠিলেই সবাই ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিত।

পতান্ একদিন পোস্টাফিসের সামনে বসিয়া 'রিনডাইন' করিতেছিল। হঠাৎ পাগলা মহিষটা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল। পতান্ কিন্তু পলাইল না। লাফাইয়া গিয়া পাগলা মহিষের শিং দুইটা ধরিয়া ফেলিল সে। দুই পশুতে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু যন্ত্রের বাহনের সহিত যুদ্ধে মনুষ্যের পরাজয় অনিবার্য। পতান্ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। মহিষ শিং দিয়া তাহার পেটটাই ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে সে বলিয়া গেল—"পাগলা ভাঁইস রিনডাইন।"

অনেকদিন পরে একটি রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার করিয়াছেন। আমার অঞ্চলে কাজ করিতেন। কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন আমার বাড়ি মণিহারী তখন বলিলেন যে মণিহারী গ্রামের এক পতান্ তাঁহাদের চাবাগানের কুলি ছিল। লোকটা চাবাগানের সাহেব মালিককে এক ঘুঁসিতে কুলারী করিয়া সকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, "সাহেবটা পাজিও ছিল মশাই। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। কথায় কথায় বলত—Bring down the whip. তার বাড়িতে দোতলার উপর একটা শক্তির মাছের ল্যাজ দিয়ে তৈরি চাবুক ছিল। সেইটে দিয়ে সপাসপ চাবকাত কুলিগুলোকে।" কে জানে পতান্র 'রিনডাইন'—ইংরেজি Bring down কথার অপভ্রংশ কি না।

ওষুধের গুণ

তুষারকান্তি ঘোষ

" আমি যে কাহিনীগুলি লিখছি, সেগুলি সবই আমার জানা। এগুলিকে ডাক্তারী গল্প বলা চলে। ঠিক ওষুধ পড়লে রোগীর যে কত উপকার হয়, তা' যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না। এই রকম কতকগুলি সত্য ঘটনা লিখছি।

প্রথমেই আমার নিজের অসুখের কথা বলি। বছর ৩০।৩৫ আগে sore throat ও Pharyngitisএ খুব ভুগতুম। সে ভোগা চলতেই থাকত,—১০।১৫ দিন পরপরই অসুখে পড়তুম এবং শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু ছিল না।

ব্যাপারটা হ'ত এই রকম : কোন একদিন সকালে উঠে দেখলুম যে গলায় ব্যথা হয়েছে আর জ্বর-জ্বর ভাব। শরীর গ্লানিতে ভর্তি, নাইবার, খাবার কোন ইচ্ছে নেই, আর মেজাজটা কিপড়ে আছে। অল্পেতেই বিরক্তি ও রাগ হয়। তখন চিকিৎসা সুরু করতুম, তা সে হোমিও-প্যাথিই হোক, কবিরাজিই হোক কিংবা আলোপ্যাথিই হোক। আমার তাড়া-তাড়ি relief পেলেই হল। কখনও foot bath নিচ্ছি, কখনও আলোপ্যাথি মিকশ্চার খাচ্ছি, কখনও কবিরাজি বড়ি জলে মেড়ে খাচ্ছি, কখনও বা হোমিও-প্যাথি বেলেডোনা এক dose খেয়ে নিলুম। এই সব চিকিৎসার জন্যে, কিংবা কোন চিকিৎসা না করলেও তিন চার দিনের মধ্যেই acute condi-tion-টা চলে যেত। তখন আর কাশলে লাগত না, আর গলাটাও সরল হয়ে আসত। শরীরটা মোটামুটি ভালোই বোধ হত। এইভাবে ৭।৮ দিন যেত এবং যখন মনে ভাবছি এইবারে গলাটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে তখন হঠাৎ একদিন নতুন করে গলায় ব্যথা হত এবং আবার নতুন করে চিকিৎসা সুরু করতে হত। এইভাবে বছরের পর বছর ভুগতুম। Change এ গে ল দু-একমাস ভালো থাকতুম। কিন্তু আবার যে কে সে-ই।

এই সময় একদিন ডাঃ বিধান রায়কে আমার এই অসুখের কথা বলি। ডাঃ রায় তখনই কাগজ কলম নিয়ে একটা ওষুধ লিখে দিলেন এবং বলে দিলেন যে যখন সরলভাবে কফ উঠতে থাকবে তখন খাবার পর দুবেলা ঐ ওষুধ যেন ছোট চামচের এক চামচ করে খাই। এই ওষুধ ব্যবহার করে আমি যে কী উপকার পেয়েছিলুম তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। এই ওষুধ খাবার পর দু-তিন দিনের মধ্যে অসুখটা সেরে গেল এবং শরীরে বল ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল। তারপরে এর দ্বিতীয় আক্রমণ হল ছ-মাস বাদে। সে-বারও ঠিক সময়ে ডাঃ রায়ের ওষুধ ব্যবহার করে-ছিলুম, পরের আক্রমণ এসেছিল দুবছর বাদে। তারপর থেকে যে Pharyngitis একবারও হয়নি একথা বলব না। যেমন normal কোন মানুষের কখনও-সখনও গলায় ব্যথা হয়, আমারও তাই হয়ে থাকে। সে chronic অসুখ আর নেই। ডাঃ রায় যে ওষুধ আমায় দিয়েছিলেন তার নাম colossol iodine।

এই গলার ব্যথার ব্যাপার নিয়ে আমার আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমরা ডাঃ পি সাহাকে দিয়ে করাই। একবার সেওঘর থেকে গলার ব্যথা নিয়ে ফিরলুম। শরীর বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য এবং কথা বলতে কষ্ট হয়। আমি ডাঃ সাহাকে টেলিফোন করলুম। তিনি একটা ওষুধ বলে দিলেন। তাঁর এই ওষুধ খেয়েও তিন দিনেও আমার গলার acute stage-টা গেল না। তখন একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করালুম। তিনি আমার গলাটা ভালো করে টর্চলাইট দিয়ে দেখে বললেন, "এ যে raw beef এর মত দেখছি। আচ্ছা, আপনার কি শীত করছে?" আমি বললুম, "হ্যাঁ বেশ শীত শীত করছে।" তিনি আমাকে ওষুধ দিলেন, Heper Sulphur (Dilution মনে নেই)। আমি তখনই কিং কেম্পানীতে গিয়ে ঐ ওষুধ এক ডোজ খেলুম। সেখান থেকে আপিসে গেলুম চিঠির জবাব দিতে। যখন চিঠি dictate করছি আমার সেক্রেটারী বললেন, "আপনি অন্যদিন গলার ব্যথার জন্য আস্তে আস্তে কথা বলেন, আজ তো বেশ জোরে বলছেন। গলার ব্যথা কি সেরে গেছে?" আমার হঠাৎ মনে হল, 'তাই তো, গলার ব্যথা তো টের পাচ্ছি না!' এক ঘণ্টা আগে Heper Sul-phur খেয়েছিলুম। এর মধ্যে সত্যিই অসুখটা সম্পূর্ণ সেরে গেছল।

ডাঃ পি সাহার চিকিৎসার কথা লিখতে গিয়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয়ার meno-pause এর প্রাক্কালে প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকে এবং তিনি অত্যন্ত ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁকে এলাহা-বাদের সুবিখ্যাত লেডী ডাক্তার মিসেস মজুমদারকে দিয়ে দেখানো হয়। সেই সময়ে আমার বন্ধু ডাঃ কর্ণেল মণি দাশও এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও ডাকা হল এবং আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ পি ঘোষও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। নানারূপ ওষুধ, ছুন্ ইত্যাদি দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হ'ল না। ডাক্তাররা তখন বললেন যে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে operation করতে হবে। এই কথা শুনে আমাদের বাড়ির সকলেরই অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের আত্মীয়া বললেন, কোন অস্ত্র চিকিৎসার আগে একবার যেন ডাঃ সাহাকে তাঁর অসুখের কথাটা বলা হয়। আমি রাঁচি হলুম এবং কেলকাতায় চলে এলুম। ডাঃ সাহা আমার কাছে অসুখের সমস্ত বর্ণনা শুনে একটা ওষুধ লিখে দিলেন। আমি তখনই সেই ওষুধ কিনে লোক দিয়ে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলুম। তার পরদিন আমার আত্মীয়া সেই ওষুধ গ্রহণ করলেন। অবশ্য তার দু-দিন আগে থাকতেই অন্য সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আমি টেলিফোনে খবর পেলুম যে আমার আত্মীয়ার অসুখ একটু বেড়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে ডাঃ সাহাকে

সে-কথা জানালুম। ডাঃ সাহা বললেন, "এটা হয়তো ওষুধের জন্যেই হয়েছে। এখনই চিন্তার কোন হেতু নেই।" আর সত্যিই তাই, ওষুধ খাবার বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে এলাহাবাদ থেকে আমাকে ফোনে জানানো হল, আমার আত্মীয়ার অসুখ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এটা যে আমার কাছেই একটা miracle মনে হয়েছিল তা নয়, অন্য ডাক্তারেরাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ওষুধটার নাম ছিল Faximus Americana।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি কোন ডাক্তারের কিংবা কোন চিকিৎসা পদ্ধতির নিন্দা কিংবা সুখ্যাতি করছি। ডাঃ পি সাহার চিকিৎসায় কোন কোন অসুখে ফল পাই নি। যেমন আমার বাঁ চোখে যখন Glaucoma হয়, তখন ডাঃ সাহার চিকিৎসাতে আমি উপকার বোধ করিনি। পরে অস্ট্রিয়ার Dr. Lindner আমার সেই চোখে operation করেন। সব চিকিৎসা পদ্ধতিরই উপকার আছে। তবে, কোন ক্ষেত্রে ভালো ফল হয়, কখনো বা হয় না।

ওপরে যে কর্ণেল দাসের কথা লিখেছি তিনি এখন বেহালায় বাস করেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় আলিপুর জেলে, ১৯০৫ সালে আমি সেখানে তিন মাস বন্দী ছিলুম ও কর্ণেল দাস ছিলেন ঐ জেলের superintendent।

এইখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমাদের বাড়ির একটি ছোট ছেলের একবার Bright's Disease হয়েছিল। ছেলেটি ফুলত এবং তার urine-এ ablumen ও cast ছিল। তাকে অনেক দিন ধরে অনেক রকমের চিকিৎসা করা হয়। যদিও অসুখটা অনেকটা ভালো হয়েছিল, তবু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়নি। এই চিকিৎসার সময়ে ছেলেটিকে যে কত উপোস এবং কষ খেয়ে থাকতে হয়েছিল, সে কথা মনে করলে এখনও দুঃখ পাই। তার ফোলা সেরে গেল, urine থেকে cast চলে গেল এবং ablumen খুব কমে গেল। কিন্তু ablumen-এর একটু trace কিছুতেই গেল না। সব শেষে এর চিকিৎসা করেন কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক। কবিরাজ মশায়ের চিকিৎসায় ছেলেটির urine দোষশূন্য হল। আজকে সেই ছেলে স্বাস্থ্যবান দিগ্‌গজ পুরুষ হয়েছে। কবিরাজ রামচন্দ্র তাকে কি ওষুধ দিয়েছিলেন মনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে দিতে পারবেন।

সবশেষে বলছি ডাঃ নীলরতন সরকারের একটি অদ্ভুত চিকিৎসার কথা।

সেটা বোধহয় ১৯২৬।২৭ সালের কথা। আমাদের বাড়ীর একটি মহিলার কলেরা হোল; একেবারে খাঁটি এ্যাসিয়াটিক কলেরা। ৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগিণী প্রায় মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গেছে। আমাদের বাগবাজার পাড়ার দুজন আলোপাথিক ডাক্তার প্রায় সমস্তক্ষণ উপস্থিত থেকে তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু অনেক ওষুধ, Oil Juniper, Oil Cajiputy কিছুতেও কোন উপকার হোল না। রোগিণীর শেষ অবস্থা,—হাতে পায়ে খিল্ ধরছে। ডাক্তারদের উপদেশমত হাতে পায়ে এরারুট্ ঘষে দেওয়া হতে লাগল। রোগিণীর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। ক্রমে তাঁর সামনে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। তখন তিনি বললেন, "শশীগিরি ও'কে ডেকে দাও"। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে বিদায় নিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি ভগবানকে ডাকো, তিনি নিশ্চয় তোমাকে ভাল করে দেবেন।" যে কারণেই হোক, ঘণ্টা দু-এর মধ্যে রোগিণীর অবস্থা যেন একটু ফিরল—খুব একটুখানি যেন ভাল বোধ করলেন। এইভাবে সেই রাত্রি কেটে গেল। তারপর-দিনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন না, তবে ডাক্তারেরা আশা দিলেন যে, আর প্রাণের ভয় নেই। এইভাবে আরও ৬৮ ঘণ্টা কেটে গেল; তখন কলেরার চিহ্ন আর কিছু নেই, তবে রোগিণী বড় দুর্বল, যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন।

ডাঃ রায় তখনই কাগজ কলম নিয়ে একটা ওষুধ লিখে দিলেন.....

এইবারে তাঁর অদ্ভুত অসুখের কথা ও নীলরতনবাবুর অদ্ভুত চিকিৎসার কথা বলছি। এই কার্বিন মহিলাটির টেমপারেচার সমানে ৯৬· হয়ে আছে। কখনো কখনো ৯৬·এর'ও ২।১ পয়েন্ট নীচে। দিনে ৪ বার করে টেমপারেচার দেখা হোত। মহিলাটির কলেরা সেরে যাওয়ার ৩ দিন বাদে দেখা গেল যে বেলা ১২টার সময় তাঁহার টেমপারেচার ৯৬·৬ হয়েছে। ৩ ঘণ্টা বাদে দেখা গল যে টেমপারেচার আবার ৯৬· হয়ে গেছে। তার পরদিন বেলা ১২টার সময় টেমপারেচার হোল ৯৭· এবং ৩।৪ ঘণ্টা পরে ৯৬·৫। তার পরদিন বেলা ১২টার সময় টেমপারেচার হোল ৯৮· এবং তার ৫।৬ ঘণ্টা বাদে হোল ৯৭·। এইভাবে দিনের পর দিন জ্বর বেড়ে চলল। রোজই বেলা ১২টার সময় এক ডিগ্রি করে জ্বর বাড়ে এবং Minimumও এক

ক্রমশ বেড়ে—যেমন ৯৯·—৯৮·: ১০০ —৯৯· ইত্যাদি। এইভাবে জ্বর সমানে চলছে ও বাড়ছে। রোগিণী নিজে এবং আমরা সকলে খুব ভয় পেয়ে গেলুম যে এইভাবে যদি নিয়মিত জ্বর বাড়তে থাকে তাহলে শীঘ্রই ১০৪·।১০৫· জ্বর উঠে যাবে এবং রোগিণী প্রাণ হারাবে। যে দুজন ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন তাঁরা আমাদের পাড়ার ডাক্তার ছিলেন,—তাঁদের মধ্যে একজন Retired Civil Surgeon। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন ও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর স্পষ্ট কথার একটা উদাহরণ দিই। যেদিন রোগিণীর প্রথম কলেরা হয় সেদিন বিকেল ৫টার সময় তিনি রোগিণীকে দেখে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—"কোন ভয় নেই—রাত্রি ৮টা—৯টার আগে কিছু হবে না। তখন দেখবে হাতে-পায়ে খিল্ ধরছে তখন এরারুটের গাঁড়ো ঘষে দেবে!"

ইনি এবং অপর ডাক্তারবাবু প্রাণপণে রোগিণীর জ্বরের চিকিৎসা করতে লাগলেন এবং বহু ওষুধ খাওয়ালেন। Blood examination ও Urine examination ইত্যাদি সব করালেন। কিন্তু কিছুতেই জ্বরের নিয়মিত অগ্রগতি বন্ধ করতে পারলেন না। আমাদের বাড়ীর লোকেদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। একে কলেরার প্রচণ্ড আক্রমণে রোগিণীর শরীর পাত হয়ে গেছে, তার ওপর জ্বরবিকারের উগ্র আক্রমণে শরীরের আর কিছু রইল না। প্রথমে আমরা ও পরে ডাক্তারেরা একরকম হাল ছেড়ে দিলেন। আমরা রোগিণীকে নিত্য আশ্বাস দিতুম যে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঈশ্বরকৃপা নিশ্চয়ই ভাল করে দেবেন। কিন্তু সে আশ্বাসে রোগিণী মনে কোন বল পেতেন না। তিনি নিজের শরীরের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যাবার দিন এসে গেছে। তাঁর বয়স তখন অল্প এবং তিনি তখন মাত্র একটি সন্তানের মাতা।

এই সময়ে আমরা একদিন ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করছি যে কী করা যায়। Civil Surgeon ডাক্তার আমাদের বললেন, "আমাদের চিকিৎসায় যা করা যায় সব আমরা করেছি, কিন্তু এখন যা রোগিণীর অবস্থা তাতে ২।১ দিনের মধ্যে তাঁর যা হবার তা হয়ে যাবে।" বেলা তখন ৪টা। সেদিন বেলা ১২টার সময় তাঁর জ্বর উঠেছিল ১০৪· এবং সে সময় জ্বর নেমে হয়েছে ১০০·। আমরা স্থির জানতুম যে তার পরদিন তাঁর জ্বর হবে ১০৫ এবং তার পরদিন হবে ১০৬। মনের এই অবস্থায় আমি ভাবলুম যে একবার ডাক্তার নীলরতনকে সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমাদের বাপ্ খুড়োকে জানতেন এবং আমাদের বাড়ীতে কঠিন অসুখ হলে কখনো কখনো আসতেন। তিনিও ডাক্তার বিধান রায়ের মত আমাদের পরিবারে ভিজিট্ নিতেন না। সেই জন্যে আমরা তাঁকে যখন তখন ডাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন আর লজ্জা করার সময় নয়, তাই আমি গাড়ী নিয়ে তখনি তাঁকে আনতে গেলুম। আমার বেশ মনে আছে যে তিনি সন্ধ্যার আগেই এলেন এবং রোগিণীকে পরীক্ষা করলেন। যাঁরা নীলরতনবাবুকে কোন রোগীকে পরীক্ষা করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি কী ধরে নিয়ে, কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং কত সময় দিয়ে রোগী পরীক্ষা করতেন। অবশ্য রোগীকে পরীক্ষা করবার আগে সেই ডাক্তার দুজনের কাছে রোগের সমস্ত বিবরণ শুনে নিয়েছেন। রোগীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর নীলরতনবাবু তাঁর সেই অবর্ণনীয় মিষ্ট হাসি হেসে ডাক্তারদের বললেন—"Intestine"। তারপরে তিনি যখন basinএ সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিলেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ডাক্তার বাবু, কী হবে?" তিনি তাঁর সেই চির-পরিচিত আশ্বাসদায়ী হাসি হেসে বললেন—"ভয় নেই, সেরে যাবে।" একথা শুনে আমাদের হৃদয়মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

হাত ধুয়ে নীলরতনবাবু ঘরে এসে prescription লিখতে বসলেন। লেখা মানে তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়, তিনি বলে যেতে লাগলেন আর একজন ডাক্তার লিখে যেতে লাগলেন। এইবার একটি হাসির কথা বলি। শুধু হাসির কথা নয়, এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে নীলরতনবাবু যেমন কাউকে কোন শক্ত কথা বলতে পারতেন না, তেমনি তিনি কিন্তু কারুর উপরোধে-অনুরোধে তাঁর নিজ-চিকিৎসার একটুও ব্যতিক্রম করতেন না। তিনি ওষুধের নাম বলছেন এবং কত গ্রেন্ বলে দিচ্ছেন। এসব বলার সময় ডাক্তারবাবুরা কখনো কখনো বলছেন যে অমুক ওষুধটি ৫ গ্রেন বেশী দেওয়া উচিত কিংবা ২ গ্রেন কম দেওয়া উচিত। নীলরতনবাবু চুপ্ করে শুনছেন আর বলছেন—"এটি আপনি ৫ গ্রেন বেশী দিতে বলছেন, তা দিলেও হয়।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে আমি ভাবছি যে আমি যে কগ্রেন দিচ্ছি বলছুম এখন তাই দিয়েই দেখা যাক।" এরূপ ঘটল ২।৩ বার বোধ হয়। প্রতিবারই নীলরতনবাবু ওঁদের কথা মুখে মেনে নিলেন কিন্তু একবারও তাঁর ওষুধের এক গ্রেনও এদিক-ওদিক করতে দিলেন না। Prescription লেখা হয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা বললেন, "আপনি যে

"ভয় নেই, সেরে যাবে"

Alkaline mixture দিলেন তা আমরা ঘুঁরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার দিয়েছি কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। কাল রোগীর ১০৫· জ্বর ওঠবার কথা। আপনি আর কোন ওষুধ দেবেন না?" নীলরতনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়সূচক হাসি হেসে বললেন—"আজকে এই ওষুধই চলুক।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "এই ওষুধ ৪ ঘণ্টা অন্তর দেবেন। কাল বেলা ১২টায় কত জ্বর ওঠে দেখবেন এবং সন্ধ্যার সময় আমায় Report দেবেন।" নীলরতনবাবু ঘর থেকে বেরোবার আগে রোগিণীকে শুধু বললেন—"ভয় নেই, সেরে যাবেন।"

নীলরতনবাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি ঘরে এসে দেখি যে ডাক্তারবাবুরা মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন। তাঁরা দুজনেই আমাকে বললেন যে নীলরতনবাবুর মতন ডাক্তারের কাজের সমালোচনা তাঁরা করতে চান না। তবে একথা নিশ্চিত যে এ mixtureএ রোগীর কোন উপকার হবে না। যদিও ডাক্তারদের এ কথা শুনে আমাদের মনটা দমে গিয়েছিল তবুও মনে কেমন একটি অনুভূতি হচ্ছিল যে নিশ্চয়ই নীলরতনবাবুর ওষুধে উপকার হবে। যাই হোক, নীলরতনবাবুর ওষুধের প্রথম dose পড়ল রাত ১০টায়। যাঁরা রোগিণীর সেবা করছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন রোগিণীর মাতাঠাকুরাণী। ওষুধ খাওয়াবার পরই তিনি খবর দিলেন যে ওষুধ খেয়েই রোগিণী সেটি বমি করে ফেলেছেন। আমি তক্ষুনি নীলরতনবাবুকে telephone করলুম। তিনি বললেন যে পরের dosetা ৪ ঘণ্টা বাদে না দিয়ে ২ ঘণ্টা বাদে দেওয়া হোক্। তিনি আরও বললেন যে যদি রোগীর জ্বর ছেড়ে যায় এবং রোগী আনচান্ করেন তাহলে ৫।১০ ফোঁটা Brandy যেন দেওয়া হয়। আমরা রোগিণীর মাতাঠাকুরাণীকে নীলরতনবাবুর কথা জানিয়ে শুতে গেলুম। কথা রইল ১২টার সময় ১ দাগ ও ৪টার সময় ১ দাগ ওষুধ দিতে হবে।

ভোর যখন ৫টা, আমি স্বপ্ন দেখছি যেন রোগিণীর ১০৫· জ্বর হয়েছে, অথচ তিনি কেন জানই আছেন। এমন সময় রোগিণীর মাতাঠাকুরাণী এসে বললেন—"তুমি শীগ্‌গির এস, ও'র গা বরফের মত ঠাণ্ডা আর ও কেমন করে চাইছে!" আমি ধড়মড় করে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, "ওর টেমপারেচার কত?" তিনি বললেন—৯৫·। আমি তক্ষুণি রোগিণীর ঘরে গিয়ে দেখলুম যে তিনি অতি কাতরভাবে এদিক-ওদিক চাইছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেমন আছ?" তিনি বললেন—"ভাল।" আমি—"কোন কষ্ট হচ্ছে কী? তাহলে ডাক্তারবাবু তোমাকে কয়েক ফোঁটা Brandy দিতে বলেছেন।" তিনি বললেন—"কষ্ট হচ্ছে না।"

সেই দিন সকালে আমাদের বাড়ীর সকলেরই অসীম আনন্দ। ৮টার সময় তৃতীয় ডোজ ওষুধ পড়ে গেল—তখন টেমপারেচার হয়েছে ৯৬·। সবচেয়ে বেশী জ্বরের সময় হচ্ছে বেলা ১২টা। পূর্বে যে ভাবে দিনের পর দিন জ্বর বাড়ছিল সেই হিসাবমত আজ ১২টায় জ্বর হওয়ার কথা ১০৫·। বেলা ১২টা বাজল, রুগীকে আর ১ ডোজ্ ওষুধ দেওয়া হোল। দেখা গেল যে রুগীর temperature 97·6। ৪ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল ৯৬·। সন্ধ্যার সময় যখন নীলরতনবাবুকে আমরা report পাঠালুম তখন রোগিণীর টেমপারেচার ৯৫·। এই যে টেমপারেচার ৯৫· হোল, এর পর ৩ দিন ধরে ২।১ পয়েণ্ট ছাড়া তা ৯৫য়ের চেয়ে আর বাড়েনি।

যে দিন রোগিণী পথ্য করলেন সেদিন ডাক্তারবাবু দুজনকেও আমরা খেতে বলেছিলুম। খাবার পরে যখন আমরা গল্প করছি তখন রোগিণী এসে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বসলেন। রোগিণীকে দেখে আমার আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। আমি ডাক্তারবাবুদের বললুম—"ব্যাপারটা কী হল বলুন ত।" তাঁরা বললেন—"ব্যাপার আর কী? রুগী সেরে উঠল, এই হল।" আমি বললুম—"তা যেন হল, কিন্তু আপনারা যে বলেছিলেন নীলরতনবাবুর 'Alkaline mixture'এ কিছু হবে না—তার কী?" তখন স্পষ্টবক্তা Retired Civil Surgeon মহাশয় বললেন, "এতে আশ্চর্যটা কোনখানে? এই পাশের ডাক্তারবাবুর practice কেমন আমি জানি না, তবে আমার practice কেমন তাতে জানি। Retire করে অবধি তো practice করছি, কিন্তু রোগীর মুখ দেখছি কই? যদি কারুর মুখ একবার দেখি, দ্বিতীয়বার সে তো আর আসে না। যখন Civil Surgeon ছিলুম তখন visit ১৬্ টাকা থেকে ৮্ টাকা, এবং পরে ৪্ টাকা অবধি করেছিলুম। কিন্তু তবু ত private practice জমল না। আর দেখুন গিয়ে ৭নং Short Streetএ। নীলরতনবাবু visit নিচ্ছেন ৬৪্ টাকা করে, তবুও তাঁর বাড়ীতে যেন রোগীর গাদী লেগে গেছে। তা তাঁর Alkaline mixtureও রোগ সারবে না ত কী আমাদের mixtureও সারবে!"

সেই মহিলাটি এখন সুখেই ঘরকন্না করছেন।

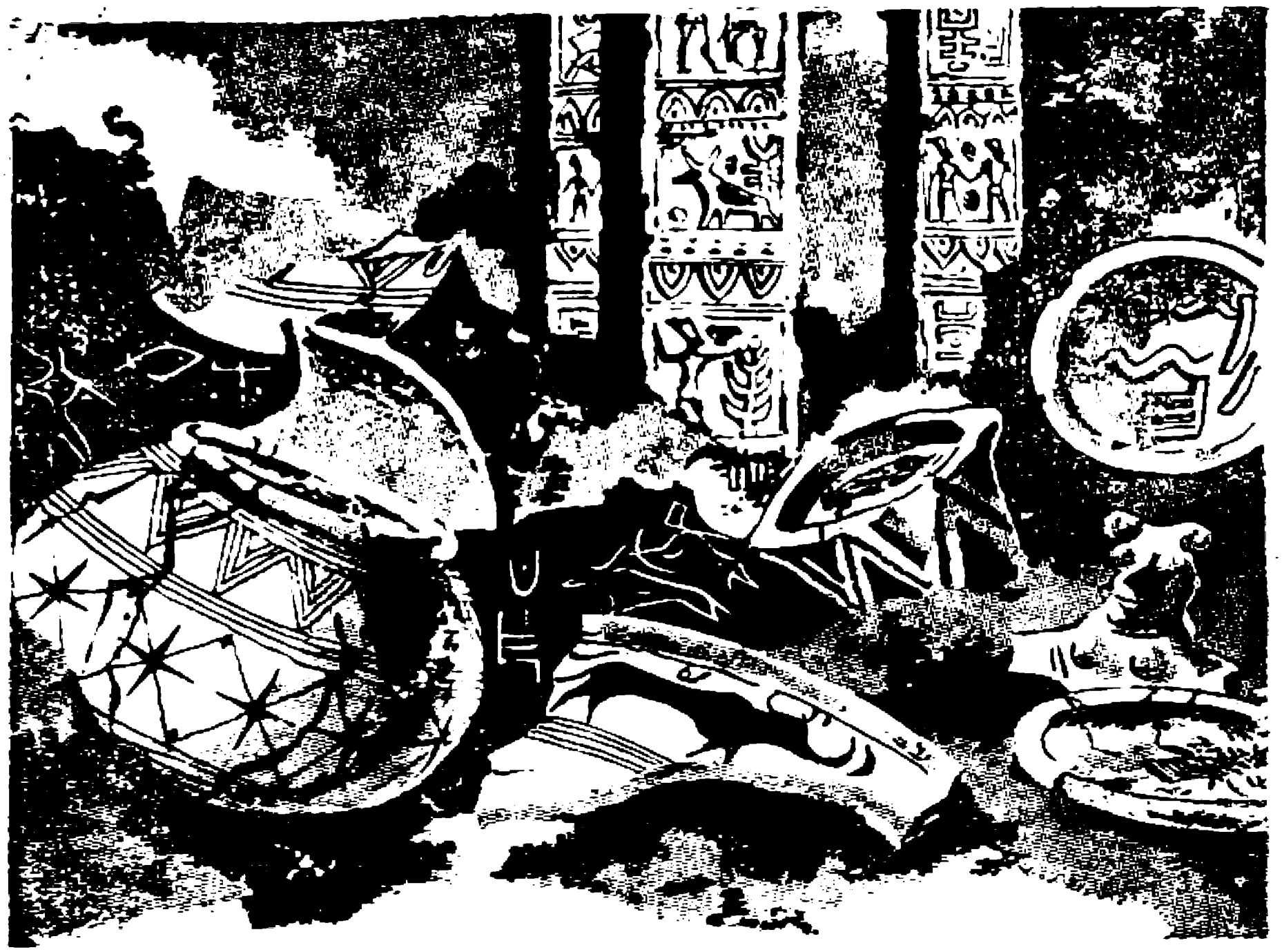

সভ্যতার প্রথম বিকাশ…

মিশরে, মধ্য এশিয়ায় বা ভারতে যেখানেই হয়ে থাক, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শস্য উৎপাদন। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম সোনালী ফসল ফলাতে সফল হলো সেদিনই তার যাযাবর জীবনে যবনিকা নেমে এলো, সে ঘর বাঁধতে শিখলো। এমন কি হাজার হাজার বছর পরেও পিরামিডের তলায়, হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া গেছে সেই প্রাক্-আর্যযুগের স্বর্ণশীর্ষ খাদ্যশস্যের সন্ধান।

তখনকার দিনে প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যব — বলা হত 'শূকধান্য'। আজকের দিনেও সারা উত্তর ভারতে সমস্ত প্রকার শুভকাজের একটি অপরিহার্য উপকরণ হলো যব। প্রাচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে যবের ব্যবহার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন যবান্ন, যবশক্তু, যবমণ্ড ও যবাগু। যুগ যুগ আগে প্রচলিত যে যবের কথা বলা হলো সেই যব থেকেই তৈরী হয় আজকের দিনের সুপরিচিত বার্লি। স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য হিসেবে বার্লি চমৎকার।

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'র প্রস্তুতকারকদের পেছনে রয়েছে দেড়শত বছরেরও ওপর বার্লি তৈরীর অভিজ্ঞতা। সুপুষ্ট বার্লিশস্য থেকে সর্বাধুনিক কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এই বার্লি তৈরী ও টিনে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকেরা রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লিরই ব্যবস্থা দেন। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিদের, শিশু ও প্রসূতিদের পক্ষে বার্লি ও দুধবার্লি একাধারে উপকারী ও উপাদেয় পথ্য। তাছাড়া, পাস্তিলেবু বা কমলালেবুর রসের সঙ্গে বার্লির পানীয় পরম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। অ্যাটলান্টিয় (ইন্ট) লিমিটেড (ইংলণ্ডে সংগঠিত),

CENTRAL LIBRARY

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (নটুয়া বেশে)

CENTRAL LIBRARY

বংশী ভুনাওয়ালা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বংশী ভুনাওয়ালার দোকান ছিল আমাদের পাড়ায়। ভুনাওয়ালা বলে তাচ্ছিল্য করবার কিছু নেই; বিরাট বড় দোকান—সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে।

বংশীর বাবা শুকদেও প্রথম জীবনে ফেরি করত। তখন কলকাতা শহরে এত রবরবা ছিল না। আমাদের বিকটায় কিস্তর জমি খালি পড়েছিল। তারই খানিকটা ইজারা নিয়ে সে ছোট একটি দোকান পেতেছিল। সেই দোকানই ক্রমশ বড় হয়ে আজ বংশী ভুনাওয়ালার দোকানে পরিণত হয়েছে।

শুকদেওয়ের তিন ছেলে—বংশী, গণেশ ও রামচরণ। এই ছেলেরাই পরে বাপের ব্যবসাকে ফলাও করে তুললে। খালি ভুনাওয়ালার দোকান নয়—দোকানের সংলগ্ন আরো খানিকটা জমি নিয়ে তারা দোতলা মাঠকোঠা করেছিল। এইখানে তারা ভাড়াও দিত এবং নিজেরাও থাকত।

শুকদেও মারা যাবার পর এরা তিন ভাইয়ে অক্লান্ত চেষ্টা করে ছোট্ট সেই দোকানটিকে বড় কারবারে পরিণত করলে। তিন ভাই বিয়ে করলে; বৌরা এসে স্বামীদের কারবারে লেগে গেল। এখন মস্ত উঁচু মাচায় গামলায় করে থরে থরে পণ্য সাজানো—চালভাজা, কড়াইভাজা, ছোলাভাজা, চাপটা ছোলা, ঘরের ছাতু, ছোলার ছাতু—আরও কত কি! নিচে গনগন করছে উনুন—পাশে বৌরা জাঁতা ঘুরোচ্ছে, কেউ বা বাড়ীর ভেতরে রাঁধছে, কেউ বা মাচার ওপরে দোকানে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করছে। ছেলেরা কোট-জুতো পরে ইসকুলে যাতায়াত করছে। এক কথায় বংশীর যেমন জমজমাট ব্যবসা তেমনি জমজমাট পরিবার।

বংশীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক বেশি। বংশীর বয়স হলেও তাকে তখনো জোয়ান বলে মনে হতো কিন্তু তার বৌকে আসল বয়সের চেয়েও অনেক বেশি বয়সের বলেই মনে হতো। এরই মধ্যে বংশী দিনকয়েকের জন্য কোথায় গিয়ে এক বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। বংশীর কাণ্ড দেখে তাদের বাড়ীর সবাই তো বটেই পাড়াসুদ্ধ লোক অবাক। দিন-কতক খুব হৈ-চৈ, ঝগড়া-ঝাঁটি—চলে আর কাক-চিল বসতে পারে না এমনই অবস্থা।

দিনকয়েক বাদে অবশ্যই একটু সামাভাব এসে পৌঁছলে সকলে বংশীর নববিবাহিত স্ত্রীকে চক্ষু মেলে দেখলে এবং দেখে দ্বিতীয় দফা অবাক হলে।

নতুন বৌয়ের বয়স বাইশ তেইশ বছর হবে। রংটা মাজা-মাজা—বংশীদের ঘরে তাকে গৌরবর্ণাই বলা চলে। টানা-টানা চোখ দুটি যেন একটি শাণিত ছুরির দুটো ফলা। মুখখানা একটু লম্বা এবং অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। দেহলতা নিটোল যেন কুঁদে বার করা হয়েছে। এ রকম সুন্দরী অনেক বড় ঘরেও মেলে না।

নতুন বৌ এসেই নিজেকে বিপরীত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে।

দুদিনের মধ্যেই সে পাঁড়িপাল্লা ধরতে শিখে গেল এবং বাংলা বলতে লাগল বংশীদেরই মতো। নতুন বৌয়ের নাম ফুলবাসিয়া।

ফুলবাসিয়ার আগমনের পর বংশীর দোকানের বিক্রি বেড়ে গেল প্রচুর পরিমাণে। পাড়ার যাঁরা জন্মেও ভুনা-ওয়ালার দোকান থেকে জিনিস কিনতেন না তাঁরা হঠাৎ ছোলাভাজা ও চালভাজার অনুরাগী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফুল-বাসিয়া তাঁদের অনুগ্রহকে গ্রাহ্যই করলে না। দরকার হলে তাদের সঙ্গে সমানে চোঁচামেচি করতেও ছাড়ত না। আমরা জানি এই ফুলবাসে অনেক দূর-দূরান্তের ভৃঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসত কিন্তু ফুলের চারদিকে গুঞ্জরণ করাই তাদের সার হতো। সকলকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ফুলবাসিয়ার বচন ছিল তীক্ষ্ণ। সমানে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সে গালি-গালাজ করে যেত। কিন্তু তবু খদ্দেরের ভিড় কমত না। বংশী ভুনাওয়ালার দোকান এখন লোকের কাছে ফুল-বাসিয়া ভুনাওয়ালীর দোকানে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে ফুলবাসিয়া আবার পশ্চিমের কোন জায়গা থেকে গোটা পাঁচ-ছয় দুধাল ছাগল আমদানি করলে। গাধার মত সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা লোম-ওয়ালা এবং গরুর পালানের মতন পালানওয়ালা সেই ছাগলের দল দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। এগুলি ছিল ফুলবাসিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি। সে নিজে তাদের পরিচর্যা করত, নিজে দুধ দোয়াতো এবং বিক্রিও করত। উদ্বৃত্ত দুধ যা থাকত তা তাদের সংসারের জন্য খরচ হতো।

বর্ষা আর শীতকাল ছাড়া বংশীদের পরিবারের পুরুষের প্রায় সকলেই রাস্তায় খাটিয়া পেতে রাত কাটাতো। ছাগলগুলোও এই সময়ে বাইরেই থাকত। তাদের বাড়ীর অনেক দূরেই ছিল প্রকাণ্ড মাঠ; সেই মাঠে দুপুরবেলা ফুলবাসিয়াই ছাগল-গুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসত। তারা স্বচ্ছন্দে ঘাস-টাস খেত। আবার বিকেল নাগাদ সেগুলোকে সংগ্রহ করে এনে বাগানের খুপরিতে বেঁধে রাখত।

এখন এই মাঠটি ছিল আমাদের লীলাভূমি। পাড়ার এবং বেপাড়ার আমরা কয়েকটি সেরা সেরা ছেলে এই মাঠে ফুটবল খেলতুম এবং আড্ডা দিতুম। ফুলবাসিয়ার দিকে না এগোলেও আমাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত ছিল না। খেলা যে বোজই হতো তা নয় কিন্তু যেদিনে খেলা হতো না সেদিনে নানান বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ফুলবাসিয়া ছিল একজন।

দেবাশীষ থাকত আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। সে ফুটবল খেলত না, আলোচনার মধ্যে অতি সামান্যই কথাবার্তা বলত; কিন্তু সে ছিল আমাদের সিগারেটের ভাণ্ডারী।

—দেবা, একটা সিগারেট ধরা।
—বলা মাত্রই সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে দুটান মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে দিত। ও ছিল অতি ভালমানুষ ও নিরীহ লোক। আমাদের যেদিন কিছুই করবার থাকত না সেদিন দেবাশীষকে নিয়ে চ্যাংদোলা করে দৌড়ানো হতো। কখনো কখনো শুকনো পাত যোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেবাশীষকে দোলানো হতো আর সে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাত। আমরা তাতে পরমানন্দ উপ-ভোগ করতুম। দেবাশীষ হাসিমুখেই এ-সব সহ্য করত এবং কোনোদিনই আড্ডা ভাঙাই করত না।

দেবাশীষ ছিল পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে কিন্তু তার কোনো চাল ছিল না বললেই হয়। মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি—এই ছিল তার পোষাক। আর ছিল তার মেজাজ! অমন নরম মেজাজের লোক আজও আমার চোখে পড়েনি। কখনো তাকে বিরক্ত হতে বা রাগতে দেখিনি।

আমাদের মাঠ রাস্তার ধারে হলেও তার তিন ভাগ ছিল কতকগুলো বাড়ীর আড়ালে, আর এক ভাগ ছিল রাস্তার দিকে খোলা। একদিন বিকেলে আমরা মাঠে বসে গুলতানি করছি, ফুটবলটা পাম্প হচ্ছে—এমনি খেলতে নামব এমনি অবস্থা—ঠিক সেই সময় কে যেন

বিবাহের শখ্যাদ্রব্য
কিনে বিবাহিত জীবন
সার্থক করে তুলুন
অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং
৩৬/৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩
ফোন ২৪-৪৩২৮

দেহে কান্তি ও মনে শান্তি অটুট রাখে
ইণ্ডিয়ান রোজউড
শান্তিরস সালসা
বিশুদ্ধ খাঁটি উপাদান দ্বারা প্রস্তুত ও শক্তি-শালিনী করে
সর্ব-প্রকার রক্তের যন্ত্রণা নিরাময় করে
সম্রান্ত ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
৪০৯।১এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ ৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

[illegible] দেবাশীষের হাতে [illegible] দেবাশীষের পকেটে তখন [illegible] ছিল না। —একটি কিনে নিয়ে [illegible]—বন্ধু সে উঠে প্রস্তাব দিয়ে [illegible] করল। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে সুলতানিয়ার [illegible] এসে পড়ল।

সুলতানিয়া এসেই চীৎকার করে তাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিতে শুরু করে। তারা কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ করতে বলল—কী হয়েছে? [illegible] সেই উত্তেজনায় [illegible] সাধ্য [illegible]। [illegible] বন্ধুরা [illegible] তার [illegible] হাত দিয়ে সে মাথের রক্ত ঝরে পড়ছে।

[illegible] চলে গেছে। এমন সময় একটি ছেলে দেবাশীষ এসে বলে সুলতানিয়াকে কি যেন বলেছে। [illegible] স্পষ্ট হাঁ করে দেখছে যে এরই [illegible] সুলতানিয়া দেবাশীষের কথার কি [illegible] ছিল কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। তারপরে সুলতানা কিছুক্ষণ [illegible] বার্তা হলে—কি [illegible] হলো কিছুই [illegible] দেবাশীষ [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [

আমি বললুম—আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ঠিক হল আজ আমরা দুজনে দেবাশীষের পেছু নেব। সে চারটের সময় বাড়ী থেকে বেরোয়।। আমরা বেলা সাড়ে তিনটের সময় গিয়ে তার বাড়ীর আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকব।

পরের দিন আমি আর নির্মল ওদের বাড়ীর থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত বাড়ীটাকে নজরে রেখে—এক জায়গায় ওৎ পেতে বসে রইলুম। বেলা চারটে নাগাদ দেবাশীষ বাড়ীর থেকে বেরিয়ে এল। দেখলুম তার গায়ে ঝোপদোস্ত পাঞ্জাবি, পরণেও তেমনি কর্সা ধুতি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে একবার চারদিকে ভালো করে দেখে আমরা যেদিকটায় বসে ছিলুম তার বিপরীত দিকে হন হন করে চলতে লাগল। খানিকটা চলে আমরা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে পৌঁছলুম। তখন রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। দেবাশীষ তারই মধ্যে দিয়ে উত্তর মুখে এগিয়ে চলল। আমরাও সমান ব্যবধান রেখে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। দেখলুম সে খানিকটা করে চলে আর ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—আবার চলতে থাকে। নির্মল বললে—দেখলি! ছেলে পড়াতে যাবে তো এত সতর্কতা কেন বাবা!

যাই হোক আবার সে চলতে লাগল। খানিকক্ষণের ভেতরে ঢুকে সে হঠাৎ ডানদিকে টেনে দৌড়। কি ফ্যাসাদ! আমরাও দৌড়তে লাগলুম। পঞ্চাশ ষাট গজ দৌড়ে একটা পানের দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলে-দুলে চলতে লাগল পশ্চিম দিকে। আমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের লুকিয়ে লুকিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। তারপরে বাঁ দিকে একটা গলীর মধ্যে ঢুকে পাঁচখানা বাড়ী ছাড়িয়ে একটা বাড়ীতে টুপ করে ঢুকে পড়ল। আমরাও ছুটে গিয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। দেবাশীষ ততক্ষণে উঠোন পার হয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমরা তার এত কাছে এসে পড়েছি—তবু সে টের পেল না। ওপরে দোতলায় উঠে সে বারান্দার ধারে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আর বাক্যব্যয় না করে আমরাও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দেবাশীষ উঠে আমাদের দেখে বলে উঠল—আরে! তোরা কোত্থেকে? আমার পেছনেই ছিলি বুঝি? আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল কে যেন আমার পেছু নিয়েছে! যাকগে—যখন এসেই পড়েছিস তখন বোস ভাই!

ঘরের মধ্যে একদিকে একটা উঁচু বিছানা—তাতে বালিশ পাশবালিশ সবই রয়েছে। বিছানার সামনে মাদুর পাতা। আমরা জুতো খুলে মাদুরে বসলুম। এমন সময় ঘরে অন্য দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল ফুলবাসিয়া।

কিমাশ্চর্যতঃপরম্! মিশরের পিরামিড কিংবা ইলোরা আর কৈলাস চেষ্টা করলে কল্পনা অন্তত করা যায়। কিন্তু এ যে কল্পনাতীত!

দেবাশীষ বললে—ফুলবাসিয়া, বোসো। এরা আমার বন্ধু। আমার অজ্ঞাতে আমার পেছু নিয়ে একেবারে এখানে এসে ঢুকেছে।

ফুলবাসিয়ার মুখ দেখে মনে হলো সে আমাদের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি। একটু হেসে তবু সে বললে—তাই নাকি!

ফুলবাসিয়াকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। একেই তো সে ছিল সুন্দরী, তার ওপরে দেহে কাঁচা সাবান পড়েছে—মাথায় তেল—সুন্দর একখানি চওড়া পেড়ে তাঁতের শাড়ী হিন্দুস্থানী ধরণে পরা—মাথায় কবরীতে একটি বেলফুলের মালা জড়ানো—সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছিল ফুলবাসিয়াকে!

দেবাশীষ আমাদের বললে—এ বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্যে এসে উঠেছি বটে কিন্তু অন্য বাড়ী আমি ঠিক করেছি। শীগগিরই সেখানে উঠে যাব—

একটুক্ষণের মধ্যে ফুলবাসিয়াও মুখর হয়ে উঠল। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা ফুলবাসিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না তো?

সে বললে—না, না, আপনারা বন্ধুলোক, আপনাদের কথায় কি রাগ করতে আছে?

জিজ্ঞাসা করলুম—অনেকগুলি ধনী লোক তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে নিরাশায় ফিরে গিয়েছে। শেষকালে দেবার মধ্যে তুমি কি দেখলে—

ফুলবাসিয়া আমার কথার মাঝখানে বললে—ওর ওপর বড় মায়া পড়ে গেল। তাছাড়া দিনরাত সতীনের সঙ্গে খিচ-মিচি আর ঐ বুড়ো বর সহ্য করতে পারলুম না। তার ওপরে দেখলুম মানুষটা ভালো—তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

দেবা বললে—কিন্তু ভাই, তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর আমরা যদ্দিন বেঁচে আছি একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না—

প্রতিজ্ঞা করলুম— ফুলবাসিয়া খপ করে আমার দুহাত ধরে বললে—কারুকে বলবেন না। আমার স্বামী খবর পেলে মিছিমিছি কতকগুলো মারপিট থানা পুলিস হবে।

ফুলবাসিয়ার হাত ধরে বললুম—তুমি নিশ্চিন্তে থাক—কারুকে বলব না।

দেবার কল্যাণে দেবদুর্লভ ফুলবাসিয়ার স্পর্শলাভ করলুম।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঘুণাক্ষরেও দেবাশীষের কথা প্রকাশ না করলেও তার সম্বন্ধে আলোচনারও অন্ত রইল না। কোথায় গেল সে—কেন আসছে না—কেন রাগ করেছে ইত্যাদি। যাই হোক দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমি কিংবা নির্মল কেউই আর ওদিকে যাইনে। একদিন নির্মল দেবার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল—তার বাবা মারা গিয়েছেন। সে নিজের বিষয়-আশয় বুঝে নিয়ে বসতবাড়ীর ভাগ ভাইদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে!

দিন কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চাকরি পেয়ে অদৃশ্য হতে লাগল। ক্রমে ফুটবল খেলা ছেড়ে ভবের খেলা সুরু করবার ডাক পড়ল। মাঠ থেকে ঘাট, ঘাট থেকে আঘাটার কোনা-কুনি ত্রিকোণীতে ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগলুম। গুরুজনদের অনুশাসন অমান্য করে নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা-সাধনের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলুম। তখনকার যুগে এখনকার মত চাকরি এত সুলভ ছিল না। খোঁটার জোর না থাকলে চাকরি পাওয়াই যেত না। অনেক

উমেদারির পর একটা বড় সওদাগরি আপিসে শেষকালে চাকরি জুটে গেল।

কিছুদিন বাদে তারা বললে—বিদেশে যদি যাও তাহলে উন্নতি হবে। ব্যস্—বিদেশে চলে গেলুম।

দীর্ঘদিন—অতি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরে বন্দরী হয়ে আবার কলিকাতায় ফিরে এলুম। মাথায় চুল ঝিচুড়ি, চোখে চশমা, দাঁত পড়তে সুরু করেছে—এই অবস্থা। কলকাতায় ফিরে এসে দেখলুম বংশী ভুজাওয়ালার অবস্থা অনেক ফিরে গিয়েছে।

তাদের মাঠকোঠা হয়েছে অনেক বিস্তৃত। শুনলুম তারা টাকা ধারধোর দেবার কারবারও করে। কারা যেন দু' তিনখানা বাড়ীও তাদের কাছে বাঁধা রেখেছে। একখানা নিজস্ব বাড়ীও করে ফেলেছে। তাছাড়া ওরা আবার খুচরোর সঙ্গে পাইকারী কারবারও আরম্ভ করেছে। বস্তা বস্তা চালডাল্লা ছোলা-ডালা কড়াইডালা ভুট্টার খই পাইকারী কারবারীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বংশী ও তার ভাইয়েদের হাতে সোনার তাগা উঠেছে। বংশীর বেশ ভুঁড়িও হয়েছে। মেয়েরা-বৌরা আর তাদের কারবারের কাজ করে না। ছটা সাতটা কারিগর দিনরাত কাজ করে চলেছে। এক কথায় অবস্থা তারা ফিরিয়ে ফেলেছে।

ইওরোপে তখন যুদ্ধের সাড়া লেগেছে। সকলেই নিজের ঘাঁটি সামলাচ্ছে—হিটলারের হিট অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন সবাই ঘুমোচ্ছিল তারই মধ্যে সে নিজেকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। তার কিছু কিছু ঢেউ আমাদের ভারতবর্ষে এসেও লাগছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা যুদ্ধ ঘোষিত হলো।

যুদ্ধ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন সকলেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল—যে যার ঘাড়ে পারল লাফিয়ে পড়ল। আমাদের শহরের হাল-চালও গেল বিগড়ে। সন্ধ্যার দীপমালা নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারে নিভে গেল। দোকান-পাট সব বন্ধ। সরকার জীবন-ধারণের জন্য খাদ্যবিতরণের ভার নিজে নিলেন। ফলে একশ' দেড়শ' বছর ধরে এখানে যারা মুদির দোকান করে আসছে তারা ঝাঁপ বন্ধ করে ম্লান মুখে দেশে ফিরে গেল। সন্ধ্যা হলেই সব বন্ধ। বংশী ভুজাওয়ালার দোকানও এর মধ্যে টিমটিম করে চলে একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

পাড়ার লোক বলে—তাই তো বংশী, তোমাদের এতকালের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল!

বংশী ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—পরমাত্মা যা করবেন তাই হবে।

কিন্তু সেই দিনই পাড়ার লোক সবিস্ময়ে দেখলে বংশীর মাঠকোঠার সামনে খানাতিনেক লরী বস্তাবোঝাই হয়ে এসে দাঁড়াল। লরীতেই লোকজন ছিল। তারা ঝটপট চোখে মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি বস্তাগুলো দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল। বস্তাগুলো ছোট বড় লাল কাল নানান আকারের কাঁকরে ভরা। ধুলো, কেওঁকিন, মাটিগুড়োনো তার মধ্যে আছে। সারারাত ধরে সেই সব কাঁকর, বালি, ধুলো, চালে ডালে ছেলের মতন করে ধনে-জিরেয় মিশিয়ে মিশ্রিত হয়ে শেষ রাত্তিরে তিন লরীর বদলে ছ' লরীর মাল চলান হয়ে গেল। আবার দিনের বেলায় আসতে লাগল চল ডাল আটা ময়দা। বংশীরা ফুলে ফেঁপে উঠল। শুধু বংশীরা নয়—এ রকম অনেক বংশী অঞ্চলে ভাইকিরি করে নরহত্যা করতে লাগল।

যুদ্ধের ঘূর্ণিতে মানুষের মাথা গেল বিগড়ে। সংসারের হাওয়াই উলটে গেল। ছেলে বাপকে ধরে ঠেঙাতে লাগল—চাকর মনিবকে। চোর হল সাধু, সাধু হল চোর, মেয়েরা হয়ে উঠল বেপরোয়া। এর মধ্যে বিদেশ থেকে দলে দলে সৈনিক এসে পড়ল শহরে; জিপ গাড়ী সাঁজোয়া গাড়ী দিনরাত পথের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। সুখে নরহত্যা করবার উল্লাসে তারা লোক-চাপা দিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি লোকচাপা দিয়ে তারা হাসতে হাসতে ছুটে গেছে। লোক ছুটছে—কোথায় টাকা, হা টাকা, যো টাকা! এই উন্মাদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে

যে দেখেছে নটরাজের তাণ্ডব সেই জেনেছে কি মহান কি বিরাট অথচ কি অনুভিবার্য এই ধ্বংসের লীলা।

এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল বংশীদের অতবড় মাঠকোঠা জেঠ একেবারে মাঠ করে ফেলা হয়েছে। যে সময় একমুঠো সিমেন্ট কিংবা এক পাত ইস্পাত শতমুদ্রা দাম নিয়ে লোক বোঝাড় করতে পারে না সেই সময়ে বংশীর বিরাট প্রাসাদ হতে লাগল। ঝাঝ্-ঝাঝ্ করে এক বছরের কাজ দু-মাসেই শেষ হয়ে গেল। একদিন যেখানে বংশী ভুজাওয়ালার ছোট্ট ঘর ছিল সেখানে উঠে পড়ল এক বিরাট প্রাসাদ। তাদের বাড়ীর কাছেই মস্ত একটা খালি জায়গা পড়েছিল সেটা কিনে নিয়ে বংশী নিজের নামে বাজার বসিয়ে ফেললে। বাজারের চারদিকে তেতলা বাড়ী—বাড়ীর ওপর লেখা হলো "বংশীবাবুর বাজার"। শহরের আর একদিকে আর এক বাজারের নাম হলো "গণেশ মার্কেট"। আর একটা বাজারের নাম হলো "রাম-বাবুর বাজার"। বংশীরা এক এক ভাই আট-দশ লাখ টাকার ওয়ার-বণ্ড কিনে ফেললে। বংশীর বাড়ীর গেটে তামার প্লেটে বড় বড় পেতলের হরফে লেখা হলো—"বংশীপ্রসাদ জয়সোয়াল এণ্ড ব্রাদার্স্ প্রাইভেট লিমিটেড"। দরজার আর এক দিকে লেখা হলো "জয়সোয়াল প্যালেস"। গেটের দু'দিকে বন্দুকধারী সেপাই বসল। আরো আশ্চর্যের বিষয় বংশীকে সরকার দু'দিন ডেকে নিয়ে গেল। জেনারেল পোস্টঅফিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বংশীপ্রসাদ ওয়ার-বণ্ড সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে এল।

সেদিন ছিল মহরমের ছুটি। ছেলে-বেলার বাবার হাত ধরে আমরা দুই ভাই মহরম দেখতে যেতুম। মেছোবাজারে একটা বাড়ীর উঁচু রকে আমাদের চড়িয়ে দিয়ে বাবা নিজে পাশে দাঁড়াতেন। সেই দমামাধ্দ্দমি ও রণহুঙ্কার, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, পাটাখেলা, লুপ্‌খেলা—এই সব দেখতে দেখতে আমাদের বুকের মধ্যেও রণবাদ্য বাজতে লাগল। কখনো ভয়ে, কখনো উৎসাহে সময়টা যে কি করে কেটে যেত তা বুঝতে পারতুম না। ফেরবার সময় দুই ভাইয়ে দু'টো কিংকি-পোক কিনে বাজাতে বাজাতে ফিরতুম। তারপর থেকে সখ করে কখনো মহরম দেখতে যাইনি। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে দু'একবার যেতে হয়েছিল বটে কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় কিছুই ভালো লাগেনি।

সেদিন ছিল আপিসের ছুটি। কাজ-কর্ম কিছুই নেই। ঘুড়ো জাঠা আর অবশিষ্ট নেই যে ধরে গপ্পাবাজী করি—নিজেই গপ্পাবাজী করলে হয় এমনই অবস্থা—দুপুরবেলা সার্কুলার রোডে মহরম দেখতে গেলুম। এক জায়গায় ভিড় একটু কম দেখে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে লাঠি খেলতে খেলতে দলের পর দল চলেছে। দেখলুম সেই আণ্ডারওয়্যারের ওপরে জরির ফিতে দেওয়া জাঙিয়ার বাহুল্য আর নেই—অধিকাংশই পেণ্টুলান-হাফ-প্যাণ্ট-হাফশার্ট পরে নেমেছে। এই সব দেখছি—এমন সময় দেখি আমার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে ধীরে ধীরে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছে।

দেখলুম লোকটির মুখ হাত কান—সব কুষ্ঠরোগে ফুলে উঠেছে। মনের মধ্যে অস্বোয়াস্তি ভোগ করতে লাগলুম—মনে হলো আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। ঠিক সেই সময় লোকটি ঘুরে দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমিও তার মুখের দিকে তাকালুম—মুখটা অসম্ভব ফোলা, চোখ দুটো কোথায় গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে—কিন্তু দেখতে দেখতে সেই দুই চোখে পরিচয় ভরে উঠতে লাগল। বলে উঠলুম—আরে! দেবাশীষ যে! কি খবর?

ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললে—চিনতে পেরেছেন?

আমি বললুম—দেবাশীষ, তোমাকে আপনি বলছি কেন?

দেবাশীষ বললে—কি জানি, যদি কিছু মনে করো।

দেবাশীষ চলতে আরম্ভ করল উত্তর মুখে। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কুল-বাঁসরার খবর কি?

সে বললে—কুলবাঁসরা মারা গেছে বছর দুই হলো। তারই তো প্রথমে এই রোগ হয়। ডাক্তার দেখে বললে—এ বড় খারাপ জাতের কুষ্ঠ। একে একদূরে কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দাও, সেরে যাবে। মধ্যপ্রদেশে বড় আশ্রমে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলুম কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইল না। বললে—তোমাকে ফেলে কোথাও গেলেই আমি মরে যাব। দেখতে দেখতে সে ফুলে ফেটে পড়তে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে মারা গেল। তারপরেই আমাকে এই রোগে ধরেছে।

বললুম—কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তোমার—তোমার মুখ—তোমার চেহারা!

দেবাশীষ বললে—খালি আমার চেহারার পরিবর্তন দেখছ? সমস্ত দুনিয়াটা কি ফুলে ফেঁপে পচে ফেটে পড়ছে না? কি বদলে যায়নি? আমাদের ছেলেগুলো মেয়েগুলো নায় ধর্ম সমাজ—সবই তো কি অদ্ভুত বদলে গেছে! এর মধ্যে যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে সেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

বললুম—তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাচ্ছ না কেন?

দেবাশীষ বললে—আমি যাব ঠিক করে ফেলেছি। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করতে যা একটু দেরি।

চলতে চলতে দেবাশীষ বললে—আশ্রমে যাবার আগেই আমি একটা পরিবর্তনের আশা করছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি পরিবর্তন?

—মৃত্যু।

কথাটা বলেই দেবাশীষ বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার পা-দুটোও অসম্ভব রকমের ফুলে উঠেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। অপরিচয়-মান সেই চেহারা ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

তারপর ডানদিকের একটা গলিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হবিবর মিয়া খাদির বিবি ও গুলাব টাট্টু

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল; এর ফলটা এক হিসাবে মিট্টু মাস্টারের বাসব-লম্পটত্বেই প্রাপ্য।

সমস্যা একটা কথা কাটাকাটি, তাই থেকে রীতিমতো ঝগড়া হয়ে দুই বেহাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। ওদের জগতের মধ্যে নেশার মুখে এ রকম ব্যাপার নিত্য হচ্ছে, নেশার মুখেই আবার হাত ধরাধরি, ক্ষমা চাওয়া, নতুবান মনার ঘটা, চোখের জলে কোথায় ভেসে যাচ্ছে মনের সব গরল। নিত্যকার ব্যাপার, তবে বেহাইয়ে-বেহাইয়ে বাক্স এক্ষেত্রে একটু মর্যাদার প্রশ্ন এসে পড়ল, তাই থেকে প্রতিকারের। লছমন বলল—"ভেবেছ কি তুমি একবার নিতাকে বলা দিকিন। লছমন মেড়তের মেয়ে ঘরে তুলে তাকে বাদশা হঠ পড়তে দিল এক লাফে তোমাকে ধরাশায়ী করে দেবে একেবারে। তু যও, আজ থেকে সব সম্পর্ক শেষ করে দিলাম এই।"

দুখনও চোখ পাকিয়ে উঠল বলল—"উঃ, স্পর্ধা দেখেছ! তা থাকো তোমার স্পর্ধা নিয়ে। আমি কিন্তু মেয়েটাকে

বাড়ি ব'য়ে দিয়ে যাবে, তারপর তুমিও নাচ্চ তো আমিও নাচ্চ।"

"যাবে না ছোটলোকের বাড়ি আর। জন্ম দিয়েছি, এক মুঠো খেতে দেওয়ার সামর্থ্য রাখি।"

"এক আঁজলা টাকা নিয়ে তবে মেরে দিয়েছ। খরিদকরা পুত্তরো আমার, জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসব।"

"ফিরিয়ে নিও তোমার টাকা।"

"নিলাম না ফিরিয়ে। আমার আমার খরিদ-করা মেয়ে ফিরিয়ে দেবে, হকের জিনিস, আইন আছে দেশে। আদালত আছে।"

"যাও, করোগে আদালত।"

"জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে আসব, আদালত তো অনেক পরে।"

জিতুদাসের ছেলের তিলক, অর্থাৎ পাকা-দেখা। বাইরের ওসারায় তাল-পাতার চাটাই বিছিয়ে আসর হয়েছে, মাঝখানে দুটো ঘয়লা, গোটাকতক কাচের গেলাস; এই আসরেই কড়চা উঠল হঠাৎ। কেউ দুলুনির মধ্যে পিট-পিট ক'রে চাইছে, কেউ থামাবার চেষ্টা করছে অবশ হাত তুলে, এদিকে কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে ঝড়ের বেগ। কেড়ে নিয়ে আসবার কথায় লছমন হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে কটমট করে চেয়ে রইল দুখনের দিকে, একটা চরম জবাব খুঁজছে, এই সময় তার দৃষ্টিটা বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল, তিলক দেখতে সেখানে পাড়ার কতকগুলো ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে সেইখানে। ঘাড়টা তুলে গেলাসটা উল্টে দিল মুখে। তারপর রাগের মাথায় গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলেই যেন ফণা ধরে দাঁড়িয়ে উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল, এবং দলের মধ্যে থেকে একটা বছর আট-নয়েকের মেয়েকে জাপটে তুলে ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে নেশার ভারি গলায় হুঙ্কার করে উঠল—"তা কেড়ে নেবে তো এসো, দেখি কত বড় বুকের পাটা!"

দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ, মেয়ে-সুদ্ধ ওপরের দিকটা ভারি হয়ে গিয়ে অল্প অল্প টলছে। আরও গোটা-কতক ডাক দিল, তারপর দু হাতে মেয়েটার কাঁধ-দুটো ধ'রে মুখটা সামনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—"বল্, যাবি? তাহলে এক্ষুণি আছড়ে পাঠিয়ে দিই শ্বশুর-বাড়ি!"

কি বুঝি হয়ে পড়ে এখনি; সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে। মেয়েটা "ও বাবা!" ব'লে চুকরে কেঁদে উঠে কাঁপিয়ে পড়ে দু' হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরতে "সুনরিয়ারে!— বিটিয়ারে আমার— তোকে কেড়ে নেবে রে!" বলতে বলতে— ওর কান্নার সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে বাড়ি-মুখো হোল।

উৎপত্তিটা নেশার গেলাসের মধ্যে হ'লেও অনেক ভেতর পর্যন্ত গোড়া নেমে গেছে, বোঝাপড়া আর হতে চাইছে না কোন মতে। লছমনের গুমর জাতে নিয়ে, দুখনের জোর সে টাকা দিয়ে জাতের ধার ভোঁতা করে দিয়েছে। কেউ দমবে না। চেষ্টা করছে সমাজের সবাই, কোনও ফল হ'চ্ছে না। একটা কাজিয়া বাধিয়ে কেড়ে নিয়ে আসবার কথাটা— সামনে কলসী, গেলাস থাকলেই বেরোয় মুখ দিয়ে। তবে দুখন বসেও নেই, আদালতের কথা ভাবছে। যদিও ভাবছে খিঁতিয়ে-জিরিয়েই। তাড়াহুড়ার তো কিছু নেই, ওদিকে মেয়েকে স্থিরাগমন করাবার, এদিকেও বৌকে স্থিরাগমন করিয়ে নিয়ে আসবার এখনও ঢের দেরি। ততদিন বেশ চলে আক্রোশ জীইয়ে রাখা।

মাস-তিনেক কেটে গেল। এর মধ্যে একটা "ভার" অর্থাৎ তত্ত্ব পাঠাবার দিন এসে চলেও গেল শুকনো, দুদিকের ফৌসফোঁসানিটা দুদিনের জন্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে। এই ক'রে কেটে যেতে লাগল সময়।

ওদিকে বর-কনের কথা। ন' বছরের কনে, বর বয়সের দিক দিয়ে প্রায় ঐ রকমই, বেটাছেলে ব'লে মাথায় এক মুঠো বড়। তাই দেখে বিয়েও দেওয়া হয়েছে—বিয়ের কিন্তু এরা বোঝে কি? বর কনে আগেও যেমন সকালবেলা মোষ চরাতে নিয়ে যেত এখনও তেমনি যায়, গ্রামের শেষে পাকুড়-গাছতলায় সঙ্গীদের সঙ্গে কপাটি, গুলি-ডাণ্ডা খেলায় মাতে, নাইবার সময় পিঠে চড়ে মোষটাকে জলে নামিয়ে হুড়োহুড় করে, খাওয়ার সময় মোষ নিয়ে ফিরে আসে। কনে সুনরিয়া তো বরাবর থাকতও না শ্বশুরবাড়িতে; কখনও-সখনও গেল, কিছু দিন রইল, তা সেটুকু বন্ধ হয়ে ওর দৈনন্দিন জীবনে কোন ইতর-বিশেষই হয়নি। বেশই আছে, ওদিকে ভাববারই দরকার হয় না। শুধু একটু-খানি। সুনরিয়াদের বাড়িটা এদিকেই, বামনটুলির বড় পুকুরটার ওধারে। ওরা যখন দুটোপুটি খেলত, মেয়েটা অন্য কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে তার ছোট ভাইটাকে নিয়ে পাকুড়গাছের তলায়

উৎসবের আনন্দে
প্রিয়জনকে তৃপ্তি দিতে হলে
চাই রবীনের সন্দেশ ও দৈ
শ্রীরবীন্দ্র নাথ আশ
১০। বিবেকানন্দ রোড, ফোন: ৩৫-১৭১০

জন ক্টাচির
"মহাজাগরণ"
দুনিয়া সম্পর্কে কমিউনিস্ট ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এবং বিভিন্ন দেশে সমাজ-বাদের নব রূপায়ণে জাতিভাবের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক অনবদ্য বস্তুতন্ত্র বিশ্লেষণ।
পৃষ্ঠা—১১৫ মূল্য—১·৫০ নঃ পঃ
প্রাপ্তিস্থান:—
বাইটার্স হাউস
২১১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭

যে-কোন পরিবেশে আপনার দিনগুলি আরও মধুময় করে তুলতে
●
অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনে আর পথে-প্রবাসে অনুপম সাথীরূপে
●
পূজায় ও যে-কোন উৎসবে অনবদ্য উপহার

গ্রন্থালয়ের নবতম অর্ঘ্য
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
অন্য নয়ন ৪·৫০
অ্যাকুসিডেন্ট ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২·৫০
কর্ণাটরাগ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·০০
গোরাকালার হাট ॥ অশোক গুহ ॥ ৮·৫০
সমাপ্তি ॥ শিশির দাশ ॥ ৩·০০
সম্বাদিকা ॥ সমরেশ রায় ॥ ২·৫০
দুঃস্বপ্ন (একাঙ্কিকা) ॥ অনুরাধা দেবী ॥ ১·০০
চৌধুরী বাড়ী ॥ ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ॥ ৪·০০
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

একদিকে দাঁড়িয়ে দেখত, সেটা আর নেই। তাও ধরতে গেলে সেটা তো অনেক দিন থেকেই নেই। এ রকম নিয়মিত ছিল বিয়ের আগে, আট মাস হতে চলল, বিয়ের পর সুনীতিকে কোন কোন দিন যেন পথ ভুলে এসে পড়ত, দাঁড়াতও অনেক দূরে, পাকুড়তলার বাইরে। সেটুকু গেছে। তা করে থেকে গেছে খেয়ালও নেই। ভালও হয়েছে, বিয়ের আগে ও এসে দাঁড়ালে বেশ লাগত, খুব জিতেছো বলশাই, বিয়ের পর—লাগত এক রকম ভালোই—তবে, কি যে হোত, বড় হেরে যেত।

এক একবার ভাবে—যাক, বালাই না আসে সেই ভালো। শ্বশুরের ওপরের রাগটা ওর ততটা না থাকলেও পরিবাদ-গত তো বটেই। সুনীতার ওপর পড়ে গিয়ে খানিকটা।

যাঁর মনে পড়ে গেল। কোথায় যাচ্ছিল পড়েই বা কতটুকু মনে থাকে।

মেয়েদের আলোচনার ধারা অনেই কারুর-না-কারুর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে সেজন্য সুনীতার মতো ততটা নির্লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পাঁচজন একত্র হলেই ঐ কথা, তার মধ্যে তার স্বশুরকন্যার কথাও এসে পড়ে, নিতাই একটু একটু করে নতুন নতুন মনে থাকে মনাতে। যা শুনে পড়ল গিয়েছিল ঐ কটি দিনের মধ্যে তার স্মৃতিটাকে বারে জাগিয়ে—জামাইটি বড় ভালো, এখানে মার যেমন নিজে করুন—এটা ভুল হয়ে গেল—ওটা ওরকম করে করতে গেলি কেন?—বউমাটি বেশ সরল হচ্ছে, কানে যাচ্ছে না?—জামাইটি সেরকম নয় আদর করে, সাজিয়ে, পাঁচ-জনকে দেখিয়ে যেন আশ মিটত না। তারপর, কি খায়, কোনটে ভালোবাসে। নিজেই জোগাড়-যন্ত্র করে দেওয়া, কিম্বা বাজার থেকে আনিয়ে দেওয়া। একটু শুধু বশ থাকতে হোত, এমন প্রাণ খুলে খেলা নয়, গলা ছেড়ে হাসি-হুল্লোড় নয়। প্রথম প্রথম হয়েও যেত কিছু কিছু, এ-পাড়া-ও-পাড়াই তো, এখনকার অনেক সঙ্গী গিয়ে জুটতও সেখানে,—জামাইটি যেমন ডাকতও তাদের, একটু বাড়বাড়ি হলে তেমনি গরজারও করত। ঐ যা একটু, তবে সে গরজারনির সবটুকুই মারে নিবে—কেমন মা, মেয়েকে একটু সহবৎ শেখায়নি, কেন-রো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কিভাবে চলতে হয় বলে কইতে হয় শুনতে হয় শিখা নেই!

কি লিখেও তো অসংখ্যই সুনীতার।

ছোট কথা এর ভিতরে শ্বশুরবাড়ি জড়ানো ছাড়াই। তবে আস্তে আস্তে মিলিয়েও আসছে যেন সব। তার ওপর মার কোলে এই নতুন খুকিটি এসেছে। এও একটা কথা কম বেড়েছে সুনীতার, খিটিমিটি বেড়েওছে মার, তবু কী চমৎকার খুকিটা! কী মিষ্টি হাসি! সুনীতার এক-একবার মনে হয় কাজ নেই বাবা অত শ্বশুরের বাড়ির মিটে, দিদিরা আসুক সে।

কয়েক বছরের গল্প যদি কোনদিন বেশি হয় বড়জোর একটু হাসে, সখী-সাথীকে নিয়ে ছোট ভাইটির হাত ধরে পাকুড়তলায় ছোঁড়াদের হুটোপাটি খেলা দেখবার জন্য গিয়ে দাঁড়ায় সুনীতা। তারপর তখনো ভুলে যায় শ্বশুরবাড়ির সবার কথা।

এই করে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় এক দিন দুপুরে এক রকম হাঁফাতে হাঁফাতে মার ঘরে ঢুকে এসে বাবা—চুপ করে বসে রইলেন। চুপ করে থাকা

জীবন-বেদ

অস্বস্থো যেন বিনিদ্রো
স্বস্থো ভবতি মানবঃ

অসুস্থ মানুষকে রোগ মুক্ত করাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের লক্ষ্য। জীবন বেদের এই শাশ্বতবাণী প্রচারিত হয়েছিল বহুশতাব্দি পূর্বে। ভারতের আর্য্যঋষিগণ তাঁদের সাধনালব্ধ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা দ্বারা মুমূর্ষু বিশ্ব ব্যাধি প্রশমনের করেছিলেন সৃষ্টীভিত; এঁর ছিলেন মানব জীবনে মুক্তির মহা আনন্দ।

আজ বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক সভ্য সমাজে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি শত ৩০ বর্ষাধিক কাল রোগার্তের সেবায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। প্রবল-কুষ্ঠ, দুরারোগ্য এই রোগে বিশীড়িত কত সম্ভাবনা পূর্ণ নরনারীর যারা জীবন এখানকার চিকিৎসা নৈপুণ্যে আবার সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

শ্বেত-কুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস্ ও কঠিন চর্মরোগাদি চিকিৎসার সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, ১ নং যমুনা ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
শাখা : ৩৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে) ফোন : ৩৭-২৩৫৯

এসো! মিটুঠু মাদারির জানোয়ারের খেলা দেখবে এসো—হবিবন মিয়া আর খাদিরণ বিবি অরবী টাট্টুতে চড়ে তাদের কেরামতি দেখাতে এসেছেন!—সব কাজ ফেলে চলে এসো!—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দো—যে যেমন আছ!

হাতের তড়বড়ে বেজে ওঠে—চড়্-চ্-চ্, চড়্-চ্-চ্, চড়াৎ!

একটা সাদা রামছাগল, তার পিঠে দুটো বাঁদর। সামনেরটা হুলো, বেশ বড়ো, তাগড়া; পেছনেরটা মাকামাকি, বয়ঃ ছিমছামেই। হবিবন মিয়া আর খাদিরণ বিবি। ছেলেমেয়েরা সবাই চেনে, গত বৎসর এই সময় ফাগুয়ার করেক দিন আগে গ্রামে এসেছিল মিটুঠু মাদারি, মিয়া-বিবির নাম আওড়াতে আওড়াতে, নাচতে নাচতে, হাততালি দিতে দিতে একটা দল ঘিরে চলেছে, মাদারি বামনটুলির বড় পুকুরের ভিণ্ডার একটা গাছতলায় এসে থামল। আরবী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল দুটিতে। আগে হবিবন মিয়া, পরণে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে মেরজাই, মাথায় লাল চুড়ো-ওলা টুপি। নেমে হাতদুটো বাড়িয়ে ধরতে খাদিরণ বিবিও ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল। পরণে ঘাগরা, গায়ে মেরে-কুর্তা, চোখে টানা কাজল।

মিটুঠু মাদারির তড়বড়ে বেজে চলেছে। ছুটে আসছে ছেলেমেয়ের দল—বড়রাই বা নয় কেন? নেহাৎ ছুটে না হয় নাই আসুক। মিটুঠু মাদারি নাম ক'রে গিয়েছিল গত বৎসর। খেলা শুরু হয়ে গেল।

নানারকম। ঘড়ি হাতে মাঝখানে মিটুঠু বসে, আরবী টাট্টু গুলাব প্রথমে কেরামতি দেখাল নিজের। দু' পায়ে দাঁড়াল, সামনের পা-দুটো মুড়ে ঝুঁকে এল দু'বেপ, মাঝে মাঝে একটা পা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করাও আছে। একটা ছোট্ট টুলের ওপর চার পা একত্র ক'রে দাঁড়াল। শুরে পেটের বাথায় ছটফট করতে লাগল, হবিবন হাকিম হয়ে ওষুধ দিতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। হুলী দেখতে বাইরে যাবে হাকিম সাহেব। টাট্টু ঘোড়াকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ডলে-মলে নিজে ছিম-ছিম শব্দ করার সঙ্গে, খাদিরণের কাছ থেকে ওষুধের থলিটা নিয়ে গালে একটা বিদায়-চুম্বন দিয়ে উঠে বসল টাট্টুর ওপর।...হেসে, হাততালি দিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল। আরও সব রকমারি খেলা। মিটুঠু মাদারির ডান হাতে দড়ি, তারই টানের ইসারায় নর্তক হচ্ছে সব, তবে বোঝবার জো নেই। বাঁ হাতে তড়বড়েটা, চড়-চড়, চড়াৎ-চড়াৎ করে বেজে উঠছে। মুখে বুলি: সে-সব বুলিই বা কী মজাদার! হাসির হররা তুলছে মাকে-মাকে, সবার মধ্যে, ছোট-বড় নেই তার।

সব শেষে এল সবচেয়ে মজাদার খেলা। খাদিরণ বিবি মান করে শুয়ে আছে। হুলী দেখে এসে ওষুধের থলি হাতে দিতে গেছে, নেবে না। পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করে দিচ্ছে, নেবে না। মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, উঠবে না। "কি ব্যাপার পেয়ারী আমার, জান আমার, চোখের রোশনি আমার?"—কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মিটুঠু মাদারির মুখ দিয়ে বলছে হবিবন, খাদিরণ "খাক-খাক" করে উঠে ছিটকে সরে আসছে। মুখের কাছে খাবার ধরছে, নতুন চুনরী (ঘাঘরা) এনে ধরছে হাতের কাছে, নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এতটুকু নরম হয় না। হবিবন মাথায় করাঘাত ক'রে দুহাতে মাথা চেপে ধ'রে বসে রইল।

মাদারির মজাদার বুলির সঙ্গে তড়বড়ে বেজে চলেছে। এক সময় হঠাৎ মাদারির খেয়াল হতে প্রশ্ন করল—"দেখো তো মিয়া, খাদিরণ বিবি "নৈহর" (বাপের বাড়ি) যেতে চায় কিনা।"

শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল হবিবন, মাথা দোলাতে দোলাতে এসে মিটুঠু-মিয়ার পিঠে সাবাশির চাপড় দিল ক'টা—"ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ!"

বিবির কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে, এতক্ষণে মাথা দোলাল। তারপর উঠেও বসল। তার তোড়জোড় এবং শেষে গুলাব-টাট্টুর ওপর মিয়ার পেছনে বসে বাপের বাড়ি রওয়ানা।

এর ওপরেও ঝাড় আছে, একেবারে শেষ দিকে।

গেল তো বিবি নৈহর, ফিরতে একে-বারে নারাজ।

আবার সেই সব ব্যাপার—খোসামোদ, লোভ দেখানো—"আরে পেয়ারী মেরী, জান মেরী, তু চলো এবার, তুমি ছিন্ন ঘর আমার অন্ধকার—এই নাও চুনরী, এই নাই লহঠী" (গলার চুড়ি)—কোন মতেই আর রাগ মানানো যায় না বিবিকে, মাথা নাড়া আর থামে না। গুলাব-টাট্টুর ওপর চড়ে ফিরে ফিরে আসে হবিবন।

তারপর আবার ঐ মিটুঠু মিয়ার পরামর্শ।—"আরে মিয়া, 'কোথায় আছ তুমি? খোসামোদ ক'রে, চুনরী-লহঠী দেখিয়ে কি কেউ কখনও বিবিকে তার বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে?"—মিটুঠু হাসির হররা তুলে চারিদিক থেকে হাততা ঘুরিয়ে এনে বলল—"এই এত লোক তো রয়েছে, জিজ্ঞেস করো না তাদের নিজের নিজের কথা। বিবিকে আনবে তো তোমার এক নম্বরে ওষুধ বের করো—দবা-ই-ডণ্ডা—শুড় শুড় করে আসবে চলে।"

লাফিয়ে ওঠে হবিবন মিয়া, পিঠ ঠুকে দেয় মিটুঠু মাদারির—আলবৎ, ঠিক বলেছে! তারপর ওর পাশ থেকেই দবা-ই-ডণ্ডা, মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে গুলাব-টাট্টুকে ছুটিয়ে একেবারে শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে নামা।

তারপর মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে দে মার, দে মার! "আরে মিয়া, অত রাগ নয়, বিবি মরে গেলে করবে কি?"—ক্যাচ ক্যাচ ক'রে ওঠে হবিবন। মিটুঠু মিয়া সবার দিকে চেয়ে বুঝিয়ে দেয়—"হবিবন বলছে মরে গেলে আবার বিবি করব—একটা নয়, দুটো নয়—দশটা বিশটা—বিবির আবার অভাব নাকি?"

মারতে মরতে টেনে নিয়ে আসে। হাত ধরে নয়, গুলাব-টাট্টুর পিঠে করেও নয়—হিড়হিড় ক'রে চুলের মুঠি ধরে। খাদিরণ বিবি আওয়াজ তোলে—ক্যাচ-ক্যাচ-ক্যাচ-ক্যাচোর-ক্যাচ—এই যাচ্ছি, এই যাচ্ছি—এই তো যাচ্ছি মিয়া।

হাসির চোটে বামুনটুলির বড় পুকুরে যেন ঢেউ তুলে দেয় ছেলেগুলো, হাততালি দেয়, ডিগবাজি খায়, ধুলো ওড়ায়, হুল্লোড়-বাজি আর থামতে চায় না। তামাসা বন্ধ করে সামনে বেছানো চাদরটার ওপর থেকে পয়সা জড়ো করতে থাকে মিটুঠু মাদারি।

হুল্লোড় করতে করতে ছেলেরা চলেছে পাকুড়তলার দিকে, তাদের খেলা জমাবে। মেয়ের দলও রয়েছে—একটু আলাদা, তবে মাঝে মাঝে মিশেও যাচ্ছে: এতো মাতামাতি, একটা যেন নেশা ধ'রে গেছে সবার। মুখে হবিবন মিয়া, খাদিরণ বিবি, গুলাব-টাট্টু। একটা ছেলে অন্য একটার কাঁধ ধরে তার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠতে গেল, চেঁচিয়ে উঠল—"আমার গুলাব-টাট্টু। গুলাব-টাট্টু আমার!"

একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়তে আগুন ধরে গেল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ মিটুঠু মাদারির খেলা! হবিবন মিয়া-খাদিরণ-বিবি-গুলাব-টাট্টু। কে কি সাজবে!..."

"বন্দী কোথায়?...বন্দী! বন্দী। ...তুই হবিবন মিয়া...আর খাদিরণ?"

"খাদিরণ তো রয়েছেই—সুন্দরিয়া—এই যে দেখলুম তাকে!...ধ'রে নিয়ে চল ওদের!...উঃ কী মজাই যে হবে!....."

হোক হয় বৌ। ছেলেমানুষের মন। আর মাতালই হয়ে উঠেছে তো। এও সাঁতা-সাঁতা খেলা! তবে শেষ পর্যন্ত এত সাঁতার আর হতে পারল না।

বনশ্রী অবশ্য বাঁচি, জিজ্ঞেস করে, "সুনীরিরা ঠ্যাক আছে?"

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই সুনীরার বাঁড়ি-মুখো হয়েছে, ফিরে ধরতে বোকে দাঁড়ায়—"আমি গালাগাল দেব—চোঁচিয়ে ডাকব বাবাকে—ইস, বেত মেরে নিয়ে আসবে, সাঁলা ওর!"

একটু সুর কেটে যায়। তবে মাতালের মধ্যে একটু সুর কাটলেই বা কি? মিয়া-বিবি-টাটু পেতে দেরি হয় না। খেলা ওঠে জমে। শুধু বনশ্রী আস্তে আস্তে একটু আলাদা হয়ে পড়ে চুপটি করে থাকে বসে। তেমনি সুনীরিরা এসে জোটে আবার। অবশ্য, কাছে নয় অনেক দূরে; বামনটুলির বড় পুকুরের এপারের ভিণ্ডার ছোট্টা খেজুর গাছের নীচে।

পাড়া জাগিয়ে হুল্লোড়, পরবে কেনা থাকতে?

সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় খেলা এক শেষ হয় না।

"সুনরী, তুমি চুপ!"

পুকুর ঘুরে কখন এসে পেছনটিতে দাঁড়িয়েছে বনশ্রী। ঘুরে দেখে একবার আঁৎকে উঠেই যেন কাঠ মেরে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল সুনরী।

"বাবি আমাদের বাড়ি?"

চুপ করে চেয়েই রইল—

"মা কালীছিল তোর জন্যে গ্রাক মারাও সন্দেশ লোডও জুড়ে দিল বনশ্রী, বলল — "অঙ্ক পড়ো মোলাপো। পারিয়েছে কিনা, তুই ভালোবাসিস..."

"কি করে যাব? বাবা চটবে যে!"

"বলাব, বাঃ আমি কি করব? তোমার হাবিবন মিয়ার মতন মারতে মারতে নিয়ে এল মিটুঠু মনীরির খেলা দেখে। দুটা গালাগালও জুড়ে দিল না হয়।"

"সাঁড়া মারাব তুই!"

"তা কখনও পারি? শুনেছ তো — কারণ বাবি ভিজ হাবিবন মিয়ার জান, চোখের রোশনি।"

ভান হাতটা ধরল। সুনীরা বলল— "আবার মিছে বাবি তো?"

"তা যদি না? কী যে বলিস!"

ওদের দলের ছেলেরা বেরোয় ছোক ছোক করে। সুনরী পাশের গ্রাম থেকে লছমন আর দুখন। লেজার ফিতে টানাটানি। একটু রাত হয়ে গেছে। বামনটুলির পুকুরের ভিণ্ডার ওপর এসে থমকাল। মিটুঠু মনীরির খেলা দেখে মারের ভয়ে সুনীরিরা বনশ্রীর সঙ্গে বাঁড়ি চলে গেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল লছমন। তার চোখ দুটোও সমানসমান হয়েই। লছমন চটে ওঠবারই চেষ্টা করল, না পেরে দুখনকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলল—"আমাদের আর এরা মনল না সমাধি। বেরাই, মন-ইচ্ছং সব গেল। বনশ্রীও তোমার একবার জিজ্ঞেস করবে তো—বাঁচল কার দিলে আমাদের। আর বাঁড় নয় সমাধি, এ জীবন আর রেখে ফল কি?"

কেঁদে আর কূলকারে উঠতে পারছে না।

একবার চোখ-টোখ মুছে এসে বামনটুলির পুকুরে ডুবে মরার সংকল্প করে নুকল টলতে টলতে এগুল দুজনে বাঁড়ির দিকে।

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

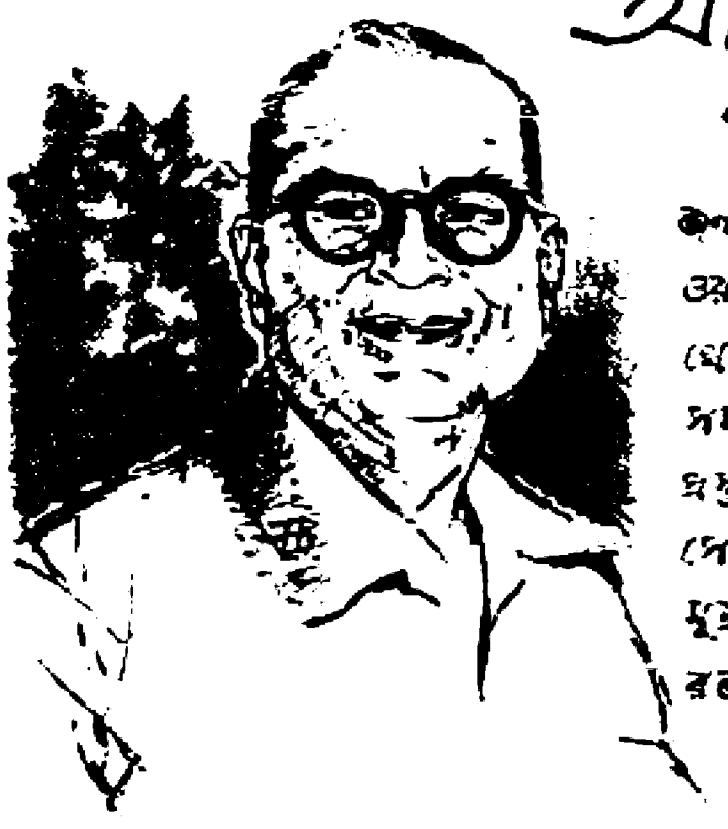

• কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার কথা যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ প্রযুক্ত সবচেয়ে সেরা কালির যে ভাগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই তাঁর অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। •

বিধান রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

অনিমিত্তা

(উপন্যাস)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মন বলছে, হবে না। ফিরে যাই। দরকার নেই।

কেউ পর্যন্ত এসে একবার পিছিয়েও গিয়েছিল ক' পা। বোধহয় নিজেরও অজান্তে। কিন্তু, না, এতদূর যখন এসেছে তখন বাকিটুকু দেখে যেতে দোষ কী। হবে না তো হবে না। না হবার আগেই ফিরি কেন? মরব তো একবারই মরব।

আর, দরকার নেই বলছ? ভীষণ দরকার। মর্মান্তিক দরকার।

গেটের ছিটকিনিটা অকারণেই খুলল ভাস্কর। না, কুকুর নেই। থাকলে এতক্ষণে সোরগোল পড়ে যেত। তা ছাড়া, উকিলের বাড়ি, যেখানে বহু লোকের আনাগোনা, সেখানে কুকুর চলে না।

নির্ভয়েই গেটটা ঠেলল ভাস্কর। আর্তনাদের মত একটা আওয়াজ উঠল। অপরাধী কেউ ঢুকছে গৃহস্বামী সচকিত হলেন।

'কী চাই?' বইয়ের দেয়াল দিয়ে গাঁথা সাজানো ঘরটাতে ঢুকতে যত না ঘাবড়েছিল, কণ্ঠস্বরে বেশি ঘাবড়াল ভাস্কর।

'কে আপনি?' জগৎপতি শূন্য চোখে তাকাল : 'আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

'আমি এ পাড়াতেই থাকি। আমার নাম ভাস্কর বসু।'

'কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।' জগৎপতি দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করলেন : 'কী দরকার?'

কাছাকাছি অনেক চেয়ার পড়ে আছে। একটার দিকে করুণ চোখে তাকাল। নড় আঙুলে একটু স্পর্শও করল একটাকে। ভাস্করের মনে হল, নিতান্ত কাঠ বলেই চেয়ারটা প্রতিবাদ করল না। নইলে লাফিয়ে কাঁপিয়ে একশেষ করত।

জামার পকেট থেকে কতগুলি কাগজ বের করল ভাস্কর।

'কোনো কেস? বসুন।'

চেয়ারের মাঝখানে নয়, চেয়ারের ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসল ভাস্কর।

'কিন্তু, শনিবার, আজ আমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আপনি কাল আসবেন।'

'কোন কেস নয়।'

'কেস নয়?' সংসারে তবে আর কী হতে পারে, কী থাকতে পারে, জগৎপতি অবাক হবার ভাব করলেন : 'তবে কাগজপত্র কিসের?'

যেন কত বড় হয়, কত বড় লজ্জা, ভাস্করের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বললে, 'একটা চাকরির—'

'চাকরি?' আকাশ থেকে পড়বার মতন মুখ করলেন জগৎপতি : 'এখনে চাকরি কোথায়?'

'চাকরি নয়, চাকরির দরখাস্ত।' ক্লিপ-আটা এক তাড়া কাগজ থেকে একটা আলগা করতে চাইল ভাস্কর।

'দরখাস্ত—তা আমাকে কী করতে হবে? লিখে দিতে হবে? দেখে দিতে হবে?' স্বরে একটু ব্যঙ্গ মেশালেন জগৎপতি : 'ফুল ইংরিজি কারেক্ট করে দিতে হবে?'

'না।'

'তবে? বলুন না, কী করতে হবে। আমার সময় নেই—' উঠি-উঠি ভাব করলেন জগৎপতি।

'আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?' নিচু চোখ উঁচু করল ভাস্কর : 'আপনি কত ছোট।'

'না, মশাই ছোট-বড় কেউ নেই। মানুষ হয়ে জন্মাবার সম্মানে সকলে সমান।' জগৎপতি ফের চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুপ করে রইলেন কেন? কী করতে হবে আমাকে তাই বলুন।'

'বিশেষ কিছুই নয়।' লঘু হবার চেষ্টায় একটু হাঁফ যা হাসল ভাস্কর।

'বিশেষ-অবিশেষ যাই হোক বলবেন তো কথাটা।' জগৎপতি এবার প্রায় ধমকে উঠলেন : 'ইয়ং ম্যান, যা বলবার তা বলতে পারেন না ফটপট? এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই? বলুন কী চাই? কী করতে হবে আমাকে?'

'একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।'

'কী দিতে হবে?' উঠতে যাচ্ছিলেন, বসে পড়লেন জগৎপতি।

'সার্টিফিকেট।'

'কেন, আমি কি গেজেটেড অফিসার?'

'গেজেটেড অফিসারের দরকার নেই। যে কোনো বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হলেই চলবে। এই দেখুন না ফর্মটা—' কাগজের তাড়া নিয়ে আবার একটু ব্যস্ত হল ভাস্কর।

'আর কোনো ভদ্রলোক নেই?'

'তেমন কাউকে চিনি না।' ভাস্কর অপরাধীর মত মুখ করল।

'আর আমাকে চেনে?'

'আপনাকে কে না চেনে! আপনার কত নাম-[redacted] প্রভাব-প্রতিপত্তি!'

[redacted] গলালেন, ঝুঁকলেন ভাস্করের দিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী লিখতে হবে?'

'এমনি খালা কাগজে নয় স্যার, আপনার লেটার পেপারে লিখবেন—'

'কী লিখব তাই বলুন না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

'সামান্য—শুধু এক লাইনের একটা ব্যাপার। আপনি যদি লিখে দেন, আপনার মত লোক যদি লিখে দেয়, তাহলেই কাজার চাকরিটা হয়ে যায়।'

'হয়ে যায়!' বাক্যে বলতে উঠলেন জগৎপতি : 'কিন্তু কী আশ্চর্য, কথাটা কী!'

'কিছুই নয়—এই লিখে দেবেন, আমাকে আপনি চেনেন আর আমার নৈতিক চরিত্র ভালো।'

'কী চরিত্র?'

'নৈতিক চরিত্র। তাই চেয়েছে। এই দেখুন—' ভাস্কর কাগজ নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করল।

'যা আপনার নৈতিক চরিত্র ভালো কি মন্দ তার আমি কী জানি?'

যেন মাটিতে বসে পড়ল ভাস্কর। হঠাৎ যেন সমস্ত আশা এক নিমেষে ফুইয়ে বলল না। বললে, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাকে কি অসৎ বলে মনে হয়?'

'অসৎ?' হা-হা করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। কষ্ট-কষ্ট কৃত্রিম হাসি।

ভাস্করের মনে হল কথাটা বুঝি ঠিক হয়নি। তাই স্বর সাবলো করে নিয়ে বললে, 'আমি যে ভালো আমার মুখ দেখে এ আপনার বিশ্বাস হয় না?'

'ভালো?' হাসতে চেয়েও হাসলেন না জগৎপতি। বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন কোর্টে। দেখে আসবেন। মুখে সব স্বর্গের ছবি আঁকা, কিন্তু ভেতরে একেকটি চোরাগোপ্তা। মুখ দেখে ভোলবার বয়েস আর নেই।'

হঠাৎ পাশের প্যাসেজ থেকে কে ডেকে উঠল : 'বাবা, আমাদের হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, এই উঠি।' ব্যস্তবাস্ত হবার ভাণ করলেন জগৎপতি : 'খবরের কাগজে চোখ বোলাবার জন্যে বৈঠকখানায় ঢুকলাম, সঙ্গে-সঙ্গে লোড—'

'কাগজ-টাগজ সব নিয়ে যাব।' ওইয়ে থেকে আবার তাড়া এল : 'তুমি চলে এসো।'

উঠছেন, ভাস্কর আবার বাধা দিল। বললে, 'সরাসরি যদি না পারেন, ঘুরিয়েও তো পারেন লিখতে। আপনার হাতের যা-হোক একটা লাইন পেলে—যেমনভাবে হোক—'

'ঘুরিয়ে লিখতে হবে?' উঠে দাঁড়ালেন জগৎপতি।

'অন্তত এভাবে লিখুন, এর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না।'

'আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে লিখতে হবে?'

'না, তা বলছি না তবে—' কিন্তু আঙুলে কাগজগুলো আঁকড়াল ভাস্কর : 'তবে ওই বিবেকের সঙ্গে সামান্যের মীমাংসা চলে হয়তো।'

'না, চলে না।' চায়ারের হাড় দুটু করলেন জগৎপতি। বললেন, 'আমি ঘুরিয়ে বলাটাকে সৎ বলে না। আপনার সৎ-অসতের ধারণা কী তা বোঝা গেল। হলনা কখনো সৎ নয়।'

দুর্বল মুখে ভাস্কর একটু হাসল। বলল, 'নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট চাওয়াটাই একটা ছলনা। আর, ছলনার সঙ্গে ছলনার মোকাবিলা করাটাই তো সার্থক ওকালতি।'

'ও, আপনি উকিল বুঝি একজন?' তেরছা করে তাকালেন জগৎপতি।

'না, ছি, উকিল হতে যাব কেন?'

'জানেন আমি একজন উকিল?'

'ও, হ্যাঁ, মাপ করুন।' সাত হাত জলের নিচে পড়েছিল, তক্ষুনি আবার সামলাল ভাস্কর। 'আমি সেই ভেবে আপনার কাছে আসিনি। একজন উদার পরোপকারী মহানুভব বাক্তি ভেবে আপনার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু সবার উপরে সত্য—সত্যটা দেখবেন তো?' জগৎপতি হুমকে উঠলেন : 'ঐ প্রথম কথাটা, আসল কথাটার হ্যাঁ বলি কী করে? প্রথমেই লিখতে হবে, আপনাকে আমি চিনি। বলুন, আমি চিনি আপনাকে? কোন দিন দেখেছি?'

শিশুর মত হেসে উঠল ভাস্কর। বলল, 'এই তো আমাকে দেখলেন। চিনলেন। মানুষকে দেখতে-চিনতে কতক্ষণ লাগে?'

'আচ্ছা—' ভিতরের দরজার দিকে হঠাৎ তাকালেন জগৎপতি। তক্ষুনি আবার মুখ ফেরালেন এদিকে : 'আচ্ছা, আপনি এ পাড়ার তরুণ-সমিতিকে চেনেন?'

'তরুণ সমিতি—' নামটা যার কতক আতঙ্ক সৃষ্টিটাকে যেন উজ্জ্বল করতে চাইল।

'অন্তত তাদের কেউ আপনাকে চেনে?' হঠাৎ ভিতরের দরজার উদ্দেশে মুখরিত হলেন জগৎপতি : 'শুচি, শুচি!'

সঙ্গে-সঙ্গেই একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই এই ভদ্রলোককে চিনিস? তোদের তরুণ সমিতির মেম্বর?'

ভদ্রমহিলাকে উত্তর দেবার একটা সুযোগ দিতে হয়। তাই মুখ খুলল ভাস্কর।

'না, না চিনি না, দেখেছি কোথায়-কিনা।' জগৎপতি দিয়ে ভাস্করের দিকে তাকাল শুচিস্মিতা : 'শুভময় বলতে পারে।'

'কেন তুইও তো সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' সগর্বচিত্তে তাকালেন জগৎপতি।

হ্যাঁ, সে দিক থেকে বলতে পারি', নিজের থেকে শুচিস্মিতা এবার তাকাল : 'নন ইনি মেম্বর।'

'তার জন্যে এত পরিশ্রমের দরকার কী! সে তো আমিই বলতে পারতাম।' ভাস্কর অস্ফুটে একটু হাসল।

সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন জগৎপতি। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলছেন পাড়ায় থাকেন, তবু এঁকে মেম্বর করা হয়নি?'

এটা কী রকম সওয়াল হল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালো শুচিস্মিতা। পাড়ার যত কাণা-খোঁড়া-অন্ধ আছে সবাইকে মেম্বর করতে হবে? যে অসভ্য তাকে কি উচিত সভ্য করা? কিন্তু বাবার

বুঝিয়ে মুখোমুখি হওয়া দরকার। তাই বুঁচিয়া খিঁচিয়ে উঠল : 'তা হলে উনি থাকেন না পড়ুক।'

'না, না, উনিশ-এক-এ আমি থাকি, যদি চান তো সঙ্গে আসবেন।' বলেই আবার চোখ নামাল ভাস্কর। বলল, 'হুট করে করতে চাইলেই হয়তো কিনা ঠিক নেই।'

'কেন, পয়সা নেই? দুঃস্থ গরিব?' জগৎপতি প্রায় মুখ ভেংচালেন।

'তা তো বটেই। তা ছাড়া বুঁচিরও তো একটা কথা আছে।' বলেই অজান্তে চমকে উঠল ভাস্কর, পাপ মুখে কারু নাম নেওয়া হয়ে গেল বুঝি। বলেই সামলাল তৎক্ষণাৎ। 'তার মানে ওটা তো একটা নাচ-গান-ফুর্তির আড্ডা বলে শুনেছি।'

'শুনেছেন? কেন নাচ-গান-ফুর্তি খারাপ?' জগৎপতি এবার স্পষ্ট রুষ্ট হলেন : 'আপনি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন না?'

কায়দামতো গুছোতে লাগল ভাস্কর। বুঝল আসার শেষ রেখাটুকুও মিলিয়ে গেল। তাই বুঝি, চেষ্টা না করলেও, একটি বাঙ্গের রেখা ঠোঁটে ফুটে উঠল। বলল, 'ওটা তো সংকৃত করে বলা। কিন্তু আসলে, মানে সংসারে, ওটা একটা উচ্চ-মধ্যবিত্তের ভাঁড়ে।

'জানেন তরুণ সমিতির প্রেসিডেন্ট আমি?' জগৎপতি প্রায় বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন।

গম্ভীর ম্লান হয়ে গেল ভাস্কর। বেমাইনি ভাবেই এতক্ষণ বসে ছিল চেয়ারে, আলা ছেড়ে দিয়ে সুবোধকে আঁকড়ে ধরে। এবার উঠে পড়ল। বলল, 'আমাকে মাপ করবেন। আমি তরুণ সমিতি নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। তরুণ সমিতি দীর্ঘজীবী হোক। আমি এসেছিলাম আপনার একটা সহযোগের জন্যে—'

'বাবা, চলে এস, আর সময় নেই, এখুনি সবাই এসে পড়বে—' প্রায় কাঁপিয়ে-পড়ার মতো করে বলল বুঁচিরা। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে মা এলোকেশীকে কাছে পেয়েই একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে উঠল। 'দেখ না, বাবা কোন একটা বাজে লোকের সঙ্গে বসে তরুণ সমিতি নিয়ে চর্চা করছেন। যার-তার সঙ্গে কী দরকার আলোচনা করা। ওঁদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—' ডান হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল একবার বুঁচিরা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে অথচ আলোচনায় মাতিয়ে রাখছেন, কে সেই লোক, কৌতূহলী হল এলোকেশী। একটা অসফল উঁকি মেরে কাপল গলায় জিগগেস করলেন, 'কে লোক?'

'কে জানি কে' বলেই একটা সহযোগের জন্যে পিড়াপিড়ি করছে।' আশেপাশের সবাইকে শুনিয়ে স্বরস্বরে বলতে বুঁচিরা, 'কিন্তু—সহযোগ নিতে হয় কই? নাকে কি ছাড়া উঁকিল কখনো কলম ধরে নাকি?'

কথাটা লুফে নিল ভাস্কর। বলল, 'এখন সার্টিফিকেটের জন্যে কি নেন আপনি?'

বেফাঁস কথায় বুঁচি-টা একেক সময় এমন অপ্রস্তুত করে, জগৎপতি ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বললেন, 'না। আপনাকে আমি চিনি না। তাই এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেওয়া অসম্ভব। কি-এর কথা বলছেন, ফি নিতে চাইও অসম্ভব। যখন চিনি না। তখন আমি অসহায়। সরোষে—'

'চলে যান।' ভাস্কর বলল : 'চলেই যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাই বলুন। কোথায় পাই তেমন বড়লোক।'

'না পান তো আমি কী করব।' ঘরের বাইরে এলেন জগৎপতি।

'এমন সব সৃষ্টিছাড়া নিয়ম করে যায় মাথামুণ্ডু হয় না।'

'যারা নিয়ম করেছে তাদের মুণ্ডুপাত করুন গে। এখানে কিছু হবে না।' জগৎপতি মুখ ফেরালেন।

ঠিক্‌খুনি একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

এণাক্ষী চাওলো ঝলমল করে উঠল : 'শুভময়রা এল বুঝি?'

'না, না, শুভময় তো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে আসবে।' রুচিরা মাকে সংশোধন করল : 'এ মিস্টার চক্রবর্তী এসেছেন।'

অরিন্দম চক্রবর্তী। ইনজিনিয়র। জগৎপতি বেরিয়ে আসতেই অরিন্দম বলল, 'আমার সঙ্গে ইনি কণাদ বক্সগুপ্ত। চার্টার্ড য়্যাকাউন্টেন্ট।'

'উনিও জয়েন করছেন নাকি?' ঢেউ তুলে দু পা এগিয়ে এল রুচিরা।

সেই মতলবেই তো নিয়ে এসেছি লঞ্চে করে।' জয়ীর মত হাসল অরিন্দম।

'তা হলে প্রথমেই তো ও'র মেম্বর হতে হয়।'

'ওরে বাবা, কী ঝানু সেক্রেটারি! কারু কসকে যাবার উপায় নেই।' অরিন্দম হেসে উঠল : 'একেবারে লাইফ মেম্বর হয়ে যাবে।'

'সঙ্গেই চেক-বই আছে।' কণাদ বক্সগুপ্ত কোটের পকেটে চড় মারল কিন্তু রুচিরা শুধু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি খুলেই দেখাল চেক-বই।

জগৎপতি অভ্যর্থনা করে উঠলেন : 'বা, ছামলা কথা।'

'কিন্তু এ আপনারা করেছেন কী?' রুচিরা কলসে উঠল।

'কী করেছি?' এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল অরিন্দম।

'স্যুট পরে এসেছেন কেন? বলাই তো আছে, পার্টিতে-অনুষ্ঠানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসতে হবে—'

'তা, এখন কি সময় আছে?' কণাদ ব্যস্ত হয়ে উঠল। পারলে পোশাক কেন গায়ের চামড়াও বুঝি সে ছুলে নেয়। অরিন্দমের হাত ধরে টান মারল হেঁচকা। বলল, 'চলো না, চেঞ্জ করে আসি। নিয়ম যখন আছে—'

কোমল হল রুচিরা। বলল, 'আপনি ফার্স্ট অফেন্ডার, এ যাত্রা এক্সকিউজ করা গেল। আর আপনি সাঙ্ঘাতিক হলে আপনাকেও। কিন্তু, আগেই বলে রাখি বসতে চেয়ার পাবেন না।'

'না', ওধার থেকে জগৎপতি উচ্ছ্বসিত হলেন : 'ডেক-এ ঢালা করাস। সমান-তন্ত।'

'তাই সই। ট্রাউজার্স পরলে কী হয়, আরাম চাপটি ক্ষেত্রেই হবে।' কণাদ বলল। ভরথানা বোধ হয় এই আমরা সমস্ত দোকানের বন্দের।

'তা আপনারা তো তৈরি।' এণাক্ষীকে লক্ষ্য করল অরিন্দম : 'চলুন, আমার গাড়ি আছে, আমার গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়ি।' রুচিরার গায়েও একবার বুলিয়ে নিল চাউনি।

এণাক্ষী বিবি ঠেলে দিল মেয়েকে। বললে, 'তুই যা।'

'চলুন।' কণাদকে আড়াল করে এগিয়ে এল অরিন্দম।

'আমাদেরও গাড়ি আছে।' পালটা বলে রুচিরা, খোঁচাটা প্রক্ষয় থেকেও থাকল না বোধ হয়।

'তাতে আমি আর উনি যাব।' এণাক্ষী ছটফট করে উঠল : 'ও'র তো এখনো স্নানও হয়নি।'

'সে তো আমাদের বাড়ির গাড়ি।' রুচিরা বললে, 'আমি তার কথা বলছি না। আমাদের গাড়ি মানে স্টেশন ওয়াগন, সেটা শুভময় নিয়ে আসছে। সেটায় আমরা র‍্যাঙ্ক য়্যান্ড ফাইলরা যাব।'

'হ্যাঁ', মীমাংসার সুর আনলেন জগৎপতি : 'ও সেক্রেটারি, ওর কি আগে গেলে চলে? ও পরে যাবে।'

'শেষে আয়োজনে কোনো ত্রুটি হলে আপনারাই অসন্তুষ্ট হবেন।' রুচিরা হাসল : 'তারপর আজ যিনি নতুন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন তাঁর কাছে যথাসম্ভব নিখুঁত করেই দেখানো দরকার।' তাকাল কণাদের দিকে : 'কী বলেন, ঠিক বলিনি?'

'ঠিক বলেছেন।' অরিন্দমের হাত ধরে টানল কণাদ। বললে, 'চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় খুলে দিয়ে গেল গেটটা।

জগৎপতি বুঝি একটু এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, দেখলেন ভাস্কর, সেই প্রার্থী ছেলেটা তখনো ঘুরঘুর করছে।

'এ কি, যাননি এখনো?' প্রায় ফেটে পড়লেন জগৎপতি।

'ভাবছি এখনো যদি দেন সার্টিফিকেটটা। সামান্য একটা কথা। তাতে আপনার কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই।'

যেন একটা সান্ত্বনা পেয়ে যাই এমনি করে বললে কথাটা।

'আপনাকে বলেছি না, আপনাকে চিনি না, আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না, তাই পারব না লিখতে।' ফিরে দাঁড়ালেন জগৎপতি : 'তখন থেকে কেন মিছামিছি বিরক্ত করছেন? যান, আমার সময় নেই। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।'

'জানি, আজ তরুণ সমিতির স্টিমার-পার্টি। আপনারা সবাই যাচ্ছেন। কিন্তু এক লাইন লিখে দিতে কতক্ষণ আর লাগে বলুন। আপনারা বড়লোক—আপনারা হবেন—'

'বড়লোক মানে?' যেন প্রচণ্ড একটা গাল খেয়েছেন এমনি জ্বলে উঠলেন জগৎপতি : 'বড়লোক হওয়া কি দোষের কথা? আমি কি ইনহেরিট করে বড়লোক হয়েছি? যা হয়েছি স্ট্রাগল করে হয়েছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হয়েছি। কত বাধা-বিপত্তি-ব্যর্থতার সঙ্গে লড়াই করে, কত ধৈর্য কত অধ্যবসায়ের পাহাড় ডিঙিয়ে—তার আপনি কী জানেন। আপনি যে চাকরি করতে যাচ্ছেন তাও হয়ে এই বড়লোক হবার জন্যে—'

'না, তা নয়, আমি বলছিলাম, বড়-লোক যখন, তখন হৃদয় কেন বড় হবে না?'

'সেই হৃদয়ের বড়ত্ব প্রমাণ করতে হবে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে, বে-আইনি কাজ করে? মার্জনা করুন। আমার দ্বারা হবে না। আপনি যান।' জগৎপতি গেটের দিকে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিলেন : 'পথ দেখুন।'

'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' করুণ মুখে নমস্কার করল ভাস্কর। জগৎপতি লক্ষ্য করলেন, দুটি হাত ঠিক একরকই করেছে ছেলেটা আর নাকে মুখে নয়, সম্পূর্ণ কপালে এনেই ঠেকিয়েছে। এবং পরাভূত, প্রত্যাখাত হলেও ধীর পদেই পেরিয়েছে গেটটা; আর, সব চেয়ে আশ্চর্য, পেরিয়ে গিয়ে হাট-করা গেটের দরজা দুটো আস্তে টেনে খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে বন্ধ করেছে।

ভাবখানা এমনি, যেন হেরে গেলেও পৃথিবীর উপর তার রাগ নেই।

কোথায় ফিরে আসবেন তক্ষুনি, তা নয়, জগৎপতি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এক মুহূর্ত ভাবলেন, ছেলে-টাকে ডাকবেন নাকি।

কিন্তু তক্ষুনি ওয়াগন নিয়ে হুড়-মুড় করে এসে পড়ল শুভময়। হুড়-মুড় করে গেট-টেট হাটখোল করে দিয়ে ভিতরে ঢুকল। লাফিয়ে উঠল দাওয়াতে। 'আপনারা রেডি?'

জগৎপতি বললেন, 'ওরা রেডি। আমি চানটা করে নিই।'

'কী দরকার! স্টিমারেই ফার্স্ট ক্লাস বন্দোবস্ত আছে, সেখানেই চান করে নেবেন।' তারপর প্যাসেজটা পেরিয়ে

রূপার বই

বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী [প্রবন্ধ] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাম : ১২·০০

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির অক্ষয়তার নিদর্শন স্বরূপ। শিল্পকলা সম্পর্কিত বাস্তবীয় সংজ্ঞা তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিশ্লেষক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষাদান করেন নি, সেকালের ঋষি ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা [উপন্যাস] বাণী রায় দাম : ৬·০০

জন্মজন্মান্তরের তৃষিত সে আত্মা, তারই সুগভীর তৃষ্ণার কাহিনী। এই তৃষ্ণা শুধু চক্ষের নয়, অন্তরাত্মার নিবিড় অনুভূতি। অবৈধ প্রেম যদি মনে জন্মলাভ করে, যদি আত্মীয়ের মুখে কেউ চিরসন্ধানের প্রিয়তমকে খুঁজে পায়, যদি ভুলভ্রান্তির পথচলায় বাঁকে চমকে উঠে সেই বাসিত সত্তা নিজের হৃদয়কে মুখোমুখি দেখতে পায়, তার কি হবে?.....সাহসিকা নায়িকার দুর্বার গতি অপ্রাপনীয় প্রেমের প্রতি, তারি পাশে ধূর্তবিলাস আত্মভোলন, আড়া ঠাকুরঝির মেয়ের অভিসারী পদক্ষেপ। অসংখ্য নাটকের নায়ক বিপত্নীক নিরঞ্জনের বিচিত্র চরিত্রের পাশে মায়ার প্রগাঢ় ক্ষমাশীলতা এখানে উপস্থিত। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নূতন আঙ্গিক ও ভাবধারার প্রথম সংযোজন।

যাদু-কাহিনী [বিচিত্র কাহিনী] অজিত কৃষ্ণ বসু দাম : ৮·০০

মঞ্চে, গহ্বরে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর, ভেলকিওয়ালা, মায়াবি। এদের জগতে দীর্ঘ দিন বিচরণের ফলে এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই কিছু কিছু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

বরবর্ণিনী [গল্প-সংগ্রহ] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দাম : ৩·০০

অচিন্ত্যকুমারের শিল্পসত্তা চিরন্তন তারুণ্যে অধিষ্ঠিত। জীবনের বহু বেশ তিনি দেখেছেন, শ্যামল ও ধূসর, সমুখ ও বিপ্রকৃত, দেখেছেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দৃষ্টিতে। তাঁর ক্ষণকালের স্বপ্নের বাতায়ন শাশ্বতের দিকে খোলা। তাঁরই আধুনিকতম গল্পগ্রন্থ **ব র ব র্ণি নী**।

ছায়াময় অতীত [স্মৃতিকথা] মহাদেবী বর্মা অনুবাদ : মলিনা রায় দাম : ৪·০০

রামা, বোঁচি, বিল্লা, সাবিয়া প্রভৃতি এগারোটি চরিত্রচিত্রের সংকলন এই গ্রন্থে মহাদেবী তাঁর হারিয়ে যাওয়া অতীতের দিনগুলির মমতা-মেদুর স্মৃতি মন্থন করেছেন। তাঁর এই স্মৃতি-কাহিনী দেশ-কাল-পাত্রের সীমারেখা অতিক্রমে সার্থক।

অস্তগামী সূর্য [উপন্যাস] ওসামু দাজাই অনুবাদ : কল্পনা রায় দাম : ৪·৫০

যুদ্ধোত্তর জাপানের এক অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবার। পিতা মৃত ও মাতা কর্করোগগ্রস্তা। কাহিনীর বর্ণনা-কারিণী তরুণী কন্যা কাজুকো স্বামী-পরিত্যক্তা। তারই মাদক-জর্জরিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাওজী জাপান অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর আস্থা হারিয়ে জীবনের ঘটোনো পরিসমাপ্তি। এই ভ্রাতাকেই মাধ্যমে করে গড়ে উঠল ভ্রাতৃবন্ধু পানাসক্ত এক ঔপন্যাসিকের প্রতি কাজুকোর প্রণয়াসক্তি এবং তারই উপহার-স্বরূপ তাঁর সন্তান কামনার বিষাদময় পরিতৃপ্তি।

রূপা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আসতেই উথলে উঠল : 'বা, আপনারা তৈরি। তাড়ার আগেই তৈরি—এ যে আপনারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন—'

'না, তৈরি নয়।' এণাক্ষী বললেন, মোড়ের দোকান থেকে কিছু সাজা পান কিনে নিতে হবে।'

'দিন, কিনে আনছি।' শুভময় হাত পাতল : 'এ আর কতক্ষণ!'

ব্যাগ খুলে তার হাতে টাকা দিলেন এণাক্ষী। 'জর্দা আনবেন কিন্তু।'

'আর আমাকে ঐ রক্তকরবীর গুচ্ছটা।' বাগানে গাছের দিকে চোখ ফেলল রুচিরা।

শুভময় পানের দোকানে অর্ডার দিয়ে ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল। ফুলের গুচ্ছটা রুচিরাকে পেড়ে দিয়ে আবার ছুটল দোকানে।

পান নিয়ে এসে দেখল জগৎপতির স্নেভ হয়েছে বটে স্নান হয়নি। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে শুভময়কে বললেন, 'খান-কয়েক চেয়ার জোগাড় হবে তো হে?'

'চেয়ার? চেয়ার কেন? ধাক্কা খেল শুভময়।

'অরিন্দম আর তার বন্ধু আসছে। দুজনেরই সাহেবী পোশাক। যখন এসেই পড়েছে এ পোশাকে তখন আর ওদের বসতে দেওয়া কেন? বিশেষত', হাসলেন জগৎপতি : 'বন্ধু যখন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন—'

'লাইফ মেম্বর হচ্ছেন? তা, চেয়ার জোগাড় হবে বৈকি।' লাফিয়ে উঠল শুভময়।

'না। সমিতির নিয়ম ভাঙা চলবে না।' দৃঢ়স্বর রুচিরার। 'আমরা আইন করে আবার আমরাই যদি তা ভাঙি, তাহলে মানে হয় না কোনো।'

'যে বন্ধু আজ নতুন মেম্বর হচ্ছে সে তো জানে না সাত-পাঁচ।' বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আইন জানি না এ আইনের চোখে কেনো অজুহাত নয়।' দৃঢ়তর রুচিরা।

'বন্ধু না জানতে পারে কিন্তু অরিন্দমবাবু তো জানেন।' রুচিরার থেকে প্রেরণা নিয়ে বললে শুভময়, 'তিনি কেন অনুষ্ঠানে সুট পরে আসেন? চেয়ার ডিমাণ্ড করেন? তিনি তো আর নতুন নন।'

'আহা, বন্ধুর খাতিরে ঐ রকম পরে ফেলেছে। বিশেষ খেয়াল করেনি।' জগৎপতি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আর তার বন্ধু যদি চেয়ার পায় সে নিচে বসবে এটা দৃষ্টিকটু লাগে।'

'দুজনেই নিচে বসবে।' রুচিরার স্বর তপ্ততর।

'চেয়ার কখনো থাক না।' মিটমাটের সুরে বললেন এণাক্ষী, 'যার যখন খুশি কখনো নিচে বসবে কখনো বা চেয়ারে বসবে।'

'নিজের কথাটাই ভাবলে বুঝি।' স্ত্রীকে লক্ষ্য করে পরিহাস করলেন জগৎপতি।

'তোমার কথাটাও ভাবলাম।' পান-মুখে হাসলেন এণাক্ষী।

শুভময় চেয়েছিল হাসতে কিন্তু রুচিরার মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে যাই বলুন, অন্তরে বড়লোকের প্রতিই যাবার টান বেশি, তার প্রতিবাদেই যে রুচিরার গাম্ভীর্য সেটা বুঝতে দেরি হল না। তাই জগৎপতিকে লক্ষ্য করে রুক্ষ স্বরে জিগগেস করলে, 'আপনার কি আরো দেরি হবে?'

'হ্যাঁ, হবে একটু। তোমরা বেরিয়ে পড়। আমি বাড়ির গাড়িতেই যাব না-হয়।'

'আপনি?' এণাক্ষীর দিকে তাকাল শুভময়।

'আমিও পরে যাব।'

'আর—' এবার রক্তকরবীর গুচ্ছের উপর চোখ রাখল।

'আমি যাব আমাদের গাড়িতে। সমিতির গাড়িতে।' খসা আঁচলটা পুনো উড়িয়ে দিয়ে ওয়াগনে উঠল রুচিরা।

গাড়িভর্তি গুচ্ছের ছেলেমেয়ে কিল-বিল খিলখিল করে উঠল।

২

একমাত্র মেয়ে। তারও চেয়ে বেশি—একমাত্রসন্তান। তারও চেয়ে বেশি—আশা যখন চলে যাচ্ছিল তখন এসেছে। এসেছে শেষ যৌবনে শেষ জোয়ারে।

তাই রুচিরা আদরের পিরামিড। সোহাগের পাহাড়-পর্বত।

প্রথম জীবনে সামান্য অবস্থায় জগৎপতি সুরু করেছিল। যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারই জন্যে বি-এ পাশ করেই ল-তে ঢুকল। টায়েটুয়ে ল পাশ করেই, যাতে তাড়াতাড়ি হয়, চলল কৌজদারিতে।

পাঠের ও উপহারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত; মূল্য ৪·৭৫ নঃ পঃ

বিনপ্ন সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

"দেশ" পত্রিকা :—রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়বার মত। লেখকের মূল্যবান ভূমিকাটিও পাঠকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

"অমৃত" পত্রিকা :—কাহিনীগুলি চমকপ্রদ, রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। এই জাতীয় গ্রন্থ এই প্রথম, সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

আনন্দবাজার :—বইটি পাঠকদের খুব ভাল লাগিবে।

বসুমতী :—পাঠকেরা গ্রন্থখানিকে গল্প উপন্যাস অপেক্ষাও যে আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে তাহে আর সন্দেহ নাই।

একজন বিনপ্ন সমালোচক লিখিয়াছেন :—"ইহা সাময়িক রুচি অরুচির মানদণ্ডে নিরূপিত হবার নয়। এতে জীবন-মৃত্যুর এত বড় ব্যাখ্যা আছে যা আর কোথায়ও দেখা যায় নাই।

প্রাপ্তিস্থান :— প্রকাশক—দি ঘাটশীলা কোম্পানী
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা—১

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে।

চাল নেই চুলো নেই মুহুরি-মাতব্বর কেউ নেই, একমাত্র উচ্চাশাকে মূলধন করেই বসল বটতলায়।

দেখতে-দেখতে জমে গেল প্র্যাকটিস।

প্র্যাকটিস জমাতে কী লাগে? বিদ্যে নয় বুদ্ধি নয় বিবেচনাও নয়, একমাত্র অদৃষ্ট। শুধু লাউডস্পীকার বসালে কী হবে যদি বৃষ্টি না করে? আর বৃষ্টি যদি করে, মাটিতে যদি একবার জল দাঁড়ায় তাহলে এমনি একটা বীজ ছুঁড়ে দিলেই সোনা।

প্রথমেই একটা বলাৎকারের মামলা পায়। হতভাগা মামলা। তাতে উকিলের কী! সে মামলা পেলেই ভাগ্যবন্ত। তার কাজ মহৎ কাজ। দুঃস্থের সেবা। পীড়িতের উপশম। দোষী ছেলেও অসামীকে খালাস করে আনা।

কোর্টে যাবার মুখে, ঠিক জায়গা বুঝেই, নবগ্রহের মন্দির। জগৎপতি থালায় পয়সা দিয়ে প্রণাম করে কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা চড়াল। আর আসামীকে কাঠগড়া থেকে বেকসুর ছাড়িয়ে আনলে।

প্রমাণে পাওয়া গেল মেয়েটার আইন-সিদ্ধ বয়স হয়েছে আর অভিযোগে যাকে ধর্ষণ বলা হচ্ছে তা আসলে প্রেমের উপঢৌকন।

জগৎপতির জয়জয়কার পড়ে গেল।

সকলে বললে, কপালে ওর ঐ সিঁদুরের ফোঁটাটাই তার সাফল্যের রহস্য।

তা কেন। কালক্রমে জগৎপতি যখন হাইকোর্টের খাতায় নাম লেখাল, সম্ভ্রান্ত-তম হল, তখন সে আর সিঁদুরের ফোঁটা দিত কই? দিত না। যে কপার ফোঁটা পায় তার আর সিঁদুরের ফোঁটার দরকার হয় না।

কী কুহকিত কণ্ঠেই না কেঁদেছে প্রহমটা। মানিকতলার ওদিকে একটা ছাপরা গলিতে সেড়খানা ঘর নিয়ে ছিল। বাজার-দর পড়ে যেতে পারে ভেবে ল পড়তে-পড়তেই বিয়েটা সেরে নিয়ে-ছিল বুদ্ধি করে। নইলে একা থাকলেই মেসে থাকতে হত, আর মেসে থাকতে হলে বৈঠকখানা পেত কোথায়? মক্কেলের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেই তো সর্বনাশ। তাহলে প্র্যাকটিসের কথা না ভেবে ভাবতে হত কেরানি-গিরির কথা, নয়তো ইস্কুল মাস্টারির। উচ্চাশার মুখে ছাই পড়ত। এ দিদিরা বউ হল বলে একটা ডেরা হল, ঠিকানা দেবার মত বৈঠকখানা হল। যদি কেউ কখনো আসে, এজন্যেই আধখানা ফার্নিচার ঘরটাতে দড়ি কাঁরিয়ে রেখে দেবার

—পূজায় গ্রন্থমের গ্রন্থ-সম্ভার—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

॥ ৮·৫০ ॥

স্মৃতিচারণ	॥ ৭·০০ ॥	পরিমল গোস্বামী
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ	॥ ৪·৫০ ॥	ডেল কার্নেগি
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন	॥ ৫·৫০ ॥	ডেল কার্নেগি
ভারতে জাতীয় আন্দোলন	॥ ১০·৭৫ ॥	প্রভাত মুখোপাধ্যায়
নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ	॥ ৭·৫০ ॥	মৈত্রেয়ী দেবী
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ	॥ ৭·৫০ ॥	মৈত্রেয়ী দেবী
অমৃতের উপাখ্যান	॥ ৩·৫০ ॥	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
তারাপীঠের একতারা	॥ ৩·৭৫ ॥	চিত্তরঞ্জন দেব
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে	॥ ২·৫০ ॥	বিশ্বদেব বিশ্বাস
ডাকটিকিটের জন্মকথা	॥ ৬·০০ ॥	শচীন্দ্রবিলাস রায়চৌধুরী
আজব নগরী	॥ ৩·০০ ॥	শ্রীপান্থ
মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা	॥ ৭·০০ ॥	রাধী রায়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	॥ ২·৭৫ ॥	নাগ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না	॥ ৩·০০ ॥	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

— গল্প —

প্রমুখ পঁচিশ জনের লেখা

শ্রেষ্ঠ গল্প	॥ ৫·০০ ॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বনির্বাচিত গল্প	॥ ৫·০০ ॥	সজনীকান্ত দাস
প্রেমের গল্প	॥ ৪·০০ ॥	প্রতিভা বসু
ভালবাসার ইতিকথা	॥ ২·৫০ ॥	শিবরাম চক্রবর্তী
সামনে চড়াই	॥ ১·৫০ ॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বাঘের চোখ	॥ ২·৫০ ॥	লীলা মজুমদার
ভজহরির সংসার	॥ ৩·০০ ॥	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (ডাল্টন

—উপন্যাস—

ধনঞ্জয় বৈরাগীর		বনে যদি ফুটলো কুসুম	
অন্তকন্যা	॥ ৭·০০ ॥	প্রতিভা বসু	॥ ৪·৫০ ॥
মধুরাই	॥ ২·৫০ ॥	জয়ন্তিকার চিঠি	
একমুঠো আকাশ	॥ ৫·০০ ॥	বিধায়ক ভট্টাচার্য	॥ ৩·০০ ॥
বাণী রায়ের		বিভূতি গুপ্তের	
মিস্ খোসের কাহিনী	॥ ৩·০০ ॥	জাগ সন্ধ্যা	॥ ৩·০০ ॥
সাড়া বুদ্ধদেব বসু	॥ ৩·০০ ॥	সদ্য প্রকাশিত কিশোর গ্রন্থ	
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের		বাদু-নাতির ঝোড়	
সমুদ্র নয়ন মন	॥ ৩·০০ ॥	শিবরাম চক্রবর্তী	॥ ২·৫০ ॥
সূর্যশিখা মায়া বসু	॥ ৩·৫০ ॥	রোল নং ২০৫	
		পরিমল গোস্বামী	॥ ২·৫০ ॥

গ্রন্থম : ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ঘরকেই বৈঠকখানা করে নেওয়া যায়। বসুন, বসুন, তাতে কী, বিছানার উপরেই বসুন।—কথাটা সেরে নিতে কতক্ষণ। লোকে যাই বলুক, বৈঠকখানাতে কে কবে শোবার ঘরের স্পর্শ দিয়েছে!

দিন-দিন বছরে-বছরে জগৎপতির উন্নতি হতে লাগল। টাকা হওয়া মানেই উন্নতি হওয়া। আর, তখন তার মান শুধু ধনবান বলে নয়, সর্ববিদ্যায় জ্ঞানবান বলে। সর্বসভায় সে তখন দীপ্ত লোভা-পতি। সে হাসলেই তখন সেটা রসিকতা, মুখ গম্ভীর করলেই সেটা বিসদৃশ। টাকার প্রবেশ করলেই তার তখন শিল্পে প্রবেশ, সাহিত্যে প্রবেশ, শাস্ত্রে-পাণ্ডিত্যে পর্যন্ত অধিকার। সমাজের তখন সে একজন কর্তা-ভর্তা লোক, বৈদগ্ধ্যের চূড়ামণি। তখন এমন কি সে সার্টিফিকেট দিতে উপযুক্ত।

'তুমিই আমার লক্ষ্মী।' এণাক্ষীকে সোড়ায় দিকে বলেছিল একদিন জগৎপতি।

'লক্ষ্মী না তার বাহন!'

'কী যে বলো! তোমার জন্যই তো আমার এ সাফল্য। নইলে, আমি কী ছিলাম—'

'কিন্তু আমার সফলতা কোথায়?' মুখখানা বুঝি ছলছল করেছিল এণাক্ষী: 'তুমি তো টাকা পাচ্ছ, মান পাচ্ছ, প্রশংসা পাচ্ছ, কিন্তু আমি কী পেলাম! আমি তো রিক্ত।'

হেসে উঠেছিল জগৎপতি। 'তাই তো তোমাকে লক্ষ্মী বলছি। এ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, বাংলা দেশের লক্ষ্মী। তার মানে বেশ শান্ত, ঠাণ্ডা, সুবোধ মেয়ে।'

'কচু আর কি।' চোখের কোণে ইসারাকে সূক্ষ্ম করেছিল এণাক্ষী: 'বাংলা দেশের লক্ষ্মীদেরও ধন-রত্ন কিছু কম নয়।'

'সেইজন্যেই তো তোমাকে বাহবা দিচ্ছি। গোড়াতেই তুমি রত্নপ্রসূ হয়ে ওঠনি। শুছনহ করনি সংসার। আমাকে একটু গুছিয়ে তোলবার সময় দিয়েছ।'

'সব তো আমারই দোষ।' অভিমানে মুখ মেঘলা করেছিল এণাক্ষী।

'আমি দোষ বললাম নাকি? গুণ, গুণ—তুমি আমার গুণের সাগর।' চিবুক ধরে একটু বা আদর করতে চেয়েছিল জগৎপতি: 'আমার নিশ্বাসের হাওয়া। নইলে তুমি যদি ঘর-বার বাসপাতালে ছেড়ে যেতে, তাহলে আমি এত সব সফলতাম কী করে? আমার প্রাক-টিসই হত না।'

'কিন্তু শুধু প্র্যাকটিসে কী হবে? বাবে ভরসেই কি আর ঘর ভরে?' হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠেছিল এণাক্ষী: 'সব, সব তোমার দোষ।'

'আমার দোষ?' ছুটতে-ছুটতে বাস্ মিস করার মত মুখ করেছিল জগৎপতি।

'হ্যাঁ, তোমার। তোমার মন এক-কোটাও আমার দিকে নয়, কেবল মোকদ্দমার দিকে। তোমার ফাঁদিফিকির মামলা জেতার, আমাকে জেতার নয়। আমি নিতে চাইলেও তুমিই দিতে চাও না। তোমার মন নেই সংসারে।'

'আমার সংসারে মন নেই?' মন খুলে হেসে উঠেছিল জগৎপতি: 'আমি কি সন্ন্যাসি?'

'তোমার মন শুধু টাকায়। নামে। কী করে আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হবে তার কি।'

'তার আগে কলাগাছটা হয়ে নিই।' আবার হেসেছিল জগৎপতি।

'তোমার এত দিয়ে কী হবে? খাবে কে?'

'বাঁড়াও, সবুর করো। সবুরেই মেওয়া ফলবে। কাল পূর্ণ হলেই আসবে অকালকুষ্মাণ্ড।'

বাড়ি বদলাল জগৎপতি। একতলা তেড়ে আতলা বাড়ি নিল। নিচে বৈঠক-খানা উপরে শোবার ঘর, ঠাকুর-চাকর টেলিফোন—বাঁড়াল পাকাপোক্ত মধ্য-বিত্তদের। অনেক আরাম-অবকাশ নিয়ে এল এণাক্ষীর জন্যে। সাজ-গোজ-গয়না, সিনেমা-থিয়েটার-জলসা, দরাজ হাত-খরচ—কোনো কিছুই ত্রুটি রাখল না জগৎপতি। কিন্তু আসল ঘরেই মশাল নেই, শুধু ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া টাঙিয়ে কী হবে?

'আমি যদি আসামী হতাম তাহলেই বোধ হয় আমাতে তোমার আগ্রহ আকর্ষণ হত।' তবু অভিযোগ যায় না এণাক্ষীর।

'আসামী হত মানে?'

'আসামী হলে তুমি যে করে হোক আমাকে মুক্ত করে দিতে।'

'তুমি এখানে মুক্ত হতে চাইছ কোথায়? তুমি তো বন্ধ হতে চাইছ। যেতে চাইছ সলিটারি কনফাইনমেন্টে।' আবার হাসির ঢেউ তুলল জগৎপতি।

বিয়ের প্রায় পনেরো বছর পর আগমনীর আভাস জাগল।

হাসি ফুটল এণাক্ষীর। হাসি শুধু মুখে নয় সর্বাঙ্গে। ধনপতির মধ্যেও যে এত স্বপ্ন তা কে জানত। সবাই বললে, ছেলে হবে।

মেয়ে হল।

আর মেয়ে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আরো পসার বাড়ল জগৎপতির। গাড়ি হল। প্রথমে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, ক-মাস পরেই একটা আনকোরা অস্টিনখান।

অনেক টাকা দিয়ে গ্যারেজওয়ালা বড় বাড়ি ভাড়া নিল। ঈর্ষা হল ড্রাইভারের।

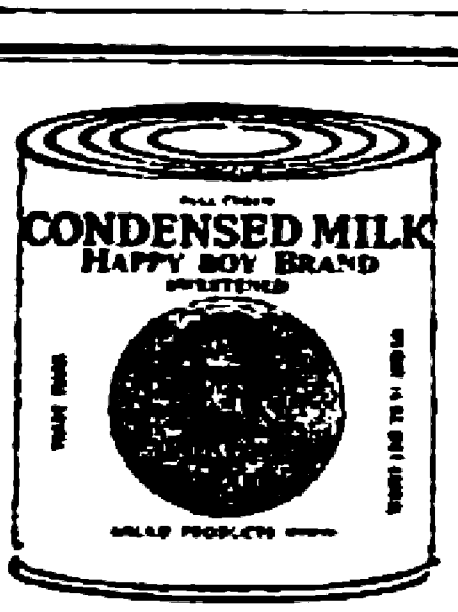

ভারতের জনপ্রিয়
হ্যাপিবয়
কনডেনসড মিল্ক
(নর্দা ও মিষ্টিযুক্ত)

সুগঠিত দেহ ও
শক্তির উৎস
মিলকোস ঘি
মিলকো প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া)
৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১ ফোন : ২২-৬১১২

সব এখন মেয়ের দৌলতে। মেয়েই সাত রাজার ধন এক মানিক। সাত আকাশ-ছোঁচা এক চাঁদ।

খরচের ঢেউয়ের আদরের পানসি ভাসাল বাপ-মা।

মেয়ে যখন জন্মেছে তখন সেটা বড়-লোকের ঘর; তাই, সন্দেহ কি, সে আস্যাপাস্ত বড়লোকের মেয়ে আর তার জন্মাবার উনিশ-কুড়ি বছর পরও যখন আর কেউ এল না, তখন, সন্দেহ কি, সে বড়লোকের একমাত্র সন্তান।

রুচিরা যা চায় তাই পায়।

সাজগোজ প্রসাধন এ সব তো মামুলি কথা। বই-লাইব্রেরি-প্রফেসর এ সবও সেকেলে। খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ এতেই বা কী এমন নতুনত্ব। নাচবে গাইবে বা নাটক করবে এ তো গরিব মধ্যবিত্তরাও করে। তারপর সাঁতার লেখা বা মোটর চালানো মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়, মাস খানেকের ওয়াস্তা। এতে আর সবিশেষ কী স্বপনার পরিচয়।

এ সবে রুচিরার মন ভরে না। এক দিকে তার বিষম অভাব। তার একটা জিনিস নেই। আর সেটাই আসল জিনিস।

তার নাম স্বাধীনতা। তার স্বাধীনতা নেই।

নেই? না। অনেক কিছুই সে পায় বটে কিন্তু চেয়ে পায়। বাবা, ওটা আমার চাই, বলতে হয় মুখ ফুটে। বাবা যদি বোঝেন ওটায় সম্ভ্রমের হানি হবে না পাইয়ে দেন। দামের জন্যে ভাবেন না। মা, ওটা আমায় কিনে দাও, ওটা দেখতে বেশ, মিনতির সুরে আনতে হয় দস্তুর-মত। আর্জি নিয়ে মা তখন পেশ করবেন বাবার কাছে। আর বাবার হিসেব মর্যাদার হিসেব। যদি বোঝেন ওতে অভিজাতের ক্ষতি হবে না, যুক্তি হোক বা না হোক, বাবা প্রশ্রয়ে উদার হবেন।

কিন্তু যাই বলো, চাইতে হয়, আর চাওয়াটাই বেয়া। হোক না বা তা বাপের কাছে চাওয়া। হোক না বা তা ঈশ্বরের কাছে। চাইতে গেলেই নিজেকে কেমন ছোট-ছোট লাগে, কেমন গলায় কাছে গলা পাকায়। যতই হাল্কা সুরে খুশির ঢেউ তুলে চাওয়া যাক না কেন, কোত্থেকে একটা সন্দেহ না কুণ্ঠা না দ্বিধা এসে জোটে। কিংবা হয়তো বা নামঞ্জুরের ভয়।

নিজের বলে অনেক যদি টাকা থাকত রুচিরার! আর টাকা, টাকাই যুক্তি স্বাধীনতা!

তার বাবার টাকা আছে, মারও হয়তো আছে, কিন্তু সেই কপর্দকশূন্য। সে হাত-খরচ পায় না বলতে চাও? না, তা পায়, কিন্তু এক থোক খুচিয়ে আরেক থোক চাইতে গেলেই বাবার কাছে হিসেব দিতে হয়। একেবারে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না হোক, অন্তত উপর-উপর। যে টাকার হিসেব দিতে হয়, সে কি আর টাকা? আর, সুখ তো মাটি খনে নয়, মনে। তাই যখন ভাবা যায় এ টাকা আমার নয় পরের, তখন আর আদর থাকে না বলে যুক্তি দরও থাকে না।

কিন্তু টাকার রুচিরার কী দরকার? কোথাও যাবে? বাবাকে বলুক না, নির্ঘাত বন্দোবস্ত করে দেবে। কিছু কিনবে? বাবাকে বলুক না, নিটোল কিনিয়ে দেবে। কাউকে দেবে, দান করবে? বলুক না বাবাকে। পাত্র বা প্রতিষ্ঠান যদি জগৎপতির ব্যবসায় না প্রতিকূল হয় সে আপত্তি করবে না।

না, সব সময় বাবাকে বলতে হবে কেন? পারব না বলতে।

নিজের বলে টাকা পেলে কী করত সে? হয়তো কিছুই করত না। শুধু নিজের বলে, নিজস্ব বলে অনুভব করত।

বা, তা হলে বাবার বাড়ি-গাড়ি—দক্ষিণে নতুন বাড়ি উঠছে জগৎপতির—টাকা-পয়সা অশ্বাবর মালামাল সবই তার, ওমনি অনুভব করলে হয়! অন্তত জগৎপতির তিরোধানে তো তাই হবে। প্রথমে একটা আট আনা প্রণামী পাবে কটে, কিন্তু এগারোর অবর্তমানে ষোল আনাই রুচিরার।

কিন্তু সে ষোল আনা অনুভব এখন এ মুহূর্তেই হবে কী করে? যা হবে তা এক্ষুনি-এক্ষুনি হয় কই? তাছাড়া কে কার আগে মরে তার ঠিক কী?

বেশ তো, যা একদিন তার ষোল আনা হবে, তার এক চিলতে এখুনি তাকে লিখে-পড়ে দিয়ে দেওয়া যায় না? সে তো আইনের চোখে এখন সাবালক হয়ে উঠেছে। সেই এক চিলতের সে নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারে না? যার সম্পর্কে কোনো জবাবদিহি থাকবে না কারু কাছে? মুখ নিচু করে দিতে হবে না হিসেব-নিকেশ।

সে মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। অমন একটা চিলতে পেলে সে একটু স্বাধীনতা কিনত।

সে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে উঠত, রিকশা চড়ত, ট্রেনে টিকেট কাটতে হলেও।

॥ গান্ধী স্মারক নিধির বই ॥

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

সত্যই ভগবান

ধর্ম ও ধর্মপথ সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তাধারার এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন। ধর্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুহ অনূদিত

মূল্য : ৩·৫০

নারী ও সামাজিক অবিচার

ভারতীয় নারীর অবনমন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার যথার্থ পথনির্দেশ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অমর-লেখনীপ্রসূত এই গ্রন্থখানিতে।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

মূল্য : ৪·০০

পল্লী-পুনর্গঠন

গ্রামকর্মীর কর্তব্য সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তাধারার একখানি অমূল্য সংগ্রহ।

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য : ৩·০০

গীতাবোধ

গান্ধীজী কৃত গীতার সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা অনূদিত ॥ মূল্য : ১·৫০

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত

মূল্য : ০·৫০

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

সর্বোদয় আন্দোলনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন দেশে সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার বিবর্তনের ইতিহাস ॥ মূল্য : ৯·৫০

॥ প্রকাশিতব্য পথে ॥

১। সর্বোদয় —গান্ধীজী
২। পঞ্চায়েৎ রাজ "
৩। মোহনদাস "
৪। কর্মীর সন্ধানে —রিচার্ড গ্রেগ
৫। গান্ধী স্মরণ সংকলন
—অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

: প্রাপ্তিস্থান :

ডি এম লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিঃ ১২

প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা শাখা), ১১১/এ, আচার্যপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলিকাতা—২৬

হুচকা খেত, খেত বা ছুপনিদল। পান খেত, আলতা পরত খালি পায়ে, কালী-ঘাট যেত, গঙ্গাস্নান করত। উনুনের সামনে বসে রাঁধত ডাল-ভাত।

তার সব আছে কিন্তু সাধারণ হবার আটপৌরে হবার স্বাধীনতা নেই। এমন কিছুই সে করতে পারে না যাতে তাকে গরিব-গরিব দেখায়। সদামাটা বলে মনে হয়।

যেহেতু তার যে-সব পাশের ধনে পোদ্দার। নিজের রোজগারে টাকা হলে তাকে সাদাসিধে হতে কে বাধা দেয়?

তাই বি-এ পাশ করার পর জগৎ-পতিকে হুচিরা বললে, 'আমি এবার চাকরি করব।'

'কোনো দরকার নেই।' ঘরে ঢুকেই ভাস্কর বললে মাকে উদ্দেশ করে। মা পাশের ঘরে পড়ুক মন, তারই জন্যে তাকে উঁচু গলায় শোনানো দরকার। 'কী করে হবে? মানী-গুণী ভদ্রলোক সামান্য এক লাইন সার্টিফিকেট দিতে রাজি হবে? এই আবদারটা ছাড়ো দিকি।'

পড়ুকের মধ্যেও মা মৃদু-একটা কথা বলল এমন নয়। জবাবের উদ্বেগ মনে পুষে না রেখে সোজা খোলসা করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে মার কোনো সাড়া নেই। নেই বা একটু, হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

'দুঃস্থ মেয়ে নেই এ কথা বলছিনে।' আপনমনেই বলতে লাগল ভাস্কর: 'তারা আসে, আসুক। কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যারা বড়লোক, যাদের টাকা রোজগারের কোনো দরকার নেই। তারা চাকরি করতে চায় শুধু চালের জন্যে। আর তাদের মুরোদ্দিস যাকে বলে তারই পেয়ে যায় সহজে।'

মহালয়ার তবুও সাড়াশব্দ নেই।

কুতো পায়েই পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল ভাস্কর: 'এই চাকরিটাও হল না মা।'

পড়ুকের ছোট ঘরের এক কোণে একটু জায়গা নিয়ে পড়ুক বসেছে মহালয়া। সামনে ছোট জলচৌকির উপরে

শিউলির সিংহাসনে ছোট একটি গোপাল।

'একটা না হয় আরেকটা হবে।' মহালয়া কাতস্বরে বললে।

'ছাই হবে। তুমি ঐ কুড়কুয়ে দেবতা তাঁকে ছাড়ো।' ভাস্কর বলল গম্ভীর হয়ে: 'ওটা অপোগণ্ড শিশু, ওর কোনোই শক্তি নেই।'

মহালয়া বুঝি মনে মনে হাসল। বললে, 'ও গিরিগোবর্ধন ধরেছিল।'

'মুণ্ডু ধরেছিল। দেখ কী নিলাজ, আমরাই খেতে পাচ্ছি না, আর ও কেমন হাত বাড়িয়ে আমাদের কাছেই ভিক্ষে চাইছে। ওটাকে ফেলে দাও মা, তার চেয়ে বরং হনুমানকে ধরো।'

মহালয়া কথা কইল না।

'হনুমান পাহাড় শুধু মাথায় ধরেনি বয়ে নিয়ে এসেছিল লঙ্কায়। মরা লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিল ওষুধ দিয়ে।'

তন্ময়তার মধ্য থেকেই বললেন মহালয়া। 'তুই-ই তো আমার মহাধীর।'

৩

নতুন অঞ্চলে তেতলা বাড়ি তুললেন জগৎপতি।

প্রথমে ভেবেছিলেন একতলাটা ভাড়া দেবেন, নিজেরা থাকবেন উপরে। কিন্তু ঠিক সময়েই, ধনী হবার পর মোটা হয়েছে এলাকাটা, হুংপিণ্ডে চাঞ্চল্য ঘটাল। ডাক্তার বলেছে, ওঠা-নামা যত কম করা যায়। তাছাড়া মক্কেলরা হন-হন করে ঢুকে পড়তে বাস্ত, সিঁড়ি ভাঙতে গেলেই দেরি করবে তারা, স্বিধায় পড়বে। ধনাগমের পথ দ্রুত ও সমতল রাখাই বাঞ্ছনীয়। তাই ছাড়া যাবে না একতলা।

কিন্তু তিনটি তো মোটে প্রাণী— এত-এত ঘর তারা ভরবে কী দিয়ে? ঠিক করলে, তেতলাটা ভাড়া দিই।

কিন্তু যাকে-তাকে দেওয়া যায় না। এমন লোককে দিতে হয় যাতে বাড়ির ভাত থাকে। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট অনেক-দিন থেকে খোঁজাখুঁজি করছে। তাদের এক পাঞ্জাবী অফিসরের সমস্ত একটা ফ্ল্যাট দরকার। কোনো ঝামেলা নেই, সজ্জন সিং-এর। সে একলা, অবিবাহিত। বিয়ে করেনি এখনো। আর ভাড়া যা দেবে সরকার তা নাবোর চেয়েও লোভ। তার আদায়ে কোনো কষ্ট নেই বাড়ি-ওয়ালার। আদায় নিশ্চিত ও অনায়াস।

সজ্জন সিং মুকুটের মণি হয়ে বসল মাথার উপর।

মাঝে মাঝে রাস্তায় একা-একা এসে দাঁড়ান জগৎপতি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। এ কি তার বাড়ি? এ অবিবাদী স্বপ্নের উপর দাঁড়িয়েছে

ভিত্তি করে? এ কি তারই ইট-পাথরের স্বপ্ন? কী করে এ সম্ভব হল? কোত্থেকে উঠল গর্জিয়ে? কে দিল? কেন দিল? না কি আবার একদিন কেড়ে নিয়ে যাবে? ধুলো করে ফেলবে? যেমন ফাঁকা ছিল তেমনি ফাঁকা করে দেবে সমস্ত?

তা কেন? মনে মনে হাসলেন জগৎপতি। যখন একবার দিতে শুরু করেছে অঢেল করেই দেবে। না দিলে চলবে কেন? আমিই বা ছাড়ব কোন বুদ্ধিতে? আমি কি দুর্বল, না অধম?

যখন উঠতে সুরু করেছি, আরো উঠব। বাড়িতে-গাড়িতে উঠেছি, নামে-ধামে উঠেছি, এবার উঠব শক্তিতে।

আর শক্তি মানেই রাজশক্তি।

হাইকোর্টের জজ করে নেবার কথা উঠছিল। প্রত্যেক নিয়োগেই একটা-না-একটা প্রতিবাদ ওঠে, জগৎপতির বেলায়ও ব্যতিক্রম হল না। বলা হল, জগৎপতি ফৌজদারিতেই রপ্ত, দেওয়ানির ক-খ-গও জানে না। জজ হলে কিছু জানতে লাগে নাকি? পাল্টা বলে এপক্ষ। উকিল জজ হলে তো তার আইনের লাইব্রেরি বেচে দেয়, বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তা নয়, জগৎপতি নিজেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। জজের মধ্যে জৌলুস কোথায়? গাড়িতে পাশে আর্দালি নিয়ে না এলে তাকে চেনে কে? আর মাইনেই বা কত, এবং কত দিন? উকিল হিসেবে জগৎপতির রোজগার অনেক বেশি আর ইহ-জগতে তার কোনোদিন রিটায়ারমেন্ট নেই। স্ট্রেচারে করে উঠে শুয়ে-বসে শেষ দিন পর্যন্ত সে হেঁদিয়ে যাবে আর রক্ত উঠে মরে গেলে লোকে বলবে, দেখ, লোকটা কেমন জিন-লাগাম-যুক্ত ঘোড়ার মত মরেছে।

না, শুধু টাকার সুখ নেই। ভোগ নেই। আসল সুখভোগ শক্তিতে। আর শক্তি মানে হিত করার শক্তি নয়, অনিষ্ট করার শক্তি। যার যত অনিষ্ট করার শক্তি তারই তত সম্মান, তত অভিনন্দন। আর শাসন করার অস্ত্র হাতে না থাকলে অনিষ্ট করি কি করে? আর শাসন করার চূড়ান্ত অস্ত্র মন্ত্রীত্ব।

মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন জগৎপতি।

ভাবছেন রাজনীতিতে ঢুকবেন। আর তো জেলে যাওয়া নেই, এখন শুধু টাকার খেলা। টাকা দিয়ে, টাকা দেখিয়েই কিন-বেন নমিনেশন। তারপরে ভোট। মনে-মনে হাসলেন জগৎপতি। হ্যাঁ, তার জন্যে কিছু মাটি তৈরি করতে হবে বৈকি। দরিদ্রের বন্ধু সাজতে হবে। তার মানে এখানে-ওখানে কিছু চাঁদা দিতে হবে মুক্তহস্তে। নিতে হবে জনপ্রিয়তার দীক্ষা। আর যে যা বলে সকলের মতে ঘাড় কাত করে নির্বিবাদ সায় দিয়ে যাওয়ার নামই জনপ্রিয়তা। আরো একটা বড় কথা, হতে হবে প্রগতিবাদী। এ আবার হতে হবে কী! বড়লোক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো আপনা থেকে হয়ে গিয়েছে। প্রগতির প্রত্যক্ষ উদাহরণই তো রুচিরা। তার সাজ-গোজ লেখা-পড়া চলা-ফেরা, ইংরিজি-বাঙলা উচ্চারণের কথা ছেড়ে দিই, মাঠে-ময়দানে তার দাপাদাপি ছুটোছুটিও ধর্তব্য নয়, এত-র উপরে তার আবার নাচ-গান-অভিনয় দেখ। আর কে না জানে, হালের অভিধানে নাচ-গান-অভিনয়ই সংস্কৃতির নামান্তর। আর যা সংস্কৃতি তা-ই প্রগতি।

সেদিন কোথায় বেরুচ্ছে রুচিরা, পোশাক দেখে জগৎপতি থমকে গেলেন। বলে উঠলেন : 'এ কী! হাত গলা কান সব খালি কেন?'

রুচিরা মৃদু হেসে বললে, 'এটাই প্রোগ্রেসিভ।'

'বুঝেছি। যাতে বলে গরিব-গরিব দেখানো।' জগৎপতি হাসলেন। 'কি, গাড়িতে যাচ্ছিল তো?'

'হ্যাঁ, বাবা—'

'তার মানেই তাই। কারুকার্য যাই থাক, আসল ঠিক থাকলেই হল।' এবার জগৎপতি তাঁর হাসিতে একটু কুটিলতা মেশালেন : 'গরিব হওয়া নয়, গরিব-গরিব দেখানো।'

'বেশি দেখাতে গেলে লোকে আবার কৃপণ না ভাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা আবার লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃপণ-কৃপণ না দেখানো।' কথাটা কী রকম হয়ে গেল দেখে শব্দ করে হাসলেন জগৎপতি : 'কৃপণ কখনো জনপ্রিয় হয় না। জনপ্রিয় হওয়াটাই প্রগ্রেসিভনেস। যাচ্ছ যে, একা যাচ্ছ?'

'না, কলেজের কটা মেয়েকে তুলে নেব।'

'খুব ভালো। সকলের সঙ্গে মিশে পাঁচজনের একজন হয়ে গিয়ে আবার

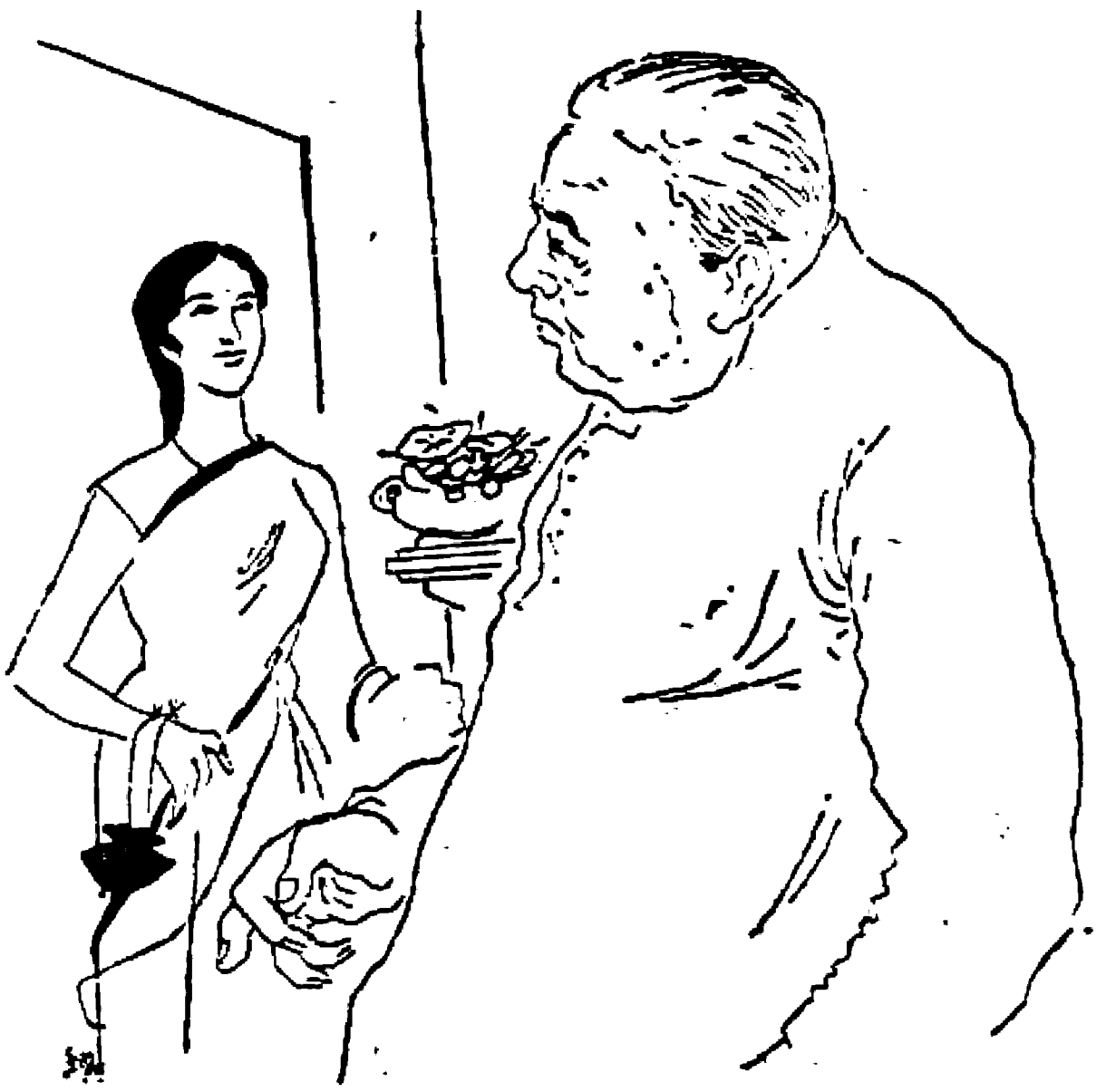

"এ কী! হাত গলা কান সব খালি কেন?"

নিজের কোটে একলাটি হয়ে ফিরে আসা। এটাই বোধহয় বাঁচবার আর্ট।'

'কোনটা?' মেয়ের সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলতে জানেন জগৎপতি।

'এই নিরলঙ্কার থাকা।' কথাটা শক্ত হয়ে গেল বুঝে রুচিরা নিজেই সেটা নিরলঙ্কার করল : 'মানে সরল সাদামাঠা থাকা—'

খুব একটা ফরার ভাব ফুটিয়ে রুচিরা বললে, 'এ বেলা তোমার গাড়ি লাগবে?'

'না। কতক্ষণ দেরি হবে তোমার।'

'এই ঘণ্টা দু-তিন।'

কোথায় যজ্ঞ জিগ্যেস করাটা অবান্তর, অনাধুনিক, তাই জগৎপতি সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'এস।'

তারপরে গেলেন এলাকীর কাছে। 'তুমি একবার পাড়াটা ঘুরে এস।'

'ও আমি পারব না।'

'সে কী, নতুন বাড়ি করে এসেছ এ পাড়ায়, সবার সঙ্গে ভাব করতে হয়।'

'তুমি করো গে।'

'আমি তো গেছি এ-বাড়ি ও-বাড়ি। আপনাদের কাছাকাছি এলাম—নমস্কার করে বলতেই সবকে সোকনো একেবারে বিগলিত হল। কী অমায়িক, কী নিরহঙ্কার, পরস্পর বলাবলিও কানে এল।' সমস্ত মুখে দুষ্টু হেসে তাকালেন জগৎপতি : 'যাও না, তুমিও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিনয় দেখিয়ে এস না। দেখবে গিন্নিরা সব কেমন তোমাকে মাথায় করে রাখবে।'

'আমার বয়ে গেছে।' একরাশ নাকচ করে দিল এলাকী। : 'কিছুর মধ্যে কিছু না, আমি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াই—পাগলের মত!'

'পাগলের মত হবে কেন, ঘোর বুদ্ধিমানের মত।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি : 'ওটাই হচ্ছে জনপ্রিয় হবার সহজ উপায়। আর জনপ্রিয় না হলে ইলেকশানে জিতব কী করে?'

বিদ্রূপের হাসি হাসল এলাকী। বলল, 'এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আগে ইলেকশান আসুক। তখন দেখা যাবে। তখন না হয় ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাঁড়াব।'

'সেই দাঁড়ানোটা যাতে সড়গড় হয় তারই অভ্যেস আগে থেকে করে রাখা ভালো। মাটি পাট করে না রাখলে ফসল ভালো হয় কী করে?'

'রাখো। ঘোড়ার দেখা নেই আগেই চাবুকের ঘুম।' হঠাৎ ভাঁপটা মেজাজে বলল এলাকী : 'দেখবে ওরাই আসবে আগে আগে।'

'তা আসুন, কিন্তু ভয় হয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাকে অহঙ্কারী বলবে। কিন্তু আগে-ভাগে তুমি যদি যাও নিজের থেকে, তার দেখতে হবে না, জয় পড়ে যাবে চারদিকে।'

'দরকার নেই। অমন ফাঁকা জয়ধ্বনি আমি চাই না।' ঘুরে দাঁড়াল এলাকী : 'তার চেয়ে, অহঙ্কারী বলুক, তা অনেক ভালো।'

'বলে কী, শুধু শুধু লোকের পাঁড়ার কারণ হবে?'

'শুধু শুধু লোকে যদি পাঁড়িত হয়, আমি কী করতে পারি?' সরল-শান্ত মুখ করল এলাকী : 'ভগবান যদি আমাকে ঐশ্বর্য দেন, আমার কী উপায় আছে? জিনিস বেশি হলেই জিনিস উঁচু হবে। আর উঁচু হওয়া মানেই তো উদ্ধত হওয়া নয়। এই যদি লোকে বলে—'

'না, লোককে বলতে দেওয়া নয় কিছুতেই। আচ্ছা, বেশ, মাসখানের সময় ভাঁড়ল জগৎপতি, 'আমি গিয়েছি, তুমি হঠাৎ এক্ষুনি না গেলে। কিন্তু ভদ্রমহিলারা যদি আসেন কেউ বেড়াতে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে, তাঁদের অপমানিত করবে, অমানীকে মান দেবে অকাতরে—'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না।' এলাকী হাসল : 'তবে দয়া করে জানিয়ে দিও যেন কেউ দুপুরবেলা না জ্বালায়। কত তপস্যা করে এই দুপুরের ঘুমটুকু আদায় করেছি, তা যেন পণ্ড না হয়।'

কণ্ঠে জগৎপতিও তারলা আনলেন : 'কুকুর থেকে সাবধান' লোকে যেমন নোটিশ টাঙিয়ে রাখে তুমি তেমনি নোটিশ টাঙিয়ে রাখ—নাস্তিকগর্জন থেকে সাবধান।'

কিন্তু প্রথমেই যে এল সে শুভময়। সঙ্গে আরো দুটি যুবক।

সরাসরি ঢুকে পড়ার মুখে একটু বোধহয় চমকালেন জগৎপতি। কিন্তু ভুল করলেন না, দিলেন না ভুরু কুঁচকে। বললেন, 'বসুন।'

চিড়বিড় করে উঠল ছেলেগুলি। শুভময় বলল, 'আমাদের আপনি বলছেন কী—আমরা কত ছোট—'

'না, না, ছোট-বড় কী! ছোট-বড় বলে কেউ নেই। গণতন্ত্রে আমরা সকলে সমান!'

'সৈদ্ধিক থেকে বলতে গেলে অবশ্যি ঠিক কথাই, তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রে—' শুভময় কথাটা শেষ করতে পারল না।

'দেখুন যতদিন আপনি-তুমি-তুই চলবে ততদিন গণতন্ত্র নিরর্থক। গণতন্ত্রে ভাষারও সংস্কার হওয়া দরকার। এমন বাক্য ও ব্যাকরণ রচনা উচিত নয়, যা থেকে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে তারতম্যের সূচনা হয়।'

সঙ্গের আর দুটো ছেলে তো চুপ করেই রইল, শুভময় কান চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তা, আপনি যা বলছেন—কিন্তু, আমাদের বস্তিবাটা খুব ছোট।'

বিবাহের শ্রেষ্ঠদ্রব্য
যখন কিনবেন
অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং
৬৭ এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩
ফোন ২৪-৩১২৮

নগদ ও কিস্তিতে
ন্যাশনাল এবং, জি. ই. সি. ব্রুশ,
টেলিফান কিং রেডিও,
হাই কিউ ট্রানজিসটার সেট,
পাখা এবং সেলাইকল
এলায়েড রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ
১৫৩/এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৫-৪৬২৬

বেনারসী, শাল, আলোয়ান, গেঞ্জি,
মোজা, সোয়েটার, সার্টিং, সুটিং,
সর্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাইভেট লিমিটেড
বড়বাজার : : কলিকাতা : : ফোন : ৩৩-২৩০০

'ছোট হয়, নাই বা বললেন তবে।' জগৎপতি বন্ধ করলেন বক্তৃতা। সহৃদয় সস্মিত চোখে তাকালেন : 'বলুন কী চাই?'

'সরস্বতী পুজোর চাঁদা।'

পুজো? ঝাঁজ নিয়ে মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল কথাটা, তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন জগৎপতি। পুজোর্থীর চেহারা ও পোশাক এক পলকেই দেখলেন একটু খুঁটিয়ে। পরনে প্যান্ট, গায়ে হাতা-গুটোনো শার্ট, বুকের সবগুলো বোতাম খোলা। বোতাম একটাও নেই বলতে চাও? না, সবগুলো বোতামই আছে কিন্তু একটাও ঘরে অবশ্য নয়। জামার বুক খুলে রাখাই শুভময়ের বৈশিষ্ট্য।

'পুজো করেন বুঝি আপনারা?' একটুও যেন রাগ না ফোটে সতর্ক থাকলেন জগৎপতি।

'বুঝতেই পারেন—' একটু যা কাঁচুমাচু মুখ করল শুভময় : 'পুজোটা উপলক্ষ্য মাত্র, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎসব।'

'ঠিকই তো। তাই তো দরকার। উৎসব না থাকলে পুজো কী?' রসিদ-বইয়ের জন্যে হাত বাড়ালেন জগৎপতি : 'কত দিতে হবে?'

বাইরে থেকে মহড়া দিয়ে এসেছে বোধহয়, শুভময় আর তার বন্ধুরা একসঙ্গে বলে উঠল : 'দশ টাকা।'

রসিদ-বইটা দেখতে লাগলেন জগৎপতি। সপ্রশংস স্বরে বলে উঠলেন : 'বাঃ, চমৎকার নাম তো সমিতির!'

'আপনি ভালো বলছেন? সবাই ঠাট্টা করে, বলে, বুড়ো হয়ে গেলেও, চুল-দাড়ি পাকলেও তরুণ থাকবে।'

'তাই তো চাই। চিত্তে তরুণ, রক্তে তরুণ।' তরুণের দৃষ্টিতে তাকালেন জগৎপতি : 'তা ছাড়া এ ত কোনো ব্যক্তি নয়, এ সমিতি। তরুণ সমিতি। মেম্বররা আসবে যাবে, বুড়ো হবে, কিন্তু সমিতি যে-তরুণ সেই তরুণ।'

'ঐ যে কী না জানি বলে কথাটা—মেন মে কাম য়্যান্ড গেন মে গো—' সমিতির পিছনের দিকের ছেলেটা বাকি কথাটা মনে করতে না পেরে বাঙলায় সারল : 'কিন্তু আমি ঠিক আছি।'

'বাট, আই গো অন ফর এভার।' জগৎপতি পাদপূরণ করে দিলেন। রসিদ-বইয়ের শূন্য স্থানও পূরণ করলেন স্বহস্তে।

'ভুল লেখেন নি তো স্যার?' শুভময় নতমুখে বললে।

'ভুল? ভুল করতে যাব কেন?' টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি।

'একটা শূন্য বেশি বেন নি তো?'

'কই? দেখি। না, ঠিক আছে। একশোই দিচ্ছি তোমাদের।' টানা খুলে জগৎপতি একটা একশো টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দিলেন অনায়াসে।

'একশো!' প্রায় একটা জয় দিয়ে ওঠবার মত উদ্দীপ্ত ভঙ্গি করল শুভময়। লোকে চায় আনা—আট আনা দেয়, বড়জোর এক টাকা—তাও না হয় দু টাকা দেবেন, খুব বেশি হলে পাঁচ টাকা—কিন্তু এ যে পুজোতীত প্রসাদ! অতি-উৎসাহে শুভময় জগৎপতির পায়ের ধুলো নিয়ে বসল। গদগদস্বরে বললে, 'যাবেন কিন্তু।'

বিসর্জনের পরের দিন জলসা।

সমিতির সেক্রেটারি, শুভময় ও আরো কটা ছেলে এসেছে জগৎপতির কাছে। 'আপনাকে স্যার সভাপতি হতে হবে।'

তা জগৎপতি জানেন। নইলে এক-মুষ্টিতে অতগুলো টাকা দেবার মানে কী? তবু একেবারে লম্ফ না দেখায় তাই বললেন, উদাসীনের মত, 'আমার সময় কোথায়?'

'তা আমাদের জন্যে একটু সেক্রিফাইস করবেন, স্যার।' শুভময় এমনভাবে বললেন যেন সময়কালে ওরাও অনেক করবে জগৎপতির জন্যে, অনেক খাটবে-পিটবে, অনেক সময় ও শ্রম দেবে অকাতরে।

'তা ছাড়া আমি এসব বুঝি কী—'

'কী যে বলেন স্যার। তাছাড়া, কী বলব, আপনি তো সবই জানেন, আজকাল কি কিছু বুঝতে লাগে?'

'তবু যে-বিষয়ে যার নাম-ডাক—আর কাউকে ডাকুন।' অনায়মনস্ক হতে চাইলেন জগৎপতি।

'আপনার নাম-ডাক কি কম? আমাদের পাড়ায় মনীষী থাকতে আমরা অন্যত্র যাব কেন?'

'তোমরা পাড়ার ছেলে—তোমরা যখন বলছ।' অগত্যা রাজি হলেন জগৎপতি।

'বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবেন। আমি কার্ড দিয়ে যাব।'

বাড়ির সবার দিকে তা হলে নজর পড়েছে সমিতির। জগৎপতি হাসলেন মনে-মনে। কিন্তু পরিপূর্ণ পড়েনি। নচেৎ পাড়ার জলসা হচ্ছে অথচ তাতে বুচিরা নেই এটা আর যাই হোক, সংস্কৃতি নয়।

জলসায় গিয়ে জগৎপতি এক বিশ্রী কাণ্ড করে বসলেন। একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, তাতে তিনি বসেছিলেন আর তাঁরই সঙ্গে সংযুক্ত বলে এণাক্ষী আর বুচিরা। আরো কে-কে বসেছিলেন সেটা তাঁর লক্ষ্যের ছিল না। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বললেন, গণতন্ত্রে মঞ্চের প্রয়োজন নেই, যে কার থেকে উঁচু যে উচ্চাসনে বসবে, সব শ্রেণীহীন সমতলতার মিশে যাবে একত্র হয়ে। তবে যদি বলেন, দর্শকের সুবিধের জন্যে একটা মঞ্চ দরকার, তা হলে তাতে তারাই বসবে যারা অংশ নিয়েছে জলসাতে; যারা অবান্তর, যারা আগন্তুক, তারা শুধু তাদের পদমর্যাদা বা অন্য মর্যাদার বলে মঞ্চাধিকার করে থাকবেন ঐ অসম্ভব। সন্তুরন্তো বুচিরার দিকে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, আমি সভাপতি বলে মঞ্চস্থ হয়েছি, কিন্তু আমার বাড়ির মেয়েরা কোন অধিকারে বসবেন বেদীতে? তাঁরা তো সভার কেউ নন, তাঁরা সাধারণ দর্শকমাত্র। তাঁদের স্থান জনগণের মাঝখানে। আর, মঞ্চ থেকে নেমে গেলে আমিও তাঁদেরই পার্শ্বে—

চারদিক থেকে সবলে হাততালি পড়ল। থামতে চায় না সহজে। এ একেবারে জননেতার মত কথা। মহানুভবের আহ্বান।

এণাক্ষী আর বুচিরা নেমে গেল স্টেজ থেকে। মাটিতে মেয়েদের এলেকায় গিয়ে বসল। বাড়ি ফিরে এণাক্ষী বিস্তর মুখে বললে, 'খুব স্টাণ্ট দিলে যা হোক।'

'কিন্তু কী করব নিলুম এহাত!' নিশ্বাসে বুক ভরে নিয়ে পরিতৃপ্ত মুখে বললেন জগৎপতি : 'জনপ্রিয়তার মই ধরে উঠে গেলুম কয়েক ধাপ। কী, বলো, উঠলুম কিনা। তোমরা যদি সাহায্য করো—'

'কিন্তু যাই বলো, ছেলেটা ভালো।'

'কোন ছেলেটা?'

'ক্লাবের যে সেক্রেটারি। শুভময়।'

'কেন, কী করেছে?'

'আমাকে একটা চেয়ার দিয়েছে বসতে। বললে, জনগণের মধ্যেও যাঁরা মানী-গুণী তাঁরা বিশেষ আসন পার বৈ কি। নিন, বসুন। বলে কোণের দিকে, একটা চেয়ার পাতলে আমার জন্যে।'

'তোমার মোটেই চেয়ারে গিয়ে বসা উচিত হয়নি।' বুচিরা ফোড়ন দিয়ে উঠল : 'আমাকেও দিতে চেয়েছিল একটা, আমি রিফিউজ করে দিয়েছি। গোড়াতেই আমার নিচে মাটিতে বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবাই ডেকে নিলেন স্টেজের উপরে—'

হো হো করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'ঐ, ঐ স্টাণ্টটার জন্যে। কিন্তু, এণাক্ষীকে লক্ষ্য করলেন : 'শুভময় বেশ বিবেচক ছেলে তো! চেয়ার এনে দিয়েছে। তাছাড়া, যাই বলো, গঠনশক্তি আছে ছেলেটার! কী রকম করে-কম্মে তুলেছে ব্যাপারখানা! করে কী ছেলেটা? চাকরি-বাকরি আছে কিছু?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটালো এণাক্ষী। মানে, করলে কত টাকায় যা করে, এমনি উপেক্ষা।

'অবস্থা নাজানি কী রকম?'

'পায়ে যখন স্যাণ্ডেল তখন নিশ্চয়ই ভালো নয়।' রায় দিল এণাক্ষী।

'লেখাপড়াই বা কদ্দুর?'

'বেশিদূর নয়।' এণাক্ষী মুখচোখ গম্ভীর করল: 'বেশিদূর হলে কি জামার বুকের বোতামগুলো খোলা রাখে?'

হেসে উঠলেন জগৎপতি। বললেন, 'ওটা বোধহয় স্মার্টনেসের চেহারা। মানে, এত দ্রুত, যে জামার বোতাম লাগাবার সময় নেই।'

'হ্যাঁ, ঐ চেহারাটাই চকচকে।'

একটা লোককে বিচার করবার কীসব দুর্জোয়া স্ট্যাণ্ডার্ড! মনে মনে রুষ্ট হল মুচিয়া। বললে, 'অলস গবেষণা না করে ভদ্রলোককে সরাসরি ডেকে জিগগেস করলেই হয়!'

৪

ডাকতে হল না, ফাঁকা বুঝে নিজের থেকেই হাজির শুভময়। 'একদিন আমাদের সমিতিতে চলুন, দেখে আসুন স্বচক্ষে।'

'এই যে—' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি: 'আসুন, বসুন।'

'আপনি যদি এখনো আপনি বলেন তাহলে তো মুস্কিল।' দাঁড়িয়ে রইল শুভময়।

'গণতন্ত্রের যুগ—আপনি না বললেই অপমান। কিন্তু যাই বলো,' নিজেকেই নিজে সংশোধন করলেন জগৎপতি: 'বাঙলা ভাষায় আপনি-তুমি-তুই একটা আশ্চর্য চারুকলা। গণতন্ত্রের লোক মনতন্ত্রে এসে গেলেই আপনি তুমি হয়ে ওঠে।'

'তবে?' প্রায় জয়ীর মত তাকাল শুভময়।

'বোসো হে বোসো।' সপ্রশংস দৃষ্টি তুলে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, "তোমার কিন্তু চমৎকার গঠনশক্তি। ফাংশানটা কী অপূর্ব, সুপারবলি সাকসেসফুল করে তুললে। কত বয়েস হবে তোমার? টিশ-বত্রিশ?'

'কাছাকাছি।' ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করল শুভময়। দৃঢ় করল কণ্ঠস্বর। বললে, "এই গঠনশক্তির গুণেই তো গত ইলেকশানে জিতিয়ে দিলাম বিনয়দাকে।'

একটু বুঝি বা চিন্তিত হলেন জগৎপতি। ইলেকশানে দাঁড়াতে হলে তাঁকেও দাদা হতে হবে। এসব অর্বাচীনের দল তাঁকে জগৎদা বলে ডাকবে। উপায় নেই। দাদার জোরেই কুস্তি করা।

'কিন্তু দেখুন ইলেকশানে জেতার পর বিনয়দার আর দেখা নেই। তখন কত কী বলেছিলেন আমাদের সমিতির জন্যে হ্যানো করবেন ত্যানো করবেন। এখন সব ফক্কা।' আস্তিন গুটোলো শুভময়: 'আমরাও দেখে নেব। এক মাঘে শীত পালায় না। যাই বলুন ইলেকশানের ক্যাণ্ডিডেটকে বিশ্বাস করতে নেই।'

'না, না, লোক বুঝে বিশ্বাস করবে বৈকি।' পরামর্শদাতা-উকিলের ভঙ্গি করলেন জগৎপতি: 'তবে আগে কড়ি পিছে বড়ি। দাম আদায় করে নিয়ে পরে কাজ দিতে হয়। যাক গে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন বলো,' উদার প্রশ্রয়ে হাসলেন জগৎপতি: 'তুমি কী করো?'

'এই ডোবালেন।' শুভময়ও হাসল। বললে, 'করি মানে, সমিতি করি, ভলানটিয়ারি করি।' যেন এটা একটা প্রকাণ্ড করা এমনি গর্বের ভাব করল শুভময়। 'বলতে পারেন রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটাই।'

'না, আমি বলছি, কোনো আফিসে চাকরি-বাকরি করো কিনা।'

'তা একটা করতে হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে' যৎসামান্য মেকানিকের চাকরি।'

'কিছু মনে কেরো না। মাইনে?'

'অতি দরিদ্র। বাবার বন্ধুর ফার্ম, গোড়াতে খুব আশ্বাস দিয়েছিলেন উন্নতির চূড়ায় এনে তুলবেন, এমনকি বিলেত পাঠাবেন ট্রেনিং দিয়ে—'

'সে সব হলনা বুঝি?'

'কী করে হবে? গোটা দুই স্ট্রাইক অগানাইজ করতে হল যে।' থামল শুভময়: 'কিন্তু আফিসে উন্নতি হল না বলে আমি আমার উচ্চাশা ছাড়িনি।'

'উচ্চাশা—কতদূর উচ্চ?'

'মন্ত্রীর গদি পর্যন্ত।' এতটুকু ভড়কালনা শুভময়।

'মন্ত্রী?' জগৎপতি স্তব্ধের মত হয়ে গেলেন। তার অর্থ, আগামী নির্বাচনে তাঁকে একটা লোফারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য হচ্ছেন কী!' তরল স্রোতে হাসল শুভময়: 'সবচেয়ে সোজা।' সবচেয়ে সস্তা এই মন্ত্রী হওয়া।'

'বলো কী?' একটু বুঝি বা গম্ভীর হলেন জগৎপতি: 'তোমার পড়াশোনা কদ্দুর?'

'কেন, পড়াশোনা লাগে নাকি? বিনয়দা, বাঁকে রিটার্ন করিয়ে দিলাম তিনি তো আই-এ ফেল।'

'আর তুমি?'

'বাবা মারা গেলেন, আমার আর বিএস-সি পরীক্ষা দেওয়া হল না।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। হ্যাঁ, চলতি বাঙলায় বলতে পারেন বি-এ ফেল। যারা ফেল করে তাদের পরীক্ষা দেওয়া হয় না। যারা প্লেস কিংবা ডিভিশন পায় না তারা সব সময়েই দু নম্বরের জন্যে মিস করে।' হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল শুভময়: কিছু না, কিছু না, কিস্সু লাগেনা মন্ত্রী হতে।'

'কিছু না?' প্রায় হতাশের মত মুখ করলেন জগৎপতি।

'অন্তত লেখাপড়া না। বরং লেখাপড়াটা মন্ত্রীত্বের পক্ষে হ্যাণ্ডিক্যাপ। রাজনীতির পক্ষে ডিসট্রাকশান। যে হোলটাইমার পলিটিশিয়ান সে লেখাপড়া করবে কী! লেখাপড়া করলেই তো বিবেক জন্মাবে। যার বিবেক আছে সে মন্ত্রী হবে কী করে?'

'তবে কী লাগে? টাকাকড়ি?'

'কিছুমাত্র না। বিনয়দার অবস্থা কী! নো অস্টেনসিবল মিনস অফ লাইভলিহুড।' চোখের ইঙ্গিতটা কৌতুকে উজ্জ্বল করল শুভময়: 'আর পরের বার আমি যদি দাঁড়াই, আমার অবস্থা তো বিনয়দার চেয়েও বিনীত।'

সমস্ত বিষয়বৈভব অসার ভস্মমুষ্টি—জগৎপতির মনে এক পলকের জন্যে বৈরাগ্যের উদয় হল। ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলে, 'তাহলে কী লাগে?'

'শুধু পার্টি, পার্টির একজন হওয়া লাগে। আই বিলঙ টু দি পার্টি—শুধু এই উন্নতির ছাড়পত্র। বিদ্যা না অর্থ না চরিত্র না—আর কোনো যোগ্যতা না, শুধু দলের দলী হওয়া। শুধু ভলানটিয়ারি করা।'

'শুধু ভলানটিয়ারি?'

'এখন তো তবু একটা কিছু করতে হচ্ছে, কয়েক বছর আগে হলে শুধু গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেই মন্ত্রী হতে পারতাম।'

যেন মেনে নিতে পারছেন না এমনি কষ্ট-মাখা মুখ করলেন জগৎপতি।

'কেন নয় বলুন? ডেমোক্র্যাসিতে আর কী লাগে? ডেমোক্র্যাসিতে পার্টি ছাড়া আর কী আছে? পার্টি ছাড়া আর কোনো ধর্ম নেই কর্ম নেই তীর্থ নেই। স্লোগানের বাইরে কোনো গান নেই। এই ধরুন না আমাকে। আমি পার্টির একজন য়্যাকটিভ মেম্বর, আমার উদ্দেশ্য আরো কী করে য়্যাকটিভ হব, কী করে আসব দলের ফ্রন্ট লাইনে। আমার সামনে দলবাজি ছাড়া আর আদর্শ কী! আর আমি যদি একবার দলের মধ্যে

অপ্রণী হতে পারি, মানে, ঠেলাঠেলি করে পারি এগিয়ে আসতে, তখন আমাকে নির্বাচনের টিকিট না দিয়ে যাবে কোথায়? আমার পার্টীতে আমি ছাড়া আর আছে কে?'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জগৎপতি বললেন, 'কিন্তু শুধু টিকিট পেলেই তো চলবে না।'

'বাকিটা পার্টি দেখবে। চেষ্টা করবে তার প্রেস্টিজ রাখতে। নিয়ে আসবে তার ফান্ড, তার কাগজ, তার অর্গানাইজেশন। আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করণীয় নেই। আমি কেন লেখাপড়া করতে যাব? আমার টাকাপয়সা না থাকলেই বা কী আসে যায়? আর চরিত্র? ও তো একটা সুবিধের কথা।'

'কিন্তু ভোট যারা নেবে তাদের কাছে তো একটু প্রিয় হতে হবে?'

'তারই জন্যে তো সমিতি করা। দুঃস্থের সেবা করা, নিরানন্দকে আনন্দ দেওয়া—মানে কিনা—' কুটিল রেখার হাসল শুভময়ঃ 'জনসংস্পর্শ ঘটানো।'

'চলো দেখে আসি তোমাদের সমিতি।' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

পায়ে হেঁটে যাবারই ইচ্ছে ছিল জগৎপতির, কতটুকুনই বা পথ—কিন্তু শুভময় বললে, 'না, গাড়ি করে চলুন। সব পথটাই পায়ে হেঁটে গেলে কেউ ইমপ্রেসড হয় না, খানিকটা মেটরে গিয়ে বাকিটা পায়ে হাঁটলেই লোকে মহানুভব বলে।'

দুখানা ছোট-ছোট ঘর নিয়ে সমিতির বসবাস। একখানা ঘরে কাঁচ আলমারিতে কিছু বই ও মাঝখানে টেবলের উপর কটা ছেঁড়া পত্রিকা আর তাকে ঘিরে কটা নড়বড়ে চেয়ার। পাশের ঘরটাতে কিছু খেলার ও জিমেটারের সরঞ্জাম।

'সমিতির শক্তি জিনিসে নয়, মানুষে।' টিপ্পনী কাটল শুভময়।

'তা আর বলতে। কিন্তু দুঃস্থের সেবাটা কী হয়?'

'শীত-অন্তরে শিশুদের দুধ দেওয়া হয়, ওষুধ দেওয়া হয়, কোথায় কোনো বিরোধ ঘটলে তার মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়, রাস্তার আবর্জনা সাফ না হলে তুলে নিয়ে কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে জড়ো করা হয়—' প্রকাণ্ড লিস্টি দিলে শুভময়।

'আর আনন্দের ব্যবস্থা?' রিডিং-রুম আর লাইব্রেরির দিকে কটাক্ষ করলেন জগৎপতি। 'এই মাত্র?'

'না। আরো আছে। মাঝে মাঝে গানের গান করা আছে। প্রভাতফেরী থেকে আর আছে পুজো পার্বণ ইত্যাদি। আর জন্মোৎসব-উপলক্ষে জলসা করা, থিয়েটার করা—আর বুঝতে পাচ্ছেন—এতেই জনগণের বেশি ফুর্তি।'

'এ সব তো ভালোই কিন্তু স্থায়ী কোনো একটা সমাজসেবা হয় এটাই কি ভালো নয়? যেমন ধরো নাইট-স্কুল, রোব-ক্লিনিক—'

'নিশ্চয়। একশোবার। আপনি যদি আসেন—'

আসবেন বলেই তো এগিয়েছেন জগৎপতি। তরুণ সমিতির আওতায় নিজের বাড়িতে সভা ডাকলেন। সভা যারা অটে তারা তো বটেই, বাইরের ভদ্রলোকদেরও নিমন্ত্রণ হল। লোকসেবা শিবরাত্রের মত মহৎ হয় আর কী আছে, কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। আন্তরিক কর্মী যদি পাওয়া যায় টাকার অভাব হবে না। আর তরুণ সমিতির কর্মীরা যে আন্তরিক এ কে সন্দেহ করবে?

প্রথমেই সমিতির জন্যে বড় ঘর দরকার। নকুলবাবুর দোতলার ভাড়াটেরা বদলি হয়ে উঠে যাবে শুনেছি, সেটা সমিতির জন্যে কিনা সেখানিতে নেওয়া যায় হয়তো। তারপর জগৎপতিবাবু নিজে যখন হাল ধরেছেন তখন আর ভাবতে হবে না।

কিন্তু আরেকটা দিক দেখা দরকার। স্বাধীন ভারতে পুরুষ আর মেয়ে দুয়েরই সমান অধিকার, সমান ভোট। তাই তরুণ সমিতিতে মেয়েদেরও আসা উচিত। অন্তত তাদের আসার পথে কোনো বাধা রাখা অনুচিত।

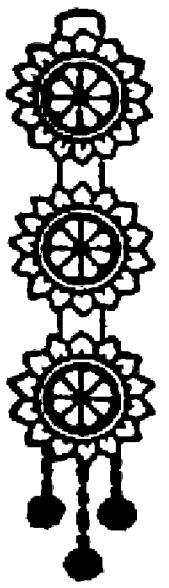

শারদীয় সংবাদ

মুখার্জী ব্রাদার্স তাঁহাদের দোকানের পরিবর্তন ও সজ্জায়ন করিতেছেন। মুখার্জী ব্রাদার্স এই অঞ্চলের ক্রেতাদের বিশেষ পক্ষপাত ও সহানুভূতি এই প্রতিষ্ঠানটিকে অল্প-বয়সেই উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে এবং অল্পকালমধ্যে বিভিন্ন ক্রচিসম্মত পরিকল্পনা এবং ব্যবসায়ে সততা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এই প্রতিষ্ঠানটির মুনাম ও গৌরবের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা শারদীয় সংখ্যে আপনার দৃষ্টি আনন্দমুখরিত করিতে যে প্রয়াস পাইতেছি তাহা আমাদের আকাশে বাতাসে অঙ্গনে ও প্রাঙ্গনে, তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে মুখার্জী ব্রাদার্সও তাঁহাদের ক্রেতাদের লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের মুখাক্ষিত দোকানে আপনার পদার্পণে তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন সার্থক হইবে।

বিনয়াবনত
মুখার্জী ব্রাদার্স

বহুবাজার শাখাঃ
৮৪।১।২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২।

মুখার্জীর গহনা শুদ্ধ ও সুন্দর

বা, জলসা কি থিয়েটারে পাড়ার মেয়েরা তো নামেই। কখনো-কখনো প্রসেশনে।

হ্যাঁ, এবার তাদের 'অফিস' দিতে হবে। হল কি, লেডিস সেকশানই খোলা হোক। তাদেরও ক্লাব-লাইফ, সম্বর্ধনার দরকার। তাছাড়া বস্তি-এলাকায় এমন বহু সমস্যা আছে যা মেয়েদের পক্ষেই চর্চা করা সম্ভব, হয়ত শোভনও।

'সমিতির নাম স্যার? তরুণ-তরুণী?

নাম যা আছে তাই থাকবে। তরুণের মধ্যেই তরুণী অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই তরুণ।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঘ্যাঁচ করে জগৎপতি হাজার টাকার চেক কাটলেন। নকুলবাবুর ভাড়াটে দোতলা ছেড়ে দিল সমিতিকে। নকুলবাবু ছেড়ে দিলেন সেলামি।

লেডিস সেকশানের ইন-চার্জ কে হবে এই নিয়ে এখন প্রশ্ন।

আগে মেয়েরা আসুক। জমুক। তারপর তারাই ঠিক করবে কে হবে তাদের ইন-চার্জ।

'তরুণ সমিতিটা ক্যাপচার করা যাক।' রুচিরাকে বললেন জগৎপতি, 'তুই লেডিস সেকশানের ইনচার্জ হ।'

উৎসাহে মেতে উঠল রুচিরা। বললে, 'খুব ভালো কথা। সোশ্যাল সার্ভিস আমার চিরকালের ফেভারিট সবজেক্ট—'

রুচিরার স্বরে সভোর টান পেয়ে একটু বুঝি ভড়কালেন জগৎপতি। বললেন, 'আগে তোর পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

'তা তো বটেই। কিন্তু বিকেল-বিকেল বাড়ি-বাড়ি ঘুরে রিক্রুট করতে বাধা নেই।'

'তারপর তোরা দলে যখন ভারী হবি,' বাড়িতে জগৎপতি লঘুতার সুরই বজায় রাখতে চাইছেন, 'তখন ওটাকে একটা মহিলা সমিতি করে নেব, আর তোর মা তার অধিনেত্রী হবে।'

'ফক্ষে করো।' এণাক্ষী নিশ্বাস ছাড়ল: 'স্বস্তিতে আছি তাই থাকতে দাও। ওসব বস্তি-সংস্কারে আমি নেই।'

এণাক্ষীর সেকেলে কথার কে কান দেয়। মাস-মাস চার আনা চাঁদা, মেয়ে হলে জোগাড় করল না রুচিরা। বড়-লোকের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, দরজা থেকে কী করে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য কেউ-কেউ আপত্তি তুলেছিল, পুরুষদের একর সমিতি কেন? সেকশন যদিও নামকা ওয়াস্তে আলাদা রাখা হয়েছে, কেন্দ্র এক। রুচিরা আর তার সহচরীরা হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। একত্র নয় কোথায়? কলেজে একত্র, ইউনিয়নে একত্র, অফিসে য়্যাসেম্‌ব্লিতে, সেক্রেটারিয়েটে— সর্বত্র। জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে। একত্র না হয়ে উপায় কী! সংবিধানেরই তাই নির্দেশ। সামান্য একটা পাড়ার সমিতিতে উলটো হতে যাবে কেন?

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'লেডিস সেকশানটা তুলে দিন।'

'তুলে দেব?' শুভময় এমনভাবে তাকাল যেন তার বুকের মধ্য থেকে কে হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেললে।

'তুলে দেবেন মানে মিলিয়ে দেবেন, য়্যামালগেমেট করে দেবেন।' রুচিরা বললে। 'ক্লাব এক হয়ে যাবে, তার কোনো বিভাগ থাকবে না।'

'তার মানে এক পাখির দুই পাখা নয়, দুই পাখার এক পাখি।' প্রাঞ্জল করল শুভময়। 'একত্র না হলে কমরেড-শিপ, সহমর্মিতা জন্মায় না।'

'হ্যাঁ,' হাসল রুচিরা: 'যাকে বলে, এক প্রাণ এক মন একতা।'

'তা আপনার বাবাকে বলুন।'

'বাবাকে বলতে যাব কেন? এ আমরা নেক্সট্ মিটিং-এ নিজেরাই পাশ করিয়ে নেব।'

'তা হলে আপনার পজিশনটা কী রকম হবে?'

'আপনার যা আমারও তাই। সমান-সমান।'

'সমান-সমান?'

'হ্যাঁ, আমি আপনারই মত জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওটা পাশ করিয়ে নিন।'

'চমৎকার হবে। বাঙলার বলবে যুগ্ম সম্পাদক।'

পরের মিটিং-এ তাই পাশ করিয়ে নিল। শুনে জগৎপতি খুব উচ্ছ্বসিত হলেন না। বাড়িতে রুচিরাকে বললেন, 'এতটা সক্রিয় হবার কী দরকার? চুল না ভিজিয়ে সাঁতার কাটাই তো ভালো। যাকে বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।' সুক্ষ্ম করে হাসলেন বিজ্ঞের মত।

'না, না, কোনো কিছুতে লাগতে হলে সর্বশক্তি দিয়েই লাগতে হয়।'

কিন্তু রুচিরার কী দুর্দান্ত শক্তি তা কি এই বাউন্ডুলে পাড়া জানে?

কী করে জানবে!

তাই রুচিরার পরীক্ষা হয়ে যেতেই জগৎপতি নিজে একটা জলসাতে উদ্যোগী হলেন। আর তার মধ্যে একটা গীতি-নাট্য ঢুকিয়ে দাও। রুচিরা নাচবে গান গাইবে অভিনয় করবে।

হ্যাঁ, এবার আর খোলামেলা প্যাণ্ডেল নয়, স্টেজওয়ালা হল-এ, আর, কণ্ঠস্বর দৃষ্ট করলেন জগৎপতি, দস্তুরমত টিকিট বেচে।

আর এভাবেই আয়-আদায় বাড়াতে হবে সমিতির।

উদ্যমে-উৎসাহে উন্মাদ হয়ে উঠল শুভময়। জামার বুকের শেষ বোতামটাও খুলে ফেলল।

জগৎপতি নিজেও কিছু টিকিট বেচলেন। ব্যারিস্টার মহলে, ইঞ্জিনিয়ার মহলে, ফার্মে-কোম্পানিতে। পাত্রস্থ করবার আগে মেয়েকে মঞ্চস্থ করি। তাকে আগে দেখ, শোনো, তারপরে যদি উপযুক্ত বুঝি আলাপ করিয়ে দেব।

কয়েকজন অভিনেতা-শিল্পীকেও ডাকা হল। কয়েকজন বা সীমান্তবর্তিনীকে। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। আর রোমহর্ষক টিকিটবিক্রির পরিচয় যত না ছিড়ে তত, বা, তার চেয়েও বেশি, দুর্মর হাততালিতে।

আর কী গান, কী বা নাচ! নাচের কাছে গান কী! দেখেছ কেমন আনন্দের বৃষ্টি। প্রতিটি ভঙ্গি কেমন লাবণ্যে লালিত-পালিত। লাস্য আর বিন্যাসের কারিকুরি, রেখার আর চূড়ার আর গহ্বরের। অভিনেত্রীর কাছে নর্তকী কী! দেখেছ কেমন উচ্চারণ কেমন অঙ্গ দিয়ে অসামান্যের ইশারা। আর সমস্ত কিছুর মাঝে যে একটি শালীন নম্রতা আছে, মার্জন-ভূষণ আছে, তার রহস্য হচ্ছে রুচিরা শিক্ষিতা। আর সবচেয়ে যা মজবুত তা হচ্ছে এই শিক্ষার আভি-জাত্য। কিন্তু যাই বলো, সব কথার শেষ কথা হচ্ছে মেয়েটা ধনী। ধনে-জনেই রুচিরা মনোহারিকা।

জলসার সাফল্যে জগৎপতির বুক-কাঁধ আরো চওড়া হয়ে উঠল। কিন্তু এণাক্ষীর সব মামুলি কথা। সে উঠল কাপটা মেয়ে: 'কিন্তু মেয়েটাকে তো শুধু নাচালে চলবে না, বিয়ে দিতে হবে তো।'

'এইবার নূপুরের আওয়াজ ছাড়িয়ে পড়ল, এইবার আসবে সব যোগ্য পাত্রের আবেদন।'

'সে সব দরখাস্ত তুমিই যাচাই করবে নাকি?' এণাক্ষী কটাক্ষ হানল।

'প্রথম স্ক্রুটিনিটা আমি করে দিলেই কি ভালো হয় না? পরে ইন্টারভিউ করে শেষ বাছাই মেয়ে করে নেবে।'

'তার মানে তুমি তোমার ইচ্ছামত পাত্র ধরে আনবে আর তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলে তাদের ভেতর থেকে মেয়ে এক-জনকে চয়ন বেছে নেবে বলতে চাও?' এণাক্ষীকে প্রায় রুদ্ধ শোনাল।

'আমি বুঝি অমনি করে বললাম?'

জগৎপতি তার বক্তব্যটা বিশদ করলেন। মেয়ে নিজেই যদি তার বর নির্বাচন করে জগৎপতি তাতে বাধা দেবেন না, বাধা দেবার তাঁর অধিকারই বা কী। কিন্তু তার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয় এটুকু তো তিনি দেখতে পারেন। যা, তার নির্বাচনে মতামত দিতে গেলে তো সে সেই তার স্বাধীনতাতেই হাত দেওয়া হল। কিন্তু, প্রশ্ন এই, তার সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রটা কতটুকু? ক্ষেত্রটা নিতান্তই সংকীর্ণ বলে মেয়েরা সাধারণত কী করে? যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই ধরে বসে। তাই কখনো-কখনো পরিবারের মধ্যেই প্রেম ঘটায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে মেয়েদের নির্বাচনের ক্ষেত্রটা বড় করে দেওয়া উচিত, বাজারটা বড় হলেই জিনিসটা ভালো পাবার সম্ভাবনা। তাই ভাবছি কি, বাড়িতে এসব গণ্য-মানদের যোগা-ভোগানের ডেকে আনি, রুচিরার জন্যে বাজার বড় করি।

এটা মন্দ কী, সায় দিতে এণাক্ষীর বেগ পেতে হল না।

'অসম্ভব'। বিয়ের ইঙ্গিতও রুচিরা কাছে ঘেঁসতে দেয় না। বলে, 'আমার অনেক কাজ।'

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'দেখুন আমাদের সমিতির দুটো দিক আছে, একটা কালচারাল আরেকটা সোশ্যাল। এ পর্যন্ত আমরা আগেরটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়—'

'আপনার ঠিকই মনে হয়, সোশ্যাল-টাই বেশি জরুরি।'

'চলুন না। বাস্তিতে-কলোনিতে যাই, ওদের কী গ্রিভ্যান্স তার খোঁজ নিই।'

'ওদের অনন্ত গ্রিভ্যান্স, খোঁজ নিয়ে শেষ করতে পারবেন না,' হাসল শুভময়, 'তার চেয়ে আমরা বরং আমাদের লীডার খোঁজ নিতে পারি। মানে, আমরা কতদূর কী ক্ষমতা রাখি তার খোঁজ।'

'আমরা স্কুল খুলতে পারি।'

'ঠিক বলেছেন। নাইট স্কুল তো আমাদের প্রেসিডেন্টের পেট প্রোজেক্ট।'

'হাঁ, আমি যা বুঝি, একমাত্র শিক্ষার অভাবই আমাদের সমস্ত ব্যাধির মূল। শিক্ষার অভাবের জন্যেই আমাদের অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অধর্ম—'

'সব কিছু।' অসহিষ্ণু হয়ে শুভময় বললে, 'তাহলে শিগগির একদিন কমিটির মিটিং ডাকি।'

'এর আবার মিটিং কী!' রুচিরাও কম অসহিষ্ণু নয়। 'এ সবচেয়ে সোজা কাজ। যে কেউ ইচ্ছে করলে যাকে খুশি এক নিমেষেই আলোকিত করে তুলতে পারে।'

'তবু সমিতির বিধি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তা, কমিটিতে ওটা পাশ করে নিতে কতক্ষণ।'

সেই সম্পর্কেই শুভময় জগৎপতির কাছে এসেছে।

"আমি একটা খুব বড় কেস নিয়ে মফস্বলে যাচ্ছি। ফিরতে কদিন দেরি হতে পারে।' জগৎপতি আশ্বাসের সুরে বললেন, 'তা আমি না থাকি, আমাকে বাদ দিয়েই করে নিয়ো। স্কিমটা তো খুব চমৎকার। কী নাজানি কথাটা? লোক-কল্যাণকর।'

'না, না, আপনি আসুন—'

চলে যাচ্ছিল শুভময়, জগৎপতি ডাকলেন। বললেন, 'আচ্ছা, ধরো, নেক্সট ইলেকশানে পার্টি তোমাকে টিকেট দিল না, অন্য লোককে দিল, তা হলে তুমি কী করবে?'

'যা যতক্ষণ পার্টিতে আছি ততক্ষণ পার্টির মাস্কেট মানব, ভাঙব না তার ডিসিপ্লিন।' খোলা বুকে বীরের মত বললে শুভময়।

'যে টিকিট পাবে তার জন্যে খাটবে তুমি ইলেকশানে?'

'আপ্রাণ খাটব। বিনয়দার জন্যে খাটিনি? তবে এবার বুদ্ধিমান হব। আগে সাব-কন্ট্রাক্ট নাও, পরে অন্য কথা।'

'এম-এল-এ হবার আগেই কন্ট্রাক্ট দেবে কী করে?'

'তা হলে নগদ যেরে করো। তেল মাখবার আগে কড়ি ফেল।'

'তা বলতে পারো।'

'শুধু সিঙাড়া খেয়ে স্লোগান দিতে পারব না।'

'তা বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তোমাদের সমিতিকে খুব সুখ্যাতি করলেন। বললেন সবুর করতে। সময়মত গ্রান্ট-ট্রান্ট পাইয়ে দেবেন অনেক কিছু।'

'তা হলেই হল।' প্রশস্ত বুক ভরে নিশ্বাস নিল শুভময়ঃ 'আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না। সমিতি যদি পায়, তাহলে আমিই পেলাম। সমিতি বড় হলেই আমার বড় হওয়া।'

৫

সকাল থেকেই ছেতলার ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে। কখনো হঠাৎ ঘুরপার শব্দ।

'কী ব্যাপার?' রুচিরার দিকে তাকাল এণাক্ষী।

'কিছু একটা মেরামত হচ্ছে মনে হচ্ছে—' রুচিরারও স্বস্তি নেই।

ক্রমশই বাড়ছে সে শব্দ। হঠাৎ কত-গুলি ইট খসে পড়ল নিচে। মনে হল ছেতলার ছাদের দেয়াল ভাঙা হচ্ছে।

পূজায় এবার—

রঙিন মাছ ও এ্যাকুরিয়াম বিক্রেতা

মান্না এ্যাকুরিয়াম

১৬, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিঃ-৪

(হাতিবাগান বাজারের পিছনের গেট)

—ব্যবহার করুন—

ডাঃ ভিগোর

হেয়ার কিওর

(মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল)

হেয়ার কিওর ল্যাবরেটরী

৩, সতীশ মুখার্জী রোড, কালিঘাট।

॥ সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

সর্বদা ভিন্ন কলম ব্যবহার করুন

'একবার দেখে আসবি?'

'সজ্জন সিং বাড়িতে আছে কিনা ঠিক কী।'

এণাক্ষী নিজেই আবার বারণ করল। বললে, 'কী জানি কী, মিলিটারির কাণ্ড, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। থাক, গিয়ে কাজ নেই।'

বারণ সহ্য করতে পারে না রুচিরা। আর এ বুঝি তার ভীরুতা তার অপটুতার উপর কটাক্ষ।

সটান উঠে গেল রুচিরা।

সিঁড়ির প্রান্তে দেখতে পেল সজ্জনকে। রুক্ষ মুখে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিগগেস করল : 'এসব কী হচ্ছে?'

সজ্জন সিং বুঝতে পেরেছে অভিযোগটা কে। কথার সে কোনো উত্তর দিল না। চেষ্টারও ধার দিয়ে গেল না। বরং পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

এ কী অসৌজন্য! আরো দুধাপ উপরে উঠল রুচিরা। স্বর আরো একটু চড়া করে বললে, 'জানতে পারি কি কেন এত গোলমাল হচ্ছে? কেন এত সব ভাঙাচোরা?'

'এসব জেনে আপনার কাজ নেই।' শুধু ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নের জবাব দিল সজ্জন।

'নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু আমরা এ বাড়ির মালিক। আপনাকে তেতলায় শুধু থাকতে দেওয়া হয়েছে। ছাদ-দেয়াল ভেঙে ফেলতে দেওয়া হয়নি।'

'সে আমি বুঝব, আমার ডিপার্টমেন্ট বুঝবে।' সদূরমত সিঁড়ির দিকে চাকুষ ইশারা করল সজ্জন : 'আপনি এখানে নাক ঢোকাতে আসবেন না। নিজের চরকায় তেল দিন গে যান।'

'না, বিনা অধিকারে আমার বাড়ির কী ক্ষতিসাধন করছেন তা আমাকে দেখতে হবে স্বচক্ষে।' রুচিরার ভঙ্গিও কম জঙ্গী নয়।

'আপনারই অধিকার নেই বিনানুমতিতে আমার ফ্ল্যাটে ঢোকবার—' উদ্যত বাধার মত দরজা জুড়ে দাঁড়াল সজ্জন সিং।

'এ কী, ওপাশের জানলাটাই আপনি লোপাট করে দিয়েছেন।' শেষ পর্যন্ত না উঠে এখান থেকেই নজর করতে পেরেছে রুচিরা। 'এ সবের মানে কী? হচ্ছে কী এ সব?'

এবার ইঞ্জিনিয়র সাহেব দয়া করলেন। বললেন, 'তেতলাটা এয়ারকণ্ডিশানড হচ্ছে। তারই জন্যে হচ্ছে খানিক রদবদল।'

'এয়ারকণ্ডিশানড হচ্ছে, তার জন্যে বাড়িওলার অনুমতি নিয়েছেন?'

ইঞ্জিনিয়র বললেন, 'তার আমি কী জানি?'

'আপনাকে জিগগেস করা হয়নি। যে এ বাড়ির টেনেন্ট তাকে জিগগেস করা হয়েছে।'

'আর সেই টেনেন্ট জবাবদিহি করবে আপনার কাছে নয়, আপনার বাবার কাছে যিনি এ বাড়ির আসল মালিক, যিনিই আমাকে বসিয়েছেন ভাড়াটে।' কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াল সজ্জন।

'বাবা এখন বাড়ি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমিই তাঁর প্রতিনিধি।'

'যান-যান। তিনি মরে গেলে আসবেন।' বিদ্রূপে ঝিলকিয়ে উঠল সজ্জন। 'যতদিন তিনি বেঁচে আছেন আপনি কেউ নন, কিছু নন।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমিই সমস্ত। সহ্য করব না আপনার ঔদ্ধত্য।'

'যা করতে পারেন করুন।' পিছন ফিরে সজ্জন আবার ইঞ্জিনিয়রকে নিয়ে পড়ল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিচে নেমে গেল রুচিরা। এণাক্ষীকে একবার জিগগেস করল, তেতলার কোনো ঘর এয়ারকণ্ডিশানড করার অনুমতি বাবা দিয়ে গিয়েছেন কিনা। কখনো না। তা হলেই হল। একেবারে নিচে নেমে গেলে রুচিরা। আর খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে একেবারে তরুণ সমিতিতে।

সমিতির তদারকিতে সকালেও একবার হাজিরা দেয় শুভময়, সান্ধ্য-পালারাও কেউ-কেউ থাকে, সহসা সেখানে এসে দাঁড়াল রুচিরা। রুক্ষ, দীপ্ত, অবিনাস্ত।

'শুনুন। একবারটি বাইরে আসুন।' রুচিরা অন্তরঙ্গের মত ডাকল।

যদিও জানে কাকে ডাকছে তবু শুভময় নিজের বুকের উপর আঙুল রাখল : 'আমাকে বলছেন?'

'আর কাকে?'

হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে আছে বিশ্বভুবনে, বীরত্বের এমনি ভঙ্গি করে রাস্তায় বেরিয়ে এল শুভময়।

সমস্ত বললে রুচিরা। এর প্রতিবিধান কী?

মালিক-শ্রমিক বিরোধে সমিতি চিরদিন শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। মহাজন খাতকের সংঘর্ষে খাতকের পক্ষে। তেমনি বাড়িওলা-ভাড়াটের ঝগড়ায় ভাড়াটের পক্ষে। কোন দিকে ন্যায় বা সত্য তার মধ্যে যায়নি, শুধু পক্ষ দেখেছে।

এবারও পক্ষ দেখল। রুচির বাড়িওলা এ প্রশ্ন আর উঠল না। রুচিরা রুচিরা। রুচিরাই সমিতি।

'চলুন।, কী স্পর্ধা! ভদ্রমহিলাকে অপমান করে।'

এক বাক্যে এত ক্ষেপে উঠবে এ ভাবতেও পারেনি রুচিরা। যেন খোলা তলোয়ারের ডগার উপর লাফিয়ে পড়তে ছুটেছে শুভময়। নিরস্ত করবার দুর্বল চেষ্টা করল রুচিরা। বললে, 'থানায় খবর দিলে কেমন হয়?'

'থানার রাস্তা তো জানা নেই।' অস্পষ্ট একটু হাসল শুভময় : 'আইনের বাহুর চেয়ে নিজের বাহুকেই চিরদিন দীর্ঘ ও বলবান মনে করে এসেছি।' বলে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল তেতলায়।

দোতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিল রুচিরা, বাকিটা শুভময় তাকে উঠতে দিল না। বললে, 'আপনি আপনার জায়গায় থাকুন, একা আমি যাচ্ছি। এখানে যুদ্ধ হয়ে লাভ নেই। এখানে একা এক পুরুষ থাকাই ভালো।'

বাকি সিঁড়িটা প্রায় একলাফে উঠে গেল শুভময়। দেখল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

তবু, ছেড়ে দেবার মতন ব্যাপার নয়। সাধারণ ভাড়াটে-বাড়িওলার ঝগড়া নয়, এখানে এক বাঙালি তরুণীকে অপমান করা হয়েছে। আর সে তরুণী যে-সে নয়। সমিতির অন্যতর সম্পাদিকা। তার মানেই সমিতির অপমান। আর শুভময় যখন সহকারী তখন তারও।

দ্রুত ও দুর্বিনীত কড়া নাড়তে লাগল শুভময়।

সজ্জন সিং গ্রাহ্যও করল না।

'কাওয়ার্ড'। শুভময় গর্জন করে উঠল।

আর বার কোথা! যেন ঝড়ের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। 'হোয়াট ডু ইউ মিন?' হুমকে উঠল সজ্জন সিং : 'তুমি কে?'

'আমি যেই হই না কেন, তুমি কোন সাহসে বাঙালি ভদ্রমহিলাকে অপমান করো?'

'বেশ করি। তাতে তোমার কী! তুমি বলবার কে? তুমি এ বাড়ির কেউ নও। তুমি একটা রাস্তার লোক।'

'রাস্তার লোক? বেশ, নেমে এস রাস্তায়।'

'তাই, যাও, নামো গে। অন্তত যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, দোতলা-তেতলার এই সিঁড়ি—এ আমার টেনান্সির মধ্যে। সুতরাং তুমি একটা ট্রেসপাসার। গুলি করে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে

পারি।' বলতে-বলতে প্রবল আক্রোশে দরজা আবার বন্ধ করে দিল সজ্জন।

'বার করছি তোমার গুলি-করা।' রাগে গরগর করতে করতে নেমে গেল শুভময়।

দোতলা থেকে যখন একতলায় নামছে তখন রুচিরা চাইল তার পিছু নিতে।

এণাক্ষী মুখিয়ে উঠল : 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'যা, দেখি কী হয়।' ছটফট করে উঠল রুচিরা।

'এখন ঝগড়া তো ওদের দুজনের! ওদের মধ্যে তোর এখন গিয়ে পড়বার কী হয়েছে! শোন, যাসনে—'

'কী অদ্ভুত, আমাকে নিয়েই তো ঝগড়া! আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি সরে রইলাম এটা কেমন কথা!' কথা শুনল না রুচিরা, নিচে নেমে গেল।

উত্তেজনায় আরো বুঝি ইন্ধন পড়ল। শুভময় বললে, 'বলে কিনা গুলি করবে। তার আগেই তিলিয়ে টিট করে দেব শাঁখচুন্নিকে।'

বলতে-বলতেই নলের কটা ছেকরা তেতলার বারান্দা তক করে ঢিল ছুড়তে লাগল। সে মরলাতেই তখন দাঁড়িয়ে-ছিল সজ্জন আর ইঞ্জিনিয়র। একটা ঢিল তো ইঞ্জিনিয়রের টুপির উপর পড়ল, আরেকটা সজ্জনের কান ঘেঁষে দেয়ালের গায়ে। আর কটা এখানে-ওখানে জানলা-দরজায়।

তবে যে—একেবারে একটা বন্দুক নিয়ে নিচে ছুটে এল সজ্জন। তিলমুখের কে সেনাপতি আন্দাজ করতে তার দেরি হল না। 'কই সেই স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়?' মুখে এই সিংহনাদ। 'কই সেই রিংলিডার?'

এদিক-ওদিক খুঁজতে হল না, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে শুভময়। যেমন বুকখোলা তেমনি। বললে, 'মরবে তো মরবে। আমি তোমার মত কাওয়ার্ড নই। লক্ষ্যহীন ঢিলের উত্তরে প্রত্যক্ষ বন্দুক নিয়ে আসি না—'

চোখের পলকপাতে কী না জানি কাণ্ড ঘটে যাবে মুহূর্তে, চূড়ান্ত উত্তেজনার নিশেহারার মত রুচিরা হঠাৎ শুভময়কে আড়াল করে দাঁড়াল। সজ্জনের বুঝি আর গুলি ছোঁড়া হল না। দ্বিধার এক মুহূর্তে দুলে-ওঠা অর্থই পাহাড়ের চূড়ার শেষ ও শাণিত বিন্দু থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যাওয়া মাটিতে।

প্রায় একেবারে রাস্তায় নেমে এসে-ছিল সজ্জন, কিন্তু গুলি যখন ছোঁড়া হল না তখন আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে ধর-ধর মার-মার করতে-করতে, এখুনি মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে সজ্জনের উপর আর বন্দুকটাকে কেড়ে নিয়ে লণ্ডভণ্ড করে তুলবে। সুতরাং সাহসের আসলই হচ্ছে বৈচক্ষণ, এ সনাতন মন্ত্র বিবেচনা করে যেমন এসেছিল তেমনি পালিয়ে গেল সজ্জন। ফ্ল্যাটে ঢুকে সিঁড়ির দরজা সবলে বন্ধ করে দিল।

জনতার তখন মহাস্ফূর্তি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হৈ-হল্লা করতে তখন অনেক সুবিধে।

মুহূর্তে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় নিশেহারার মত রুচিরা হঠাৎ শুভময়কে আড়াল করে দাঁড়াল।

ভারতের গৃহিনীরা চিনতেন গাছগাছড়া

[illegible]

চুল পাতলা হওয়া, মরামাস জমা, স্থানে স্থানে টাক পড়া—চুল পড়ে যাওয়ার এই সব লক্ষণে ভারতের মহিলারা তাঁদের নিজেদের ঘরে তৈরী ভেষজ কেশতৈল ব্যবহারে প্রায়ই বেশ সুফল পেতেন।

এখন এইরূপ ভেষজ কেশতৈল তৈরীর পদ্ধতি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

অথচ কেয়ো-কার্পিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এমন একটি ভেষজ তৈল পাওয়া যায় যাতে ঘন ও সুন্দর চুল জন্মাবার ও মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সব উপাদানই আছে।

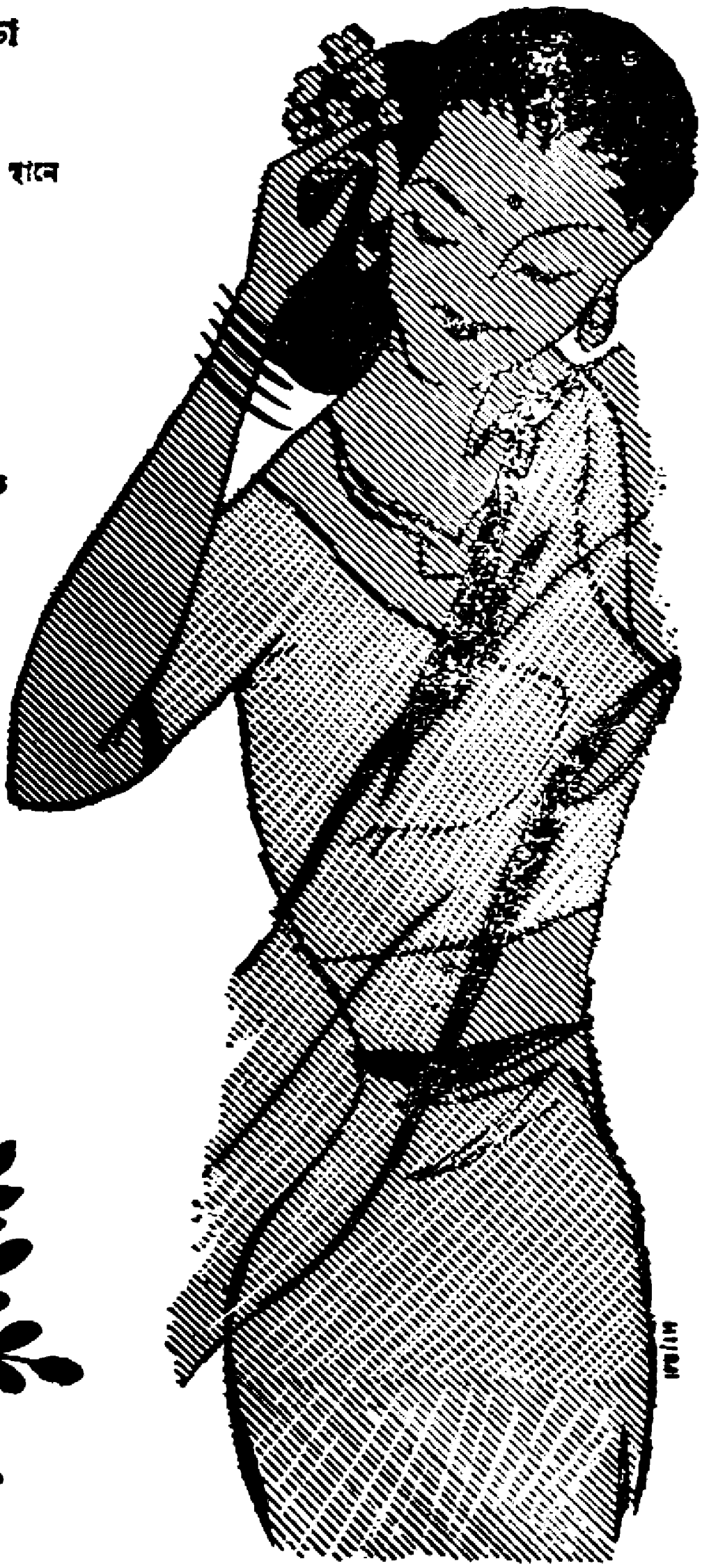

মনোরম গন্ধযুক্ত

কেয়ো-কার্পিন

সুচারু কেশচর্চ্চার জন্য ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল

মেসার্স মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক

বেরিয়ে এস। খালি হাতে বেরিয়ে এস। দেখি তোমার কেমন মুরোদ, কতটা আস্ফালন।

জিরো-তে ডায়াল করল এণাক্ষী।

পুলিশের গাড়ি এসে গেল। শুভময় আর সজ্জনকে নিয়ে গেল থানায়। রুচিরাকে লক্ষ্য করে বলে গেল, আপনিও প্রস্তুত থাকুন।

পরদিন এসে পড়লেন জগৎপতি। ব্যাপারটা জেনে প্রথমেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল এটা তাঁর ইলেকশানের কাজে লাগবে কিনা। একবার মনে হল লাগবে, আরেকবার ভাবলেন লাগবে না। আর যাই হোক, এতদূর গড়াতে দেওয়ার দরকার ছিল কী?

'খুব নাটক শিখেছিস, না?' ভয়ে-উদ্বেগে জর্জর, এণাক্ষী সরাসরি রুখে উঠল: 'অমন করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবার কী হয়েছিল?'

'মানে?' দারুণ বিরক্ত হল রুচিরা: 'তুমি কোত্থেকে দেখলে?'

'জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমার বুক কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জানো, দেখলাম,' এবার স্বামীর দিকে তাকাল এণাক্ষী: 'উনি একেবারে দেয়াল হয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই, গুলি করতে হলে আমাকে করো। কী নাটক! কী নাটক!'

'যে আমার জন্যে বিপন্ন হয়েছে তাকে আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করব না?'

'তারই জন্যে তুই ও লোকটার অমন গা ঘেঁষে দাঁড়াবি?' এণাক্ষীর জিভ প্রায় লকলক করে উঠল।

'গা ঘেঁষে দাঁড়ালে কী হয়?' রুচিরাও কম জ্বলে উঠল না: 'কাছা-কাছি হয়ে না দাঁড়ালে ওকে আড়াল করা যায় কী করে?'

'কিন্তু যদি, মা, ছুঁড়ে দিত গুলি?' জগৎপতি মন-মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন।

'কই দিল না তো! আমাকে দেখেই তো ভড়কে গেল।'

'কী দরকার ছিল ভড়কিয়ে দেবার! ছুঁড়লে ছুঁড়ত গুলি! যে মরবার মরে যেত।' এণাক্ষী উঠল আবার ফোঁস করে।

'মরে যেত!' রুষ্ট রেখায় হাসল রুচিরা।

'কত লোকই তো পথে-ঘাটে মরছে এমন র‍্যাকসিডেন্টে। হঠকারীরা অমনি মরেই থাকে। তাছাড়া ও তো গুলি খাবার জন্যে বুকের জামা খুলেই রেখেছে।' সারা শরীরে রি-রি করছে এণাক্ষী।

এতটা স্পষ্টাস্পষ্টি জগৎপতির পছন্দ হল না। তাঁর কৌশল হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কৌশল। দেখাবেন শাক খাবেন মাছ। খাবেন পটল বলবেন উচ্ছে। তাই বললেন, 'অমন করে বলছ কেন? শুভময়ের দোষ কী! শুভময় তো মহৎ কাজই করেছে। বিপন্ন যদি সাহায্য চায় ও সাধ্যমত নেবে না সাহায্য? কিন্তু আমি বলছিলাম—' মেয়ের দিকে তাকালেন জগৎপতি।

'কী?' রুচিরাও তাকাল স্থির চোখে।

'আমি বলছিলাম, তরুণ সমিতি পর্যন্ত যাওয়ার কী দরকার ছিল? আমি এলেই তো ফয়সালা হতে পারত। বিনানুমতিতে ঘরদোর রনবদল করছে, ওদের ডিপার্টমেন্টে নালিশ করলেই তো পারেস্তা হত। নয় তো আদালতে যেতাম।' গলার স্বর এতটুকু কাঁপল না জগৎপতির: 'মিছিমিছি বাইরের লোককে এ ঘরের ব্যাপারে টেনে আনতে গেলে কেন?'

'মিছিমিছি বলছ বাবা?' রুচিরার স্বরে একটু বুঝি অভিমানের টান লাগল: 'একটা অত্যাচারী যদি পীড়ন করে অপমান করে তাহলেও প্রতিকারের আশায় যেতে পারি না বাইরে?'

'কী দরকার! এ তো তেমন কিছু গুরুতর নয়! যদি চাও তো থানায় ফোন করো।'

'যেমন আমি করেছিলাম।' গর্বের ঢেউ তুলল এণাক্ষী।

'যদি হাতের কাছে সাহায্য থাকে, তবুও?'

'হ্যাঁ, তবুও।' এণাক্ষীই খেই ধরল: 'সব কিছুরই একটা শ্রী আছে, রীতি-নীতি আছে। নাটুকেপনাটা ভালো নয়। ভাগ্যিস কারু হাতে তখন ক্যামেরা ছিল না। একটা কেউ ক্ল্যাপ তুলে নিলেই কেলেঙ্কারি।'

'আহা, অমন করে বলছ কেন?' জগৎপতি আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলেন।

'এই যে আপনি এসে পড়েছেন—' সিঁড়ি দিয়ে সটান উপরে উঠতে লাগল শুভময়: 'এ দিকে কী মজা হয়েছে শুনুন।'

কার অনুমতি নিয়ে উঠছে? বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল এণাক্ষী। যেন কোন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি গর্বে সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে আসছে উপরে। 'উপরে কেন?' এণাক্ষী নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারল না। প্রায় দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: 'নিচে নিয়ে যাও। এখানে নয়। এখানে কী?'

কথাটা কানে গেল নাকি শুভময়ের? দরজার সামনে দাঁড়াল এক সেকেণ্ড। বললে, 'ভিতরে আসতে পারি?'

'আসুন এস এস, তুমি হলে ঘরের লোক, আসবে বৈকি।' জগৎপতি উদার আনন্দে অভ্যর্থনা করলেন: 'তুমি ছিলে বলেই কত বড় বিপদ থেকে এঁরা সবাই বেঁচে গেল সেদিন—'

'এখন সজ্জন সিং যুকে কী জানেন?' শুভময় হাসতে লাগল: 'বলে, বন্দুক গুলি ছিল না। শুধু ফাঁকা ভয় দেখাবার জন্যেই বন্দুক তাক করেছিল। কিন্তু বন্দুকে গুলি আছে কি না আছে এ কে হিসেব করবে? যে বন্দুকের সামনে বুক দিয়ে দাঁড়াবে, নিশ্চয়ই সে নয়। তার দাঁড়ানোটাই মহৎ, এক কথায় অপূর্ব।' তন্ময় চোখে রুচিরার দিকে তাকাল শুভময়: 'আমি বাঁচিয়েছি কী বলছেন? বাঁচিয়েছেন উনি। শুধু আমাকে নয় সমস্ত তরুণ সমিতিকে। এ যুগের তারুণ্যকে—'

নিচে নামবার ইঙ্গিত দেখালেন জগৎপতি। বললেন, 'পুলিশ কোনো কেস-টেস করবে নাকি?'

'চলুন, বলছি।' হাতের এক ঝাপটায় বাজে কথা সব সরিয়ে দিতে চাইল শুভময়। বললে, 'আমরা ঠিক করেছি সমিতির পক্ষ থেকে রুচিরা-দেবীকে সম্বর্ধনা দেব।'

'আমাকে ছাড়া কী করে ঠিক হয়?' হাসি-হাসি মুখ করল রুচিরা।

'আপনার একটা ভোট না হয় বিপক্ষে যাবে, কিন্তু এদিকে আর সবাই হাত তুলে দিয়েছে, আওয়াজ তুলে দিয়েছে—'

'সামান্য কী একটু সাহস দেখিয়েছে, তার আবার সম্বর্ধনা কী!' সহজ গলায় দিব্যি বলতে পারল এণাক্ষী।

'সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন চলো নিচে চলো, সজ্জন সিংকে ডাকাই—' শুভময়কে জগৎপতি নিচে নামিয়ে নিলেন।

সজ্জন সিংকে ডাকতে হল না। আর কোনো দিন না। সজ্জন সিং ভেগেছে, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। ডিপার্টমেন্ট তার আচরণ সমর্থন করতে পারে নি। সজ্জন সিং-এর বদলি আর কোনো ভাড়াটেও পাঠায় নি। প্রজা-স্বত্বই ইস্তফা দিল ডিপার্টমেন্ট। এই লোকালয়ে কাজ নেই ভাড়াটে হয়ে।

'বুঝলেন ঢিলের কাছে গুলি হেরে গেল।' বাহাদুরের মত বললে এসে শুভময়।

'কিন্তু মাস-মাস পাঁচশো টাকার ক্ষতি।' পরিবারিক নিষ্ঠুরতায় শোক।

'মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করে তো ভারী হল।' মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করলেন এণাক্ষী : 'সস্তায় একটা ভাড়াটে উৎখাত হল।'

'ভাড়াটের জন্যে ভাবনা!' ঠোঁট ওলটালো রুচিরা।

'তা হলেও, মাথার উপরে মিলিটারি থাকা, কত বড় প্রেস্টিজ একটা।' এণাক্ষী নড়ে-চড়ে বসল।

প্রকাশ্যে এতটা যেন হজম হচ্ছিল না জগৎপতির। মা-মেয়ের মধ্যে মীমাংসার সুরে বললেন, 'তা নয়, কিন্তু শাঁসালো অথচ ভালো ভাড়াটে পাওয়া দুর্ঘট।'

'আমি বলছি কি বাবা, তেতলাটা আর ভাড়া দিয়ে কাজ নেই।' একটু আবদারের টান আনল রুচিরা।

'সে কী?'

'ওটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।' দুই চোখে আনন্দ নিয়ে এল রুচিরা : 'ওটাতে আমি একটা ইস্কুল করি।'

'ইস্কুল?' এবার চমকালেন জগৎপতি।

'হ্যাঁ, বয়স্কদের না হয়, শিশুদের ইস্কুল।' আনন্দের সঙ্গে স্বপ্ন এনে মেশাল রুচিরা : 'বস্তির ছেলে-মেয়ে, গরিব ছেলে-মেয়ে জড়ো করে এনে পড়াই! আমাদের বাড়িতেই একটা নাইট-ইস্কুল করি। তুমি তো কত নাইট-ইস্কুলের ভক্ত!'

'ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নাইট-স্কুল কী!'

'বেশ তো ডে-ইস্কুলই না হয় করব। কত বড় কাজ বাবা। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, এ কত বড় প্রার্থনা!'

'তেতলায় ইস্কুল কী!' এবার এণাক্ষী রব তুলল। 'যত রাজ্যের নোংরা ছেলে-মেয়ে এসে বাড়ি ঘরদোর একটা জঘন্য ঘাটাল করে তুলবে এ আমার সহ্য হবে না।'

'বা, তা হতে দেব কেন? ওরা আসুক না তেতলায়। ওরা বুঝুক ওরাও এত উঁচুতে উঠতে পারে। উঠেও পেতে পারে মানুষের মমতা—বাবা—' জগৎপতির কাছে দু' পা বুঝি এগিয়ে এল রুচিরা।

'তুমি ইস্কুল করতে চাও একটা নার্সারি খোলো, কে-জি ক্লাশ চালাও।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি : 'এটাই তো আজকাল খুব চলছে, খুব ফ্যাসানেবল হয়েছে।'

'বেশ, তাই বলি।' মরীয়ার মত বলল রুচিরা, 'কিছু একটা করি।'

'তার জন্যে তোমাকে আলাদা ঘর নিতে হবে, পাঁচশো টাকার কম তো আর ফেলে দিতে পারি না।'

'তোমার আর টাকা দিয়ে কী হবে বাবা?'

'টাকা দিয়ে আর কী হয়?' হেসে উঠলেন জগৎপতি : 'কিছু হয় না। টাকা দিয়ে শুধু স্কুল হয়।'

ভাড়াটে শুভময়ই জোগাড় করে আনল। উঁচু দাঁড়ের এক মাদ্রাজী অফিসর।

'মাদ্রাজি-পাঞ্জাবি ছাড়া আজকাল আর বড় অফিসর নেই?' দুঃখের সঙ্গে অনেকটা যেন একটু তৃপ্তির আভাস নিলেন জগৎপতি : 'শুধু অফিসরই বড় নয়, টেনান্টও ভালো। তা পাঁচশো নিতেই রাজি তো?'

'সাড়ে পাঁচশো।' বিজয়ীর মত ভঙ্গি করল শুভময়।

'পঞ্চাশ টাকা বেশি?' সে যেন কত বেশি এমনি বেশি-বেশি খুশি হল এণাক্ষী।

'তা ছাড়া—' জগৎপতির কানে-কানে বলার মত ভঙ্গি করে অথচ সবাইকে শুনিয়ে শুভময় বললে, 'সেলামিও দেবে বলেছে।'

'দেবে?' দরকার হলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্দনা করতেও পারে এণাক্ষী। 'যা হোক তুমি বেশ কাজের ছেলে।'

সন্ধ্যায় সমিতির ঘর থেকে টেনে শুভময়কে বাইরে নিয়ে এল রুচিরা।

'এটা আপনি কী করলেন?'

'কী করলাম!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল শুভময়।

'আপনি সেক্রেটারি হয়ে সমিতির নিয়মকে অমান্য করলেন?'

তবু যেন সোজা হচ্ছে না বিষয়টা শুভময় এমনি মুখ করল।

'সমিতির নিয়ম হচ্ছে বাঙালি হয়ে বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া। আপনি এক মাদ্রাজি জোগাড় করে আনলেন?'

'ভাড়া না দেওয়া মানে পারতপক্ষে না দেওয়া।' শুভময় হাসবার চেষ্টা করল : 'নিয়মের মধ্যে একটা 'পারত-পক্ষে' আছে।'

'তা বাঙালির জন্যে চেষ্টা করে-ছিলেন?'

'চেষ্টা করতে গেলেই দেরি হয়ে যেত। আর যত দেরি তত ক্ষতি।'

'কার ক্ষতি?' জ্বলসে উঠল রুচিরা।

'কার আবার! আপনাদের।'

'কিন্তু সেলামি পাইয়ে দিলেন কী বলে? সমিতির জন্যে নকুলবাবুর থেকে দোতলাটা ভাড়া নেবার সময় সেলামির বিরুদ্ধে তো কত আন্দোলন করলেন—'

'বা, সে তো সমিতির জন্যে। একটা সৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর এ তো উড়ে এসে জুড়ে-বসা বিদেশী ভাড়াটে, একে শুষতে আপত্তি কী!'

'আপনার কোনো নীতিজ্ঞান নেই।'

'নীতি!' তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাসল শুভময়। 'সংসারে একটা মাত্র নীতি আছে, সে হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আরো একটু বাড়িয়ে বলতে পারেন, আত্মবিস্তার।'

'ও বাড়ির জন্যে সেলামি পাইয়ে দিলে আপনার প্রতিষ্ঠা হয় কোন হিসেবে?' এবার যেন বিদ্রূপের খোঁচা মারল রুচিরা।

'এখানে আত্ম ইনক্লুডস আত্মীয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থ—একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে—আত্মীয় প্রতিষ্ঠা।'

'ও বাড়ি আপনার আত্মীয় হল কী করে?' এবারের খোঁচা যেন উপর-উপর নয়।

'ও বাড়ি মানে, আপনারা। তার মানে আপনাদের স্বার্থে—আপনারা যখন সমিতির লোক—শুধু আপনাদের জন্যে। এও বোধ হয় বাড়িয়ে বললাম।' রুচিরার চোখের মধ্যে চোখ রাখল শুভময় : 'কিছু মনে করবেন না, সত্য করে বলি, শুধু আপনার জন্যে।'

যা ভেবেছিল তা নয়, অন্য রকম মনে করল রুচিরা। বললে, 'না, না, আমি কেউ নই, আমি ও বাড়ির কেউ নই।'

'সে কি?' ও বাড়িঘর সব তো একদিন আপনার হবে।'

'আমার সেই সুদূর স্বার্থের কথা ভাবলেন বুঝি?' রুচিরার চোখে আবার সেই বিদ্রূপের ঝিলিক : 'সেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা? কিন্তু বর্তমানে—বর্তমানে আমার কী স্বার্থ? বর্তমানে আমার কী আছে? কিছু নেই। কিছু নেই।'

'কিছু নেই?'

'না। আসল যে জিনিস সেই স্বাধীনতাই নেই।'

'আপনার স্বাধীনতা নেই? আপনি বড়লোকের মেয়ে—'

'গালাগাল দিচ্ছেন নাকি?' চলতে-চলতে এক পা থামল রুচিরা। 'বড়-লোকের মেয়ে, কিন্তু নিজে তো বড়লোক নই।'

'তবু—'

'না, না, নেই স্বাধীনতা।' প্রায় কান্নার মত মুখ করল রুচিরা : 'যেখানে খুশি আমি যেতে পারি না, যার সঙ্গে

খুশি মিশতে পারিনে। ঘরে-বাইরে পারিনে আন্তরিক হতে।'

'না, না, সে কী কথা!' শুভময় দাঁড়িয়ে পড়ল : 'স্বাধীনতা চাই বৈকি। যে করে হোক, নিতে হবে স্বাধীনতা। সমস্ত সংগ্রামই তো এই স্বাধীনতার জন্যে।'

অনেক সেবা করে বাড়ি ফিরল রুচিরা।

গোমরা মুখে এণাক্ষী জিগগেস করল : 'কোথায় গিয়েছিলি?'

এক বাক্যে উত্তর দিল রুচিরা : 'কোথাও না।'

৬

এণাক্ষী বললে, মেয়ের এবার বিয়ে দাও।

বলতে হয়, বললে কথাটা। কিন্তু ওই কুঁড়ি তোর বিয়ে—ব্যাপারটা যে এত সোজা নয় এ কে না জানে। মেয়ের পছন্দই যে শেষ পর্যন্ত কাজ করবে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু পছন্দটা খানিক ছন্দ মেনে চলে এটাই শুধু দেখবার। আকাঙ্ক্ষার বিমানটা ঘূর্ণিবায়ু বা বজ্র-বিদ্যুতের উপর দিয়ে মসৃণ-স্নিগ্ধ অভিজাত আকাশে উঠে আসে এইটুকুই শুধু চালিয়ে আনার কৌশল।

'কজন পাত্রকে তো সেদিনকার জলসাতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।' বললেন জগৎপতি, 'তারা তো রুচিরাকে দেখে খুব ইমপ্রেসড। এবার ভাবছি দুয়েক জনকে বাড়িতে ডাকি চা খেতে। রুচিরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। তা থেকে—'

'তার থেকে তুমি শুভকে বলো ও ঠিক এক শাঁসালো পাত্র এনে দেবে।' লঘু শব্দেই হাসল এণাক্ষী : 'দেখতে-না-দেখতে কেমন সুন্দর জাড়াটে এনে দিল। কবিতকর্মা ছেলে—'

'তা বটে।' সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাকচ করলেন জগৎপতি : 'কিন্তু পাত্রের ও বুকবে কী!'

'হ্যাঁ', একটু বুঝি বা অনুকম্পার সুর আনল এণাক্ষী : 'ছেলেটা ভারি গরিব। কাকার বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হয়ে থাকে। লেখাপড়াও বেশি করতে পারে নি। চাকরিটাও সামান্য।'

'কিন্তু উচ্চাশা আছে।'

'গরিবের আবার উচ্চাশা! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার চেষ্টা।' এণাক্ষী এবার একটু বা মিনতির সুর আনল : 'তুমি ওকে একটা কিছু পাইয়ে দিতে পারো না?'

'দেখি—' কোটের পোশাক পরে বেরুচ্ছেন জগৎপতি, ফিরলেন। চিন্তার মু-একটা সূক্ষ্ম রেখা টানলেন মুখে। বললেন, 'আজকাল ও যেন একটু বেশি আসে।'

'সে তো আমার ফটোগ্রাফস খাটতে আসে।'

'তা আসুক আর যাক, ওকে আমাদের সকলেরই দরকার, কিন্তু যেন বসে না।'

'না, না, আচ্ছা ও বের কোথায়?'

'কিন্তু এখন যেন রুচিরার ঘরে আছে মনে হচ্ছে।'

'সে ওর ঐ ছেলেদের জন্যে বই-খাতা কিনতে দিয়েছিল, তাই বোধ হয় পৌঁছে দিতে এসেছে।'

বলতে-না-বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এল শুভময়। সিঁড়ির দিকে দ্রুত পায়ে ছুটতে ছুটতে বললে, 'অফিসে লেট হয়ে গেল—'

জগৎপতি তাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিতে পারতেন, অনেকটা পথ পারতেন এগিয়ে দিতে। অনেকটা সময় তাহলে বাঁচত শুভময়ের, কিছুটা বা বাসভাড়া। কিন্তু জগৎপতি তাকিয়েও দেখলেন না। এমন ভাব করলেন যেন তিনি তেল আইনের চিন্তায় বিভোর। যেন তিনি এখন এ সংসারেই নেই।

'দেখ কী আনল!' রুচিরার ঘরে ঢুকল এণাক্ষী।

এই শুধু জিনিস এনে দিয়েই এণাক্ষীর সুনজরে এসেছে শুভময়। এণাক্ষীর বিপুল সখ, এনে দিয়েছে নানা রকমের ফুলের চারা, পাখি-পাখাল, ঘর সাজাবার টুকিটাকি। কী নয়? পালের জরদা-মশলা পর্যন্ত। চাকর-বাকর ছাড়া বাড়িতে একটা ছেলে নেই যে আদেশে-অনাদেশে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে পারে। অসামান্য তো বটেই, সামান্যও। জলের পাম্পটা খারাপ হয়েছে তো সমিতির সেক্রেটারিকেই ডাকো। নিওন লাইটের টিউবের বেলায়ও তাই। ভাড়াটের কী অসুবিধে তারও নিরাকরণে সমিতির সেক্রেটারি। সেক্রেটারিটা পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে শুভময়। মধ্য-টা লয় হয়ে গিয়ে শেষে শুভ।

কিন্তু ঐ,—কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরোলেই পাজি।

'বই-টই কী আনল?' রুচিরার ঘরে ঢুকল এণাক্ষী।

'এখনো আনেনি, লিস্ট নিয়ে গেল।'

হঠাৎ ঘরের মেঝের দিকে নজর পড়ল এণাক্ষীর। ও কী, কাঁচা কলম

টেলিগ্রাম : "বোম্বাইসেফ" ফোন : ২২-১১৮১

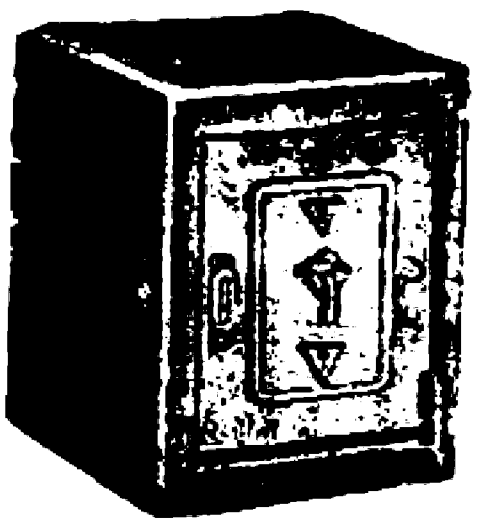

উচ্চশ্রেণীর অগ্নি ও তস্কর-নিরোধক ইস্পাতের সেফ্, আলমারী ক্যাবিনেট, স্ট্রং রুমের দরজা, ইস্পাতের ক্যাশ-বাক্স, চেয়ার এবং সর্বপ্রকার গৃহস্থালী, অফিস ও হাসপাতালের আসবাবপত্র ইত্যাদির প্রধান প্রস্তুতকারক।

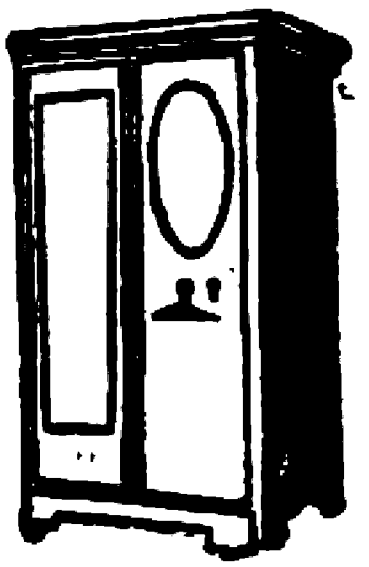

ভারিয়া এজেন্টস :
মেসার্স সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
শো-রুম : পুরাতন ফলের বাজারের নিকট
ফোন : ৮১১১

বোম্বে সেফ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১।

বলে। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল এণাক্ষীর : 'ওকে ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসতে বলতে পারিসনে?'

'তাকি কখনো বলা যায়?'

'খুব বলা যায়। যে ম্যানার্স জানে না তাকে শেখাতে হয় কানে ধরে। আর পরে ওর সেই শান্তিলা মুনির আমলের সাপ্তেলাই থেকে খেল চিরদিন। এতটুকু উদ্গ্রন্থ হল না!'

'আহা, মেঝেতে কাদা লাগলে কী হয়?' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা।

'জলে-কাটার ধুয়ে মুছে ফেলতে হয়।'

'কখিন ফেলবে?'

'তার মানে?'

'এ বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কে নেবে?' চোখে-মুখে আতঙ্কের ছবি ফোটাল এণাক্ষী।

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা : 'এ বাড়ি ইস্কুল হয়ে যাবে।'

রসিকতাটা যেন একটু হৃদয়ঙ্গম হল এণাক্ষীর। 'তোর বস্তি-ক্লাশটা তোর এই দোতলার ঘরেই চালাবি নাকি?'

'না, আপাতত নিচের ঘরে বসাব। তবে পরে, কালক্রমে কী হয় কিছু বলা যায় না।' মাকে ভয় পাইয়ে দিতে ভারি ভালো লাগে বলে রুচিরা আবার ঘোর-ঘোর মুখ করল।

'কী হবে কালক্রমে?'

'ভূমিকম্পও তো হতে পারে। চারদিক থেকে কী সব উঠছেন গগনচুম্বীরা—ঔদ্ধত্যের কলাপাহাড়ের দল। যিনি সর্বংসহা তাঁরও সহ্যের সীমা আছে। একদিন সব পড়বে হুড়মুড় করে—'

'সেদিনও শেষ পর্যন্ত জল আর ঝাঁটারই দরকার হবে।' চাকরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল এণাক্ষী।

কিন্তু নিচের ঘরও ক্লাশ বসাতে দিতে আপত্তি জগৎপতির।

'এগুলোকে পেলি কোত্থেকে?' কোথায় মমতায় আকৃষ্ট হবেন, তা নয়, যেন শিউরে উঠলেন।

আশেপাশেরই বস্তির ছেলেমেয়ে। এমনিতে কুল চুরি করে নিয়ে যায়, ধরা যায় না, কিন্তু সেদিন একটা কাটা ঘুড়ির উদ্দেশে এক দঙ্গল ঢুকে পড়েছিল বাগানে। অতি-উৎসাহে দেখতে পায়নি গেট কখন বন্ধ করে দিয়েছে রুচিরা। তা ছাড়া ঘুড়িটা প্রথম কে ধরেছে তাও রুচিরাকে বিচার করে দেওয়া দরকার। কই ঘুড়ি কই? শুধু কঙ্কাল দুটো কাঠি পড়ে আছে। এ নিয়ে আবার কান্নাকাটি, মারপিট। পানের দোকান থেকে এক গোছা ঘুড়ি কিনে আনল রুচিরা। চুরি-করা কুলের চেয়ে এ অনেক ভালো। কাল আবার এলে খাবার দেবে। কদিন খাবার দিয়ে পরে শার্ট-ব্লুক। এবার আস্তে আস্তে বই-খাতায় এস। অ-আ শেখ। এক-দুই শেখ। এক পয়সা খরচ লাগবে না।

গোড়ার গোড়ায় বাঙালি। পরে হিন্দি মাস্টার এনে হিন্দি।

বাপ-মারা খুশি। মহাখুশি। বড়-লোকের বাড়ির খেয়াল, ভালো ছাড়া মন্দ হবার কী আছে! লেখাপড়া কিছু হোক না হোক, ফ্রি টিফিন তো পাবে।

ছাত্রছাত্রীর চেহারা দেখে জগৎপতির মোটেই আহ্লাদ হল না। বললেন, 'এক রাজ্যের নোংরা এ বাড়িতে কেন?'

'সুস্থ করতে হলে ঘর তো একটা কোথাও চাই।' রুচিরা বললে ঠাণ্ডা হয়ে : 'সমিতির অফিসে জায়গা কোথায়?'

'তা হল আমার বাড়ির এ নিচের ঘরটা সমিতিরই সামিল হল?'

'মন্দ কী! তুমি সমিতির প্রেসিডেন্ট, জনসেবার খাতিরে দিলেই না হয় একটা ঘর ছেড়ে। আমাদের নাটকের রিহা-র্সেলেরও একটা ভালো ঘর নেই। ও ঘরটা সে কাজেও লাগতে পারবে।'

'রিহার্সেলের জন্যে হল-ঘরটাই তো ছেড়ে দিতে পারব। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এই নোংরা বস্তি-বস্তি ভাবটা ভালো লাগছে না।'

'সেবা তো নোংরা ঘেঁটেই করতে হবে বাবা। যে সুস্থ আছে, পরিচ্ছন্ন আছে তার সেবার কী দরকার!'

'আমার সেবার আইডিয়া এ রকম ছিল না।'

'তোমার আইডিয়া ছিল মুখেই জগৎ মারবো, কাজে কিছু করবা না।'

'অন্তত তুমি করবে না। তুমি উপরে থাকবে, একটি নাম হয়ে থাকবে, যাকে বলে ফিগার হেড হয়ে থাকবে। আর র‍্যাকচুয়াল ফিল্ডে কাজ করবে গরিব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা, যারা র‍্যাঙ্ক র‍্যাণ্ড ফাইল—'

'তার মানে কাজের বেলায় ওরা আর ক্রেডিট নেবার বেলায় আমি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই হচ্ছে পলিটিক্স।'

'অন্য মেয়েরা যা পারবে তা আমার করতে বাধা কী!'

'বাধা অনেক। প্রধান বাধা আভিজাত্য। শালীনতা।'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'আমি যদি কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিই, চ্যারিটি করি, তা হলে কি তাতে আমারও সেবা করা হল না?' জগৎপতি একটু পরিচারি করে নিলেন : 'কুষ্ঠ হাসপাতালে আমার শুধু ধন করলেই চলবে না, হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে আমাকে রুগীর সেবা করতে হবে?'

'কিন্তু আমার যখন টাকা নেই তখন আমি কী দেব?' নত চোখ তুলল না রুচিরা : 'আমার পক্ষে শ্রম দেওয়া ছাড়া আর কী আছে?'

'না, তুমি শুধু নাম দেবে, ঔজ্জ্বল্য দেবে।'

'নাইট স্কুল করবার তো তুমি পক্ষ-পাতী ছিলে—' চোখ তুলল রুচিরা।

'সে তো এখনো আছি। তাই বলে তুমি সে স্কুলে মাস্টারি করবে নাকি?'

'আমি তাহলে কী করব?'

'তুমি শুধু মেড়ালি করবে। উপর-উপর ফোঁপর-দালালি করবে।'

আবার চুপ করল রুচিরা।

'একটা স্কুল অর্গানাইজ করতে হলে অনেক রকম লোক লাগে। তাদের সবাই আর মাস্টার নয়, দারোয়ান চাপরাশি নয়। কেউ কেউ বা পরিচালক-গোষ্ঠীর মধ্যে। কারু কারু বা সেক্রেটারিয়েট ডিউটি। তুমি তাদের কেউ হবে। শেকড়ে যাবে কেন, পল্লবে থাকবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কী ভাবে প্রতিষ্ঠান চালায় দেখ না। তুমিও তেমনি কাগজে-কলমে থাকবে, একেবারে কোদাল-শাবল ধরবে কেন? বরং মাস্টার রাখবে মাইনে দিয়ে, নিজে হবে কেন? জাহাজের যে সারেঙ সে কি খালাসীর কাজ করে?'

বাড়ির স্কুল তুলে দিল রুচিরা।

'ও সব কী করব দিদিমণি?' বই-খাতা শ্লেট-পেন্সিল যা যা দেওয়া হয়েছিল তাদের দিকে লক্ষ্য করল ছেলে-মেয়েরা : 'রেখে যাব?'

'না, নিয়ে যা। রেখে দিস যত দিন পারিস।' তারপর নিজের মনে বললে, 'যদি কোথাও কোনোদিন একটা আগুনের ফিনকি জ্বলে ওঠে।'

তারপর একদিন জগৎপতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুচিরা। বললে, 'আমি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?'

'কোথায় চাকরি?' কাজের মধ্যে আছেন বলে জগৎপতিকে অন্যমনস্ক শোনাল।

'পাইনি এখনো। চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'আগে তোমার রেজাল্টটা বেরুক।'

'চুপচাপ বসে আছি।' নিস্পৃহের মত বললে রুচিরা।

চুপচাপই থাকো, নিজের স্তব্ধতা দিয়ে তাই বোঝালেন জগৎপতি।

স্বাধীনতা কি চেয়ে-চিন্তে হয়, কাকুতি-মিনতি করে? জোর করে নিতে হয় ছিনিয়ে। নিজের পথ নিজে কাটতে হয়। অস্ত্র শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা।

চলে যাচ্ছিল রুচিরা, ডাকলেন জগৎপতি। বললেন, 'তোমার যদি টাকার দরকার হয়, তোমার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো।' নীরবে একটু বুঝি বা বিবেচনা করলেন: 'হ্যাঁ, একশো টাকা।'

'দরকার নেই।'

এর কদিন পরই এক সন্ধেয় জগৎপতি অরিন্দমকে চায়ে নেমন্তন্ন করে আনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন রুচিরার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল অরিন্দম। বললে, 'বাঃ, আপনার টেন্ট আছে। নাম তো রুচিরা, তাই রুচি থাকবে তাতে আশ্চর্য কী।'

এঞ্জিন থেকে আর কত কবির বেরুবে, হাসল রুচিরা। বললে, 'কেন, আমি কী করেছি?'

'প্রকাণ্ড কাণ্ড করছেন—তার মানে, আপনি কিছুই করেন নি। মানে', টাই নিয়ে একটু টানাটানি করল অরিন্দম: 'একদম সাজেন নি। আমি আসব, আমি এসেছি জেনেও একটুও ফিটফাট হবার চেষ্টা করেন নি। যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। এ যে কত বড় রূপ, স্বভাবে সুন্দর হওয়া—' ধীরে ধীরে বসল অরিন্দম।

'আপনার জন্যে রান্না করছিলাম যে।' বাধা দিল রুচিরা।

'সে কি, আপনি রাঁধতেও জানেন নাকি?'

সব রান্না জানলে বোধ হয় আভিজাত্য দেখায় না, সারা দিন আশপাশেই কাটাতে হয়, তাই জগৎপতি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন: 'কয়েকটা স্পেশাল রান্না শিখেছে—ঐ যে কোন কোম্পানি থেকে শিখিয়ে যায়!'

'কত আপনার গুণ!' তন্ময়ের মত বলতে লাগল অরিন্দম: 'সেদিন কী গর্জাস নাচলেন! কী সুপার্ব ফিগার আপনার! একবার মনে হল প্যান্থার, একবার মনে হল পাইথন—'

'আপনি এঞ্জিনিয়র, মোটরগাড়ি কি ট্রেন কি এরোপ্লেন মনে হল না?' লঘু করে দিতে চাইল রুচিরা।

'তারপর গানও তো শুনলে।' মনে করিয়ে দিলেন জগৎপতি।

'এক কথায় সুইট।' সোফায় ঢেউয়ে উঠল অরিন্দম: 'ছাড়ব না। গান শোনাতেই হবে।'

'তারপর আরো আছে।' জগৎপতি প্রগাঢ় হলেন: 'সোশ্যাল সার্ভিসে ইনটারেস্টেড।'

'সে তো আজকাল একটা বিরাট কোয়ালিফিকেশন।'

মুখ চোখ জ্বলে উঠল রুচিরার। বললে, 'যাই আপনার চাটা নিয়ে আসি।'

'না এই যে আমি এনেছি।' দরজার বাইরে এগাক্কী ঘোষণা করল।

প্রথমে খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাল অরিন্দম। পরে সোশ্যাল সার্ভিস বা সমাজ সেবার কথা তুলল। বিলেতে কী রকম কী দেখে এসেছে তার বিবরণ দিলে। এই যে সে দিন জলসাতে এসেছিলে, যাতে রুচিরা নাচল গাইল খেলা করল সে একটা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তারই জন্যেই তো টিকিট বিক্রি হল। আর, জানো, সে প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি রুচিরা।

ভলেন্ট সেক্রেটারি! রুচিরার ইচ্ছে হল প্রতিবাদ করে। কিন্তু কী হবে প্রতিবাদে। কে যা বলছে কাকে যা বলছে।

'আমরা সে সমিতির মেম্বর হতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি। 'আমার এলাকায় যখন এ প্রতিষ্ঠান তার উন্নতি-সমৃদ্ধি চাই বইকি একশোবার। আর তোমরা এসে ঢুকলেই ওর টোনটা একটু সুস্থ হয়, সম্ভ্রান্ততা বাড়ে।'

'ঠিক, ঠিক। আজই মেম্বর হয়ে যাব।'

'তার আগে সমিতির নিয়মাবলীটা একটু দেখে নেবেন না?' অরিন্দমের চাঞ্চল্যকে একটু সংযত করতে চাইল রুচিরা।

'আপনিই তো সেক্রেটারি, শুধু আপনাকে দেখে নিলেই তো হবে।' মনি-ব্যাগ বার করল অরিন্দম: 'মোট কত দিতে হবে তাই বলুন।'

'সে পরে হবে খন। আপনি আগে হাত লাগান।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুরু করে দাও।' জগৎপতি তাড়া দিলেন।

'আপনি—আপনারা?'

'এ শুধু আপনার জন্যে পার্টি। আপনি সভা হবেন সেই সম্মানে। আপনি খাবেন, অমরা খাওয়াব।'

'বা, তাকি হয়?' প্লেটগুলো প্রতিপক্ষের দিকে ঠেলে-ঠেলে দিল অরিন্দম। 'আমরা সবাই সভা।'

'হ্যাঁ, সমস্তটাই ইনফরমাল। তাই যে পারো যা পারো তুলে নাও।' একটা ঘরোয়া আত্মীয়-পরিবেশ এনে ফেললেন জগৎপতি। এগাক্কীকেও ইঙ্গিত করলেন বসে পড়তে।

'কিন্তু আপনি কিছু নিচ্ছেন না?' রুচিরার দিকে চোখ তুলল অরিন্দম।

'বা, একজনকে তো পরিবেশন করতে হবে!'

'আহা, এর আবার পরিবেশন কী!' এগাক্কী ভ্রুকুটি করল: 'তুইও বোস না ও পাশটাতে।'

'আমি পরে। আমি সবলের শেষে। সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।'

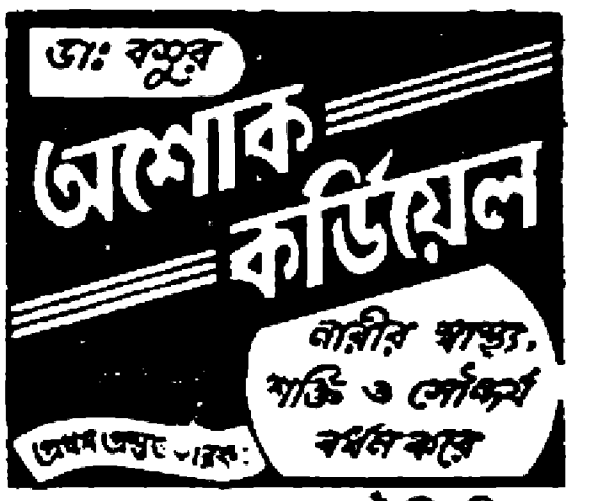

BENGAL TRADING & CO.
Manufacturers of Bolts, Nuts, Bridge Hooks & Signal Fittings.
Govt. & Rly. Contractors
245, Netaji Subhas Road, Howrah.

লম্বু করে বলতে গিয়ে অলক্ষ্যে বুঝি সুরের একটু টান দিয়ে ফেলল রুচিরা।

'ভালোই, আপনার মুখে যে কোনো খাবার নেই। আপনার মুখ-নাক সব ঠিক আছে।'

অরিন্দম খাবারভরা মুখে বললে, 'আপনি তাহলে গান পরিবেশন করুন।'

'সেইটেই শ্রেষ্ঠ খাবার।' টিপ্পনী জুড়লেন জগৎপতি : 'সকল মিষ্টির সেরা মিষ্টি।'

'ঠিক, ঠিক।' সায় দিল অরিন্দম। যেন এটা তার নিজেরই বলা উচিত ছিল এমনি আপশোষের ভাঁশ করলে।

'যে রকম নাকে-মুখে খাচ্ছেন, কান-দুটোও ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।' রুচিরা এবার শব্দ করেই হাসল।

'আছে, আছে।'

মুখ মেঘলা করে থাকেনি, পরিহাসের সুরে কথা কইছে রুচিরা, এতেই এণাক্ষী আর জগৎপতি খুশি কিন্তু এত সহজেই সে গান ধরে বসবে এ প্রায় কল্পনার অতীত। তা হলে অরিন্দমকে তার অপছন্দ হয়নি। মোটকথা, পাখিকে তার অনুকূল আকাশ দিলেই উড়তে পারে। এবং একটি অনুকূল বৃক্ষ দিলেই বসতে পারে বিশ্রামে। একটু যেন বা হালকা হলেন দুজনে।

এমন সময়, চারপাশে যৌনরমের হাওয়া, সেই ঘরে ঢুকে পড়ল শুভময়। গায়ে সেই বুকখোলা পাঞ্জাবি, পায়ে শান্তিলাম্বুনির সাণ্ডেল।

কাঁচের বাসনের শব্দ, টুকরো-টুকরো কথা, হঠাৎ স্তব্ধতা, তারপরে গান—সহজেই আকৃষ্ট হবার মত। তাছাড়া এ অভিনব পরিবেশে হঠাৎ কোনো কাজের জন্যে শুভময়কে দরকার পড়তে পারে।

কিন্তু হঠাৎ জগৎপতি ধমকে উঠলেন, : 'এখন নয়। পরে।'

তবু এক মুহূর্ত ঝুলে থেকে নিরুদ্যম অনিচ্ছায় সরে গেল শুভময়।

'দাঁড়াও, কথাটা সেরে আসি।' জগৎপতি অনুসরণ করলেন। পাছে আবার না চলে আসে। রসভঙ্গ ঘটায়।

গান থেমে গেছে রুচিরার।

'কে?' জিগ্যেস করল অরিন্দম।

যেন দেখতে পায়নি এমনি সরল অনুমানের ভাব করল এণাক্ষী। বললে, 'কোনো মক্কেল-টক্কেল হবে হয়তো।'

তক্ষুনি ফিরে এলেন জগৎপতি। অরিন্দমের কৌতূহলকে নিরুদ্যম করবার জন্যে বললে, 'সমিতির এই একজন মেম্বর। নেক্সট মিটিং-এর ডেটটা ঠিক করতে এসেছিল—'

'এই ভদ্রলোক সেদিনকার জলসাতে র‍্যাকটিং করেছিল না?' অরিন্দম বললে, 'চমৎকার করে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, র‍্যাকটিংটা বেশ শিখেছে।' জগৎপতি টিপ্পনী জুড়লেন।

'এ কি, আপনার গান কী হল!' রুচিরাকে মনে করিয়ে দিল অরিন্দম।

রুচিরা তখন একটা প্লেট নিয়ে পড়েছে। বললে, 'দেখছেন না মুখে খাবার পোরা।' সেই অবস্থাতেই হাসল : 'এখন আর সভা নই, অন্যরকম হয়ে গিয়েছি।'

তারপর কথায়-কথায়, শেষ ক্ষেপে, প্রস্তাব এল, অরিন্দমের নতুন ওয়ার্ক-সাইটে বেড়াতে গেলে কেমন হয়।

'চলুন, আমার গাড়ি আছে।'

জগৎপতি কী করে যাবেন, তাঁর কত কাজ। আর এণাক্ষীর যদি যেতে হয় বাড়ির গাড়িই তো তৈরি। রুচিরার তবে জায়গা হয় কোথায়?

তাই এণাক্ষী বললে রুচিরাকে, 'তুই যা।'

অরিন্দমের উৎসাহে তাতে মন্দ পড়বার কথা নয়, বললে, 'তাই চলুন।'

'মন্দ কী। চলুন।' রুচিরা পা বাড়াল।

'আমরা পরে না হয় একদিন যাব।' পিছন থেকে বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আপনি এমনি ভরেই যাবেন?' একটু কি ইতস্তত করল অরিন্দম?

'না, না, একটু ফিটফাট হয়ে যা।' এণাক্ষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রহার হানলেন।

'যা, কেন, দিব্যি আছি। তখন যে বললেন, আটপৌরে থাকাই অসাধারণ থাকা, স্বভাবে সুন্দর থাকা—'

'ও, বলেছিলাম নাকি? চলুন তাহলে।'

ড্রাইভার নেই, অরিন্দমই হুইল ধরল।। কাজেকাজেই সামনে বসতে হল রুচিরাকে।

জগৎপতি আর এণাক্ষী চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। অনুকূল দেশ পেলে নদী আপনা থেকেই চল নামায়।

'আপনি বেশ ফ্রি—'

'ফ্রি মানে কী?'

'স্বাধীন। সংস্কারমুক্ত। তাই না? দিব্যি চলে এলেন। সাজগোজ প্রসাধনেরও তোয়াক্কা করলেন না—'

'হ্যাঁ, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এলাম।'

'অনুরোধ? কী?'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন?'

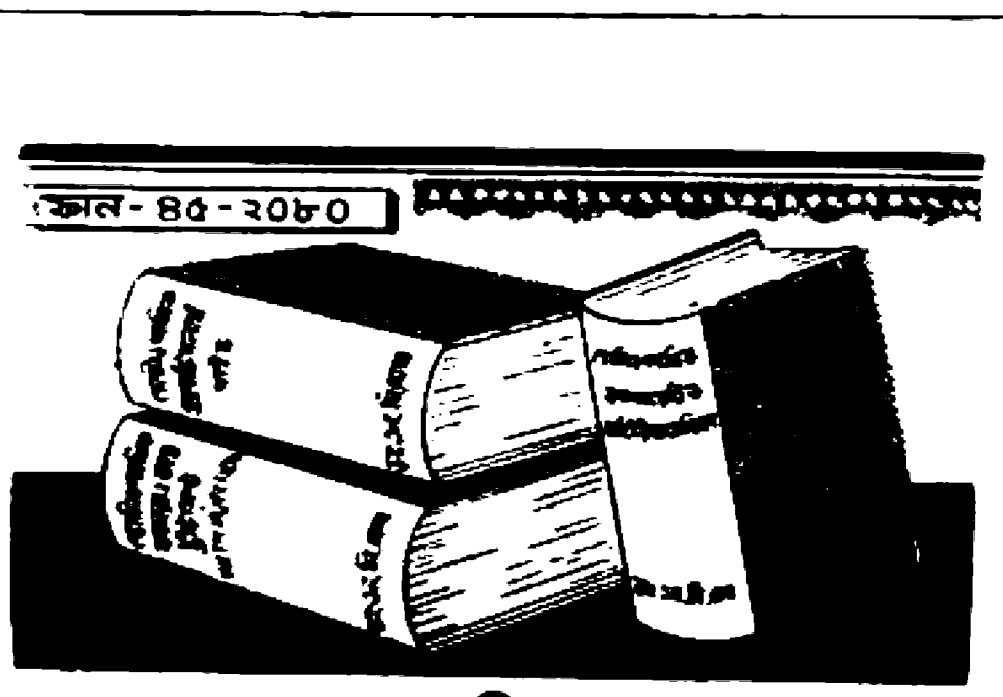

'চাকরি?' অবিশ্বাস্য হেসে উঠল অরিন্দম : 'আপনার চাকরির কী দরকার!'

'দরকার—ঐ যে বললেন ফ্রিডম—তার জন্যে।'

'বাজে কথা।' একটু বুঝি বা গম্ভীর হল অরিন্দম : 'অবাধ্য বাপের ঘরে মেয়ের ফ্রিডম নেই। তার ফ্রিডম স্বামীর সংসারে। আর সেই মনোমত সংসার আপনি তো ইচ্ছে করলেই জুটিয়ে নিতে পারেন। রূপে গুণে অর্থে—'

'রাখুন, আমার মত দীনহীন খুবে কম আছে—'

হাসিতে আবার ফেটে পড়ল অরিন্দম। 'দাঁড়ান, আপনার বাবাকে বলছি।'

'ঐ তো আমার স্বাধীনতার নমুনা।'

'বেশ তো বলব না। আপনার রেজাল্ট বেরুচ্ছে কবে?'

ক-দিন পরেই রেজাল্ট বেরুল।

শুভময়কে ডাকালেন জগৎপতি। বললেন, সমিতি এবার তার জয়েন্ট সেক্রেটারিকে একটা সম্বর্ধনা দিক। খুব ভালো কথা, সব এক তন্ত্রীতে শিহরিত হবে। হ্যাঁ, সেই উপলক্ষে আমি একটা স্টিমার পার্টি অ্যারেঞ্জ করছি। সব খরচ আমার। ভীষণ আনন্দের কথা। তোমার সমিতির তরফ থেকে একটা জলসা বসাও। যিনি পাশ করেছেন, যাঁর জন্য সংবর্ধনা, তিনি নাচবেন-গাইবেন তো? হ্যাঁ, বিশিষ্ট কজন অতিথি-অভ্যাগত নিমন্ত্রণ করব, তাঁদের খাতিরে রুচিরাকেও নামতে হবে আসরে। লেগে যাও জোগাড়যন্ত্রে। ঢোল পিটিয়ে দাও।

স্টিমার পার্টিটা জমল না।

আর সবই হল, রুচিরা নাচল তো না-ই, গানও গাইল না। কত পাহাড়-গলানো অনুরোধ, টলল না রুচিরা। বলল, নিদারুণ মাথা ধরে আছে, মন-মেজাজ তিরিক্ষি।

সর্বক্ষণই দেখছে সম্ভ্রান্তের দল থেকে অসম্ভ্রান্তের দলকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। যদি খাবার কিছু কম পড়ছে সে ঐ অসম্ভ্রান্তদের পাতে। চা-সিগারেট যত বার খুশি সম্ভ্রান্তরাই পাবে, অসম্ভ্রান্তরা সকলেই পেয়ালা-পিরিচ আশা কোরো না, রুমাল দিয়ে ধরে খুরি করে খাও।

আর জগৎপতি শুভময়কে এমনভাবে খাটাচ্ছেন যেন খিদমদগারিই তার পেশা।

অথচ এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। খাটছে না তো, প্রাণের স্বাস্থ্যে চারদিকে উথলে পড়ছে।

রুচিরার মনে হয় ভদ্রতার অবশেষ জামাটাই বা শুভময় গায়ে রেখেছে কেন? রীতিমত রিক্সায় মজদুর হয়ে যাক। ওদের শালীনতাকে চুন্ত-বান্ত করুক।

'নতুন তাশটাও ওদের দেবেন নাকি?' রুচিরা আপত্তি করল।

'ওরা অতিথি।'

'ওরা সবাই সমিতির মেম্বর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিথি-অতিথি নেই, সবাই সমান, নো ডিসক্রিমিনেশান—'

'ওদের দিচ্ছি ওদের কিছু অধিকার আছে বলে নয়, ওদের প্রতি কৃপা ক'রে।'

ওদের দিকে

অরিন্দম বাড়িতে এসে গিয়েছে, তার পরে কণাদকে ডাকা হবে। আর ঐ বুঝি নতুন ব্যারিস্টার পল্লব বাগচি। কণাদের পর চারে পল্লব আসবে। আর পল্লবের পাশে তিলক বিশ্বাস, কোন এক সদাগরী ফার্মের অফিসর। পল্লবের পরে হবে তিলকের নিমন্ত্রণ।

কোন অরণ্যে গেলে এসব দ্বিপদের থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়?

ফিরতি পথে বাস-এ আসতে-আসতে রুচিরা শুভময়কে বললে, 'ওদের প্রতি আপনি যেমন কৃপা দেখাচ্ছেন, শেষকালে ওরা না সমিতি ক্যাপচার করে বসে!'

শুভময় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

'সমিতির 'টেরিটরি' কতটা হবে কিছুই বলা নেই।' রুচিরা মুখচোখ আবার চিন্তিত করল : 'তাই যে কোনো ওয়ার্ডের লোক এসে ভিড় জমাতে পারে। আমাদের পাড়াকে দিতে পারে ডুবিয়ে।'

বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় শুভময়। বাস থেকে নেমে যাবার সময় হাসিমুখে বললে, 'যতক্ষণ আমি-আপনি একত্র আছি কারু সাধ্যি নেই আমাদের হটাতে পারে।'

৭

শুভময় আর রুচিরা একত্র হয়ে কাজে বেরুল।

কথাটা জগৎপতির কাছে চাপা থাকল না। রুচিরাকে ডেকে জিগগেস করলেন : 'তোরা নাকি বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরছিস?'

অস্বীকার করবার কী আছে? নাইট স্কুল খুললে শ্রমিকদের মধ্য থেকে কত নম্বর ছাত্র পাওয়া যাবে তারই একটা হিসেব নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। স্কুল খুলতে এখনো অনেক দেরি।

'তা হোক। তাতে তোর কেন মাথাব্যথা?'

সমিতির খাতায় আছে, জগৎপতির সইয়ের উপরে, বস্তিতে বস্তিতে নাইট স্কুল খোলার কথা। যদি সে সন্ধানে সেক্রেটারিকে যেতে হয় রুচিরাকেও জয়েন্ট হিসেবে সঙ্গী না হয়ে উপায় কী।

'ও বস্তির লোক, ও থাক বস্তিতে। তুই না।' হুঙ্কার ছাড়লেন জগৎপতি।

'বস্তিই তো শক্তির স্বরূপ। তোমার ভোটের সারনাথ।'

'আমি সমস্ত ভেট পয়সা দিয়ে কিনে নেব। নাইট স্কুল-টুল সব কায়দার কথা, নইলে আমি বস্তিতে গোপনে আগুন লাগিয়ে নিয়ে পরে প্রত্যক্ষ লরিবোঝাই রিলিফ নিয়ে যাব, লুটে নেব সমস্ত ভেট। তার জন্যে তোকে এ নোংরার রাজ্যে গিয়ে দালালি করতে হবে না।'

শুভময়কে ডাকলেন জগৎপতি।

'শোনো, ওসব বস্তি-টস্তিতে তুমি রুচিরাকে সঙ্গে নিও না।'

যে আজ্ঞে, এই রকমই একটা উত্তরই জগৎপতি আশা করেছিলেন, কিন্তু শুভময় একটা অন্যরকম সুর বার করল। বললে, 'আমি কি আর নিই! উনি নিজের থেকেই আসেন!'

'ও একা-একা যায়, তার তুমি কী করবে!' জগৎপতি অন্যদিকে তাকালেন : 'কিন্তু তোমরা একসঙ্গে গেলে কী রকম যেন দেখায়!' কথাটা কঠিন হয়ে গেল টের পেয়ে একটু বা পরিহাসের আমেজ আনলেন : 'পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সূর্পনখা আর পুরুষেরা খরদূষণ।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শুভময়। তার মানে তার সঙ্গটা বরণীয় নয়। সে নিচুতলার লোক। সে অকুলীন।

কিন্তু কথাটা শুভময় সুন্দর ঘুরিয়ে নিল। বললে, 'হ্যাঁ, তা মিথ্যে নয়। শত হলেও মিস চ্যাটার্জির রেপুটেশানটা দেখতে হয়। তবে, উনি রিলিফে যান আর না যান, মেয়েরা মেয়ের নিন্দ করবেই।'

'তা করুক। অপযশ শত ধুলেও তার মলিনা যাবে না। শত লেখাপড়া সত্ত্বেও মেয়ে মেয়েই থেকে যাবে।'

'তা হলে এক কাজ করুন। ও'কে ক্লাবটাই ছেড়ে দিতে বলুন।' আর পরম হিতৈষীর মত মুখ করে বললে, 'আর একটা ওকে গাড়ি কিনে দিন।'

তা হলে বোধহয় এ'র সুবিধে হয়! কিন্তু তেমন কোনো ত্রুটি না করে জগৎপতি সরল মুখে বললেন, 'কই গাড়ির কথা তো কিছু বলছে না।'

'গাড়ি হলেই আর ওসব গলি-ঘুঁজিতে ঢুকতে পারবেন না। আপনা থেকেই রিলিফের থেকে মুখ সরিয়ে নেবেন।'

'সে চেষ্টা আমি দেখছি। এদিকে তুমি—'

'নইলে ক্লাবের থেকে নাম কাটিয়ে নিন।'

'সে ভারি ড্রাস্টিক হবে। শুধু তুমি যদি ওকে একটু পাত্তা কম দাও, সমীহ কম করো, এড়িয়ে চলো—'

'এত বড় একজন গুণী শিল্পী—' প্রশংসার কথাটা কী ভাবে বলবে বুঝতে পারল না শুভময়।

'কিন্তু সেইসঙ্গে ও যে আবার ধনী—বড়লোকের মেয়ে। কারু কারু মতে শুধু বড়লোক হওয়াটাই তো একটা অপরাধ। ওকে যদি সেই বড়লোক হওয়ার দরুন খোঁটা দাও, ঠাট্টা করো, যদি ওর আন্তরিকতায় সন্দেহ দেখাও—'

'বড়লোক!' কী রকম অদ্ভুত চোখে তাকাল শুভময়।

'তাছাড়া আবার কী। বড়লোকের মেয়ে তো বটে।' জগৎপতির উর্বশি-গলায় এতটুকু আটকাল না : 'আর বড়লোক মানেই তো স্বার্থান্বেষী। এসব বলে ওকে টিটকিরি দেবে। ওকেই বা তোমরা রেহাই দেবে কেন? ওর এই রিলিফের ভাবটা যে একটা স্টান্ট মাত্র সেটাই বা দেবে না কেন বুঝতে?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।' সুন্দর ঘাড় হেলাল শুভময় : 'মানে, ও'কে বোঝাব ও'র সত্যিকার অবস্থা—মানে ও'র সামাজিক অবস্থা—'

'হ্যাঁ, তুমিই পারবে।' জগৎপতি দিব্যি শুভময়ের কাঁধে হাত রাখলেন, দিব্যি হাসলেন : 'আমার-তোমার ভবিষ্যৎ থাক বা না থাক, ওর তো আছে। তুমি তো সেটা বোঝো—'

'কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।' কাঁধ থেকে হাতটা খসিয়ে দিল শুভময়। বললে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি। 'আর তোমাদের সেই হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির জন্যে টাকা চাই বলছিলে—'

'সে আরেকদিন হবেখন।' দ্রুত বেরিয়ে গেল শুভময়।

তারপর যথারীতি কথার গুহের চারে নেমন্তন্ন হল। রুচিরা বললে, 'আমার কজন বন্ধুকে ডাকি।'

'তোর আবার বন্ধু কে?' এণাক্ষী ফোঁস করে উঠল।

'যা, জয়শ্রী, প্রাবনী, নিবেদিতা—'

'সর্বনাশ!' প্রায় পথে-বসার মত মুখ করল এণাক্ষী।

'শুধু মেয়েদের নাম করলাম, তাইতেই সর্বনাশ?'

'শেষকালে ওদের কাউকে পছন্দ করে বসুক।' এণাক্ষী হাসফাস করে উঠল।

'না, এতে বাইরের লোকের পাট নেই। এটা কোনো জলসা বা স্টিমার-পার্টি নয়।'

ওপাশ থেকে বলে উঠলেন জগৎপতি : 'এটা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, কনফিডেনশিয়াল—'

ক্লাবে নয়, একেবারে শুভময়ের বাড়িতে গিয়ে পাকড়াও করল রুচিরা।

'কী আশ্চর্য, আপনি এখানে কেন? সমিতিতেই তো দেখা হতে পারত। কিংবা ওখানে কাউকে খবর দিলেই তো—'

'না, না, ব্যাপারটা ঘরোয়া আর কনফিডেনশিয়াল—'

'সেটা মন্দ নয়।' শুভময় হাসল : 'কিন্তু এখানে, এ বাড়িতে আপনাকে আমি বসাই কোথায়?'

বাড়িটার দিকে নিজেরও অলক্ষ্যে তাকাল রুচিরা। বললে, 'না, বাড়ি লাগবে না, বসতে আসিনি। আপাতত পথে নেমে এলেই চলবে।'

'সে তো খুব আইডিয়াল অবস্থা।' রোয়াক থেকে পথেই নেবে এল শুভময়। 'বলুন কী করতে হবে?'

'পর্শু বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়িতে আপনার চা-খাবার নেমন্তন্ন।'

'চা খেতে হবে?' হতাশের মত চেহারা করল শুভময় : 'মোটে এইটুকু? আমি ভেবেছিলাম বুঝি লাফ দিয়ে সমুদ্র পেরোতে বলবেন।'

'সে তো কনস্ট্রাকটিভ কিছু হল।' রুচিরা ধারালো চোখে হাসল : 'আমি ডাকব আপনাকে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দিতে। তার মানে, ঠিক চা খেতে নয়, চায়ের আসরটা ভণ্ডুল করে দিতে।'

উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল শুভময়। বললে, 'আমি পণ্ড করতে ভণ্ডুল করতে ওস্তাদ। কিন্তু ব্যাপার কী?'

ব্যাপারটা বললে রুচিরা। বললে, 'ভাব দেখাবেন, আপনাকে কেউ ডাকেনি, আপনি নিজের থেকেই এসেছেন। আর যদি একবার এসেছেন, মাঝপথে আপনি চলে যেতে প্রস্তুত নন। আপনি উঠবেন না, নড়বেন না, ঐ লোকটাকে কিছুতেই দেবেন না নিভৃত হতে।'

'মাত্র এইটুকু? জিনিসপত্র কাপ-গ্লাস কিছু ভাঙতে-টাঙতে হবে না?'

'না, দরকার হবে না। শুধু জীবনের কৃত্রিম শালীনতার উপর একটা উপহাসের মত উপস্থিত থাকবেন।'

'খুব পারব। আপনার জন্যে সব পারব।' খোলা বুকে একবার বুঝি বা হাত রাখল শুভময়।

'জানি পারবেন। তারপরে আরো লোক আসবে—তিলক আসবে, পল্লব আসবে, তাদেরও ঠেকাবেন।'

'কিছু ভাববেন না।' শুভময়ের কপালের কাছেকার কটা কালো চুলের গুচ্ছি হাওয়ায় দুলে উঠল। 'মিলিটারিকেই ঠেকিয়েছি, আর এ তো তুল-পল্লব!'

শনিবার, বিকেল চারটের কথাকে নিয়ে আসর প্রায় সরগরম হয়ে উঠছে এমনি সময় পর্দা সরিয়ে হঠাৎ শুভময় ঘরে ঢুকল। আজকের জামা কাপড় সচরাচরের চেয়েও ম্লান, স্যাণ্ডেলের একটা স্ট্র্যাপ বোধহয় খানিক আগেই ছিঁড়ে গিয়েছে। হুল্লোড়ের মত করে বললে, 'বাঃ, এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। চমৎকার।' মুহূর্তমাত্র দেরি বা দ্বিধা না করে একেবারে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল : 'শেনপাপড়ি? এ আমার খুব প্রিয়।' বলেই বলা-কওয়া নেই একটা তুলে মুখে পুরল।

সর্বশরীরে জ্বলে উঠল এণাক্ষী। 'এ অসময়ে তুমি কোত্থেকে?'

'দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে।' গুঁড়ো গুঁড়ো পাপড়ি ফেলতে-ফেলতে শুভময় বললে।

'ও! তোমার সেই ডিসপেনসারির চাঁদাটা বুঝি?' জগৎপতি উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। 'এসো। পাশের ঘরে এসো।'

'চাঁদা পরে হবে। আগে এই উপস্থিতকে সারি।' সন্দেশের স্তূপের দিকে হাত বাড়াল শুভময় : 'আজ আর মক্কেল সেজে কেটে পড়তে রাজি নই।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রুচিরা। বললে, 'বসুন। এই নিন স্যান্ডউইচ নিন।' আর লোক পেল না, প্লেটটা শুভময়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরল।

'মিষ্টিতেই আমার বেশি লোভ।' প্রায় বর্বরের মতই দাঁত দেখাল শুভময়। 'এখনো অনভ্যাস আছি। দাঁত এখনো ভালো আছে।'

এণাক্ষীও দাঁত দেখাল। স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও না। বাইরের লোকের সামনে মিস্টার গুহ আড়ষ্ট বোধ করছেন।'

'করছেন?' জিগগেস করল শুভময়।

'না, না, সে কী কথা?' লাজুক ভঙ্গি করল কথার : 'আড়ষ্ট হতে যাব কেন? তা ছাড়া ও'কে তো চিনি। সেদিন আলাপ হল স্টিমারে—'

'বলুন আমাকে তাহলে বাইরের লোক বলা যায়?' কথাদেবীকেই সালিশ মানল শুভময়।

'কিন্তু এ অকেশনে উনি তো

ইনভাইটেড নন।' এণাক্ষী যন্ত্রণা আর পারল না লুকোতে।

এবার এণাক্ষীর কাছেই শুভময় পেশ করল। 'সংসারে কে ইনভাইটেড? আর এত যেখানে ভোগ্যবস্তু, যে যা পাচ্ছে সে তাই লুফে নিচ্ছে, কেড়ে খাচ্ছে।'

'প্যাটিস নিন।' রুচিরা শুভময়কেই সাধল। তারপর কণাদের দিকে ফিরে : 'আপনি?'

'না, আমি উঠি।'

কাজে কাজেই। কমল না এতটুকু। না গান না বাজনা না বা একটু রসালাপ। গাড়ি কণাদও একটা জোগাড় করেছিল কিন্তু বৃথাই সেটাকে নিতে হল ফিরিয়ে।

রুচিরা শুভময়কে লক্ষ্য করে বললে, 'যদি চান তো মিস্টার গুহ লিফট দিতে পারেন আপনাকে।'

কোনো পক্ষ থেকে কোনো চঞ্চলতা ফোটবার আগেই জগৎপতি গর্জন করে উঠলেন : 'না।' পরে তাকালেন শুভময়ের দিকে : 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

শুভময় থামল। কণাদ চলে গেল একা-একা।

ঘরে এক পিণ্ড ঠাণ্ডা লোহার মত স্তব্ধতা।

জগৎপতি দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। এক পা এগোলেন শুভময়ের দিকে। বললেন, 'শোনো। তুমি আর আমার বাড়িতে এস না।'

'আসব না?'

'না, কখনো না। এলেও বাইরের বৈঠকখানা পর্যন্ত। অন্তঃপুরে নয়। অভিজাত পরিবারের ভেতরের লোকেদের সঙ্গে মিশতে তুমি উপযুক্ত নও।'

রুচিরা ভাবছিল এর পরে, আচ্ছা, আসি, বলে সোজা চলে যাবে শুভময়। তা নয়, সাফাই গাইবার চেষ্টা করল। 'আমার এইভাবে এসে পড়াটা খুব অন্যায় হয়েছে, তাই না?'

'ঘোরতর অন্যায়।' জগৎপতি রুষ্ট ভঙ্গিটা একটুকু শিথিল করলেন না। 'তোমার ব্যবহারে মিস্টার গুহ রীতিমত অপমানিত বোধ করেছেন। বুঝে নিয়েছেন কোন স্তরের জীবেদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা। রুচিরা কোন সমিতির সেক্রেটারি।'

'সে তো আগেই বুঝেছেন সেই স্টিমারে।'

'না, আজকে একটি বিশেষ বোঝা-পড়ার জন্যে এসেছিলেন। এসেছিলেন রুচিরাকে পছন্দ করতে। কিন্তু তোমার অসৌজন্য আর অভদ্রতায় হয়েছে!'

'সে কী কথা! আমি এখুনি ভদ্রলোককে ধরে আনছি।' শুভময় ভঙ্গিতে ছোটবার উদ্যোগ দেখাল : 'দেখি কেমন সে পছন্দ না করে! বাঁচান তো আমায় করে নিচ্ছি ডকুমেণ্ট।'

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা। যেন এক পক্ষের পছন্দেই হবে!

'না। তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ দেখ গে যাও।' জগৎপতি একেবারে চূড়ান্ত দাঁড়ি টানলেন।

শুভময় এণাক্ষীর দিকে এগোল। বললে, 'আপনার সেই ফুলগাছের কথা বলেছিলেন—' কী যে ফুলটার নাম নিজেই মনে করতে পারল না।

'না, দরকার নেই।' মুখের দিকে চেয়েও দেখল না এণাক্ষী।

'আর সেই হাতির দাঁতের জিনিস চেয়েছিলেন—'

'দরকার নেই। তুমি আর এস না।'

'আসবই না?'

'না। তোমরা-আমরা দুই সমাজের লোক। তেলে-জলে মিশ খায় না কিছুতেই।'

চলে গেল শুভময়।

তারপর কিছুকাল জগৎপতি অনন্য-স্মরণ হয়ে প্র্যাকটিসেই ডুবে রইলেন। তাঁর চটক ভাঙল যখন একদিন রুচিরা ধীরপায়ে কাছে এসে শান্তস্বরে বললে, 'আমি একটা মেয়ে-ইস্কুলে চাকরি পেয়েছি।'

'পেয়েছ—নাওনি তো এখনো?'

'নিয়েছি। কাল জয়েনিং ডেট।'

'কত মাইনে?'

'মাইনে সামান্য।'

'তোমার ঐ কটা টাকার মর্মান্তিক দরকার?'

'দরকার টাকার নয়, দরকার স্বাধীনতার?'

'স্বাধীনতার?'

'হ্যাঁ, তার চেয়ে বড় জিনিস কিছু হতে নেই সংসারে।'

'একটা গরিব মাস্টারি নেওয়াই যদি তোমার স্বাধীনতার নমুনা হয় তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।'

'বা, তা কেন?'

'তা নইলে ছোট কাজ করে আমার অভিজাতের সম্মান তুমি ক্ষুণ্ণ করতে পারো না।'

'মাইনে কম বলেই তো কাজটা ছোট?'

'তা ছাড়া আর কী?'

'কিন্তু কাজটা যদি বড় হত, মানে মাইনে যদি বেশি হত!'

'তা হলেও দেখতে হত কাজটা মানের কিনা, কাজটা কোথায়, কী ধরনের—'

'এইখানেই স্বাধীনতা।'

'নয় তো আমার বাড়িতে থাকবে আর আমারই সম্মান নস্যাৎ করবে এ হয়

মাতৃপূজায় প্রমোদ ভ্রমণ

॥ মধুর ও সার্থক করে তুলতে ॥
কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী
● প্রেসার কুকার ● প্রভাকর স্টোভ
● পরিধান স্লেট - গ্লাস - বাটী
মগ ও ব্রেড বক্স ● রাজজাগ
—পরিবেশনায়—

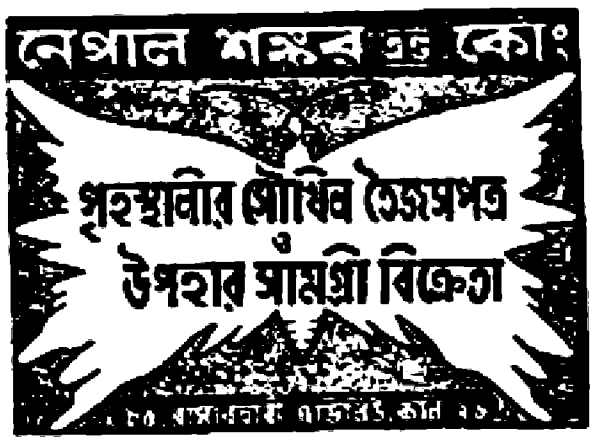

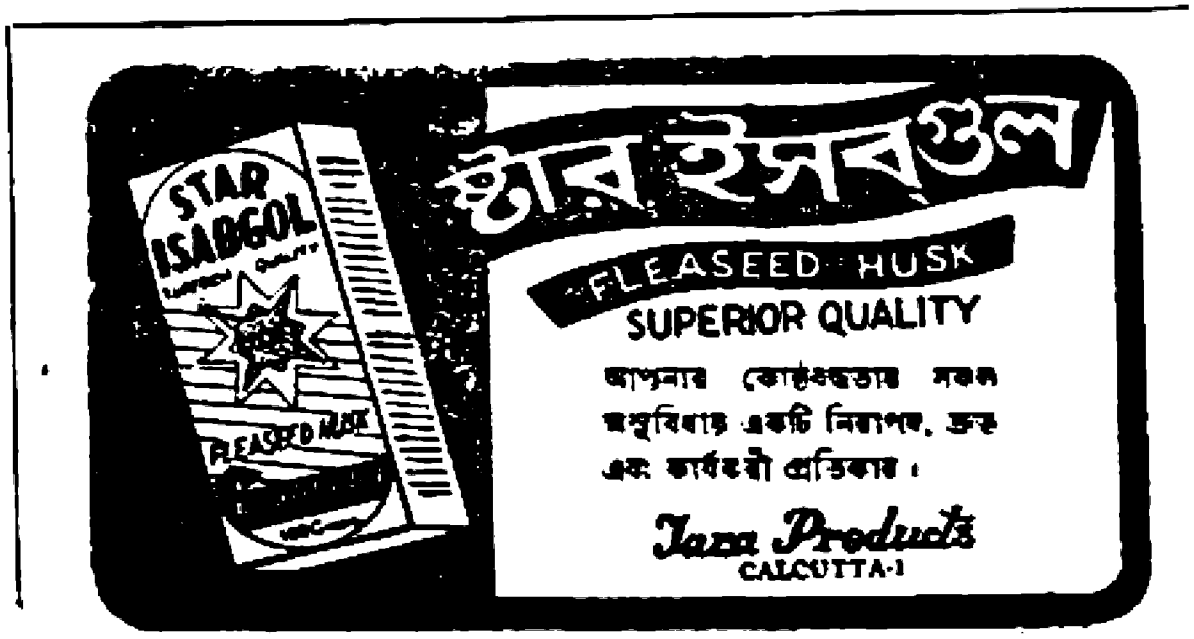

না, কোনোক্রমেই না। আমার হাড় ছাড়ো, ইচ্ছেমত স্বাধীনতা ফলাও, কিন্তু বলতে আসব না। দেখবও না তাকিয়ে। না, নেই, অমন অন্ধ স্নেহ নেই আমার।' শেষের কথাটায় যেন বেশি জোর দিয়ে ফেললেন জগৎপতি।

রুচিরা মনে-মনে হাসল। অমন বোকা আবেগও তার নেই যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে নিজের থেকে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দিয়ে অকূলে ভাসবে। বাবা যদি দেনও তাড়িয়ে কদিন বাদেই কোল না আবার ডেকে নেবেন বুকে তুলে।

এ সব ইতিহাসের চেয়েও পুরোনো।

চাকরিতে ফেল না রুচিরা। এক চাকরি যায় আরেক চাকরি হবে।

'তুই সেদিন বড় চাকরির কথা বলছিলি না?' জগৎপতি সেদিন বললেন, 'একটা জোগাড় করেছি তোর জন্যে।'

'মাইনে কত?' উৎসাহ যেন এণাক্ষীরই বেশি।

'দেড় হাজার।'

'দেড় হাজার! পনেরো শো। একটা মেয়ের মাইনে পনেরো শো'

'মেয়ের নয়, মেয়ের স্বামীর। অরিন্দমের। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অরিন্দম রাজি আছে। কী বল?' রুচিরার চোখে চোখ ফেললেন জগৎপতি: 'ওর বাবা যখন বেঁচে, তখন তাঁর কাছে গিয়ে সম্বন্ধটা উত্থাপন করি।'

জেরায় প্রশ্ন করে মনোমত উত্তর পাবারই আশা করার অভ্যস্ত জগৎপতি। এ ক্ষেত্রেও আশা করেছিলেন রুচিরা বলবে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। কিন্তু বেয়াড়া সাক্ষীর মত হঠাৎ বলে বসল, 'আমার সম্বন্ধ ঠিক আছে।' —

'ঠিক আছে মানে? কাকে বিয়ে করবি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'জিগগেস কোরো না। জানতে চেও না।'

'মানে ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা?'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'কে, নাম বল, কণ্ঠস্বর চাপতে চাইলেও পারছেন না: 'শুভময় ঘোষ?'

'হ্যাঁ।' রুচিরা নিটোল গলায় বললে।

'ওটা তো বেজাত, জাতছাড়া।'

'মানে ঘোষ বলে?' নয় থাকবারই চেষ্টা করল রুচিরা। 'ও সব কায়েত-বামুন তো কোনোদিন মানতে না।'

'এখনো মানি না। ও সব নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কিন্তু ও ছাড়া আরো এক জাতিভেদ আছে।'

'সে আবার কী?'

'বড়লোক আর ছোটলোক।'

'ছোটলোক? গরিব বলেই ছোট-লোক?' যেন একটা রুদ্ধ আর্তি রুচিরার বুক থেকে বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, গরিব বলে।'

'তুমিও এককালে গরিব ছিলে বাবা।'

'যখন ছিলাম তখন ছিলাম। তখন তুই আদালতের একটা পিওনকে বিয়ে করতিস কিছু বলতে আসতাম না। কিন্তু এখন—' সাজানো ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলেন জগৎপতি: 'এখন জাতে উঠে জাত খোয়াতে পারব না আমি কিছুতেই। না, কিছুতেই না। আমার মেয়ের বিয়েতে হাইকোর্টের জজেরা আসবে না এ অসম্ভব।'

অপমানে স্তব্ধ হয়ে রইল রুচিরা।

এণাক্ষী এতক্ষণে মুখ খুলল। এতক্ষণ এমন একখানা ভাব করেছিল যেন একবর্ণও তার হৃদয়ঙ্গম হয়নি। কিন্তু এখন, ঘর হঠাৎ নীরব হয়ে যেতেই সমস্ত প্রাঞ্জল হয়ে উঠল নিমেষে। 'এ সব কী বলছিস তুই?' কণ্ঠস্বরে প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা: 'ঐ গুণ্ডাটাকে বিয়ে করবি?'

রুচিরার মুখে কথা নেই।

'ঐ চাকরটাকে? যে সর্বক্ষণ লোকের ফাইফরমাস খাটে? বাজার করে? পানের দোকান থেকে পান কিনে আনে? বিড়ি খায়?' ঘৃণায় কিলবিল করতে লাগল এণাক্ষী।

আর যেন কিছু বলবার নেই, কাটা-কুটি করবার নেই, তেমনি বসে রইল রুচিরা।

'তোর রুচিকে বলিহারি! ওটা তোর চেয়েও কম লেখাপড়া জানে। আর মাইনে পায় কত? আমরা আমাদের ড্রাইভারটাকে যা দিই তার চেয়েও কম। ও তো একটা ভোলানটিয়ার।'

সূর্য পূব দিক ছাড়তে পারে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ছাড়ব না তেমনি যেন ভাঙল রুচিরার।

'এ বিয়ে যদি হয় তা হলে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব মাটিতে।'

জগৎপতি ও সব অতিশয্যে গেলেন না, যান্ত্রিবকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: 'ও তোর ভরণপোষণ করবে কী করে?'

রুচিরা চুপ।

'ও তো ওর কাকার বাসায় এক চিলতে এক ফালির মধ্যে থাকে, ও তোকে রাখবে কোথায়? আলাদা একটা বাসা ভাড়া নেবারও তো ওর সঙ্গতি নেই। কি, কী হবে ভবিষ্যতে? ভেবেছিস কিছু?'

রুচিরা হাসল একটু রুচিরা। বললে, 'ও সব এখনো কিছু চূড়ান্ত ভাবিনি।'

'ওগো সেই মিলিটারিটা সেদিন এই বুক-খোলা নচ্ছারটাকে গুলি করল না কেন? স্টেটবাস এত লোককে চাপা দেয়, ওকে কেন ছাড়া রেখেছে? পুলিশ এত রকবাজ গোলন্দাজকে ধরে ওকে কেন এখনো ধরেনি? শোন,' এণাক্ষী বিপুল বিক্রমে ঘোষণা করল: 'যে করে পারো ঠেকাও এই বিয়ে। ভেঙে দাও, ভেস্তে দাও।'

সুতরাং ভাবতে দাও। মাথা গরম করে শুধু হৈ-চৈ করলে অপর-পক্ষের জেদ বাড়ে। উৎপীড়ন করতে গেলে মরীয়া হয়ে ওঠে। চুপচাপ বসো পাশটিতে। বুঝি দাও।

কিসের কী বুঝি। সমানে চেঁচাচ্ছে এণাক্ষী: 'অরিন্দমকে ডাকো। ওর হাতে যত শিগগির পারো দিয়ে দাও গছিয়ে।'

আর রুচিরা মনে-মনে স্থির করছে এ বিয়েকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতেই হবে। গরিব বলে যাতে আর প্রত্যাখান চলবে না। চলবে না। শুভময় যাই হোক, যেমনতরোই হোক, তারই হাতে অনিবার্য হবে সমর্পণ।

৮

শুভময় যে ফার্মে কাজ করে তার কর্তা অনাদি ঘোষালের সঙ্গে মত করলেন জগৎপতি। প্রাথমিক টাকাটা জগৎপতিই দাদন করলেন, অনাদি ভাব দেখাল কোম্পানিই খরচ দিচ্ছে। তবে যাও দু বছরের ট্রেনিংএ চলে যাও বিলেত।

উত্তুঙ্গতম শৃঙ্গেরও বাইরে এই কল্পনা। কালো একটা আগুনের শিখার মত লেলিহান হয়ে উঠল শুভময়।

'টাকার জন্যে ভেবো না। আমিই তোমার গ্যারেন্টার থাকব।' জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'কোম্পানি না দেয় টাকা আমি দেব। তুমি যাও, মানুষ হয়ে এস।'

উৎসাহে জ্বলতে লাগল শুভময়। পারলে এখুনি সে ছুট দেয়, পাল তোলে, পাখা মেলে আকাশে। বললে, 'আমার কত দিনের স্বপ্ন। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কিছু ভাবি না। একবার ঝাঁপ দিতে পারলেই হল—ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে কথা—ঝাঁপ দিতে পারলে পায়ের নিচে মাটি পাবই। হয় দাঁড়াবার নয় পড়বার। টাকা কত দিক থেকে আসবে, নয়তো ছিনিয়ে নেব গায়ের জোরে।'

পিঠ চাপড়ালেন জগৎপতি: 'এত বড় একটা উচ্চাশা পরিপূর্ণতার অবকাশ

পারবে না এ অসহ্য। তাই তোমার ফার্মকে ধরে এই সুযোগটা করে নিলাম।'

'আর ষ্টোনিং কমপ্লিট করে এই ফার্মেই ফের ফিরে আসবে এই আমরা আশা করব।' বললেন অনাদি ঘোষাল। 'ওড সই করে সেবে সেই মর্মে।'

'তা সেবে বইকি।' গম্ভীরমুখে বললেন জগৎপতি, 'তবে যদি নিজের স্বার্থেও ওর চেয়েও ভালো চান্স কোথাও পাও, কোম্পানি তাতে বাদ সাধবে না।'

'নিশ্চয়ই নয়।' সায় দিল অনাদি : 'শুধু ফার্মের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেই হবে।'

'তার জন্যে আমি আছি।' টেবলে কিল মারলেন জগৎপতি : 'আর ইতি-মধ্যে ফার্মের অবস্থা যদি খারাপ হয়, ফার্ম ব্যাক-আউট করে, তাহলেও ভাবনার কিছু নেই।'

'আমি কিছুমাত্র ভাবি না, কোনো অবস্থাতেই না।' হাসতে লাগল শুভময়।

'তখনও আমিই আছি। সব সময়েই আছি। কোনো মামলা নিলে শেষ পর্যন্ত আমি না জিতে ছাড়ি না।'

কী ইঙ্গিত পেয়ে অনাদি চলে গেল ঘর ছেড়ে, শুভময়ের সঙ্গে জগৎপতি নিভৃত হলেন। অনাদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে, দেখবেন কেউ যেন না ঢোকে, দেয়ালে না কান পাতে।'

'ঠিক আছে।' ওপার থেকে বেরিয়ে এল কি। যেন নিজেই সে পাহারায় নিচ্ছে এমনি আশ্বাস তার স্বরে।

'বোসো।' কণ্ঠে মধু ঢেলে বললেন জগৎপতি।

মুখোমুখি বসল শুভময়।

'তোমাকে মানুষ হবার এত বড় একটা চান্স দিচ্ছি কেন বুঝতে পারছ?' জগৎপতি শুভময়ের চোখের মধ্যে তাকালেন।

বুঝতে পারছে এমনি বিনয়কমনীয় ভঙ্গি করল শুভময়।

'বলতে তুমি হয়তো মনে মনে হাসতে পারো। সমাজের উঁচু মহলে উঠে আসতে পারো সহজে।'

যেন বুকের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেল শুভময়। কিন্তু নিবিড় হাসি মুখে। বলল, 'তা তো ঠিকই।'

'তাই, ওয়ার্নার্স পেয়ে বড় হওয়া কেউ কোনো কালের কথা নয়।'

'না, না, সব সময়ে নিজের জোরে বড় হওয়া।' অনাদা হাত মুঠ করল শুভময়।

'প্রত্যেক ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থ বলে একটা জিনিস থাকে—কী ফলো, থাকে কিনা?'

'নিশ্চয়ই থাকে।'

'থাকা উচিত। নইলে ভালোবাসা টেকসই হয় না। তারই জন্যে ধন-মানে মজবুত হওয়া দরকার। তারই জন্যে তোমাকে বিলেত পাঠানো।'

এ সবও ছোটখাটো প্রহার, কিন্তু হাসিমুখে সব সহ্য করল শুভময়।

'তারপর, শোনো।' আরো একটু এগিয়ে এলেন জগৎপতি, কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করলেন : 'শুধু একটা সর্ত আছে, সর্তটা কঠিন।'

কঠিন বলে সংসারে কিছুই নেই এমনি উড়িয়ে দেবার হাসি হাসল শুভময় : বলুন।

'তুমি যে ঘরে এ কথা দ্বিতীয়কে আউটে বলতে পারবে না। যেন জন্তুত দুটিকা না জানতে পারে।'

প্রথমটা শুভময় একটু ঘাবড়ে যা

হকচকিয়ে গেল। শুকিয়ে গেল মুখ-চোখ। কথা বেরুল না।

জগৎপতি বললেন, 'রুচিরা যদি জানতে পারে তাহলে বিপদ আছে। বুঝতে পাচ্ছ?'

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে শুভময়। নিজেরও অলক্ষ্যে ঠোঁট দিয়ে একবার জিভ চাটল। বললে, 'বুঝতে পাচ্ছি। জানতে পারলে ও বাধা দেবে।'

'হ্যাঁ, রব তুলবে, বিয়ে করে তবে যাও, কিংবা নিজেই যাবার জন্যে, সঙ্গী হবার জন্যে হৈ-চৈ করবে। তার মানেই—বুঝতে পাচ্ছ—'

'তার মানেই যাওয়া বন্ধ।' ফাঁকা গলায় হাসির আওয়াজ তুলল শুভময়।

'মানুষ হবার বিরাট একটা সম্ভাবনার মুলোচ্ছেদ।' একটু বা দার্শনিক হলেন জগৎপতি : 'জীবনে বড় হতে হলে নিষ্ঠুরও হতে হয় মাঝে মাঝে।'

'যা, এ নিষ্ঠুরতা কোথায়?' জগৎপতির জীবনদর্শনে ভাষা জোগাল শুভময় : 'সব শুরুই শেষের জন্যে। আর যেখানে শেষ ভালো সেখানে সব ভালো।' একটু বুঝি বা জগৎপতিকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল : 'তাছাড়া দু বছর কতটুকুই বা সময়। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'হ্যাঁ, আড়ালে থেকে তোমারও রুচিরাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, তার ভালোবাসা খাঁটি কিনা, দু বছর তোমার জন্যে ঠিক সে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারে কিনা, না, সবটাই তার মোহ, বড়লোকের মেয়ের খামখেয়াল।' জগৎপতি যেন শুভময়ের কত বড় বন্ধু, অভিজ্ঞ হিতৈষী, ডিফেন্সের উকিল—এমনি উদার ভাব করলেন।

'নিশ্চয়, পরীক্ষা দরকার।' সং হতে চাইল শুভময়। 'শুধু ওর নয়, আমারও। ওরও দেখা দরকার বড় হয়েও আমি কৃতজ্ঞ আছি কিনা, আবদ্ধ আছি কিনা ছুটিতে।'

'সুতরাং ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া নয়।' চোখমুখ ঘোরালো করলেন জগৎপতি : 'যদি দৈবাৎ ও জানতে পেরেছে, তাহলে—তাহলে সমস্ত ওলটপালট করে দেব।'

'আমার কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। কিন্তু অফিস থেকে যদি কথা ওঠে!'

'সাধ্যমত চেপে রাখবে অনাদি। তবু যদি কেউ ফিস ফিস করে সটান উড়িয়ে দেবে। অস্বীকার করবে। যদি রুচিরাও কিছু সন্দেহ করে জিগগেস করে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভময় বললে, 'অস্বীকার করব।'

'শোনা, এ কটা দিন সমিতিতে বিশেষ যাওয়া-আসা করে কাজ নেই।'

'না, কী কাজ!'

'আর রুচিরার সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করে দাও।'

একটা বুঝি ঢোক গিলল শুভময়। বললে, 'একেবারে বন্ধ করে দিলে বরং সন্দেহ হতে পারে। তার চেয়ে যেমন দেখা হচ্ছে হোক, ওর মনটাকে সন্দেহের অতীত করে রাখি।'

'তা তুমি যা ভালো বোঝো।' উঠি-উঠি করলেন জগৎপতি : 'কিন্তু বলে দিচ্ছি, রুচিরার কথায় বা ব্যবহারে যদি বুঝি ও জানতে পেরেছে, তাহলে সমস্ত ক্যানসেলড।'

'আমি বোকা নই। নিজের কপাল আমি নিজে খাব না।' বুক-খোলা জামায় হাসল শুভময়।

'সমস্ত কিছু ভীষণ তাড়াতাড়ি করিয়ে নিচ্ছি। ধরো, আর সাত দিন। তারপর তুমি বম্বে চলে যাও। তোমার জাহাজ বম্বে থেকেই ছাড়বে। সেখানেই না হয় দিনকতক গাঢাকা দিয়ে থাকো।'

'তাই থাকব।' অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলল শুভময় : 'এদিকে না হয় চালু করে দেব আফিসের কাজে মফস্বলে গিয়েছি।'

কাঁটায়-কাঁটায় ঘুরল ঘড়ির কাঁটা।

হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেলে শুভময়কে সি-অফ করতে এলেন জগৎপতি। সঙ্গে অনাদি ঘোষাল। অনাদিকে শুধু নমস্কার করে জগৎপতিকে প্রণাম করল শুভময়।

'থাক থাক এস।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনাদি বললে, 'তাড়িয়ে দিলেন, না, ওই পালিয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না।

কদিন পরেই বুঝবে। মনে মনে হাসলেন জগৎপতি, যখন টাকা গিয়ে আর পৌঁছবে না। যখন পড়বে আধান্তরে। যখন জলে পড়ে হাত তুললেও কাউকে পাবে না আশেপাশে।

খুনের আসামী অনেক খালাস করেছেন জগৎপতি। কিন্তু খুন করা যে এত সহজ, আরামের, তা কোনোদিন জানতেন না।

১

তারপর চাকায়-চাকায় ঘুরতে-ঘুরতে জগৎপতির মোটর উনিশ-এফ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন জগৎপতি : 'ভাস্কর আছে?' দেখলেন তেরো-চোদ্দ বছরের একটা ছেলে মেঝেতে মাদুরে বসে পড়ছে। তার মনোযোগকে চাঁটিয়ে দেবার জন্যে এবার চেঁচিয়ে উঠলেন : 'শোনো এটা কি ভাস্কর বসুর বাড়ি?'

ধড়মড় করে উঠল ছেলেটা। বাইরে গাড়ি দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। একটা গাড়িওলা লোক দাদাকে খুঁজছে এ একেবারে অভিনব।

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি।' সপ্রতিভের মত ছেলেটা বললে, 'দাদা বাজারে গিয়েছেন।'

'তারপরেই তো নাকে মুখে গুঁজে আপিসে বেরুবে। তবে আর সকালে দেখা করার সুবিধে হবে না। শোনো, ভাস্কর ব বোলো সন্ধের আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'সন্ধের যে দাদার আবার টিউশানি আছে।'

'তাহোক। টিউশানির পরেই যেন যায়। আমি কে চেন তো?' গাড়ির দিকে আভাসবশেই চোখ ফেললেন : 'এ গাড়িটা কোন বাড়ির জানো তো?'

'না।' নির্মল সারল্যে ছেলেটা হেসে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। বললে, 'গাড়ির নম্বরটা দেখে রাখছি। দাদা এলে বলব।'

'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম তো সোমনাথ।' তবু ভদ্রলোক নিজের নামটা বলে কিনা অপেক্ষা করতে লাগল।

জগৎপতি বললেন, 'বোলো মিস্টার চ্যাটার্জি এসেছিলেন। জরুরি কাজ আছে।'

আমাকে দেখামাত্রই চোখের পলকে সবাই চেন এটাই তো যশস্বীদের আশা, কিন্তু এই ছেলেটা অপোগণ্ড বলে তত বিরক্ত হলেন না জগৎপতি। বাঙলায় জগৎপতি বলতেও কেমন যেন খেলো শোনায়, তাই মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন। ফথেষ্টেরও বেশি পরিচয় দেওয়া হয়েছে এতে। বললেন, 'বোলো, ভুলো না।'

'ঐ যে দাদা এসে পড়েছেন।' বাঁচল সোমনাথ।

এক হাতে রেশনের থলে আরেক হাতে মাছের জায়গা—মাছের জায়গাটা খালি—দেখা দিল ভাস্কর।

'এ কি, আপনি?' নমস্কার করার কথাও ভুলে গেল সহসা।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।' ভাস্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলোলেন জগৎপতি। বললেন, 'সন্ধের পর টিউশানি সেরে যেও একবার আমার বাড়িতে। নয়তো যদি বলো তোমার এখানে—।' জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর চোখ ফেললেন আরেকবার।

'আমার এখানে কী!' একটু আড়ষ্ট হল ভাস্কর : 'আমিই যাব আপনার বাড়ি।'

'হ্যাঁ, যেও। সুখবর আছে।'

গাড়িতে যেতে-যেতে মনে মনে হিসেব করলেন জগৎপতি। বাড়িতে চাকর নেই, ভাস্করই বাজার করে। মাছের দাম বেশি বলে মাছ কেনে না প্রত্যহ। ঘরের মধ্যে চেয়ার নেই, লোক এলে বাইরে দাঁড়িয়েই বোধ হয় কথা সারে। আর নেহাৎ ভিতরে নিতে হলে বসতে খাদুর পেতে দেয়। মোট দুখানা ঘর মনে হল। পাশের ঘরে তল্পপোশ আছে কিনা বলা যায় না, তবে একজন মহিলার আভাস পাওয়া গেল, তিনি বোধ হয় মা। মা না থাকলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কিন্তু মা না থাকলে দুবেলা লুচি ফুটিয়ে দেবে কে? একটা রাঁধুনে বামুন রাখবার সঙ্গতি কই?

আরো খানিক দেখলেন তলিয়ে। ছেলেটা বোধহয় সৎ, স্থির, মজবুত। জামার বোতামগুলো কখ, মাথার চুল-গুলো পাখির বাসা করে রাখেনি। আরো মনে পড়ল সেদিন প্রথম তাঁর বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাবার সময়ও সে খোলা গেটটা খোলা রেখেই চলে যায়নি, যথারীতি বন্ধ করে দিয়েছিল। সে এলো-মেলো নয়, সে ছন্দের অনুগামী। সে রীতির পূজারি। সে বিশ্বাসযোগ্য।

সুখবর বলতে আর কী, কোথাও একটা চাকরির সুবিধে হয়েছে হয়তো।

এতটা যেন আশার বাইরে, এমনি করেই দেখলেন মহালয়া। বললেন, 'হয়তো বা কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাকে উদ্ধার করবার ডাক পড়েছে।'

'তাতে আমার কী!' হেসে উঠল ভাস্কর : 'সেটা আমার কী সুখবর!'

'বা, আমার সুখবর। আমার ঘরদোর আলো হয়ে উঠবে।'

'সেই ঘরের আলোতে তুমি বাইরে বসে আঁধার দেখবে। যা না রোজগার তাতে আবার বিয়ে! কী না জানি বলে, আহা, সেই কথাটা—' ভাস্কর হাসল : 'যা না বলে তার দু পায়ে আলতা!'

টিউশনি সেরে সন্ধ্যার পরে ঠিক হাজির হল ভাস্কর। দেখে মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছেন জগৎপতি।

বৈঠকখানায় না বসিয়ে পাশের ছোট একটা ঘরে নিয়ে এলেন। আস্তে বললেন, 'বোসো।' বসতেই একেবারে খিল চাপালেন দরজায়।

মাঝখানে একটা চেয়ার রেখে দুজনে বসলেন মুখোমুখি। আজেবাজে হালকা কথা পাড়লেন প্রথমে, আজকের খবরের কাগজের কথা, খেলের দুর্ঘটনার কথা, প্রতিষ্ঠান বা পার্টি দিয়ে কী হবে যদি মানুষ না থাকে, আর মানুষেই যদি বিশ্বাস না রাখা যায় তা হলে পৃথিবীতে কী নিয়ে থাকবে মানুষ, এমনি সব অবান্তর কথা।

একটু বুঝি বা চঞ্চল হল ভাস্কর। হাসি-হাসি মুখ করে বললে, 'কী একটা সুখবর আছে বলছিলেন—'

'বলছি।' এত বড় একটা কোর্ট-কাঁপানো উকিল, কথার ভট্টাচার্য তারই মুখ দিয়ে কিনা এখন কথা বেরুচ্ছে না। 'আচ্ছা তোমার সেই চাকরিটা যেখানি ফেটার জন্যে আমার কাছে সেই এসেছিলে?'

'কী করে হবে? আপনি বিমুখ হয়ে রইলেন।'

'হ্যাঁ, সেটা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার এত মানুষ নিয়ে কারবার, আমার লোক চেনা উচিত ছিল। তুমি সেই যে বলেছিলে আমার মুখ দেখুন, সেইটেই খাঁটি কথা। আমি মনে-মনে ঠিক চিনেছিলাম তোমার মুখ দেখে, কিন্তু জানো, ওকালতির ঐ এক বিষম দোষ একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলে প্রাণপণে তাকেই আঁকড়ে থাকা, আর তাকে ছেড়ে দেওয়া নয় কিছুতেই। কত অমন কূট তুচ্ছ পয়েন্টের ফাঁক দিয়ে বড়-বড় মক্কেল টেঁসে গেছে, সেদিন তোমারটাও গেল। কিন্তু জানো, সেই দিন থেকে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার একটা ক্ষতি-পূরণ না করে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিনে। আচ্ছা, যেখানে এখন তুমি আছ সেখানে কত পাচ্ছ?'

'সব সুদ্ধ একশো চৌষট্টি টাকা।'

'মোটে? আচ্ছা, তোমার মাইনে যদি সাড়ে তিনশো হয়, চারশো হয়?'

এতে আবার কী হয় জিগগেস করতে হয় নাকি? ভাস্কর নির্লিপ্তের মত শুনো তাকিয়ে রইল।

'তাহলেই হয়, কী বলো?'

এর আবার ভাস্কর কী বলবে? ভাস্কর কি কোনোদিন অত মাইনে কখনো হতে দেখেছে সজ্ঞানে?

'তোমরা তো দুটি ভাই। আর—' থামলেন জগৎপতি।

'আর, মা আছেন।'

হালকা হয়ে যাবার মত নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি। 'আর কোনো ডিপেণ্ডেন্ট?'

'আপাতত নেই।'

'তা হলে ওরকম একটা মোটামোটা মাইনে হলে বিয়েও করতে পারো স্বচ্ছন্দে।'

কণ্ঠের মত হাসল ভাস্কর : 'বর্তমানে যা মাইনে তাইতেই তো মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।

'না, বর্তমান মাইনেতে হয় না। শোনো,' একটা পার্কেট থেকে কিছু

কেশই.....

ভারতীয় নারীর সৌন্দর্যের মূল। কেশকে উজ্জ্বল ও সতেজ রাখতে কেশতৈল নির্বাচনে সতর্কতা প্রয়োজন।

আপনার শ্রেষ্ঠ নির্বাচনই হবে "কেশলীন"। ইহা কুড় চন্দন মিশ্রিত ভেষজ গুণসম্পন্ন কেশ-তৈল এবং কেমিস্ট কর্তৃক পরীক্ষিত। নিয়মিত ব্যবহারে চুল ওঠা বন্ধ করে ও খুসকী মরামাস নষ্ট করে।

স্বপ্নার

কেশলীন

॥ নতুন নতুন উপন্যাস ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের...	ঝড়ের সংকেত	... ৩·৫০
বিশ্বনাথ রায়ের...	নতুন নগর	... ২·৫০
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ...	লালনিক	... ৩·০০
শৈলেশ দে'র...	আকাশ প্রদীপ	... ২·৫০

ছোটদের অ আ ক খ শেখার সুন্দর ও সুদৃশ্য বই

বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপবাণী (প্রথম ভাগ) ১·২৫

শ্রীভারতী পাবলিশার্স

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

কাগজ বের করলেন জগৎপতি : 'এই অ্যাপলিকেশন ফর্মটা ফিল-আপ করে কালই পাঠিয়ে দাও। এ কোম্পানির মালিক, বন্ধুবিশাল আমার মক্কেল। আমার খাতিরেই একটা এপয়েন্ট করে নিচ্ছে তোমার জন্যে। ইনস্পেক্টরের চাকরি, চাকরিটা ভালো। মাইনে ভালো হলেই সমস্ত ভালো। কত টিনের ঘরের টালির ঘরের কোর্টে গিয়ে কেস করেছি; কি লিক মা, গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেস করব। যেখানে যি কেন, যেখানেই হোক জলবে দাউ দাউ করে।'

'চাকরিটা পার্মানেন্ট?'

'নিশ্চয়ই। নইলে তুমি তা নেবে কেন? তুমি একবার গিয়ে সব দেখেশুনে এস না। পছন্দ না হয় চলে আসবে।'

'না, না, নানারকম ফার্ম', ফর্মটা উলটে-পালটে দেখল ভাস্কর। 'দেখবার শোনবার কিছু নেই।'

'দেখবে জয়েন করার সঙ্গে-সঙ্গেই চাকরি। ইন্টারভিউও লাগবে না।'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট?' ভাস্কর না বলে পারল না।

'না, তাও না। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে শার্ট-প্যান্ট পরতে হবে। জুতো কাবার্ল পর্যন্ত চলতে পারে কিন্তু স্যান্ডেল চলবে না। তার মানে টিকির ছেড়ে স্মার্টনেসে আসতে হবে।'

'বা, তাতে আপত্তি কী! যেমন জায়গার যেমন পোশাক। যে দেশের যা রেওয়াজ তা মানতে হবে বৈকি।'

'পোশাক-আশাকের জন্যে তোমার হাতে টাকা না থাকে, আমি দিতে পারি চালিয়ে।'

'না, না, তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে। সে আর কটা টাকা।'

তবু সমস্তই যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, অবান্তর মনে হচ্ছে ভাস্করের কাছে। যেন আরো কিছু কথা আছে, অন্য কিছু বক্তব্য। এতেই যেন সমস্যার শেষ নয়।

তবু কই, মুখ খুলছেন না তো জগৎপতি।

তবে এবার উঠতে হয়। দরখাস্তের ফর্মটা ভাঁজ করে পকেটে পুরছে ভাস্কর, জগৎপতি হঠাৎ গলা নামালেন : 'আর শোনো তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দেব।'

'টাকা? দশ হাজার! আমাকে!' ভাস্কর কি মাটিতে আছে না শূন্যে আছে বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ, বিয়ের যৌতুকস্বরূপ দেব। প্রথমে পাঁচ হাজার, পরে আরো পাঁচ। কিংবা যদি বলো—'

ভাস্কর কী বলবে! সে তো জড়, পাথর হয়ে গিয়েছে। বললে, 'কে বিয়ে করবে?'

'তুমি।'

'আমি বিয়ে করব, তার আপনি যৌতুক দেবেন কেন?'

'বা, আমার মেয়েকেই যে বিয়ে করবে। মেয়ের বিয়েতে জামাইকে শ্বশুর যৌতুক দেয় না?' কথার সুরে জগৎপতি যেন একটু স্নেহ মেশালেন।

যেন কোন এক রূপকথার রাজ্যে উড়ে এসেছে, ভাস্কর তেমনি ঘুনেজডানো গলায় জিগগেস করল, 'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব? তার মানে আমার হাতে আপনার মেয়েকে সঁপে দেবেন, তুলে দেবেন? এও হয় নাকি? এ আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি।'

'আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য? আমি একটা সামান্য মাইনের কেরানি—'

'চারশো টাকা মাইনের ইনস্পেক্টর—জামাই হিসেবে একেবারে মন্দ কী!' জগৎপতি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন : 'তা ছাড়া যোগ্যতা তো শুধু টাকার নয়, যোগ্যতা চরিত্রে, যোগ্যতা সাধুতায়। যোগ্যতা মনুষ্যত্বে।'

'এ সব কী প্রলাপ বকছেন?' ভাস্কর ছটফট করে উঠল : 'আপনার মেয়ে জানেন? তাঁর এ বিয়েতে মত আছে?'

'ব্যাচেরার মত না থাকলে তোমাকে বলতে সাহস পেতাম কী করে?' সে রাজি আছে বলেই তো—'

'কিন্তু কেন? আমি কেন? আমি কে?' ভাস্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'রূপে-গুণে উজ্জ্বলন্ত মেয়ে, কোথায় রাজার ঘর আলো করবে, তার জন্যে কিনা আমারই ভাঙা বাড়ি ঠিক করলেন? আমি কোথাকার কে এক হরিপদ কেরানি—'

হঠাৎ ঘরের আলো অফ হয়ে গেল, সমস্ত কিছু মুছে গেল, ডুবে গেল অন্ধকারে।

বেশিক্ষণ নয়।

কতক্ষণ পরেই আবার আলো জ্বলল। ঘরে আলো হতেই শোনা গেল জগৎপতিকে : 'কিন্তু তুমি গ্রহণ। তুমি বিশ্বাসযোগ্য। তবে এই সর্ত, তুমি এক বছর বাদে বিয়ে আবার নাকচ করে দেবে। ডিভোর্স দিয়ে দেবে ব্যাচেরাকে।'

এতক্ষণে যেন পায়ের তলায় মাটি পেল ভাস্কর। 'তাই বলুন। এক বছর পর বিয়ে আবার ভেঙে দিতে হবে!'

'এক বছর না হোক বড় জোর দেড় বছর।' জগৎপতি মনে মনে হিসেব করলেন।

মানে বিয়ে করে আবার তা ভেঙে দিতে হবে।' মুখের মত হাসল ভাস্কর : 'তাও আবার হয় নাকি?'

'খুব হয়। কিছুমাত্র হাঙ্গামা নেই। তোমাকে শুধু তিনবার তিনটি দস্তখৎ করতে হবে। ব্যস, তা হলেই নিষ্পত্তি।'

'শুধু তিনবার?' কণ্ঠের গলায় আবৃত্তি করল ভাস্কর।

'প্রথমে বিয়ের নোটিশে একটা সই, দ্বিতীয় সইটা বিয়ের দলিলে, আর তৃতীয়টা ডিভোর্সের আর্জিতে। কিছু-মাত্র হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না তোমাকে।' আশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকালেন জগৎপতি। যেন কোথাও এতটুকু বাঁকা-কাঁকর নেই আগাগোড়া মোলায়েম।

'কিন্তু—' আবার কোথায় যেন একটা দুষ্টু কাঁটা খোঁচা মারছে। ঢোক গিলল ভাস্কর।

'বলো, হ্যাঁ, যা কিছু প্রশ্ন আছে খোলসা করে নেওয়াই ভালো।'

'আর কিছু নয়', ভাস্কর হাসল : 'বিয়ে নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটাও নাকচ হয়ে যাবে?'

'বা, তা কেন?' জগৎপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'চাকরির সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী? বিয়ে ছুটে গেলেও তোমার পার্মানেন্ট চাকরি পার্মানেন্টই থাকবে। অত কথার কাজ কী! আগে চাকরিতে ঢুকবে পরে তো বিয়ে। সুতরাং চাকরি নেবার পর যদি বিয়েটা না-ও করো—'

'না, না, চাকরির সঙ্গেই তো বিয়ে।' ভাস্কর গম্ভীরমুখে বলল, 'আর কথা একবার দিলে তা রাখতে হবে বৈকি।'

'এইটেই তো কথার মতো কথা।' জগৎপতি আবার আশ্বাসের আলো আনলেন চোখে : 'আর আমি বলছি এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

'না, না, ভয়ের কী!' খোলা গলায় হেসে উঠল ভাস্কর।

'লোকসানও কিছু নেই।'

'লোকসান!' ভাস্করের চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল : 'লোক-সানের কথা কে ভাবে?'

'তবে—'

তবু কী যেন ভাবনা থেকে যায় এখানে-ওখানে। ভাস্কর চেয়ার থেকে উঠি-উঠি করতে-করতে বলল, 'দু-চার দিন একটু ভেবে দেখি।'

'কিন্তু তাই বলে চাকরির দরখাস্তটা দিতে কিন্তু দু চারদিন দেরি কোরো না। কালকেই পাঠিয়ে দিও। নিজের হাতে যদি দিতে পারো তাহলে সব চেয়ে ভালো হয়।'

সত্যিই তো, আলোয় আবার স্থির হল

পরিবারের
জন্য
ভেরা উপহার

উৎসব ঋতুই তো উপহার দেওয়ার সময় আর ঊষা সেলাই কলের চেয়ে ভালো উপহার কি হতে পারে! একটি ঊষা সেলাই কল বাড়ীতে থাকলে কত উপকার হয়। আধুনিক ডিজাইনে গড়া প্রতিটি ঊষা মডেলে অনেক রকম সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ঊষায় শুধু সেলাই হয় না, ঊষায় সেলাই করাটা আনন্দময়ও বটে।

সুবিধাজনক কিস্তির সর্ত স্থানীয় বিক্রেতার নিকট জেনে নিন।

চিহ্নিত মেসিনগুলি হাও, ফুট এবং কোল্ডিং মডেলে পাওয়া যায়।

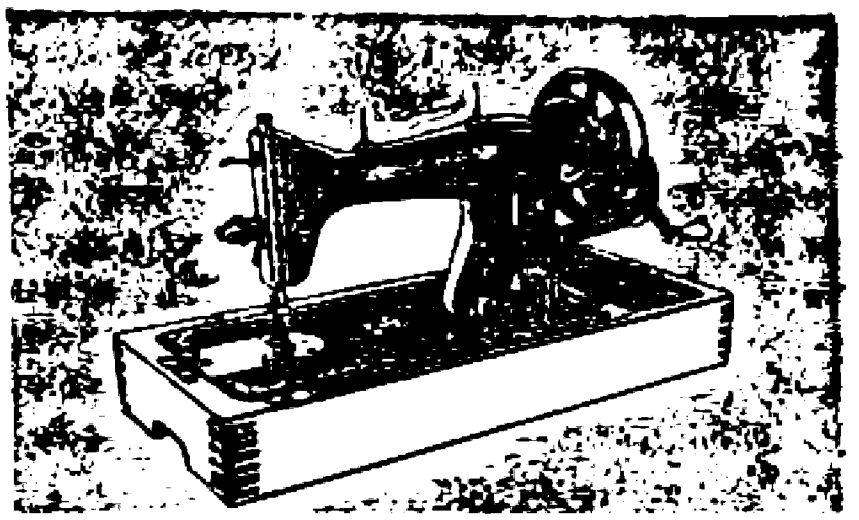

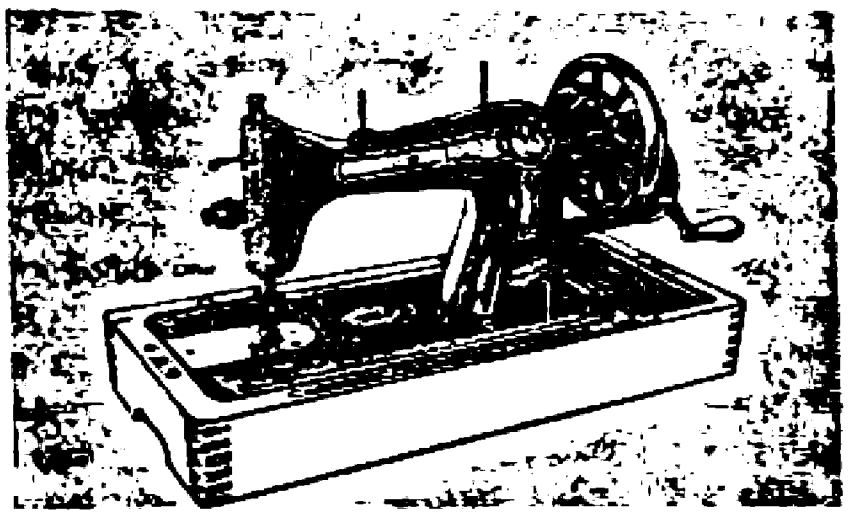

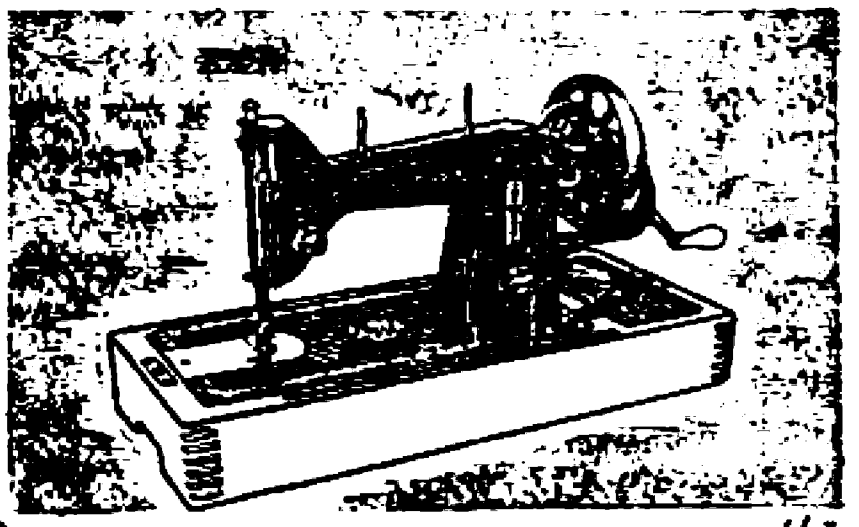

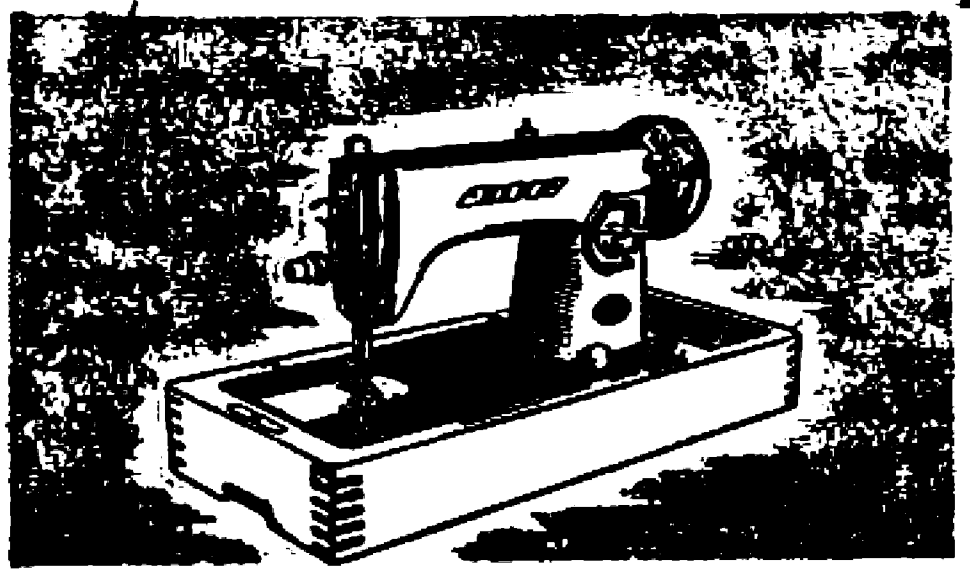

ঊষা কিনুন —
আরামে সেলাই করুন

ঊষা

সেলাই কল

ঊষা ইণ্ডিয়া বিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

ভাস্কর। কালকেই তো চাকরিটা ধরতে হয়—অন্তত দেখে-শুনে আসতে হয়—যত শিগগির অবস্থিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। আর চাকরি সম্বন্ধেই যদি সে কৃতসঙ্কল্প হয় তা হলে অন্য বিষয়টা সম্বন্ধে দ্বিধা করার অবকাশ কোথায়?

ভাস্কর ফের শিথিল হয়ে বসেছে লক্ষ্য করলেন জগৎপতি। বললেন, 'এতে ভাববার কী আছে? তোমার কোথাও এতটুকু ক্ষতি নেই, বিপদ নেই। ঝামেলা নেই এক ফোঁটা। একবার নামটা লেখা, আরেকবার নামটা কেটে দেওয়া। বাস, ফুরিয়ে গেল। কেউ কিছু জানতেও পারবে না।'

'জানতেও পারবে না?' চমকে উঠল ভাস্কর।

'না, মানে, বিয়েটা জানতে পারবে, ডিভোর্সটাও জানতে পারবে। সে সব আমিই ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া এ তো হয়, হামেশাই হচ্ছে আজকাল। কি, হয় না?'

'হয় বৈকি। সংসারে কী না হয়? এমন সব হয় যা ভাবাও যায় না।' ভাস্কর নিশ্বাস ফেলল।

'এ তো প্রায় ডাল-ভাত। বড় ঘরের মেয়ে একটা হেঁজিপেঁজির সঙ্গে প্রেমে পড়েছে এ শোনোনি তুমি কোনো দিন?'

'কিন্তু এটা কি প্রেম?'

'তাই মান্য করতে হবে। প্রায় প্রেমের বিয়ে বছর ঘুরতেই ভেঙে যচ্ছে এও এমন কিছু আশ্চর্য নয়। লোকে সার্তর কথা কী করে জানবে? সে তো আর লেখা-পড়া হচ্ছে না। সে আমাতে-তোমাতে। লোকে জানবে বিয়ের পর বনিবনা হয়নি, বড়লোক-পরিবের বিয়ে ত এ রকম জটিল হয়েই থাকে—তাই ডিভোর্স হচ্ছে এতে অত ঘাবড়াবার আছে কী! লোকের এ ক্ষেত্রে অন্য জানবার অধিকার নেই। আইনই দেয় না সে অধিকার।' জগৎপতি টেবলের ধারটা ধরলেন মুঠ করে।

'আইন?'

'হ্যাঁ, আইন। যখন তোমার বিয়ে, তোমার স্ত্রী, তোমারই সমস্ত।'

'আবার সেই সমস্ত ফিরে দিতে হবে জলাঞ্জলি।' ম্লান মুখে হাসল ভাস্কর।

'তা দিলেই বা। যা তোমার প্রাপ্য নয়, ন্যায্য নয়, তা তুমি রাখবে কেন?' জগৎপতি বিস্ময়ের ভাব করলেন: 'তা তুমি বিদেয় করে দেবে। তুমি যেটুকু করবে সবই পরিত্রাতার ভূমিকায়। তার জন্যে তোমার টাকা, চাকরি—'

'টাকা?' কথাটা যেন ভুলে গিয়েছিল ভাস্কর, প্রায় উছলে উঠল।

'হ্যাঁ, বলেছি তো, নগদ দশ হাজার—বিয়েতে পাঁচ, বিচ্ছেদে পাঁচ। আর স্থায়ী লাভের চাকরি। এ প্রায় মাস্তার কুড়িয়ে পাওয়া জমিদারি—এ কি কেউ ছাড়ে?'

কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে হল, আরো কত বড় জিনিস ছেড়ে দিতে হবে তার সে হিসেব রাখে?

'কেউ ছাড়ে না। এত বড় একটা সুযোগ আসে না হামেসা। আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠল ভাস্কর: 'মানে পরোপকারের সুযোগ।'

'তবে তোমার ফাইনাল কথাটা জানতে পারব কবে? কাল? নতুন চাকরিতে জয়েন করবার পর?'

'আমার মাকে জানাই। তিনি কী বলেন—'

'না, না, মাকে জানানোর দরকার নেই।' শত মুখে 'না' করে উঠলেন জগৎপতি: 'তাঁকে জানিয়ে লাভ কী? তিনি যদি মত না দেন?'

সত্যিই তো, কিছুই হয় না তা হলে। চাকরিটাও হয় না।

'সব ছেলেই মাকে জানিয়ে প্রেম করে নাকি? না কি বিয়ে করে? একেবারে বউ নিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম করে। রাখো,' প্রায় ধমকে উঠলেন জগৎপতি: 'মাতৃ-ভক্তি দেখাতে হবে না। তোমার মাকে যা বলবার আমি বলব।'

'যা, তা হলে তো কথাই নেই।' দরজার দিকে এগুলো ভাস্কর।

'তা হলে নতুন অফিসটা ঘুরেই করে কালকেই আমাকে ফাইনাল কথা দিচ্ছ।'

'দেখি—'

'বেশ, কাল না হলে পরশু।' দৃঢ় হলেন জগৎপতি।

'পরশু।'

ভিতরে-বাইরে আকুল চোখে তাকাল ভাস্কর। যার জন্যে এত, সে কই? তাকে কি একবার দেখা যায় না স্বচক্ষে? বিয়ে হবে কি অনেকে দেখতে না দিয়ে? অন্ধকারে রেখে?

সেই কবে একবার দেখেছিল ঐ বৈঠকখানায়। যেন একটা বিদ্যুৎ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে কি কারণে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারেনি, খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো দু একবার দেখেছে হয়তো রাস্তায়, মোটরে। রাস্তা দিয়ে কে হাঁটছে ফিরেও তাকায়নি। আজ, এখন, একবার দেখা হয় না? দেখতায় চোখ দুটো কতটা উদাসীন। আর বিদ্যুৎ জুড়ে কটা মেঘের পলস্তারা।

ভাস্করের ঔৎসুক্যকে ধরতে পেরেছেন জগৎপতি। বললেন, 'রুচিরার শরীরটা ভালো নেই।'

'না, না, তাকে বিরক্ত করে লাভ কী। সবই তো কাগজ-কলমের ব্যাপার।' হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল ভাস্কর। 'খলিলের লীলাখেলা।'

'কাল তবু একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো। হ্যাঁ, আর, যা বললাম তা যেন আর কাউকে প্রকাশ কোরো না।'

'আমি কি পাগল? নিজের পায়ে কুড়ুল মারি? জানাজানি করে ফাঁসিয়ে দিই মামলাটা?' ভাস্কর একটু যা মিনতি করল কণ্ঠে: 'আপনিই যেন আর কাউকে বলবেন না।'

বাড়িতে ফিরলে মহালয়া জিগগেস করলেন ব্যাপারটা কী।

'একটা চাকরি দিতে চায়।'

'সে কী?' চমকে উঠলেন মহালয়া: 'কত মাইনে?'

'আড়ে তিন শো চারশো—' যেন গায়ে লাগে না এমনি ভাবে ভাস্কর বললে।

'কী সর্বনাশ! এত?' মহালয়া চোখ প্রায় কপালে তুললেন: 'হঠাৎ তোর প্রতি এত দয়া?'

দ্বিধা গোপন করল ভাস্কর। বললে, 'একবার আমার চাকরিতে সার্টিফিকেট দেয়নি চাওয়া সত্ত্বেও, তাই হয়নি সেই চাকরিটা। তারই প্রায়শ্চিত্ত করল বোধ হয়।'

'লোকটা ভালো।' রায় দিলেন মহালয়া।

'ভীষণ ভালো।' সায় দিল ভাস্কর: 'প্রথম-প্রথম ঠিক বোঝা যায় না।'

১০

হোক অসুস্থ, তবু রুচিরার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না।

'চাকরি কেমন দেখলে?' জিগগেস করলেন জগৎপতি।

'সব ঠিক হয়ে ছিল। দরখাস্তটা দিতেই র‍্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিয়েছে।'

'তাই দেবে। তেমনি বলা ছিল। স্টার্টিং কত দিল?'

'আড়ে তিন শো।'

'তাই বা ক'জনে দেয়। তিন মাস পরেই চারশো দেবে দেখো।' জগৎপতি একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন: 'তোমার মাকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'কী বললেন?'

'বললেন, এবার আর কোনো কথা শুনব না, বিয়ে করে বউ এনে দিতেই হবে আমাকে।'

'তাই বলো!' সশব্দে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'কবে জয়েন করছ?'

'করছি শিগগিরই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী, বলো।'

মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে নিভৃতে

একবার দেখা করা দরকার।' ভাস্কর চোখেমুখে সারল্য আনবার চেষ্টা করল : 'আপনিই বলুন, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি একবার না দেখা করে পারতেন? হাঁ কি না তাঁর মুখের কথাটা একবার শুনে নিতেন না স্বকর্ণে? মন খোলসা করে নিতেন না?'

কথাটা আর বিশ্লেষণ করবার কী আছে? আর এর মধ্যে মনেরই বা প্রাবল্য কতটুকু যে তাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে? এ তো শুধু কটা দস্তখতের কারিকুরি। তবু পুরুষের কৌতূহল কী বস্তু তা জগৎপতি বোঝেন। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে অসঙ্গত কিছু নেই। তবু উকিলিবিদ্যায় পারঙ্গম, একটু অন্যরকম করে না বলে পারেন না থাকতে। তাই বললেন, 'এ তো নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ। এ রকম ক্ষেত্রে বর-কনের প্রথম দেখা তো বিবাহ-সভাতেই হয়ে থাকে। আগে আর হয় কবে?'

'এখানে বিবাহ-সভাটা কোথায়?'

'রেজেস্ট্রি-অফিসে।'

'বিয়ে যখন রেজিস্ট্রারি করে তখন এটাই ধরে নিতে হবে বিয়ের আগে থেকেই পার্টিদের জানাশোনা।' শুধু সুরটাই বজায় রাখল ভাস্কর : 'নইলে আকস্মিকভাবে দুজনে একদিন বিয়ে-অফিসে এসে পড়েই বলা নেই কওয়া নেই বললে দস্তখত করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী সাজব এটা বোধহয় নাটকেও চলে না।'

'তা অন্যায় বলোনি।' তর্ক আর বাড়ালেন না জগৎপতি। সন্দেহ কি, তুরুপের তাস ভাস্করের হাতে। এখন এক ধার থেকে সব পিট নেবারই মালিক সে নিঃসন্দেহ। তাই আর কাঁটা-খোঁচা না রেখে বললেন সহজ সুরে : 'তাহলে তুমি একটু বোসো, আমি ওকে খবর দিই।'

'খবর দেবেন মানে—' ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করতে চাইল ভাস্কর।

'মানে, দেখে আসি ও এখনই দেখা করতে প্রস্তুত কিনা, না, কি দেখা করার অন্য সময় ঠিক করে দেবে।'

মুহূর্তে মাথার মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ভাস্কর মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেই সঙ্গে স্থানটাও ঠিক করে নেবেন।'

'স্থান? স্থান আবার কোথায়। স্থান তো এখানেই, এ বাড়িতেই।'

'না। আমার মনে হয়, দেখাটা আমার বাড়িতেই হওয়া দরকার।'

'তোমার বাড়িতে?' যেন জগৎপতির পিঠে কে ছোরা বসাল।

'সেইটেই তো সমীচীন। যেহেতু এক্ষেত্রে প্রার্থী আমি নই, প্রার্থী উনি। একটু বা বুঝে শোনে ভাস্কর : 'যে প্রার্থী সেই যায়, সেই সাধে। আর যে দেয়, যে প্রার্থনা পূরণ করে, সে নড়ে না, সে তার নিজের জায়গায় বসে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে মিস চাটার্জিই যাবেন আমার কাছে, আমার বাড়িতে, তাঁর আবেদন নিয়ে। সেইটেই শোভন, সেইটেই সম্ভ্রান্ত। বলুন, ঠিক বলছি না? আর্জি নিয়ে, দরখাস্ত নিয়ে প্রার্থীই কোর্টে যায়, কোর্ট কি আর প্রার্থীর বাড়িতে আসে?'

'তা কমিশনে জবানবন্দি নিতে কোর্টও বাড়িতে আসে বৈকি।' গভীর একটু বুদ্ধি বিতরণ করলেন জগৎপতি। 'তাছাড়া তোমার বাড়িতে জায়গা কোথায়?'

'তা যা জায়গা আছে তাই যথেষ্ট। একটা কথা সাব্যস্ত করতে আর কত জায়গা লাগে?'

'না, না, আমি বলছি একটু রম্য-টেবিল বসে অন্য দু-চার কথার মধ্যে বিষয়টা পাড়লেই ভালো হয়।'

অভিমানের ছোঁয়াচ এখনো বুঝি সম্পূর্ণ কাটল না স্বর থেকে। ভাস্কর বললে, 'সোফা-কোচ না থাকলেও কম্ফর্টেবলি বসা যায় হয়তো। তা ছাড়া, বিস্তৃত আলাপ করবার অবকাশ এখন কোথায়, প্রয়োজনই বা কী। যে ঘটনা ঘটতে চলেছে তাতে ওঁর সম্মতিটা কত-দূর তাই একটু যাচাই করে নেওয়া। আমি জানি আপনি ওঁর ঠিকই প্রতি-নিধিত্ব করছেন তবু ওঁর সঙ্গে যে একটা সাক্ষাৎ বোঝাপড়া দরকার তা অস্বীকার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয়ই খুব সংক্ষিপ্ত হবে, দ্রুত হবে—'

চাকরিটা বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়তে চায় নাকি? কিন্তু, না, তা কী করে হয়? মুখ-চোখের তেমন চেহারা নয়, আর, তা ছাড়া, স্বরে যুক্তি নেই এমন কথাও বলা যায় না। জগৎপতি সুর বদলালেন। 'এখুনি যদি ও যায়, তোমার মা যে দেখে ফেলবেন। কী ভাববেন তিনি? কী বোঝাবে তাঁকে?'

ভাস্কর এক মুহূর্তও দেরি করল না ভেবে নিতে। বললে, সময় আগে থেকে ঠিক করা থাকলে সে সময় মাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু,' গলা নামালেন জগৎপতি : 'প্রতিবেশীরা তো আছে। তোমাদের পাশেই তো অনেক ভাড়াটে। কে কী দেখে নিয়ে কী সন্দেহ করবে, শুরু করবে ফিসফিসানি, বলা তো যায় না। ব্যাপারটা যত গোপনে রাখা যায়, যত চুপচাপ—'

'তবু, তাই হোক—' ভাস্কর আরও কী আপত্তি তুলতে চাইল। একটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক ভাব করে সে করে নিচু হবে এই ভঙ্গিটা সে কিছুতেই তার মর্জির সঙ্গে পাচ্ছে না খাপ খাওয়াতে।

জগৎপতি আর দেরি করলেন না। তার না থেকে সরাসরি ফিনিশিংয়ে নেমে এলেন। বললেন 'ওর অবস্থাটা তো তুমি সহজেই বুঝতে পারো। মেয়ে-মনে একে-

পূজায়
প্রিয়জনের

নিত্য
ব্যবহারে
রেডিয়ম
প্রসাধন
রেডিয়ম লেবরেটরী, কলিকাতা-৩৬

Puja Greetings —
CHANDRA KANTA MANNA
& CO. (Private) LTD.
Govt. Controlled Stockists of Iron & Steel
20, Maharshi Debendra Road, Calcutta-7. Phone : 33-1609.

যারে ভেঙে গিয়েছে। এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা কেই পারে ক্ষমা করতে? সর্ব-ক্ষণ দু হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে।'

শুধু এইটুকুতেই হল না, হবে না—বুঝে নিলেন জগৎপতি। বললেন : 'খালি কাঁদছে, চুল ছিঁড়ছে, মেঝেতে মাথা কুটছে। স্নান করছে না, খাচ্ছে না, ঘুমুতে পাচ্ছে না। শেষকালে মরে যাবে মেয়েটা? শুধু ক্ষণিক একটা ভুলের জন্যে, এত বড় একটা জীবন ছারখার হয়ে যাবে? বলো আমি তাই হতে দেব? আমার যে আর কেউ নেই—' ভাস্করের কাঁধে হাত রাখলেন জগৎপতি।

'যা, আমি তো প্রায় রাজিই।'

'আমি তা জানি। তুমি দয়ালু, তুমি মহানুভব, তুমিই প্রগতিপন্থী। এই দয়াতেই তোমাকে আরো একটু উদার হতে হবে। মেয়েটা যে সাঙাই অসুস্থ, অক্ষম। অন্তত সেই কারণেই যদি একটু ক্ষমা করো—'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল ভাস্কর। বললে, 'বেশ, এইখানেই দেখা করব। তবে সময়টা কখন হবে—'

আর জট পাকালেন না জগৎপতি। বললেন, 'সময় আর কী! এখুনি, এখুনিই তো হতে পারে। সবই যখন ঠিক, তখন দেরি করার মানে হয় না। তুমি এস, চলে এস আমার সঙ্গে উপরে। এখুনি আলাপ করিয়ে দি।'

সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে উঠতে লাগলেন জগৎপতি।

আশ্চর্য ভাস্করও চলতে লাগল পিছু-পিছু।

এটা কী রকম হচ্ছে কে জানে। ভাগ্যের মুখ হিংস্র না গম্ভীর না পরি-হাসতরল তাই বা কে বলবে। নিজের বেশবাস, ক্লান্তি-গ্লানির কথাও একবার চেষ্টা করল ভাবতে, ভাববার কিছু প্রয়ো-জন আছে কিনা তাও ভেবে পেল না। ও পক্ষেও কোনো উদ্যোগ নেই, আয়োজন নেই। সজ্জা-চেষ্টা তো দূরের কথা। তবু দুজনের দেখা হবে। আর, এই কিনা প্রথম দেখা।

'চলে এস।' উপরে ঘরে যে আছে তাকে অবহিত করবার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন জগৎপতি : 'রুচি ঘরেই আছে। কোথায় আর যাবে এ সময়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলে এস।'

কোথায় চলেছে ভাস্কর? কাকে দেখতে! কাকে পেতে কাকেই বা আবার ছেড়ে দিতে!

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন জগৎপতি।

'এই যে তুই আছিস। সেই যে বল-ছিলাম—সেই ভাস্কর, ভাস্কর বোস এসেছে।' পর্দার বাইরে অপেক্ষা করছিল ভাস্কর, তাকে লক্ষ্য করে জগৎপতি বলে উঠলেন, 'এস, এ ঘরে এস। তোমাদের কথাটা সেরে নাও। ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, সব কিছু ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো। শেষে কোনো না ছিচ্‌ হয়—'

খাটের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে রুচিরা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল বিকেল কেমন করে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, সন্ধ্যা কেমন অন্ধ-কারে। একটা হলদে রোদের ফালি কেমন এতক্ষণ ও ফ্রাশের বাড়িটার গায়ে স্বপ্নের মত লেগে ছিল, কেমন আস্তে-আস্তে সেটা বেগনি হতে-হতে ছাই-ছাই রঙের হয়ে গেল। আর বুঝি তাকে দেখা যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না, মরা দেয়ালে সেই মরা হয়েই থাকবে। হঠাৎ বাবার ডাকে ধড়মড় করে উঠল রুচিরা। চকিতে একটু টানাটান করে নিল শাড়িটা, ভঙ্গির শৈথিল্যটাকে শাসন করল। আর কে একটা অচেনা বলা জন্তু ঘরে ঢোকে তা দেখবার জন্যে দুই চোখের সন্দেহকে তীক্ষ্ণ করে তুলল।

ভাস্কর ঘরে ঢুকতেই জগৎপতি বললেন, 'বেশ নিরিবিলি আছে, তোমাদের বোঝাপড়াটা করে নাও। নিশ্চিন্ত হয়ে। আমি যাই।' বলে তাকা-লেন রুচিরার দিকে : 'ইনিই সেই ভাস্কর। যে অর্থে সূর্য অন্ধকার দূর করে, আরোগ্য নিয়ে আসে, ও সেই অর্থেই ভাস্কর।' আর পরে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে : 'বুঝতেই পাচ্ছ ইনিই রুচিরা, আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান।' বলে আস্তে-আস্তে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জগৎপতি।

ঘরের মধ্যে চুপ করে রইল দুজনে। স্তব্ধতা কোনো কালে এমন চেহারা নিতে পারে ভাবতেও পারত না কেউ। ঘরের মাঝখানে ভাস্কর দাঁড়িয়ে, আর রুচিরা খাটের উপর বসে, পিছন ফিরে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কেউ কাউকে চেনে না, কে কী বলবে বা কেমন করে বলবে জানা নেই, শুধু এক ঘর শূন্যতা এক পিণ্ড পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। যেন কোথাও আরম্ভ নেই সমস্তটাই সমাপ্তি দিয়ে ভরা।

দূর ছাই, আমার ঘরে গেছে দাঁড়িয়ে থাকতে। চঞ্চল হয়ে উঠল ভাস্কর। যার কাঁদবার কথা, সাধবার কথা, মূর্ছার মূর্তিমতী আকৃতি হয়ে ওঠবার কথা, সে বিমুখ হয়ে বসে থাকবে আর আমি ধানাই-পানাই করব এ অসম্ভব।

'দয়া করে পর্দাটা টেনে দিন।' মুখ না ফিরিয়েই বললে রুচিরা।

ভাস্কর চলে যাবার জন্যেই বুঝি এগিয়েছিল দরজার দিকে, এখন কথা শুনে পুরু করে পর্দাটা টেনে দিয়ে খাটের অনেক কাছে এসে দাঁড়াল।

'বসুন।' ঘাড় ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে চেয়ার দেখাল রুচিরা।

ভাস্কর বসল কাছাকাছি। বললে, 'কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তবে কার সঙ্গে কথা কইব?'

তবু নিঃসাড়ের মত বসে রইল অন্য-মনে।

'ভাগ্যের প্রহারে আমাদের মুখ হতই বিকৃত হোক,' ভাস্কর বললে, 'আমরা সেই মুখেই পরিপূর্ণ সম্ভাষণ করব পৃথিবীকে। আমরা পরাজিত নই কিছু-তেই।'

রুচিরা মুখ ফেরাল।

সন্ধ্যা হব-হব করলেও ঘরে আলো ছিল, যে-আলোতে ধীরেসুস্থে সব কথা-টাই বলে নেওয়া যায়। কিন্তু অস্থির হয়ে উঠল ভাস্কর, জিগগেস করল, 'আলোর সুইচটা কোথায়?'

সেটা আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয়, শুধু পরোক্ষে জেনে নেওয়া আলো জ্বালতে রুচিরার আপত্তি আছে কিনা।

না, নেই। সুইচটা দেখিয়ে দিল রুচিরা।

আলোটা জ্বালতেই রুচিরা ঝলমল করে উঠল। সমস্ত ঘুসর সোনার রং ধরল। উজ্জ্বল আর মধুর বেজে উঠল একসঙ্গে।

কিন্তু আলোতে তো শুধু দেখা নয়, নিজেকেও দেখানো। ভাস্কর তাকাল অন্যদিকে।

রুচিরা জিগগেস করলে, 'আপনি নতুন চাকরিতে জয়েন করেছেন?'

'করিনি এখনো।'

'দেখবেন।' যেন সাবধান করে দিচ্ছে রুচিরা। 'ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ে নেবেন।'

'খোঁজ-খবর?'

'হ্যাঁ, যেন শেষে না ঠকেন।' তীর্যক বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রুচিরা : 'চার-দিকেই স্বার্থপরের ভিড়। আর, সেই টাকাটা পেয়েছেন?'

'টাকা?'

'যে নগদ দশ হাজার টাকা দেবার কথা—পাঁচ হাজার এখন আর পাঁচ হাজার পরে—দিয়েছে প্রথম কিস্তি?'

'দেয়নি এখনো।'

'আগে নিয়ে নেবেন। নগদ নেবেন। আগাম নেবেন। চেক-টেক বিশ্বাস করবেন না।'

'না, না, সে কী অবিশ্বাসের কী আছে?' কুণ্ঠায় কালো হয়ে গেল ভাস্কর।

'তবু সাবধান থাকা ভালো।' কালো চোখের কোলে একটু বুঝি মমতার

অভাব আনল বৃচিরা : 'আগের চাকরিটা হুট করে ছেড়ে দেবেন না।'

'না, আমি কয়েক দিনের ছুটি নেব প্রথমে। ছুটি নিয়ে দেখব নতুন চাকরিটা সাতা সত্যি কিনা, মরীচিকা কিনা।' হাসল ভাস্কর : 'ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।'

যার সঙ্গে সম্পর্ক হবে, তাকেই, তার সঙ্গে প্রথম আলাপে কী সব কথাবার্তা! ভগবানকে বলিহারি। এমন কথা কোনো শাস্ত্রে, কোনো ইতিহাসেই বুঝি লেখা নেই। কিন্তু কী করা যাবে, আনন্দ তো আর সবার কাছে এক পোশাকেই আসে না। আনকোরা নতুন পোশাকে যদি না পায়, বাসি মলিন পোশাকে এলেও বড় সুন্দর লাগে না মাঝে-মাঝে।

'তা ছাড়া, চাকরি বিপদ এলেও বা কী এসে যায়!' একটু বুঝি স্ফূর্তির টান আনল ভাস্কর : 'এমন যার হৃদয়ের তার যোগ্য ব্যবস্থা হবেই।'

'হৃদয়ের?' হঠাৎ যেন চমকে উঠল বৃচিরা।

'বাঙলা ভাষায় তো তাই-ই বলে জানি।'

চোখে পড়তেই হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে নিল বৃচিরা।

'সেই কথাটাই তো আমি জানতে এসেছি আপনার কাছে।' চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে আনল ভাস্কর : 'আমাকে কেন নির্বাচিত করলেন?'

এতটুকু অপ্রস্তুত হল না বৃচিরা। বললে, 'একজনকে নির্বাচিত করতে হতই।'

'কিন্তু আমাকে কেন?'

'তা জানি না। আপনি বরং নির্বাচন।'

'কিন্তু আপনার যিনি নির্বাচক ছিলেন তিনি কোথায়?' ভাস্করের কথার টানে একটু বুঝি বা কাজ ফুটে উঠল।

'জানি না। শুনেছি তিনি বিদেশে চলে গিয়েছেন। এত বড় অসৎ, যাবার সময় দেখা পর্যন্ত করল না। দেখা করা দূরের কথা, জানালও না চলে যাচ্ছে। গিয়ে একটা চিঠিও লিখল না। অফিস থেকে নাকি পাঠিয়েছে, বার ঠিকানা এনে দিলেন। কত লেখালেখি কত তার-টেলার, কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই কিচ্ছু নেই—'

'তার নাম কী?'

রুক্ষ রেখায় করুণ করে হাসল বৃচিরা। বললে, 'সে যখন পুরুষ তখন তার নাম অদৃষ্ট। আর সে যদি মেয়ে হত তার নাম হত নিয়তি।'

ভাস্কর ভেবেছিল এইখানে বৃচিরা কান্নায় ভেঙে পড়বে, যে অপমানের প্রতিশোধ নেই তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কিন্তু তা নয়, স্বরে দৃঢ়তা আনল বৃচিরা। বললে, 'অদৃষ্ট যখন জীবনকে ধরে বেঁধে মারে তখন জীবন সেই অদৃষ্টকে অস্বীকার করতে চায়, অতিক্রম করতে চায়। শত মার সত্ত্বেও সেই বন্ধন মেনে নিতে চায় না, কিছুতে না। চায় বেরিয়ে আসতে। মুক্ত হওয়া মুক্ত থাকাই জীবনের একমাত্র কাম্য। আমিও তাই মুক্ত হতে চাই; আর সম্প্রতি আমার সেই মুক্তির উপায় আপনি।' অসঙ্কোচ দৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রার্থনা এবার রাখল ভাস্করের মুখের উপর।

ভাস্কর বললে, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায়, আর কোনো পথ ছিল না?'

'ছিল হয়তো কিন্তু কোনোটাই এ রকম সম্ভ্রান্ত বা নিরাপদ নয়। আপনি কি আমাকে আত্মহত্যা করতে বলছেন?' একটু হাসল বৃচিরা।

'না, না, অসম্ভব।'

'বাঁচবার পথ যদি একান্তই না পাই তখন দেখা যাবে। আর শত দুঃখে-ক্লেদে জীবনে-বঞ্চনায়, সব অবস্থাতেই বাঁচবার পথ আছে এ আমার বিশ্বাস।'

'অমরত্ব!'

'আরেক পথ ছিল আইনের বিরুদ্ধতা করা, তাতে বাবার ভীষণ আতঙ্ক।'

'নিশ্চয়। তাতে শুধু মৃত্যুরই ভয় নয়, মৃত্যুর উপরে আবার জেলের ভয়।'

'আরো একটা পথ ছিল। সে হচ্ছে বাড়ি থেকে একেবারে পথে নেমে আসা। নিরাশ্রয় সাজা। তারপর কোনো হোম-এ গিয়ে ওঠা। তা আমি সব কেন?' অনেকক্ষণ খাড়া হয়ে বসে ছিল এবার একটু হেলান দিল : 'আমার এত বড় বাড়ি, এত সব বিলুপ্ত এ আমি কেন ত্যাগ করতে যাব? জীবনের প্রথমে কোথাও একটা ভুল করেছি, তাই বলে কি বাকি জীবন ভোগের বার হয়ে গিয়েছি? একটা তুচ্ছ হঠকারিতার শাস্তি কি সমস্ত জীবন পঙ্গু করে দেওয়া?'

'না, না, কিছুতে নয়।' সব দিক থেকে সায় দিতে পেরেছে জেনে শান্তি পেল ভাস্কর।

'তাই দেখছেন এ নতুন আভরণ পথটাই সবচেয়ে নিরীহ, সবচেয়ে মানানীয়।' ভাঁপাটাতে আর একটু লালিমা আনল বৃচিরা।

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী হস্তরেখা বিশারদ ও তন্ত্র শাস্ত্রে গভর্নমেন্ট স্বীকৃত একমাত্র উপাধিপ্রাপ্ত রাজজ্যোতিষী মহোদয় ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর শাস্ত্রী মহোদয়কে তাঁহার কৌষ্ঠী দেখাইয়া ও হস্তরেখা পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার কৌষ্ঠী ফলের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ভারত ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার গণনায় ও অভ্রান্ত নির্দেশে এবং নবগ্রহ উপাসনায় অসংখ্য নরনারীর বিপদ মনীষিবৃন্দ ধন্য ধন্য করিতেছেন।

সব জটিল প্রশ্নের একটি জায়গা জবাব

শান্তি কবচ:—পরীক্ষার ফল, মনোমত ও কার্যসিদ্ধি, অকাল-মৃত্যু, দুর্ঘটনা সর্বপ্রকার বিপদ—১৫, বিশেষ—২০।

ধনদা কবচ:—ব্যবসায় উন্নতি, শত্রুবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে জয়লাভ হয়। সাধারণ—১২, বিশেষ—৫১।

সত্বরে হস্তরেখা বিচার করাইবার জন্য মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্বে ১। **হরেন্দ্র জব পাব্লিশার্স** (ইংরাজী) ৭, ২। **শারদীয়া বঙ্গ** (বাংলা) ৫, টাকা। **হাউস অব এম্পোরিয়াম** (ফোন ৪৭-৪৩১৩) ৪৭এ, এস পি মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৬

শুষ্ক রেখায় হাসল ভাস্কর। 'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আমি এর মধ্যে এলাম কী করে? আমার কী যোগ্যতা ছিল!'

যাহাহা, এ অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? কথাটা বলেই মনে মনে নিজের গালে চড় মারল ভাস্কর। তোমার কালকড়িরও যোগ্যতা নেই। না বিদ্যা না বিত্ত না বুদ্ধি না রূপ। আর ঐ তো তোমার চেহারার ছিরি। তোমার একমাত্র যোগ্যতা তুমি গরিব, তুমি একটা হীন-কম্ব কেরানি, তুমি একটা মোটাসোটা চাকরির পেলে বর্তে যাও, এক থোকে হাজার টাকা তুমি এখনো দেখনি, আর, সোনার মত সুন্দর এক লোচনলোভন তরুণী দেখলে তুমি লালায়িত হবে। জগৎপতি ঠিক তোমার পরিমাপ বুঝে নিয়েছেন। আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাড়ম্বরে শুনতে চেয়ো না।

'আপনি আদর্শবাদী, তাই বোধহয় আপনাকে যাবার ভালো লেগেছে।' বুচিরা কণ্ঠাটাকে অন্য আলোয় রাখল। 'মনে হয়েছে নির্ভরযোগ্য।'

'আদর্শবাদী?'

'হ্যাঁ, সেই গোড়াতেই যে বললেন আমরা পরাজিত নই কিছুতেই, সেই-খানেই তো আপনার আদর্শবাদের সূত্র। আর যারা আদর্শবাদী তাদেরই নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস করা চলে। বিশ্বাস করা চলে যে তারা কথা রাখবে, সর্ত পালন করবে।' হাত দুটো তুলে মাথার পিছনে এনে রাখল বুচিরা।

'ও! বছর খানেক বাদে বিয়েটা ছেড়ে দিতে হবে সেই কথা বলছেন?' ভাস্কর বুকের মধ্যে মোচড় খেল: 'সেইটে কি এসেনসিয়েল?'

'বা, সেইটেই তো সমস্ত কথা। সমস্ত কৌশলটাই তো আমার মুক্তির জন্যে। এক্ষণ তবে কী বলছিলাম আপনাকে? মুক্তি—মুক্তি ছাড়া আর কী আছে!' আবার তন্দ্রা বললে, লাবণ্যের নদীতে ঢেউ তুলে নড়ে-চড়ে বসল বুচিরা: 'আপনিই বলুন, মুক্তির মত আর দামী কী!'

'তাতো ঠিকই।' ভাস্করকে আবার সায় দিতে হল।

'নর্মালি আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবার কথা নয়, যা আমাদের সামাজিক বা সাংসারিক অবস্থা। আপনার সামরিক সম্পর্কটা যার নিছি শুধু আমার মুক্তি কিনে নেবার জন্যে। বলুন,' বুচিরার চোখ দুটো অজানা ছোঁয়ায় চকচক করে উঠল: 'মুক্তির জন্যে কী মূল্য না দেওয়া যায়! তা ছাড়া—'

চোখ তুলে তাকাল ভাস্কর।

'তা ছাড়া, যে নষ্ট যে খল যে অসাধু তাকে আপনি নেবেন কেন? তার সঙ্গে জড়িয়ে আপনার সুন্দর পবিত্র জীবন কেন বিড়ম্বিত করবেন? না, কখনো না। আমিই তা দেব না হতে। নিজেকে বাঁচাতে পারিনি,' চোখ নিচু করল বুচিরা: 'কিন্তু আপনাকে বাঁচাব।'

উত্তরে ভাস্কর কী বলবে? বাঁচবার কথায় বাঁচাবার কথায় কী বলার থাকতে পারে? আর জীবনকে সুন্দর রাখা, পবিত্র রাখা, অম্লান রাখা—এ সব তো উচ্ছ্বাসের কথা। এতে কারই বা আপত্তি? কিন্তু কেউ নষ্ট-ভ্রষ্ট হলেই সে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যায় তাই বা কে বলে? বরং এখন, যেমন মনে হচ্ছে, কারু কারু বেলায় একটু দেখ একটু, ত্রুটি একটু কালিমা থাকলেই বুঝি সে বেশি লোভনীয় হয়। তাকে তখন একটু ক্ষমার চোখে দয়ার চোখে শান্তির চোখে দেখতে হয় বলেই সে দর্শনে রূপ বুঝি আরো বেশি ফোটে।

'আমি না হয় সব কথা গোড়াতেই বললাম, কিন্তু এমন যদি হত', চোখদুটি বেদনায় নম্র করল বুচিরা: 'বিয়ের পর আপনি প্রথম জানতে পারতেন যে আপ-নার স্ত্রী' মুখ ফেরাল বুচিরা: 'আমারই মত বন্দী, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করতেন না, নিশ্চয়ই তাকে তখুনি ত্যাগ করতেন, ছুটি দিয়ে দিতেন—'

'বলা যায় না কী করতাম!' সপ্রতিভ মুখ করল ভাস্কর: 'রেখে দিতেও পার-তাম।'

'কি, সর্ত থাকলেও?' প্রায় রুখে উঠল বুচিরা।

'না, সর্তের কথা আলাদা।'

'কিন্তু আমার বেলায় সর্ত আছে।' কালো কটাক্ষে ইস্পিরাম্বির সঙ্কেত আঁকল বুচিরা।

'সে আমার মনে থাকবে।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

'আপনি খুব ভালো।' কী বলবে, এ ছাড়া কী বললে আরো ভালো শোনাতে পারে বুচিরা ভেবে পেল না।

'কিন্তু—' যাই-যাই করেও তখন যাওয়া যায় না এমনি মনে হল ভাস্করের।

'কিন্তু, কী—' ভয়-ভয় চোখে তাকাল বুচিরা।

'কিন্তু, বলুন,' হাসল ভাস্কর: 'শেষ পর্যন্ত এমন যদি হয় আপনি সর্তটা এনফোর্স করতে চাইলেন না?'

'তার মানে?'

'তার মানে এই বিয়েটা আর ভেঙে দিতে চাইলেন না?'

'না, না, তা কেন?' খাঁচায় আটকানো পাখির মত বুচিরার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠল। 'আমার চাওয়া-না-চাওয়ার কী এসে যায়? শুনুন আমি চাই কি না চাই, সমস্ত অবস্থাতেই আপনার সর্ত আপনাকে পালন করতে হবে।'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু জানেন তো, সর্তটা কার্যকর করা সর্ত যে আরোপ করে তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।'

'বুঝতে পাচ্ছি না।' জলে-পড়ার মত মুখ করল বুচিরা।

'ধরুন আমার ঘড়িটা আপনার কাছে রাখতে দিলাম। সর্ত করে দিলাম যে, সাত দিন পর আপনাকে সে ঘড়ি ফেরত দিতে হবে। সাত দিন হয়ে গেল—'

আশ্চর্য হয়ে উঠল বুচিরা। বললে, 'বা, তক্ষুনি-তক্ষুনি আমি ফেরত দেব।'

'কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আপনার যদি একটু ভুল হয়ে যায়, একদিন দেরি করে ফেলেন—'

'বা, সর্তের জোরে আপনি তা আদায় করে নেবেন।'

'আমিও তো তাই বলছি। যেহেতু সর্ত আমি আরোপ করেছি আমিই তা আদায় করব।' হাসি-হাসি মুখটা আরো সরল করল ভাস্কর: 'কিন্তু ধরুন, দেখ-লাম সে-ঘড়িটা আপনার পড়ার টেবলের উপর পড়ে আছে, কিংবা আপনার হাতে বাঁধা, তখন আমার ইচ্ছে হতে পারে, ও ঘড়ি আমি আর ফেরত চাইনে, ও ঘড়ি আমি একেবারে আপনাকে দিয়ে দিলাম।'

'আমি তা নেব কেন?' প্রায় যেন জ্বলে উঠল বুচিরা: 'আমি আমার কথা রাখব। আপনার জিনিস ফিরিয়ে দেব আপনাকে।'

'আমি যদি না নিই আপনি কিছুই করতে পারেন না। ঘড়ি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন বাইরে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন হাতুড়ি মেরে, যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি হাত পেতে ফেরত না চাইলে আর ফেরত দিতে পারেন না আমাকে। তেমনি—'

'তেমনি, তেমনি কী?'

'তেমনি, এক্ষেত্রে সর্ত থাকা সত্ত্বেও আপনার ইচ্ছে হতে পারে সর্তটা এন-ফোর্স না করি, যখন আচ্ছাদিত হয়েই গিয়েছি তখন বিয়েটা আর না ভাঙি। মোটকথা', আনন্দের একটু রঙ ছিটোল কথায়: 'মোটকথা বিয়েটা আপনার ভালো লেগে যেতে পারে।'

'তা কী করে হয়?'

'তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয় হয়তো।' হাসল ভাস্কর: 'তবু মানুষের মন আর সময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। যার সঙ্গে নর্মালি আপনার যুদ্ধ হওয়ার কথা নয়, তাকেই

হঠাৎ ভালো লেগে গেল। বিয়ে ভাঙার কথা আর মনে রইল না।'

কী লোভী বোকা-বোকা দেখাচ্ছে লোকটাকে। কথাটা একেবারে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। একটু আশ্বাস দিতে হয়, নইলে প্রেরণা আসবে কী করে? তাই রুচিরা ভাস্করের দিকে চেয়ে অপরূপ ইশারায় হাসল। বললে, 'সেই চান্স তো সব সময়েই আছে। ভালো যদি লেগে যায় তা হলে কে আর চলে যাস!'

'বলা যায় না। মাঝে মাঝে অসম্ভবও ঘটে যায় জীবনে।'

'নইলে আর জীবন কী!' হাসির ইশারার মধ্যে একটা টান দিল রুচিরা : 'আমি চলে যেতে না চাইলেও হয়তো আপনি তাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন। আপনারই আমাকে অসহ্য মনে হবে।'

'হ্যাঁ শুনেছি কখনো কখনো দরিদ্রের পেটে অমৃত সহ্য হয় না।'

'তখন দেখবেন সর্তটা ছিল বলেই বাঁচোয়া।' খাট থেকে নামবার উদ্যোগে একটি ভঙ্গির ভঙ্গি করল রুচিরা।

বড্ড বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকছে না? এণাক্ষী এল তদারক করতে। এসেই এক মুহূর্তে আপাদমস্তক দেখে নিল ভাস্করকে।

'আমার মা' বলে পরিচয় করিয়ে দিল না রুচিরা। আর এণাক্ষীর মূর্তিতে এখন শুধু তিক্ততার ভাঁজ। এমন ভাব দেখছে ভাস্করকে যেন সেই আসামী অপরাধী।

'এখন আসি।' সিঁড়ির রাস্তা চিনে এসেছে, তাড়াতাড়ি নেমে গেল ভাস্কর।

'এই ছোঁড়াটা?' খোলা দরজার দিকে উগ্র চোখ পাঠাল এণাক্ষী।

জগৎপতি এ.সি সায়িল হলেন।

'তুমি রাজ্যে আর লোক পেলে না? কোত্থেকে একটা বাজে-মার্কাকে ধরে এনেছ?'

'না, না, ছেলেটা ভালো।' জগৎপতি এক কথায় সেরে দিতে চাইলেন।

'কিন্তু কী কুচ্ছিত দেখতে! বেঁটে, মোটা, চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা—'

'না, না, অমন কিছু মন্দ নয়। তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো। বেশ সুশ্রী সবল চেহারা। খাঁটি ছেলে। ভিত-বনেদ মজবুত।' এও জগৎপতি বাড়িয়ে বলছেন কিনা কে জানে।

'এ রকম একটা জংলিকে জামাই করবে?' প্রশ্ন তোলে ফেললেন এণাক্ষী।

'এ তো আর চিরকালের জন্যে হচ্ছে না। বড় জোর বছর দেড়েকের জন্যে হচ্ছে। তারপর ছেড়ে দিচ্ছে রুচিকে, ভেঙে দিচ্ছে বিয়ে।' জগৎপতি দেখলেন রুচিরা অন্ধকারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এণাক্ষীর কিঞ্চিৎ সন্নিহিত হলেন গোপনে কথা বলবার জন্যে। এমন একটা বিষয় কথা বলেও সুখ নেই। অথচ স্তব্ধতাটাও ভয়ঙ্কর। বললেন, 'এটা একটা ক্যাপসুলে বিষ, সমস্ত ব্যাপারটাকে ডাইনের চোখে সিদ্ধ করবার জন্যে। বিষেটা যে ফের ভেঙে যাবে, ডিভোর্স করে দেবে সেটাও বৈধ ব্যাপার। আর তাহলেই ঝামেলা। কেউ কোনো কিছু খুঁত ধরতে পারবে না, সম্ভ্রান্ততা সব দিক থেকেই বজায় থাকবে। জীবনে পূর্ণ হয়ে বাঁচবার, নতুন করে বাঁচবার আবার একটা সুযোগ পাবে রুচিরা। সেই সুযোগ ওর জন্যে আবার তৈরি করে দেব। একবার ভুল করেছে বলে আরো একবার করবে না নিশ্চয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু ধরো,' চোখ মুখ

CBF-18a-57

ঘোরালো করল এণাক্ষী : 'যদি ও রুচিকে ছেড়ে না দেয়!'

'ছেড়ে না দেয়?'

'যদি ডিভোর্স না করে! বিয়ে না ভাঙে! আইনে তো তুমি ওকে বাধ্য করতে পারবে না। কি, পারবে?'

'না। তা পারব না। শুধু ওর মুখের কথা। ব্যাপারটা কাগজে-কলমে উঠে কাগজে-কলমেই কাটা পড়বে—এই ওর প্রতিশ্রুতি। আমি জানি,' জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'ও ওর কথা রাখবে।'

'সকলেই সব কথা রাখল। কিন্তু ধরো যদি না রাখে! যদি বউ আটকায়!' দ্বিতীয়বার দেখল এণাক্ষী।

'তখন অন্য পথ দেখতে হবে। মোট-কথা, যে করে হোক,' চিবুকে কুটিল রেখা ফেললেন জগৎপতি। 'জানতেই হবে ছাড়িয়ে।'

'কিন্তু যদি কোনো কারণে জানতে না পারো, আর যদি ঐ কথাকার লোকটাই পার্মানেন্ট জামাই হয় আমি পাগল হয়ে যাব।' এণাক্ষী হাঁসফাঁস করে উঠল। 'নিশ্চয়ই টাকা দিয়েছে ওটাকে?'

'একটা ভদ্রস্থ চাকরি দিয়েছি। বেশ কিছু নগদ টাকাও দেব বলেছি। নইলে ওর উৎসাহ হবে কেন?' ও কেন এগিয়ে আসবে? কেন কাজ পোয়াতে রাজি হবে? কখনো-কখনো মানুষের সদ্‌গুণকে উস্কে দেবার জন্যেও টাকা কাজ করে। কখনো-কখনো টাকা পেলে বলেই মানুষ পরোপকারী সাজে। আগুনে পর্যন্ত ঝাঁপ দেয়।'

'তার মানে,' কান্নার সুর আনল এণাক্ষী : 'লোকটা টাকাও খাবে মেয়েটাকেও আটকাবে। জানি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

'অত সোজা নয় আত্মহত্যা।' জগৎপতি বারান্দার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাস্কর কথা বেলাপ করবার মত ছেলে নয়।'

'আমি বলি কী, তুমি ওরকম গরিব-দুঃখো ছেরনি-ক্লাশ না ধরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ভদ্র শিক্ষিতকে ধরো—যেমন সাধারণ অবস্থায় হলে ধরতে। সেইখানে টাকা ঢালো। সেইখানেই খাটিয়ে নেওয়াও।'

'এই না হলে মেয়েলি বুদ্ধি।' অন্ধকার বারান্দাকেই মুখ আবার লক্ষ্য করলেন জগৎপতি : 'এমনিতে যে উপহুড়ে পড়ে সে ছেলেদুটোকে কিছুতেই রাজি হবে না। শুধু টাকাই তার আকর্ষণের বস্তু হলে না কখনো। আর যদি তুমি নুচিকে নিয়ে বিয়ে দাও পরিবার ভাস্করের ছেরেও বেশি হবে। তাছাড়া বিষয়টাকে ব্যঙ্গ করে কতজনের কাছে তুমি খাটাই করবে শুনি? জানাজানি হয়ে শেষ পর্যন্ত যার লাইব্রেরিতেও চি-টি পড়ে যাবে। যে পথটা আমি ঠিক করেছি সেইটেই সব চেয়ে বিচক্ষণ। লো-ক্লাশ গরিব কেরানিই টাকার জন্যে উত্তেজিত হবে। আর এখানে জানাজানির ভয়-ডর কিছু নেই। গোড়া-গুড়ি থেকেই দলিলে-প্রমাণে নিখুঁত।'

'তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবার পর?'

'তখন আবার নতুন পরিচ্ছেদ।' বললেন জগৎপতি, 'এমনিতে হ্যান্ডি-ক্যাপড মেয়ের চেয়ে ডিভোর্সড স্ত্রীর বাজার দর অনেক বেশি। বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে রুচিরা আবার নতুন করে পাত্রস্থ হবে। নতুন করে পৃথ্বী ওলটাবে।'

'ভগবান জানেন কী হবে!' এণাক্ষী বারান্দা থেকে মুখ সরিয়ে আনল ঘরের মধ্যে। বললে, 'একটিন করবার জন্যে যে ছেলেটাকে ঠিক করেছ সেটার রুচির মত আছে তো?'

'আর মতামত!' নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি : 'এখন তো পাত্র লক্ষ্য নয়, এখন লক্ষ্য শুধু তিনটে দলিল। এক, বিয়ের, দুই বার্থ-সার্টিফিকেটের আর তিন বিচ্ছেদের ডিক্রির। পাত্র ফুটোই হোক আর আস্তাই হোক কী যায় আসে।

'কিন্তু যা করতে হয় তাড়াতাড়ি—'

'তাতে আর সন্দেহ কী।' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

১১

অপিস থেকে ফিরে ভাস্কর দেখল মা খুব মনোযোগের সঙ্গে একটা চিঠি পড়ছে। লম্বা চিঠি।

'আপনার ছেলেকেই ইন্টারভিউ করবেন।' সেবারকটায় চলে এসেছে মহালয়া : 'সে যদি মানুষ হয় নিশ্চয়ই সে সমস্ত স্বীকার করবে। অসহায় মেয়েকে বাপের বাড়ি ফেলে সরে পড়বে না। অবিলম্বে বিয়ে করে নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। আপনি মহীয়সীর মাতার মত আপনার ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন।'

'কে লিখেছে চিঠি?'

'নাম নেই।'

'নাম নেই? বেনামী চিঠি কে লিখল?' হাত বাড়াল ভাস্কর।

'পড়ে দ্যাখ—' মহালয়ার মুখ থমথম করতে লাগল।

সমস্ত বিষয়। ভাস্কর চিৎকার করে উঠবে এই আশা করেছিল মহালয়া, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাস্কর চুপ করে রইল। শুধু নিজের মনে বলে উঠল : 'আমিই তোমাকে সব বলতাম।'

'তাহলে এ সব যা লিখেছে সত্যি?'

হাঁ-না কিছুই বলল না ভাস্কর। চুপ করে রইল।

তার মানে তাই।

মহালয়া নিশ্বাস ছাড়ল। মুখে খুশি-খুশি ভাব করল : 'তাহলে আর দেরি করছিস কেন? আমার গোপাল এসেছে। গোপালকে নিয়ে আয় উদ্ধার করে।'

এক স্তূপ পাথরের মত অনড় হয়ে বসে রইল ভাস্কর। গায়ের জামাটা খুলে ফেলার কথাও ভুলে গেল।

'তাই সেদিন এই ভালো চাকরিটা জুটিয়ে দিল।' পাশের ঘরে যেখানে ঠাকুর আছে সেদিকে লক্ষ্য করে মহালয়া বললে, 'সবই গোপালের ইচ্ছে। গোপালের দয়া।' যুক্ত করে প্রণাম করল মানসবিগ্রহকে।

এর মধ্যে যে অনিয়ম আছে সহসা দেখতে চাইল না। তবু চোখ এড়াল না ভাস্করকে কেমন যেন একটু শীর্ণ একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে। তাই একবার মহালয়াকে বলতে হল : 'এ যে কেমন করে হল কেমন করে হয় কে বলবে।'

এবারও চুপ করে থাকাই উচিত ছিল হয়তো কিন্তু অন্য অর্থে সতোর সুর আনল ভাস্কর। 'কখন কী করে যে কী ঘটে যায় কেউ জানে না।'

'তা যা হবার তাই হয়েছে। এখন তা নিয়ে কথা বলা বৃথা।' ভাস্করের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল মহালয়া : 'নতুন চাকরিতে তোর মোট কত মাইনে বাড়ল?'

'প্রায় দু শো।'

'আমি বলি কী, এবার একটু ভালো দেখে বাড়ি ভাড়া কর।' নিজেই তার কারণ দেখাল মহালয়া : 'নতুন বউ আসবে বাড়িতে।'

মাকে আরো একটু উৎসাহিত করতে লোভ হল ভাস্করের। বললে, 'তা ছাড়া যৌতুক বাবদ পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছেন।'

'বলিস কী! পাঁচ হাজার?' প্রায় ভোর রাতের স্বপ্নের মত মনে হল মহালয়ার : 'কার্পিটার দেবে না?'

'তাও যা কোন না-দেবে!'

'তবে সে সব ঢোকাবি কোথায়? তাই বলছিলাম বাড়িটা বদলা। একটু ছিমছাম ঝরঝরে দেখে ঠিক কর। স্বপ্নকে বললে সেই ঠিক করে দেবে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, বাপ তার জন্যে কিছু অভাব রাখবে না।' আহ্লাদ সাঁতা চোখ কপালে এসে থামছে, পায়ের কাছে এসে থামিক বুদ্ধি আছাড় খেল

মহালয়া, আলোয়-আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বললে, 'নিজের ইচ্ছেয় বর বেছেছে মেয়ে, তার সে-ইচ্ছেকে মেনে নিচ্ছে, মান দিচ্ছে। আর সে মেয়েই তো একমাত্র ওয়ারিশ। তার মানে তুই—তুই-ই সমস্ত কিছুর মালিক হবি?'

'গোপালই সমস্ত কিছুর মালিক হবেন।' হাসল ভাস্কর।

'গোপাল—সে তো আমারই গোপাল।' ভাবার যুক্তকর হল মহালয়ার।

যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করা হয়েছে এমনি এখন মনোভাব মহালয়ার। শেষ যদি ভালো হয় তাহলে পথের ভালো নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়? পথ যতক্ষণ পথ ততক্ষণই মতামত, পথ যখন প্রাপ্তিতে এসে পৌঁছায় তখন একমাত্র আওয়াজ—জয়ধ্বনি। সাফল্যই পথের একমাত্র বিচার।

সাধ-খেলাধুলো মেয়ে সোমনাথ বাড়ি পৌঁছুতেই মহামায়া উথলে উঠল : 'জানিস তোর বাবার বিয়ে হচ্ছে?'

মার মুখে-চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে বটে কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা আনন্দের না আতঙ্কের বুঝতে পারল না সোমনাথ। শুধু বললে, 'সত্যি?'

'কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জানিস?'

'কার সঙ্গে? সোমনাথের কী জানবার থাকতে পারে কে জানে।

'সেই যে মিলিটারির সঙ্গে লড়েছিল তার সঙ্গে।'

'সত্যি?' উচ্ছ্বাসে এবার সোমনাথই ছাপিয়ে পড়ল : 'সেই মেয়েটা?'

'মেয়েটা—মেয়েটা কী? শাসন করতে চাইল মহালয়া।

আর কী বলা যায়, কী ভাবে বলা যায় জানে না সোমনাথ। চোখ দুটো কপালে রেখেই বললে, 'সে যে মা সাংঘাতিক সুন্দর দেখতে।'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।' সায় দিল মহালয়া।

'তুমি দেখেছ?' ভাস্কর জিগগেস করল।

'সেই এক দিন দেখেছি। যেদিন ওদের সেই তিনতলার ভাড়াটে নিয়ে গোলমাল হয়—সেই দিন দেখেছিলাম রাস্তায়।' কী যে অপূর্ব সেদিন দেখেছিল তা প্রকাশ করবার মত ভাষা কোথায় মহালয়ার, চোখে মুখে কপালে ভ্রূতে তারই ছবি আঁকল।

'আমি কত বার দেখেছি।' সুতরাং তারই বলবার অধিকার বেশি এমনি ভাব করল সোমনাথ। 'আর, মা, সাংঘাতিক বড়লোক।'

'সেই বড়লোক এখন আমাদের আপনার লোক হবে।' এ নাটকে সোমনাথের কোনো অংশ নেই, তবু তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করল মহালয়া।

'কিন্তু জানো মা, আমাদের দলের ছেলেরা বলে, ও খুব অহঙ্কারী।'

'ও কে?' মহালয়া আবার শাসনের ভুরু তুলল।

'যে আমার বৌদি হবে।' লজ্জার ভাব করল সোমনাথ।

'সে বুঝি ও হয়?'

'আর কী সর্বনাম আছে?' লজ্জার ভাব কাটিয়ে উঠল সোমনাথ : 'আগে বৌদি হোক পরে উনি বলা যাবে।'

'কিন্তু তুই অহঙ্কারের কী বুঝিস?' পাড়ার চোখ থেকে দেখা কোনো নতুন আলো ফেলতে পারে কিনা সোমনাথ জানতে কৌতূহল হল ভাস্করের।

সোমনাথ কথার কথা একটা বলেছিল মাত্র, চুপ করে গেল। মহালয়া বললে, যে এত সুন্দর দেখতে, যার এত টাকা-পয়সা, তার একটু অহঙ্কার থাকবে এ আশ্চর্য কী। তার একটু অহঙ্কার না থাকলে যেন মানায়ও না। তা ছাড়া ধনী-গুণী বংশের মেয়ে লেখাপড়াও শিখেছে নিশ্চয়—'

'বা, বি-এ পাশ করেছে।' এবার ভাস্করই বুঝি একটু গর্বের টান দিয়ে বলল।

'তারপর আবার বি-এ পাশ!' মহালয়ার প্রায় লটারিতে টিকিট পাবার মতন হল : 'ভগবানের এক সঙ্গে এত দয়া খুব কমই হয়। এত দয়া, এত দান!'

'তা ছাড়া এখানকার তরুণ সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' ভাস্কর বললে, 'ভীষণ পপুলার। কত পরোপকার করেছে, করতে চেষ্টা করেছে। সবাই এক-বাক্যে প্রশংসা করে।' কেন যে অপবাদ খণ্ডন করতে চাইছে, কার জন্যে, নিজেই যেন ভেবে পেল না ভাস্কর। তবু বললে, 'সেবা করতে বস্তিতে-বস্তিতে পর্যন্ত গিয়েছে, মজুরদের জন্যে নাইট-ইস্কুল খুলেছে—'

যদি অহঙ্কারই থাকবে তাহলে জেনে-শুনে সব ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে পরিবের ঘরের বউ হতে রাজি হয় না।' শেষ রায় দিয়ে দিল মহালয়া।

কোন জানলার কোন কোণে দাঁড়ালে ঐ বড়লোক বাড়িটার এক চিলতে আভাস পাওয়া যায় সোমনাথের জানা আছে। এখন অন্ধকারে কিছু ধরা যাচ্ছে না বটে কিন্তু আকাশের কোন জায়গায় সেই প্রাসাদ, অনুমান করে নিতে দেরি হল না। মনে মনে সেই রঙের প্রাসাদটাকে হাত বাড়িয়ে ধরল সোমনাথ। একেবারে টেনে নিয়ে এল তার ছোট্ট ঘরের মধ্যে।

পরামর্শে সন্নিহিত হল মহালয়া। 'কী ভাবে বিয়েটা হচ্ছে?'

'বুকতেই পাচ্ছ—সনাতন পথে নয়, চোরাগলিতে। মানে রেজেস্ট্রি করে। আলো নেই বাজনা নেই মিছিল নেই বরযাত্রী নেই। আর জানো তো', মায়ের হঠাৎ নিবে-যাওয়া মুখের দিকে তাকাল ভাস্কর : 'এটাই আজকালকার হিসেবে সব চেয়ে সভ্য রীতি।'

'তা মেয়ের বাড়িতে উৎসব হবে না? প্রীতিভোজ?'

'না হওয়ারই সম্ভাবনা। শত হলেও ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে তো।'

'তার মানে?'

'মানে মেয়ে তো আর বাপের মত নিয়ে পতি-নির্বাচন করেনি।' বললে ভাস্কর, 'আর সে-নির্বাচন বাপের মনঃকষ্টের নিশ্চয়ই কিছু আহা-মরি নয়, তাই—'

'তা বাপ কী করবে? মেয়ে যখন ভালোবেসে একজনকে সম্পূর্ণ বরণ করে নিয়েছে—'

'তাই তো বাপ পারল না অস্বীকার করতে। কিন্তু তার অভিমান হওয়া তো স্বাভাবিক। তাই কোনো উৎসব হবে এমন মনে হয় না।'

'কিন্তু আমার এখানে?'

'বলো কী করতে হবে?' চোক গিলল ভাস্কর : 'যেখানে দস্তখৎ করে বিয়ে সেখানে আবার সামাজিকতা কী। লোকজন খাওয়ানোর কথা তুলো না।'

'তা তুলছি না। কিন্তু বিয়ের পর যেদিন বউ এনে ঘরে তুলবি সেদিন সে সময়টায় আত্মীয়স্বজন থাকবে না কেউ? না বললে তারা আসবে কেন?' মহালয়ার স্বরে কান্নার ছোঁয়াচ লাগল।

'কাকে-কাকে বলতে চাও?'

'কেন, তোর মাসীমারা আছে, জেঠ-তুতো দিদি বৌদি আছে—'

'তারা কী করবে?'

'কেন, বউ ঘরে আসার সময় বউ-বরণ করবে, কিছু মাঙ্গলিক করবে, আশীর্বাদ করবে, বউয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে, বউয়ের মত করে একটু সাজাবে-গোজাবে—আগের থেকে তো তৈরি হয়েই আপিসে যাবে না, আর আপিসে, যেখানে বিয়ে হবে, সেখানে কি সিঁদুর আছে, না প্রসাধনের জিনিস আছে?'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' হাসতে লাগল ভাস্কর।

'ঠিক, আপিসেই তো বিয়ে। আর

সেখান থেকেই তো সটান বউকে ঘরের বাড়ি নিয়ে আসা।'

'তাছাড়া আবার কী। তবে বেশি লোক ডেকো না। ঐ যা বললে, মাসিমা, দিদি আর বউদি—'

'আর পাড়ার মধ্যে যারা আছে?'

'তারা তো পরদিন বাকি উঁকি মারতে আসবে।'

'কিন্তু ফুলশয্যে?'

ফুলশয্যে, না, তুলশয্যে! কথাটা জিভের ডগায় এসেছিল, মুখে দিল ভাস্কর। বললে, 'ও সব হাঙ্গামা বাধিয়ো না। একে ছোট বাড়ি, জায়গা নেই, তার দিন-কাল ভালো নয়।'

'দিন-কাল ভালো নয় মানে?'

'ভালো নয় মানে যারা সভ্যভব্য, প্রোগ্রেসিভ, তারা ও রকম শয্যে-টয্যে করে না। করলেও লোক ডেকে করে না।'

'বা, সকলকে ডেকে এনে আমি দেখাব না আমার ভাস্করের কেমন বউ হল? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এসে কেমন বসেছে মাটির ঘরে।'

'যার অদৃষ্টে যখন আছে তখন দেখবে।'

'বা, ফুলশয্যের রাত ছাড়া আবার কখন দেখবে? লোকে জিগগেস করলে আমি বলব কী—'

'কিছু বলতে হবে না। যদি বলতে হয় বলে দিও, ও সব লাগে না, ও সব আগেই হয়ে গিয়েছে।' বলেই উচ্চরোলে হেসে উঠল ভাস্কর। হাসিটা যেন বাপের হাসির মত শোনাতে চাইল, কিন্তু নিজেই নিজেকে বাঙ্গ করছে এটা কেমন তরো? তাই হাসিটা তাড়াতাড়ি পিষে ফেলে বললে, 'সামান্য কটা বা টাকা পাওয়া যাবে তা যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে কী লাভ!'

মহালয়া নিরুত্তর হল। জিগগেস করল, 'বিয়েটা কবে?'

'নোটিশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর দিন দশ-বারো পরেই মেয়াদ যাবে নোটিশের। তার পরেই তারিখ ঠিক হবে।'

'তারিখটা আমি জানতে পারব তো?' যেন অনেক কিছু জানায়নি, অনেক কিছুই গোপন করা হয়েছে সেই অভিমানই যেন।

'বা, বউ নিয়ে ঘরে ঢুকব সেদিন, তোমাকে প্রণাম করব দুজনে, আর তুমিই তারিখ জানতে পারবে না?'

মহালয়ার অভিমান জল হয়ে গেল। তরল মুখে বললে, 'দু-দিন আগে যেন জানাস। ওদের ঘরে যেন চেয়ে বউ দেখতে আসছে!'

হ্যাঁ, দিন ঠিক হয়েছে। আগামী বুধবার। বুধবার দুপুরে। বউ নিয়ে বাড়ি আসতে ধরো, বিকেল তিনটে—চারটে।

'আমি ওদের সকালে এসেই না হয় থাকতে বলব।' সময়ের পণ্ডিত আরো একটু বাড়িয়ে দিল: 'রেখে দেব সন্ধে পর্যন্ত।'

সোমনাথ অবশ্যি সেই দিন থেকেই রাজী করছে—জগৎপতিরও সেই মত, কিছু দিন আগে থেকেই রাজী হওয়া ভালো—বেশ তো, যদি কারু কিছু বলবার থাকে, আপত্তি করবার থাকে, নোটিশে প্রতিবাদী হও, দেখা যাবে হয়-নয়। আপিসেও বিয়ের কথা শুনতে পেল ভাস্কর। সবাই তার ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। লোকে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পায়, কিন্তু এ যে দেখি রাজকন্যা আর পূর্ণ রাজত্ব। আর জগৎপতি কত উদার। প্রেমকে সম্মানিত করবার জন্যে কত সে মুক্তপ্রাণ, কত সে মহানুভব!

কিন্তু সে বুধবার কতদূর?

কে একজন এক দিনের জন্যে রাজা হয়েছিল, ভাস্কর এক বছরের জন্যে স্বামী হবে! এক বছর কি কম সময়? এক বছরের পরেও চাকরিতে কিছুটা এক্সটেনসন হতে পারে। সেটা উপরি পাওনা। সমস্তটাই উপরি পাওনা। চাকরি, টাকা, এই লোভনীয় উপস্থিতি। এই অনাবৃত অধিকার। ছোঁয়া যায় না এমন একটা আগুনের শিখাকে কয়েক রাত্রির জন্যে শয়নাগারের প্রদীপ করা যাবে এ কে জানত। তারার এমন কত শব্দ আছে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, সে সব শব্দ এবার উচ্চারিত হবে: কত সুর আছে সঙ্কেত আছে যা রক্তে আনবে অজানা কম্পনা: কত রহস্য আছে যা শত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদেও পৌঁছুতে দেবে না তার সমাপ্তিতে। এ কী এক অসহ্য জাগরণ! সমস্তটা ক্ষণস্থায়ী বলেই যেন এত তীব্র স্বাদ। পাতাটা ছাড়তে ছাড়তেই পৌঁছে যাবে তারই জন্যে এত ত্বরা এত দাহ, এত ইচ্ছা।

দুপুরের দিকেই চলে এসেছে যাত্রা-শ্রী, কিছু পরেই গিনি দিদি আর মলয়া বৌদি এক সঙ্গে।

মলয়া বৌদি বললে, 'কতই যে তোমরা আরো দেখাবে।'

সায় দিল ভাস্কর: 'হ্যাঁ, এ তো শুধু ভূমিকা।'

মলয়া বৌদি আলপনা আঁকতে চাইছে, ভাস্কর মত দিচ্ছে না। বলছে, 'কাগজে-কলমের ব্যাপার, তার মধ্যে আবার দিনপঞ্জিকা কিসের?'

মানতে চাইছে না মলয়া, বলছে, 'সবটাই কি খবরের কাগজ, একটু কবিতা-টবিতাও তো থাকবে।' পিটুলি-গোলা নিয়ে বসে গেল মলয়া।

দুপুরে দুটো নাগাদ গাড়ি পাঠালেন জগৎপতি।

'সেই গাড়িই যখন পাঠাল তখন ফুলটুল দিয়ে একটু সাজিয়ে দিল না কেন?' মলয়া ঢলে পড়ল হাসিতে।

'আহা, আমি কনের বাড়িতে আসর করে বিয়ে করতে যাচ্ছি কিনা।' ভাস্কর বললে।

'তবু বিয়ে করতেই তো যাচ্ছ। আর গাড়ি দেখে বুঝছি পাত্রীপক্ষেরই নিমন্ত্রণে। কিন্তু যাই হোক, গাড়ির সাজ না থাক, তোমার সাজ থাকবে না কেন?' মলয়া ব্যস্ততার ভাব দেখাল: 'জংলি শার্ট আর প্যান্ট পরে তোমার যাওয়া চলবে না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাও।'

'আপিসের বিয়ে আপিসি পোশাকেই হওয়া উচিত। এ তো তবু আমি বিয়েতে ফুলপ্যান্ট আর ফুল-শার্ট পরে যাচ্ছি, কদিন পরে দেখবে পুজোর পুরোতেরা হাফ-প্যান্ট আর তোয়ালে-গেঞ্জি পরে পুজোয় বসেছে।' আগের কথাটা আবার নাটকীয়ভাবে আওড়াল ভাস্কর: 'এ তো শুধু ভূমিকা।'

গাড়িতে গিয়ে উঠেছে, গিনি-দিদি পিছু ডাকল। 'সে কি, মা-মাসিকে প্রণাম করে যা।'

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর বললে, 'বা, আপিস যাবার সময় আমি প্রণাম করে যাই নাকি? এও তো আপিসেই যাওয়া।'

ড্রাইভারকে জিগগেস করল, 'কোথায় যাবে?'

ড্রাইভারটাও উদ্ধত। কথার উত্তর দিলে না। ভাবখানা এই, দেখতেই পাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

গাড়ি এসে জগৎপতির বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

ভাস্কর নামল না। হর্ণ বাজিয়ে মালিকদের সজাগ করা অসভ্যতা তাই ড্রাইভার নিজেই খবর দিতে চলল। দরকার নেই। রুচিরা আগে থেকেই তৈরি। ড্রাইভার পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বেরিয়ে এল গেট খুলে।

যে দিকে ভাস্কর তার অন্য দিকের দরজা খুলে গাড়িতে উঠল রুচিরা।

ভাস্কর জিগগেস করলে, 'কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি?'

'এই কেটে যাচ্ছে এক রকম।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

একটু যা চঞ্চল হল ভাস্কর, বললে, 'আর কেউ যাবে না?'

'হ্যাঁ, বাবার দুজন জুনিয়র উকিল, রয় আর বাসু তাঁরা আসছেন ঐ পাশের গাড়িটাতে। তাঁরা সাক্ষী হবেন।'

'ঠিক আছে।' নাটকে তার কত বড় একটা বিশিষ্ট পার্ট এমনি প্রধানত্বের ভাবে ভাস্কর নড়ে-চড়ে বসল।

সজ্ঞানে তাকালও রুচিরার দিকে। এতটুকুও সাজগোজ করেনি। একটা ফুল নয়, একটু রঙ নয়, একটু হাসি নয়। বা, কী করে তুমি আশা করতে পারো? কোথাও কিছু আশা করবার নেই জেনেও অবাধ্য মন আশা করে। তাকে না হয় শাসন করলাম, কিন্তু সুটো কৃতজ্ঞতার কথাও তো বলতে পারে। আপনি কত ভালো, কত মহৎ, আপনার জন্যেই ফাঁসির দড়িটা খুলতে পারলাম গলা থেকে এ জাতীয় দু-একটা কথা। সেদিন কত কথাই তো হল, আজ একেবারে চুপচাপ নিশ্চুপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে যেন ভাস্কর কোথাকার কে এক বিদেশী। কোনো দিন তার নামও শোনেনি রুচির।

ভাস্করও কথা বলল না।

দশ মিনিটের মধ্যেই সই-সম্পাদন হয়ে গেল। একই মোটরের দুই প্রান্তে-বসা দুই নিঃশব্দ আরোহী স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল।

রয় আর বাসু বললে, 'আমরা তা হলে চলি।' তারা অতশত কী জানে, গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললে, 'আপনারা সুখে-শান্তিতে থাকুন। উইশ ইউ গুড লাক।'

'ওদের একটু খাইয়ে নিতে হয়।' ভাস্কর তাকাল রুচিরার দিকে : 'কী বলো, ডাকব?'

রুচিরা ভুরু কুঁচকালো। বললে, 'যা না-খিয়ে তার আবার ভোজ। রাখুন, ডাকবেন না কাউকে।'

'এ তো ভোজ নয় এ সামান্য ভদ্রতা।'

'ভদ্রতার কারু দরকার নেই। কাজ হয়ে গিয়েছে, উঠুন, এখন বাড়ি চলুন।'

আগে রুচিরা, পরে ভাস্কর উঠল। বিয়ের আগে যেমন ব্যবধান রেখে বসেছিল বিয়ের পরেও সেই ব্যবধান। বিয়ের আগে যেমন চুপচাপ করে এসেছে বিয়ের পরেও সেই চুপচাপ।

'শোনো তোমাকে একটা কথা বলি।' ভাস্কর মাস্টার-মাস্টার মুখ করল।

'বলুন।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে আপনি বলে বলতে চাও।'

'আমারও ইচ্ছে আপনিও আমাকে আপনিই বলুন।'

'অসম্ভব। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে আপনি বলে বলেছে ভূভারতে এমন কথা কেউ শোনেনি।'

'বেশ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, আপনি আমাকে ডাকতে পারেন 'তুমি' বলে। কিন্তু, মাপ করবেন, আমি পারব না।'

'শোনো, আমাদের বাড়িতে যখন যাচ্ছ তখন সবার সামনে আমার সঙ্গে যদি কথা বলো, তেমন কথা বলার অবকাশ অবশ্যি কম, দয়া করে 'তুমি' বোলো—খবরদার, 'আপনি' বোলো না।'

'কেন?'

'আমাদের বাড়ির সকলে জেনেছে, মানে অনুমান করেছে, তুমি আমার প্রেমে পড়ে আমাকে বিয়ে করছ। একমাত্র প্রেমই অযোগ্যকে রাজমুকুট পরাতে পারে, নইলে আমার মত অক্ষম-অধম লোক কী করে তোমার মালা পায়? সেক্ষেত্রে তারা যদি দেখে তুমি আমাকে 'আপনি' বলছ, তারা ভড়কে যাবে। তারা অনেক কিছু অঘটন সরল মনে মেনে নিতে পারে, কিন্তু যুবক-যুবতী পরস্পরকে 'আপনি' বলে প্রেম করছে ও বিয়ের পরেও 'আপনি' চালাচ্ছে—এতটা এদের সহ্য হবে না। এরা তাহলে সন্দেহ করবে, সুন্দর করে একটা বাগান সাজিয়েছি এতদিন—চষছন্ন করে ফেলবে।'

'কিন্তু', রুচির ভুরু কুটিলতর করল রুচিরা। বললে, 'কিন্তু আমাকে আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে কেন?'

'বা, বিয়ের পর বউকে নিয়ে বর বাড়ি যায় না? তেমনি এখন নিয়ে যাব তোমাকে।'

'বউ, কে বউ?'

'তুমি।' ছেলেমানুষের মত গোবেচারা মুখ করল ভাস্কর : 'আমার বউ।'

'আমাদের এটা কি বিয়ে নাকি? এটা একটা ছল।'

'সমস্তই ছল। সে না হয় আমি-তুমি জানলাম, কিন্তু অন্য লোকে জানে কেন?' অবাধ্যকে বোঝাবার মতন করে শান্ত সুরে ভাস্কর বললে, 'লেপাফা যখন হয়েছে তখন তাকে দোরস্ত রাখাই দরকার।'

'তার মানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী এটা প্রকাশ্যে দেখিয়ে বেড়াতে হবে?'

'অন্তত আজকের দিনে তো একটু দেখানো দরকার—আমার মাকে, আমার দিদি-বৌদিকে।' আপোসের ভাবই বজায়

রাখছে ভাস্কর : 'তারা আশা করে পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'মাপ করবেন। যা মিথ্যে তা সত্যি করে জানাবার কোনো দরকার নেই।'

'মিথ্যেকে মিথ্যে বলেই জানাতে বলছেন? তাহলে তো আদ্যোপান্ত, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই জানাতে হয়। সেটা কি তোমার পক্ষে, তোমার স্বামীর পক্ষে সুবিধের হবে?'

'কিন্তু, বলতে চান, সমস্তটাই কি ভিত্তিহীন নয়?' রুচিরাকে বুঝি একটু ক্ষুণ্ণ শোনাল।

'হয়তো তাই। কিন্তু আমার বাড়ির লোককে তা বুঝতে দেওয়া হয়নি। বুঝতে দেওয়া হয়েছে, তুমি আমার। সর্বসমেত আমার।'

'সর্বসমেত?' ভাস্করের চোখে এবার চোখ ফেলতে হল রুচিরাকে।

'হ্যাঁ, মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের নোখের কোনটুকু পর্যন্ত।' কণ্ঠস্বরে দৃঢ় হল ভাস্কর : 'শুধু আমাদের সংসারকে নয় জগৎ সংসারকে তাই বুঝতে দেওয়া হয়েছে। এখন, এই মুহূর্তে আমার সংস্পর্শে এসে তুমি সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছ। তাই সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'বাজে কথা।' পাশের দিকে আরো সঙ্কুচিত হল রুচিরা।

'কিন্তু যে দলিলটা দুইজনে যুক্ত হয়ে সই করে দিয়ে এলাম, যার একটা নকল পকেটে করে নিয়ে এসেছি সেটা বাজে নয়।' ভাস্কর দৃঢ়তর হল : 'আমার যতক্ষণ পর্যন্ত না নাক্ষ হচ্ছে ততক্ষণ ও ওর সঙ্গ করে যাবে।'

একটু বুঝি ভয় পেল রুচিরা। দীর্ঘ চোখে তাকাল ভাস্করের দিকে। বললে, 'আপনার বাড়িতে গিয়ে আমাকে কী করতে হবে?'

'শুধু একটু দাঁড়াতে হবে বউ হয়ে।' ভাস্করের গলায় কোত্থেকে আপনা-আপনিই মমতা এসে গেল : 'আঁচলটা একটু তুলে দিতে হবে মাথার উপর। এখন একেবারে কাঠ-কাঠ হয়ে আছ একটু লতা-লতা হয়ে দাঁড়াবে।'

আশ্চর্য, হাসল না রুচিরা। কাঠ-কাঠ থেকেই বললে, 'শুধু দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেই হবে?'

'তাই বলে নমস্কার, আসি, বলে দুটো হাত নাক বরাবর তুলেই পালাবে না, একটু বসবে।'

এখনো হাসল না রুচিরা। বললে, 'শুধু দাঁড়াব না, আবার বসব?'

'মানে বউ-বরণ করতে কী সব স্ত্রী-আচার করে মেয়েরা তাই হয়তো করবে।'

সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরা। তার মহান মুখে দই-মধু না গোবর পুরে দেবে, আর তুলো নিয়ে ঠুকবে কপালটা? অসম্ভব।'

'আচ্ছা, আমি ও সব না হয় বাদ দেব করে দেব। কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কী?'

'কিন্তু তোমার সিঁথিতে যদি কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দেয় আপত্তি কিসের?'

'সিঁদুর?' এবার বুঝি নিজের ভাষাটা যথেষ্ট মনে হল না। অন্য ভাষার শরণ নিল রুচিরা, বললে, 'ইমপসিবল।'

'সাপের ছোবলের মত মনে হচ্ছে বেন সিঁদুরটাকে?'

'তার চেয়েও বেশি। দেখুন কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। যা আমি বিশ্বাস করি না তা করতে পারব না কিছুতেই।'

'অনেক কিছু তো আমরা বিশ্বাস না করেও করি।'

'আপনি করুন গে। আমি করি না।'

'তুমিও করো। বিয়েতে বিশ্বাস না করেও বিয়ে করো।'

'থামুন। কিছুতেই পারব না পরতে।' রুচির কথা ছেড়ে দিয়ে যুক্তির কথা খুঁজে নিল রুচিরা : 'সিঁদুর পরলে একাকিমা হয়।'

'তেমনি মিষ্টি খেলে দাঁত যায়। সুপুরি খেলে ক্যানসার হয়। কিন্তু পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করলে কেমন সুন্দর দেখায় বলো তো। ছেঁড়া নোংরা শাড়ি, ওরাট মাথায় সিঁদুর, একেবারে রাণীর মত দেখাবে।'

'তারপরে আবার গয়নাও পরতে হবে নাকি?' রুচিরার সারা শরীর রি-রি করে উঠল।

'হাতের কবজিতে সরু সুতোর মত রাখি এও তো এক রকমের গয়না।' আবার অন্যরকম কণ্ঠস্বরে স্নেহ এল ভাস্করের : 'মা হয়তো তোমার জন্যে গলায় হার আর হাতের চুড় গড়িয়েছেন, তাই দিয়ে সাজাবেন তোমাকে। একটুকরো দিনে এমন রিক্ত হাত আর শূন্য গলা কি ভালো...আবার?'

এই প্রথম সুযোগ এসেছে ভাস্করের, হাত বাড়িয়ে রুচিরার একটা করুণ, নিরীহ মণিবন্ধ টেনে নিল।

সবেগে তৎক্ষণ হাত ছাড়িয়ে নিল রুচিরা। বললে, 'অমন সঙ সেজে পারব না দাঁড়াতে।'

'জীবনের সার্কাসে, কে জানে, আমরা সবাই সঙ। আর যাদের আমরা সঙ ভাবি, কে জানে, হয় তো তারাই খাঁটি, তারাই সমস্ত খেলার বাহাদুর।'

'তারপর আমনি দাঁড়ালে ফ্ল্যাশ লাইটে ফোটো তুলে নেবেন আমার?'

'ও হো, সোমনাথকে বলে আসা হয়নি তো! ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয়ই একটি ছবি তুলে রাখতে হয়। একটা এভিডেন্স। চলে যাবার পর একটা স্মৃতিচিহ্ন। ড্রাইভারকে বলো, ফটো-গ্রাফারের দোকান থেকে একজনকে তুলে নিয়ে যাই বাড়ি। জীবনের একটা মুহূর্তকে অবিনশ্বর করে রাখি।'

'ড্রাইভার।' খরখরে হুকুমি আওয়াজ বের করল রুচিরা : 'সোজা বাড়ি চলো।'

'ফোটো না হয় ছেড়ে দিই, কিন্তু আমাদের বাড়ি হয়ে চলো। ওঁরা সব পথ চেয়ে আছেন। গয়না বিশ্বাস না করেও সোনা নেওয়া যায়। সিঁদুর বিশ্বাস না করেও শুদ্ধে সাজা যায় সিঁদুরে। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। চলো। তোমা ক তো আর কেউ ধরে রাখবে না বাড়িতে। আমিই আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

রুচিরা কথা কইল না।

ড্রাইভার সোজা চলল নিঃশব্দে, তার অর্থই নিজের বাড়ির দিকে।

ও দিক দিয়ে না ঘুরে এদিক দিয়ে গেলে আগেই ভাস্করদের বাড়ি পড়ে, ভাস্করদের বাড়ি হয়েই যাওয়া যায় সিধে। চূড়ান্ত মুহূর্তে ভাস্করের মনে হল ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, গাড়িটা ওদিক দিয়ে নয়, এদিক দিয়ে ঢুকে পড়ো। কিন্তু গলায় সে জোর কই যে রুচিরার স্তব্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে? পকেটের দলিলে কি এত জোর আছে যে গাড়ি থামায়?

কিন্তু ছোট্ট একটা শব্দ সে বার করতে পারে মুখ দিয়ে।

'রোকো।'

গাড়িটা থামল। ভাস্কর বললে, 'আমি এইখানে নেমে যাই।' বলতে-বলতেই নেমে গেল। রুচিরার সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে এ চিন্তা রুচিরা না ভাবে।

রুচিরা চোখ তুলে তাকাল ভাস্করের দিকে। চোখের কালো দেখল না চোখের কোলে কালির পোঁচ দেখল ঠিক করতে পারল না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই রুচিরা কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। সংক্ষেপে বললে, 'আসবেন।'

তৎক্ষনি-তৎক্ষনি বাড়ি ফিরল না ভাস্কর। কী মুখে ফিরবে! বিয়ে বলে আপিস থেকে ছুটি নিয়েছে, যাওয়া যায় না আপিসে। হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্রামে উঠে বসল।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনো ভাস্করের

দেখা নেই। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, নিমন্ত্রিতারা ফিরে গেল। বলে গেল, রেজেস্ট্রি করা বিয়ে তো, একদিন না হয়তো আরেক দিন হবে। এর তো আর লগ্নলগ্ন নেই, এতে তো আর পাঁজিপুঁথি লাগে না।

মহালয়া সোমনাথকে পাঠালেন খোঁজ করতে। ব্যানার্জিদের বাড়িতে দেখে আর তো ব্যাপার কী।

সোমনাথ গেল ভয়ে-ভয়ে। কোনো হৈ-চৈ নেই, লোকজন নেই, আলোও একটা বাড়তি জ্বলছে না কোথাও। বিয়ে বাড়ি কি এমনি নিঝুম হয়? এমনি কি তার আপসা-আপসা চেহারা থাকে? ওই তো বারান্দায় রুচিরাকে দেখা যাচ্ছে। দাদা কই? দাদা তো নেই ধারে-কাছে। মেয়েটাকে তো মোটেই বৌদি-বৌদি মনে হচ্ছে না। যদি তার বৌদিই হয় তবে তাকে অমনি দূরে, রাস্তায় ফেলে রাখতে পারে?

সাহস করে গেট খুলে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল সোমনাথ। হ্যাঁ, কর্তাই তো একা বসে আছেন ঘরের মধ্যে।

'আমার দাদা এখানে আছে?'

'কে দাদা?' মুখ তুললেন জগৎপতি।

'ভাস্করনাথ—'

'সে কে? সে এখানে আসবে কেন?' নির্লিপ্তের মত নাথুকে আবার চোখ রাখলেন জগৎপতি।

'তার কি আজ এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' বিরক্তিতে এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে মুখ, জগৎপতি আবার তাকালেন।

'বিয়ে হয়েছে? এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে?'

'ফাট্! ভাগ! এইটুকু ছেলে, এখুনি গাঁজা ধরেছে! মিথ্যে বলার ওস্তাদ হয়ে উঠেছে!'

লোকটা পাগল নাকি? কে জানে কী। আশ্চর্য নয়, মোটা একটা বই তুলে ছুঁড়ে মারতে পারে। পালিয়ে গেল সোমনাথ।

বাড়ি ফেরার মুখেই দেখল দাদা আসছে। কী রকম মাঠ থেকে ফেরা হেরে-যাওয়া চেহারা।

বাড়িতে পা দিতেই মহালয়া সোমনাথকে দূরে রেখে ভাস্করকে নিয়ে পড়লেন: 'কী, হয়ে গিয়েছে বিয়ে?'

পকেটে দলিলের নকলটা অনুভব করল ভাস্কর। বললে, 'হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।'

সোমনাথ ও অবাক!

'তবে বউ এল না যে বড়?'

'শরীর খারাপ।'

সোমনাথ তো আরো অবাক।

দিদি-বৌদি মাসিমারা যে চলে গিয়েছে তা আর জিগগেস করতে হয় না। ভাস্কর আপোসের সুরে বললে, 'তাতে কী। অন্য একদিন আসবে। সেদিন মাসিমাদের আবার খবর দেব। দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'আহা এ আবার কোন ঢং!' এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকার পর এই হতাশা মহালয়াকে অস্থির করে তুলল। 'আপিসে যেতে পারল, তখন শরীর বেশ সুস্থ, আর এখানে এসে একটু দেখা দিতেই ভেঙে পড়ল শরীর! এ সব ন্যাকামির কথা।'

'একটু লজ্জাও তো হতে পারে!' কেন কে জানে তবু রুচিরারই পক্ষ নিতে অলক্ষ্যে কে ঠেলছে ভাস্করকে।

'আহা, লজ্জা আবার কী! বাপের বাড়িতে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে না, বেরুচ্ছে না আত্মীয়স্বজনদের সামনে। এ তো স্বাভাবিক স্ত্রী—লজ্জা কিসের?

'তবু—'

'রাখ, বুঝতে পেরেছি, এ অন্য রকমের লজ্জা। এখন বোধহয় পষ্টাপষ্টি বুঝতে পেরেছে আমরা খুব গরিব, আমাদের ঘর-দোর ভীষণ ছোট, আমাদের জিনিসপত্র একেবারেই নেই, তাই, তাই ওর এই হেনস্তা। তাই ও এল না—'

'যা, গরিব হলে কী হয়?' জগৎপতি বোঝাচ্ছেন তাঁর মেজ শালা সরোজেন্দ্রকে: 'গরিব হলে ছেলে কি আর ভালো হতে পারে না?' জগৎপতি বেদিতে বসা আচার্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুচ্ছের টাকা থাকলেই কি গুচ্ছের সুখ হয়? হোক গরিব, তবু স্বামী যদি সৎ হয় চরিত্রবান হয়, কী বলে, যদি পত্নীপ্রেমিক হয় তাহলে মেয়ের সুখশান্তি কিসের কম হয় না।'

'তা না হোক,' সরোজেন্দ্র বললে, 'কিন্তু তাই বলে জগৎপতির মেয়ের, এক-মাত্র মেয়ের একটা চালচুলোহীন কেরানির সঙ্গে বিয়ে হবে এ ভাবা যায় না।'

'তা তুমি কী করতে পারো?' সরলতা-মাখা শিশুর মত মুখ করল জগৎপতি: 'যদি ভালোবাসা হয় তা হলে তোমার কী করবার আছে? তুমি আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিত বাপ হয়ে তাতে বাধা দিতে পারো না। আমিও তাই দিইনি বাধা।'

'আর বাধা দিতে গেলেই বিপরীত কাণ্ড।' সমাজের কত বড় দুর্দিন তারই দুশ্চিন্তায় পীড়িত সরোজেন্দ্র: 'হয় আত্মহত্যা নয় কেলেঙ্কারি।'

বড়লোক হবার পর তারেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে, কবেই ছেড়েছে, কে কোথায় আছে খবর রাখে না, কার কে বা কটা ছেলে-পিলে ও সব ভাসা-ভাসা—কিন্তু শালাদের ছাড়তে পারেনি, শালাদের কেউ ছাড়তে পারে না। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই তারাই অল্পকাল আপন জন।

'বাধা দিতে যাবই বা কেন?' আলোচনার খেই ধরল জগৎপতি: 'একের স্বাধীনতা তো অন্যের মাপ অনুসারে চলবে না। আমার পছন্দই তো তোমার পছন্দ নয়। তাই আমি বললুম তুমি যাকে ভালো বুঝেছ প্রিয় বুঝেছ তাকেই তুমি বিয়ে করো। স্বাধীনতা তোমার, দায়িত্বও তোমার। কী বলো, ঠিক বলিনি? ঠিক করিনি?'

সরাজ গলায় সায় দিল সরোজেন্দ্র: 'একশোবার ঠিক।'

'তা ছাড়া এখনো আমরা জাতিভেদ মানব, স্বাধীন হবার পরেও, এ অসহ্য।'

এখন তো আর বামুন-কায়েতের জাতিভেদ নেই, সে তো প্রায় উঠে গেছে, এখন বড়লোক আর গরিবের জাতিভেদ।'

'সে জাতিভেদও আমরা উঠিয়ে দেব। বলো দিইনি উঠিয়ে? গরিব বলে ভাস্করকে জামাই করতে আপত্তি করেছি? এই তো বিয়েটা আজ হয়ে গেল। প্রেমের সম্মান তো আমি রাখলুম। তারপরে ওদের বনিবনা না হয়, কোনো বিরোধ-সংঘর্ষ বাধে, বিয়ে ওরা উচ্ছন্ন করে দেয়, তা আমার কী করবার আছে? তাতে আমার কী দায়িত্ব!' জগৎপতি ক্লান্তের মত পিঠ রাখলেন চেয়ারে।

'সে পরের কথা পরে। সে ওদের নিজেদের আর্টিস্টি, নিজেদের কারিগরি।' বললে সরোজেন্দ্র।

'সে ওদের নিজেদের অদৃষ্ট।'

একটু চুপচাপ থাকলেন জগৎপতি। পরে দীর্ঘ নিশ্বাসটা চাপা দিয়ে বললেন ব্যস্ত সুরে: 'তোমার বোনই একটু আপসেট। শত হলেও প্রেম-ট্রেম কিছু বোঝেন না, করেনও নি কোনোদিন। তাঁকে একটু বোঝাও।'

সরোজেন্দ্র উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বললে, 'আর রুচি?'

'তার তো কেরা করে। সে নিজের সৌভাগ্যে ডগমগ।'

ঘরে এতক্ষণ টেবল-ল্যাম্পটা জ্বলছিল, সরোজেন্দ্র চলে গেলে বোতাম টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন জগৎপতি। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হল যেন শুভময় এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে-হাসতে বলছে, কী হত বিয়েটা হতে দিলে? কী হত যদি সাতা মেয়েটাকে সুখী হতে দিতেন, হালকা হতে দিতেন? সৌভাগ্যেই ডগমগ বৈকি। কী লাভ হল ওর সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের ঝুরো সম্বলকে তোল করতে

গিয়ে? পারলেন আমাকে সম্পূর্ণ তাড়াতে? না, কি ভাস্করকেই পারবেন?

যেন কয়েক পা এগিয়ে এল শুভময়। কী রুক্ষ শীর্ণ ও শুকনো দেখাচ্ছে। ছমছাড়া, ভবঘুরে।

না, কিছু হয়নি আমার। টাকা যখন বন্ধ করে দিলেন, বুঝতে পেরেছি, আমার আপিস আর কেউ নয়, আপনারই যড়-যন্ত্রের সহায়, তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমটা ঘোরতর কষ্টে কেটেছে। কিন্তু হাতে-পায়ে ঘাড়ে-পিঠে খটতে তো আমরা পেছ-পা নই। তাই যা হোক দাঁড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু ভাবছি, আপনি কী করবেন? আপনার ভাগ্য যখন আপনাকে কায়িক শ্রমে ডাক দেবে?

না, আমার ঠিকানা নেই। আমি কি এক জায়গায় আছি? জীবিকার ঠেলায় ঘুরছি এখানে-ওখানে। যাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন, উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাকে আর খুঁজবেন কোথায়? ডাকলেই কি সে আর আসে?

তার যে ডাক মনের মধ্যে আছে তা আছে। সে ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে। তাকে বেঁচে থাকতে দিন। উজ্জ্বল হতে দিন। বেঁচে থাকাই উজ্জ্বল হওয়া।

তত দিনে ভাস্করকে তাড়ান। পথ পরিষ্কার রাখুন।

আরো এক পা এগিয়ে এল বুঝি সেই ছায়ামূর্তি। জগৎপতি বোতাম টিপে আবার আলো জ্বাললেন। রগ দুটো টিপে ধরলেন দু হাতে। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা।

অসহ্য যন্ত্রণা ভাস্করেরও। পাচ্ছে না ঘুমোতে। বিছানা এত কাঁটায় আকীর্ণ ছিল এর আগে কোনোদিন আবিষ্কার করেনি।

মনকে প্রবোধ দিতে চাইল। তোমার অধিকে কেন লোভ? যা পেয়েছ তাই তোমার যথেষ্ট। আজকালকার দিনে কে হুট করে দুশো টাকা প্রমোশন পায়? একটা দলিলে সামান্য সই করার দাম পাঁচ হাজার আদায় করে? আরো পাঁচ হাজার নাচছে তোমার কপালে। তাই নিয়ে তুষ্ট থাকো। পাশ ফেরো। ঘুমোও। তোমার কিছুই হয়নি না ঘুমোবার। তাঁতি আছ, ঠিক থাক তাঁত বুনে। কেন্তন ধরে কী লাভ?

আর সোমনাথ ভাবছে, বউ নেই এ কেমনতরো বিয়ে? বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ কেমনতরো অসুখ? আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে লোকটা বিয়ের নামে বলে কিনা, ফাট? আর আমাকে বলে কিনা, আমি গাঁজা খেয়েছি।

আর দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে মহালয়া জপ করছে। আর ভাবছে গোপালকে। বলছে, গোপাল, তুমি কি সত্যিই এসেছ? সত্যিই আসবে?

১২

'বউমা কেমন আছেন একবারটি খোঁজ নিবি না?'

মহালয়াই খালি ট্যাক ট্যাক করে। আপিসে বেরুবার সময় মন্ত্র ধরিয়ে দেয়। হাতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'কে কার খোঁজ করে তার ঠিক নেই।'

আপিস থেকে ফিরলে মহালয়া আবার মনে করিয়ে দেয়ঃ 'কি রে, গিয়েছিলি?'

'সময় পাইনি।' পাশ কাটিয়ে যায় ভাস্কর।

এ কী রকম হল? বিয়ে হতে না হতেই বেসুরো! কারু প্রতি কারু টান নেই। এই তো কাছাকাছি বাড়ি। তুই বউ, তুইও তো আসতে পারিস নিজের থেকে। মিলিটারি-ঠেঙানো মেয়ে, তোরই বা কী এত সঙ্কোচে নুয়ে থাকা। একদিন শুধু একটু নিজের সংসারে দেখা দিয়ে যেতে পারিস না? আর তুই স্বামী, তোকেও আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোর কোনোই জোর নেই?

কী জানি কী! অনিয়মে সবই ব্যতিক্রম। মহালয়া ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বসে। ভাবে, আর সব থাক-থাক, তার গোপাল ঠিক আছে।

'আজ একবার সময় পেলে খোঁজ করিস।' আবার মন্ত্র দেয় মহালয়া।

'ও সব ভুলে যাও।' হাতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'ভদ্রগোছের একটা চাকরি হয়েছে, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট হয়েছে এই নিয়েই খুশি আছি। আর সব স্বপ্নকথা।'

'যা, তা কী করে হয়?'

হয়। তাই তো ছিল। আপিস যেত-আসত, তার বাইরে ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখনই বা বেশি আর কী হয়েছে! একটু ছুঁতে গিয়েছিল, হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। আর সেই যে বলেছিল, 'আসবেন'. ওটা হচ্ছে, টোপ, যাতে ভাস্কর একেবারে না কিগড়ে যায়। সেই ডাক মানে অর্থীর মত এস, আরো কিছু তোমার সাংসারিক সুরাহা হয় কিনা। দাবিদায় হয়ে এস না।

'তুই স্বামী, তুই তোর দাবি ছাড়বি কেন?' মহালয়াই আবার খোঁচ মারে।

সত্যিই তো, হঠাৎ মাথা ঘুরে যায় ভাস্করের, বাপের বাড়িতে থাকবে বললেই সে থাকবে বাপের বাড়ি? ধর্মে নীতিতে আইনে কোথাও এর সমর্থন নেই। দলিল যতদিন জীবিত আছে ততদিন তার স্বামিত্বও জীবিত। আর যতদিন স্বামিত্ব জীবিত ততদিন স্ত্রী বাধ্য স্বামীর সঙ্গে একত্রবাসে। হ্যাঁ, বাধ্য। বেশি তড়পিও না, আদালতে স্ত্রী দখলের মামলা করে দেব।

তা ছাড়া, পরে যে রুচিরাকে ডিভোর্স করে দিতে হবে, তারই জন্যে একটা বিরোধের ভূমিকা দরকার। মাকে তখন বলা যাবে এমন দুর্বিনীত ঝগড়াটে অসাধ্য স্ত্রীকে নিয়ে কে ঘর করবে? দিই এটার দাঁড় খুলে। যেখানে খুশি বেড়াক। যেখানে খুশি বাঁধা পড়ুক।

অবস্থা তখন এমন চরমে এনে দেবে, মা-ই বলবেন দে ওটাকে তাড়িয়ে। তা হলেই নিখুঁত হবে।

একটা বছর কি কম? একটা দিন কি কম? একটা মিনিট পেলে তাতেই রাজ্য জয় করা যায়। ঘুরে আসা যায় পৃথিবী।

জুনিয়র বয় এসেছে, খোলা ফাঁচারির প্রথম দিনই সেই ডাক্তারের আপিল, মুহুরি ব্রিফ এগিয়ে দিল।

'এ কনভিকশান টিকতে পারে না।' ব্রিফ ওলটাতে-ওলটাতে বললেন জগৎপতি : 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল বলেই সে ছুরি চালিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। একটা সুস্থ-সমর্থ আস্ত মানুষের থেকে একটা আগন্তুক ভ্রূণের দাম বেশি?'

জুনিয়র বললে, 'প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল কিনা।'

'মেডিকাল এভিডেন্স থেকে সেটা দেখানো যাবে। ফ্ল্যাপার্ট ফ্রম ইট, অনান্তর অর্থেও এ ব্যাপারটা দেখা হবে না কেন? হাতের লাল-নীল পেন্সিলটা শূন্যে স্থির রেখে বললেন জগৎপতি, 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন—ওরো সামাজিক কলঙ্ক থেকে, আত্মগ্লানি থেকে—সেইটেই বা কি কিছু কম শত্রু? সেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ডাক্তার যদি মেয়েটাকে জীবনের সুস্থ লাবণ্যে দাঁড়-করিয়ে দেয়, তাহলে কি সে সমাজের হিত করে, না অহিত করে?'

'এই লাইটে কোনো কেস আগুড হয়নি কোর্টে।'

'না, না, কোর্টের কথা ছেড়ে দাও। আমি সমাজের দিক থেকে বলছি। শত্রুকে ঠেকাবার জন্যে তুমি নানা রকম কনট্রোলের বেড়া দিয়েছ, বসিয়েছ সশস্ত্র প্রহরী, খুব ভালো কথা, আকস্মিক কিন্তু দুর্ঘটনায় একটা শত্রু যদি সমস্ত বেড়া-পাহারা টপকে ঢুকে পড়ে, তাকে তখন আর মারা যাবে না, তাকে তখন স্বাগত জানাতে হবে এ অভিনব।'

জুনিয়র বললে, 'এরা বলবে দুর্ঘটনা ঘটবে কেন?'

'দুর্ঘটনা তো ঘটবার জন্যই। আর দুর্ঘটনা ঘটবে না কেন? চারদিকে

দারিদ্র্য বেকারি হতাশা অনিয়ম, তার মধ্যে উত্তেজিত জীবন, ক্ষিপ্র আর ক্ষিপ্তের জনতা, দুর্ঘটনা ঘটাই তো স্বাভাবিক। তারপর তুমি সমাজ, তুমি নিজেই প্রলুব্ধ করছ, নিজাপন দিয়ে ফিরছ। যে সমস্ত উপায়-পদ্ধতি আগে বেআইনি ছিল, তাই এখন তুমি তাদের হাতের কাছে, এমন কি মুখের কাছে এনে দিচ্ছ। বড়-বড় অক্ষরে জয়গান গাইছ। সেই ক্ষেত্রে এদিক-ওদিক দু-একটা ফসকে যাবেই। বন্দুকের গুলি পর্যন্ত ফসকায়, অব ও তো সামান্য কথা।' প্রায় আর্দ্র-মেঘের পর্যায়ে নিয়ে এলেন জগৎপতি : 'তারপর তা মেরামত করতে গেলেই ধরছ ডাক্তারকে। তোমাদেরই ব্যবস্থার বলি সেই অসহায় মেয়েটাকে। কী হচ্ছে অনন্ত? এই দেশে অচল তো ওই দেশে সচল। মেয়েটার সদ্গতি নেই, তাই এ দেশ থেকে হুই করে ও দেশে চলে যেতে পারল না, বিজয়িনীর মত পারল না জীবনকে সংবর্ধনা করতে। পুলিশের আসামী হয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।'

বিনীত মুখে হর বললে, 'অন্য-দিকেও বলবার আছে।'

বা জগৎপতির ধারা, টেবিল ঘুসি মারলেন : 'কিছু বলবার নেই। চোরকে চুরি করতে পাঠিয়ে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা ভণ্ডামি—স্রেফ ভণ্ডামি। তুমি যদি চুরিকে লিগাল করো, চোরকে মারাও লিগাল করতে হবে।'

মুহূর্তে হাসল কিন্তু জুনিয়র হেসেও হাসল না। বললে, 'তাহলে পাপ বেড়ে যাবে সমাজে।'

'আর এই যে মানুষ বাড়ছে, এ সব মূর্তিমান পাপ নয়?'

কে একটা লোক বৈঠকখানার পাশের প্যাসেজ দিয়ে দ্রুত পায়ে অন্দরমহলে ঢুকে গেল।

ঠিক লক্ষ্য করেছেন জগৎপতি : 'কে?'

লোকটা প্রায় সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁচেছে। বললে, 'আমি।'

'কে আমি?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে সেই স্বরটা : 'আমি ভাস্কর।'

একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। একবিন্দু দ্বিধা নেই। যেন আলো-হাওয়ার মত সরল। আলো-হাওয়ার মতই অধিকারে অবাধ।

চুপ করে গেলেন জগৎপতি। নাঁধতে মন দিলেন।

সরাসরি একেবারে ঢুকতে পারল না এবার, কেননা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘরে রুচিরা নেই। কিন্তু ঘরে যখন রেডিও চলছে তখন সন্দেহ নেই, সাময়িক অনুপস্থিতির পর এখুনি ফিরে আসবে। ভাস্কর নিঃশব্দ ঘরে ঢুকল, বসল চেয়ারে।

ঠিক। খানিক পরেই পাশের ঘর থেকে এল রুচিরা। এক মুহূর্ত বুঝি বোঝেনি ঘরে কেউ আছে, এসে বসে আছে, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল; কিন্তু ক্ষণকালই ঘরের হাওয়াটা আর কারু নিশ্বাসে অন্যরকম হয়েছে টের পেতেই পিছন ফিরল, বিরক্ত বিমর্ষ মুখে বললে, 'এ কী! আপনি কখন?'

'এই তো।'

'একেবারে না বলে কয়ে?'

'কেন, আসা যায় না নাকি?'

'এসেছেন তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু একটু জানান দিয়ে এলেই হয়তো শোভন হয়।'

'শোভনের কথা আর না-ই বললেন।' কিছুতেই আর এখন 'তুমি' বলতে পারল না ভাস্কর : 'কিন্তু জানান যে দেব ঘরে লোক ছিল?'

'লোক না ছিল তো পর্দা ছিল।'

'পর্দা থাকলে কী হয়?' এত দুঃখেও হাসি পেল ভাস্করের।

'পর্দা থাকলে বাইরে দাঁড়াতে হয়। ভিতরের লোক যতক্ষণ না সঙ্কেত করে ততক্ষণ।'

'ভিতরে লোকই নেই তো সঙ্কেত করবে কী! আর ভিতরের লোকের জন্যে হাঁ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার দিন আর আমার নেই।'

'কেন, আপনার কিসের দিন?'

'এই যেমন এসেছি, সরাসরি চলে আসার দিন। ঘোষণা না করেই ঘরে ঢোকার দিন।'

'ঐ একটা কাগজের জোরে?'

'তা ছাড়া আবার কী। সমস্তই কাগজ। আবার আপনি যখন ছাড়া পাবেন, আমাকে কলা দেখাবেন, তখনও সেই কাগজেরই জোরে।' তরল হবার চেষ্টায় ভাস্কর হাসল : 'আপনার টাকা ও কাগজ, মানসম্ভ্রম ডিগ্রোমা-সার্টি-ফিকেটও কাগজ, বাড়ি-ঘরের স্বত্ব-স্বামিত্বও কাগজ। দয়া করে রেডিওটা বন্ধ করে দিন। কাজের কথাটা সেরে নি।'

'কাজের কথা কিছুই নেই।' গর্বের ভঙ্গি ফোটাল রুচিরা।

'কাজ বাগিয়ে নিয়ে এখন এ কথা বলা সোজা।' ভাস্কর নিজে উঠেই রেডিওটা বন্ধ করে দিল। বললে, 'কিন্তু নাটক এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং কাজের কথা এখনো কিছু থেকে গেছে।'

'না, নেই। এক দফায় টাকা নিয়েছেন কাজ দিয়েছেন, আরেক দফায় নেবেন, বাকি কাজটুকু সেরে দেবেন।'

'অত সোজা নয়। যা বলছি শুনুন। মিছিমিছি ঝগড়া করে লাভ নেই।' ভাস্কর আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। বললে, 'ঐ সোফাটাতে বসুন।'

সমস্ত অসহ্য লাগছে রুচিরার। ঝিলিক দিয়ে উঠল : 'আপনার কথামত বসব?'

'আমার কথামত বসবেন কেন? এমনিতেই বসবেন। একটা লোক কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তার উপর আপনি অসুস্থ। বসলে পরেই আপনি আরাম পাবেন।'

'কত আপনি আমার আরাম দেখছেন!'

কথায় কী রকম একটু টান লাগল না? উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। না, এদিকে চোখ নেই রুচিরার। জানলার দিক ধরে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

'আপনার আরাম দেখছি না? সমস্তই তো আপনার আরামের জন্যে। বলুন, এদিকে তাকান, বলুন, আপনি এখন প্রচণ্ড আরাম পাচ্ছেন না? আপনার সমস্ত ভার লঘু হয়ে যায়নি? এত বড় একটা উপকার করলাম তবু আপনার সামান্য কৃতজ্ঞতা নেই?'

'বলুন কী আপনার কথা।' রুচিরা ঘুরে দাঁড়াল। সোফায় বসল মুখো-মুখি।

'এখন আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে।'

মুখ-চোখ আবার গম্ভীর করল রুচিরা। বললে, 'কী কাজের কথা আছে তাই বলুন।'

'কথাটা খুব ছোট।'

'তবে এত ধানাই-পানাই করছেন কেন? আপনার আপিস নেই?'

'না। অসম্বন্ধ কথা কিছু বলব বলেই ছুটির দিন বেছে এসেছি। আপনার বাবাকেও দেখলাম বাড়িতে আছেন, নিচে বসে কাজ করছেন।'

'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। দেখলুম তিনি কাজ করছেন তাই আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না।'

'তিনি দেখেছেন আপনাকে?'

'বোধহয় দেখেছেন। না দেখলেও বুঝেছেন আমি এসেছি।'

'বুঝেছেন, তবু তিনি আপনাকে আটকালেন না?' ভুরুতে বিস্ময় আঁকল রুচিরা।

'আটকাবেন কেন? তিনি আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ, তিনি জানেন আমার সাধ্য অধিকার হয়েছে, বাড়িতে ঢোকবার, আপনার কাছাকাছি হবার। এমন কি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেবার। তাই

জায়গা ছেড়ে ওঠেননি, ছোট কড়ে আঙুলটাও নাড়েননি। আপনার বাবার বন্দুকের ভেতরেই অবস্থাটা বুঝে নিল। আচ্ছা, আপনার মা কোথায়?'

'কেন, আবার মাকে কেন?' ধমকে উঠল রুচিরা।

'আপনার মা আমার আসার খবর পেলে নিশ্চয়ই, আর কিছু না হোক, একথালা জলখাবার পাঠাতেন।'

'জলখাবার?'

'বা, জামাই এলে শাশুড়ি জলখাবার খাওয়ায় না?'

মুখ চোখ করুণ করল রুচিরা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'মার খুব অসুখ।'

'কেন কী হয়েছে?'

'হাই ব্লাডপ্রেসার। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল।'

'সব আপনার কাণ্ডে?'

'না, আপনার ভয়ে।'

'আমার ভয়ে? সে কি, আমাকে ভয় কিসের? আমি কী করেছি?'

'মার ভয় হয়েছিল আপনি কথা রাখবেন না।'

'কথা রাখব না মানে বিয়ে করব না।'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলেন, টাকা নিয়ে সরে পড়বেন।'

'এ রকম ধারণা হবার কারণ?'

'যারা গরিব, যারা অভাবী, যারা ছোট-ছোট লুব্ধতায় দিন-রাত ঘুরে বেড়ায় তারা কথা রাখে না, তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে সরে পড়ে।'

'বটে? আর আপনার নিজের ধারণা?'

'আমিও মার সঙ্গে একমত।'

'গরিবেরা কথা রাখে না?'

'না, কথার চাইতে তাদের কাছে তাদের নিজের সুবিধের দাম বেশি। স্বার্থের জন্যে তারা অনায়াসে সত্যকে ছেড়ে দেয়। এমন ছেড়ে দেয় যে, তাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না যে প্রতিশ্রুতিটি তাদের কেউ মনে করিয়ে দেবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে শুধু গরিব কেন, বড়লোকেরাও কিছু কম পড়ে না। যাক গে,' কলঙ্কার সুরটা জোর করেই তাড়িয়ে দিল ভাস্কর। বললে, 'এখন কেমন আছেন?'

'কিছুটা ভালো। তবে এখনো নিচে নামেন না।'

'কবে থেকে ভালো? যেদিন বিয়েটা হয়েছে সেদিন থেকে?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন, যেদিন সেই মারের রেজিস্ট্রারের আপিসে একটা ছাপানো ফর্ম সই করা হয়েছে।'

'অতখানি কথার আদর না নিয়ে সত্য ভাষার সংক্ষেপে সেটাকে বিয়ে বলে। যাক গে। আপনার মার যখন অসুখ তখন আপনাকেই অতিথি-সৎকার করতে হয়।'

রুচিরা দৃঢ় হল। বললে, 'আপনার কথাটা কী এই বেলা সারুন। সত্য ভাষার সংক্ষেপে সারতে তো আপনি বিশেষ দক্ষ।'

'তাই বলে আমাকে আপনি এক কাপ চা-ও খেতে দেবেন না?'

'ও সবের ভার আমার উপরে নেই।'

'না থাক। তাই বলে আপনি বললে আপনার অন্তরপক্ষ পুরুষে এ বাড়িতে এক পেয়ালা চা পাবে না এ অসম্ভব।

'কী বললেন?'

'আপনার আগন্তুক অতিথি।'

'আমি বললে এ বাড়ির যে-কাউকে চা খাওয়াতে পারি কিন্তু তার একটা টাইম আছে।'

'জামাইয়ের জন্যেও টাইম?'

'আপনার কথাটা সারুন।'

'কথাটা ছোট্ট। সেটা আর কিছুই নয়, আমার একটা অনুরোধ রাখুন। উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে। আচ্ছা, এই বেলা না হয় বিকেলে চলুন।'

'কোথায়?'

'কথাটা ছোট্ট। সেটা আর কোথাও নয়, আমাদের বাড়ি।'

'আমাদের—আমাদের বাড়ি মানে?'

'মানে আমার বাড়ি। আর যেটা আমার বাড়ি সেটা আপনারও বাড়ি। মানে আমাদের বাড়ি। চলুন।'

'ইমপসিবল।' রুচিরা সেই বিশ্রী ইংরিজি কথাটা উচ্চারণ করল।

'আমার মা, আপনাকে, তাঁর ছেলের বউকে, দেখতে উৎসুক।'

'আমি যাব না। পারব না যেতে। যদি আপনার মার ইচ্ছে হয় তিনি এখানে এসে আমাকে দেখে যেতে পারেন।'

ভাস্করের সমস্ত স্নায়ু-শিরা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল, দংশনের তীক্ষ্ণ উদ্যতিতে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করল, রূঢ় হতে দিল না। বললে, 'ছেলের বিয়ের পর মা প্রথম বউ দেখতে আসে ছেলের শ্বশুরবাড়িতে এমন অদ্ভুত কথা কেউ শোনেনি।'

'বউ যদি অসুস্থ হয় আসতে দোষ কী।'

'আপনি তো তেমন কিছু অসুস্থ নন।' চোখে আবার হঠাৎ স্নিগ্ধতা এল ভাস্করের: 'আপনি অনায়াসে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাঁর তখন কত আনন্দ হবে।'

'কিন্তু সেই আনন্দ কত দিন!'

'পরের কথা পরে। বহু আনন্দই সূচনার অকপট থেকে পরে মিথ্যে হয়ে যায়। তার জন্যে আজকের আনন্দকে কে প্রত্যাখান করে? হাতের পাখিকে কে উড়িয়ে দেয়? শুনুন আমার এ সামান্য অনুরোধটুকু রাখুন। সমস্ত পাহাড় পর্বত এড়িয়ে কাকে আমি নির্বাচন করেছি, কাকে আমি ভালোবেসেছি, মাকে একবার দেখাতে দিন।'

'ভালোবেসেছেন?'

'ঐ অমনি করে বলা। অন্তত মা তো জানেন ঐ রকম। তাছাড়া ভালোবাসলেই ভালোবাসা। শুনুন,' চেয়ারের পিঠ ছেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ভাস্কর। বললে, 'আমার মার কাছে, আগেই আপনাকে বলেছি, আপনার লেশমাত্র সংকোচ নেই। আপনি তাঁর কাছে শুধু স্বাগত নন, আপনি সম্মানিত।'

'সম্মানিত?'

'হ্যাঁ, তাঁর কাছে আপনি শুধু তার পুত্রবধূ নন, তাঁর গোপালের মা।'

'গোপালের মা?' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না রুচিরা। প্রায় আর্তনাদের মত শব্দ করে উঠল: 'ইমপসিবল! তারপর যখন সত্য টের পাবেন?'

'সত্য? সত্য আর কোথায়? এখন আইন যা বলবে তাই সত্য। এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত আমি পক্ষী আর তার শাবক দুইকেই আচ্ছাদন করেছি। সুতরাং আমিই সত্য, 'তাহার উপরে নাই'। আর আপনি যাকে সত্য বলছেন, ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক সত্য, তাও যদি একদিন মার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়, মার কাছে যে একবার গোপাল সে সব সময়েই গোপাল। সব শিশুই গোপাল।'

'সব শিশুই গোপাল?'

'হ্যাঁ, শিশুর আবার জাতিভেদ কোথায়?' উৎফুল্ল চোখে বলতে লাগল ভাস্কর: 'একটা প্রকাণ্ড টেবলের উপর আট-দশটা উলঙ্গ শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে দিন না—দেখবেন সব কটা সমান হাসছে ফ্যাক ফ্যাক করে। বলে দিতে পারবেন, কোন ছেলেটা ফুটপাতে হয়েছে, কোনটা বস্তিতে, কোনটা রাজপ্রাসাদে? তফাত করতে পারবেন না। সব শিশুই সমান। সব শিশুই গোপাল।'

তির্যক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা। বললে, 'আমি আপনাদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বুঝেছি। এমনি করে আমাকে আপনারা আপনাদের সংসারের খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে চান। রাখতে চান গরিব করে, সংকীর্ণ করে। গরিবের প্রতি আর আমার মোহ নেই। যেখানে আমার আনন্দ নেই আকর্ষণ নেই সে-ঘরে আমাকে ডাকবেন না। আমাকে ছুটি দিন।' দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কেঁদে

উঠল রুচিরা : 'আপনাকে শুধু মুক্তি-দাতা বলে ডাকা হয়েছে, আমাকে শুধু মুক্তি দিয়ে আপনি মুক্ত হোন। কেন মুক্তির বোঝা আপনি দিতে চাচ্ছেন, নিতে চাচ্ছেন? না, না, পারব না, কিছুতেই যেতে পারব না।'

'আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝছেন, ভুল দেখছেন।' শান্তস্বরে ভাস্কর বললে, 'মুক্তির ফটকে পৌঁছুতে হলে খানিকটা পথ তো হাঁটতে হবে। আমরা তো সেই পথে সেই ফটকের দিকেই চলেছি। পথ দিয়ে যেতে-যেতে শুধু এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে যাওয়া—'

'যাতে শেষ পর্যন্ত ফটকে গিয়ে না পৌঁছুই।' করতলের ঢাকা থেকে মুখ মুক্ত করল রুচিরা। 'মাপ করবেন, যা মিথ্যে তাকে ছলনা দিয়ে আর চাইনে জীবন্ত করতে।'

চাইনে, চাইনে—সমস্ত ঘরদোরও ভিতর-বার-আলো-হাওয়া বলে উঠল সমস্বরে।

চোখের কোলে এখনো জল টলটল করছে, উপর পাতার পালকে এখনো কণা-কণা শিশির—এক পলক দেখল ভাস্কর। যে এমনিতে গর্বে-গরিমায় সুন্দর সে বুঝি কাঁদলেও সুন্দর। কিন্তু কতক্ষণ তুমি দেখবে? যার প্রতি টান নেই আকর্ষণ নেই, আনন্দের সম্বোধন নেই, তাকে দেখাবেই বা কতক্ষণ। নির্মম আঁচলে চোখ মুছে ফেলল রুচিরা।

'বেশ, তবে তাই, যাবেন না।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

বারান্দায় কার আসার শব্দে দুজনেই উচ্চকিত হল।

'এ কী, মা, তুমি উঠে এসেছ কেন?' রুচিরা এগিয়ে গিয়ে ধরল এণাক্ষীকে। আস্তে-আস্তে ডিভানে বসিয়ে দিল। পিঠের দিকে কটা বালিশ দিল এগিয়ে।

'কী হয়েছে? কী চায় ও?' সামনেই দাঁড়ানো ভাস্কর, তাকে উপেক্ষা করে এণাক্ষী রুচিরাকেই জিগগেস করলে।

রুচিরা তাকাল ভাস্করের দিকে। ভাস্কর বললে, 'ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।'

'এমন কোনো কথা ছিল?' এবারও রুচিরার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল এণাক্ষী।

'না।' স্পষ্টস্বরে রুচিরাই উত্তর দিল।

'তবে?' এণাক্ষী এবার ভাস্করকে লক্ষ্য করল।

'সর্তগুলি তো আর লেখা হয়নি যে নির্দিষ্ট করা যাবে।' ভাস্কর বললে, 'তবে সব কথাই তো উচ্চারিত হয় না, কিছু কথা আবার উহ্য থাকে। খেতে আসবেন, এ বলে কেউ নিমন্ত্রণ করলে আঁচাতেও যাবেন এটা নিমন্ত্রণের মধ্যেই ধরা থাকে। তেমনি বিয়ে করুন বললে বউকে ঘরে নিয়ে যান এটা নিশ্চয়ই অনুক্ত আছে। এ নিয়ে বিচ্ছিন্ন কোনো মর্ত হয় না কোনোদিন।'

'বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?'

'আর কিছুর জন্যে নয়, আমার মা একবার দেখতে চেয়েছেন তাই।'

'আপনার মা জানলেন কী করে?'

'যাই হোক, জেনেছেন, আমিই জানিয়েছি যেটুকু জানাবার।'

'আর কাউকে জানানো যাবে এমন কোনো কথা ছিল?'

'জানানো যাবে না এমনও কোনো কথা ছিল না।'

তর্ক করা বৃথা। তাই এণাক্ষী মেয়ের মন জানতে তাকালেন রুচিরার দিকে। জিগগেস করলেন, 'কি, তুই যাবি নাকি?'

'না, না, আমি যেতে যাব কেন?' শত রসনায় না করে উঠল রুচিরা।

খুশি হয়ে বালিশের ঢেউয়ে নড়ে-চড়ে বসল এণাক্ষী। জোর পেয়ে বললে, 'মোট কথাটা ছিল, বিয়েটা হবে, তারপর বিয়েটা যাবে। এর মধ্যে আর কোথাও আর যাওয়াযাওয়ি নেই, খাওয়াখাওয়ি নেই। এক কন্তখতে হ্যাঁ, আরেক কন্তখতে, না, হয়ে গেল। যার জন্যে টাকা নিয়েছেন সেইটুকুই করুন, কমও নয়, বেশিও নয়, সেইটুকু, বুঝলেন? তবে আপনার মা যদি চান, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'বুঝেছি।' ভাস্কর দরজার দিকে এগোলো।

'নিচে ও'র সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

'উনি যদি চান ও'কে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন একদিন।'

নিচে নেমে গেল ভাস্কর। চলে যাবার সময় দেখল তরুণ সমিতির কর্তা ছেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন জগৎপতি।

'না, না তরুণ সমিতিকে কে যাবে?' পরবর্তী সম্পাদক রণেন সন্ত বললে, 'কর্ণধার একজন যায় আরেকজন আসে। নৌকা সামলে দেয়।'

'এই তো তরুণের মত কথা। যতই

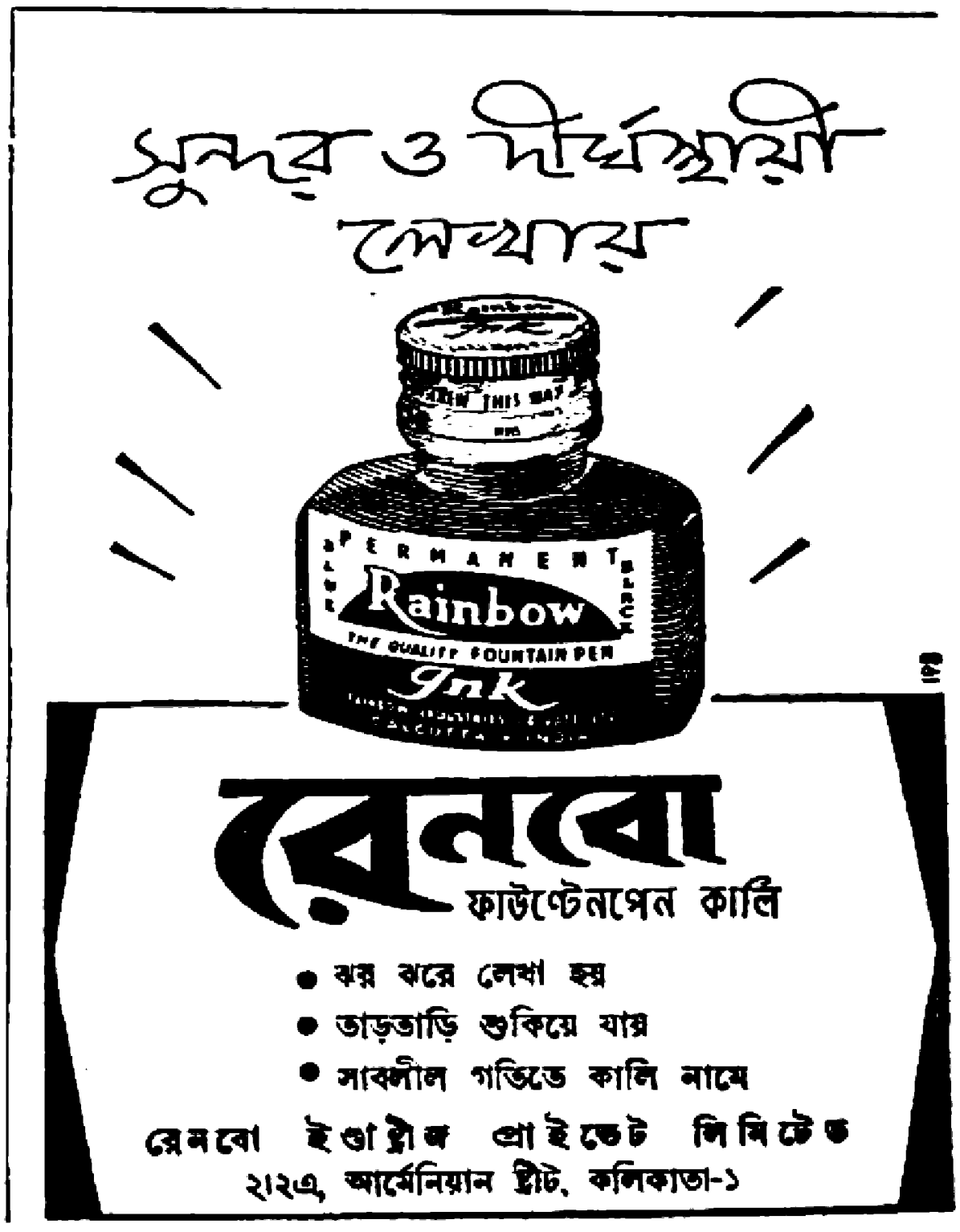

নদী ঝড়ে উত্তাল হোক, নৌকো কিছুতে ডুবতে দেওয়া নয়।' ড্রয়ার টেনে চেক-বই বার করলেন জগৎপতি। স্বর নিচু করে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের প্রাক্তন মাকির খবর কি?'

'কোনো খবর নেই। এ রকম ইরেসপনসিবল লোক দেখা যায় না।' রণেন দত্ত ঝাঁজিয়ে উঠল। 'দিব্যি পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে।'

'ইরেসপনসিবল বোলো না, বলো অপরচুনিস্ট।' দলের আরেকজন টিপ্পনী কাটল।

'অপরচুনিস্ট কথাটা ভালো শোনাচ্ছে না।' আরেকজন ফোড়ন দিল : 'চিয়ারফুল।'

দিব্যি সমান-সমান হবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি : 'এক সেক্রেটারি না-বলে-কয়ে চম্পট দিল আরেক সেক্রেটারি বিয়ে করে বসল।'

সভোর দল হেসে উঠল মন খুলে : 'একেই বলে এস্কেপিস্ট।'

আবার কেন কে জানে হেসে উঠল সকলে।

দিব্যি প্রশ্রয় পেয়ে একজন বললে, 'আমরা তো ভেবেছিলাম দুজন একসঙ্গে পালিয়েছে। তেমনি একটা কানাঘুষো চলছিল সমিতিতে।'

'যা রটে তাই সব সময়ে ঘটে না।'

'কিংবা, রটে একরকম ঘটে অন্যরকম।' একটু বুঝি সংশোধন করলেন জগৎপতি : 'আসল গোপন রেখে নকল নিয়ে খেলা করে। আসলে বিয়ে করবে ভাস্করকে, মেলামেশা শুভময়ের সঙ্গে। কী না জানি কথাটা, ভাঙে ঝিঙে বলে পটোল।'

উচ্চহাসির রোল উঠল ঘর ভরে।

'এটাও একটা তারুণ্যের লক্ষণ।' কে মন্তব্য করল।

'তবেই বলো, আমার কি ভাস্করের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করা উচিত ছিল?'

'বা, তা কেন, আপনি যুগধর্ম পালন করেছেন।'

তাই রুচিরা সমিতি থেকে বেরিয়ে গেলেও জগৎপতি থেকে গেলেন। থেকে গেলেন ছোকরাদের সহানুভূতিতে, সেই পুরোনো মুরুব্বি হয়ে।

'হলই বা না আমার একমাত্র মেয়ে, হলই বা না অবস্থাপন্ন, তাই বলে কি ওর নির্বাচনে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি?'

'বা, আপনি প্রগতিবাদী, আপনি তা কেন করবেন?'

'তারপরে ভালোবাসার বিয়ে প্রায়ই টেঁকে না।' যেন ভবিষ্যৎ বাণী করছেন এমনি অভ্রান্ত জগৎপতির কণ্ঠ : 'এ বিয়েও টিঁকবে না, ভেঙে যাবে। সেটা সুদিন না দুর্দিন হয়ে আসবে জানি না, কিন্তু সেদিনও আমি তার প্রতিবন্ধক হব না। সবার জীবনে স্বাধীনতাই বড় কথা সেইটেই স্বীকার করে যাব।'

বাড়ির মধ্যে না হয়ে রাস্তায় হলে সবাই জয় দিয়ে উঠত। এই তো দেশ-নেতা হবার মত মনোভঙ্গি। এই তো দলের সঙ্গে থাকা, দলকে সঙ্গে নিয়ে চলা।

'তোমরা টাকা চাচ্ছ, নিশ্চয়ই আমি দেব।' দুশো টাকার একটা চেক কেটে রণেনের হাতে দিলেন জগৎপতি : 'ফিস্টি করো সকলে তাতেও আমি রাজি। কিন্তু এ রকম একটা বাজে বিয়ের জন্যে ফিস্টি এতে মন উঠছে না।'

'বাজে বিয়ে, স্যার?'

'বাজে মানে আর কিছু নয়, অসবর্ণ বিয়ে। দেখালে একজনের সঙ্গে, করলে আরেকজনকে। এবং তারই আভাস পেয়ে শুভময় বিবাগী হল কিনা তার ঠিক কী!' ঠিক অবাধ গলায় বলতে পারছেন জগৎপতি : 'তাই সাধে কি আর বিয়েতে নেমন্তন্ন করিনি কাউকে? মনের দুঃখ মনেই চেপে গিয়েছি। হত দুই সেক্রেটারির বিয়ে, শুধু ক্লাব-হাউস কেন, পাড়া-কে-পাড়া আমরা ইলিউমিনেট করতাম।'

'তাই বিয়ের নামে ফিস্টি করা নয়। স্যার ঠিকই বলেছেন। এ ফিস্টি' বণেন ঘুসি তুলে ঘোষণা করল, 'আমাদের প্রেসিডেন্টের জন্মদিন উপলক্ষে।'

'আমার জন্মদিন? সে তো—' জগৎপতি আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'যেদিনই জন্মদিন হোক কিছু এসে যায় না।'

'আমরা যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে জন্মাতে পারি। প্রতিদিনই আমাদের জন্মদিন।'

'আর সেইটেই তারুণ্যের চিহ্ন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জগৎপতি।

ঘুসি তুলে আওয়াজ দিতে-দিতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। জগৎপতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গতর শৃঙ্গে এসে উঠলেন।

ভিতরে গিয়ে দেখলেন স্ত্রী আর মেয়ের মধ্যে একটা তপ্ত স্তব্ধতা থমথম করছে। 'কি, ভাস্কর এসেছিল না? চলে গিয়েছে? আমার সঙ্গে দেখা করল না তো? কী বলে গেল?'

'বলে গেল তোমাকে ওদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে।' এণাক্ষী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে।

উপর-উপর শুনেই আর সিদ্ধান্ত করতে রাজি নয় জগৎপতি। জিগগেস করলেন, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার রুচিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়।'

'কেন?'

'ওর মাকে বউ-দেখাবে বলে।'

রুচিরা সামনেই, তবু এণাক্ষীকেই জিগগেস করলেন জগৎপতি, 'রুচি কি বললে?'

'যা বলবার তাই বললে। বললে এমন কোনো সর্ত ছিল না। ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে বউ হয়ে।'

'তার মানে "না" করে দিলে?'

'হ্যাঁ, বাবা, "না" করে দিলাম।' রুচিরাই বললে অকপটে।

'একেবারে কাঠখোট্টা "না" করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।' জগৎপতি মুখে চিন্তার রেখা টানলেন : 'যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করে ছলনায় ভুলিয়ে রাখা উচিত ছিল। চটিয়ে দিলে কাজ ভালো হবে না।'

'না, না, আর ছলনা নয়। চটলে চটুক। যা হবার তা হোক। আমি কিছুতেই ও বাড়ি যাব না।' রুচিরা আবার কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

'তা তো যাবি না, কিন্তু ওর হাতে এখনো রঙের টেক্কা।'

'বলতে চাও, প্রতিশোধ নেবে? ডিভোর্সটা দেবে না? না দিক।' খরতর জ্বলে উঠল রুচিরা : 'তবু, তবু ও পাবে না আমাকে। যাব না ওর বাড়ি। যাকে আমি ভালোবাসিনি, যার প্রতি আমার ভালোবাসা জাগেনি, তাকে আমি স্বামী বলে পারব না মেনে নিতে। না, কখনো না। ডিভোর্স না দিল তো বয়েই গেল।'

'কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় অস্ত্র তার হাতে আছে।'

'সে কী?' এণাক্ষী বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'সে কোর্টে গিয়ে রেস্টিটিউশন অফ কনযুগেল রাইট চাইতে পারে। বলতে পারে কোনো সঙ্গত কারণ নেই, স্ত্রী স্বামীর থেকে আলাদা থাকছে। মামলার ডিক্রি পেয়ে জারি করে জোর করে নিয়ে যাবে স্ত্রী।'

'সে ডিক্রি আমি মানব না।'

'কো র্টর ডিক্রি মানবি না কী!'

'না মানব না, আমি আত্মহত্যা করব, খুন করব।' কাঁদতে-কাঁদতে উঠে পড়ল রুচিরা, দেয়াল ধরে দাঁড়াল টাল রাখতে : 'যে করেই হোক আমি ফিরিয়ে নেবই আমার স্বাধীনতা। একটা ভুল করেছি বলে আর আমার মুক্ত হবার নির্মল হবার অধিকার নেই, এ হতেই পারে না।

23

এত বড় জীবন! এত বড় পৃথিবী! শুধু আমারই স্থান নেই?'

এদিকে কী এক অশরীরী আতঙ্ক দেখে এণাক্ষী টলে পড়ছিল, জগৎপতি ধরে ফেললেন। আস্তে-আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। খবর পাঠালেন ডাক্তারকে।

রুচিরাকে বললেন, 'এখুনি এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? মামলার কথা বললুম বলে কী! মামলার ডিক্রি পাওয়া কি সোজা কথা? তবে আমি আছি কী করতে?'

এ সবে সান্ত্বনা নেই রুচিরার। তার আশ্বাস এখনো বিশ্বাসে। শত নষ্ট-ভ্রষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ সৎ হতে পারে সত্যাশ্রয়ী হতে পারে এই প্রত্যয়ে।

কিন্তু তাই বলে জগৎপতি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। ক' দিন পরে গাড়ি নিয়ে ভাস্করদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন এক ছুটির দিন।

মহালয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'বৌমা এল বুঝি।'

উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। সোমনাথ তো বাইরেই ছুটে এল। না, জগৎপতি একাই এসেছেন। সঙ্গে রাজ্যের জিনিসপত্র, কাগজের বাক্স-প্যাকেট খাবার-দাবার। নিজের হাতে করে, কিছুটা বা সোমনাথের সাহায্যে, নামালেন একে-একে। স্তূপীকৃত করে তুললেন।

'বৌমা এল না বুঝি?' মহালয়াই এগিয়ে এসে কথাটা পাড়ল।

'আসবে, আজই আসবে। ভাস্কর, তুমি আজ দুপুরে আমাদের ওখানে খাবে, আর বিশ্রাম করে বিকেলে ফেরবার সময় নিয়ে আসবে রুচিকে।'

প্রথমে নিষ্প্রাণ জিনিসগুলি দেখে ভাস্করের ইচ্ছে হয়েছিল, প্রত্যাখ্যান করে দেয়; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল কোন্ সততায় সে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তো এমনি ঘুষ নিতেই অভ্যস্ত। এখন রুচিরা আসবে জেনে মন খুশিতে টলমল করে উঠল, দেখতে চাইল কী কী জিনিস, কার জন্য কী। মার জন্যে গরদ, দু ভাইয়ের জন্যে ধুতি, অর্ডার না দিয়ে কেনা যায় বলে রঙ-বেরঙের বুশ-শার্ট, রুমাল। আর নীল দড়ি দিয়ে বাঁধা বাক্সে সন্দেশ আর শোনপাপড়ি।

'আসবে তো, কিন্তু এইটুকু তো আমাদের বাসা।' মহালয়া দিব্যি দরদ আনল কণ্ঠে: 'থাকবে কী করে?'

'এখন তো একবার আপনাকে দেখা দিতে আসা। তাতে তো আর এইটুকু বাসাতে আটকাবে না।' জগৎপতি অনায়াসে মায়ার মমতায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র করলেন: 'কদিন পরে যখন স্থায়ীভাবে থাকতে আসবে তখন অবশ্য কুলোবে না এখানে।'

'তখন কী হবে?'

'তখন একটু বড় দেখে ফ্ল্যাট নিতে হবে। কিন্তু,' সামলো তরপুর হয়েই বললেন জগৎপতি: 'সময়কালেই তো আর মনোমত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না, তাই সেটা এখন থেকেই ভাড়া নিতে হবে।'

'আমিও তো কবে থেকেই তাই বলছি ভাস্করকে। এখন বিয়ে করলি, বউ আসবে, আমার গোপাল আসবে, একটা বড় দেখে বাসা নে।' মহালয়া অনুযোগ করে উঠল: 'কিন্তু ছেলের আমার গা হয় না। গোপালের কৃপায় মাইনেও তো বেশ বাড়ল।'

'না, না, ও মাইনেতে কী করে পারবে? আমি একটা দেখেও এসেছি। এই কাছেই। দোতলায় তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট—'

'তিনখানায় প্রচুর হয়ে যাবে আমাদের।' কেন আর কিছু দেখতে হবে না এমনি ত্বরিত স্ফূর্তিতে বলে ফেলল মহালয়া।

'কিন্তু ভাড়া কত?' হৃদভঙ্গের মত প্রশ্ন করল ভাস্কর।

'একশো ষাট টাকা।'

শীর্ণ হয়ে গেল মহালয়া। এক ফুঁয়ে নিবে গেল ভাস্করের মুখ।

'আমাদের পক্ষে বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মহালয়া তাকাল কাতর চোখে।

'বেশি মানে? সামর্থ্যের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। অতগুলো টাকা শুধু বাড়ি-ভাড়াতেই বেরিয়ে গেলে ভাস্কর খাবে কি? শ্বেতহস্তী পুষবে কী দিয়ে?'

জগৎপতি বুঝতে পারলেন শ্বেত-হস্তীর ইঙ্গিতটা এদের পক্ষে একটু কঠিন হচ্ছে।

তাই নিজেই পরিষ্কার করলেন: 'শ্বেতহস্তী মানে বড়লোকের মেয়ে। আপনার ছেলের বউ।' তাকালেন মহালয়ার দিকে: 'শ্বেতহস্তী পোষা কি চারটিখানি কথা? আজকাল কি আর সেই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ আছে যে স্বামীর সঙ্গে বনে হয় তো বনেই যাব, কাঠ কাটতে হয় তো কাঠই কাটব কোমর বেঁধে? স্বামী গরিব বলে আমি, বড়-লোকের মেয়ে, আমি তার সংসার করব না, বা তার ঘর আমার মাপে ছোট মনে হবে এ নিদারুণ অন্যায়—'

'কিন্তু ও নিয়ে আপশোস করা বৃথা।' মহালয়াই যোগ করল।

'হাঁ, উপায় নেই। বাস্তব বাস্তব।' বললেন জগৎপতি: 'তাই ঠিক করেছি ও ফ্ল্যাটটার ভাড়া আমি দেব।'

'আপনি দেবেন?' মহালয়ার চক্ষু স্থির।

'হ্যাঁ, জামাইকে লোকে যৌতুক দেয় না? মাসিক একশো ষাট টাকা ভাড়া এমন কি আর বেশি কথা? তাই ভাড়া দেবই শুধু ঠিক করিনি, ভাড়া নিয়েও নিয়েছি ফ্ল্যাটটা।'

'নেওয়া হয়ে গিয়েছে?' মহালয়ার দুই চোখে বিস্ময় আর ধরছে না।

আরো বিস্ময় সোমনাথের মুখে-চোখে। 'ফ্ল্যাটটা দোতলায়?' কোনোদিন দোতলায় থাকেনি সেই অপূর্বের অনুভবে রঙিন এখন সোমনাথ: 'সিঁড়িটা কোনদিক দিয়ে? কটা লম্বা? কত-গুলো ধাপ আছে?'

'নিচে দোকান আছে দু-তিনটে। পাশ দিয়ে গলি, আর সেখান থেকেই উঠে গিয়েছে সিঁড়ি।' জগৎপতি তরতর করে বলে চললেন, 'মাস খানেকের মধ্যেই ফ্ল্যাটটা খালি হবে আর তক্ষুনি ঢুকে পড়বেন আপনারা। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি, বাড়িওলাকে লিখেছি সেলামি আর দু মাসের য়াডভান্স।'

কিন্তু কত দিন আপনি ভাড়া টানবেন? এমন একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঁকি মারল ভাস্করের চোখে। জানি, কত দিন। বড় জোর এক বছর। অর্থাৎ যত দিন না ছাড়পত্র সই করে দিচ্ছে। তার-পর? তারপর কি পুনর্মূষিক নয়?

ভাস্করের এই অস্বস্তিটা টের পেলেন জগৎপতি। বললেন, 'কথা হচ্ছে বাড়ি-ওলা গোটা বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। তা যদি হয়, হতে সময় হোক, কতই বা সময় হবে, আমি কিনে নেব। আর যদি ওটা শ্বশুরের বাড়ি হয়, তাহলে কি আর জামাইকে ভাড়া গুনতে হবে? গুনতে হলেও সে নিশ্চয়ই নমিন্যাল, নামমাত্র হবে কিছু। গায়ে লাগতে দেবে না। কী, তাই নয়?'

দুর্বল হেসে ভাস্কর থামল। পরের কথা পরে। এই মুহূর্তে যা সহজ তা আজকে সহজ হয়ে। সহজ সুখই বুঝি সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য।

চলে যাবার ভঙ্গি করলেন জগৎপতি। ভাস্কর এগিয়ে দিতে এল।

'যেও বারোটা নাগাদ।' জগৎপতি মনে করিয়ে দিলেন।

'খাওয়াটা থাক।'

'থাকবে, কেন?'

'ঠিক একটা হৃদ্য পরিবেশ হবে না।'

'হবে না মনে করছ? তা হলে থাক।' জগৎপতি দিব্যি ফিরিয়ে নিলেন কথা। সদাশয় মুখে বললেন, 'তাহলে বিকেল চারটে নাগাদ যেও। একটু চা খেও না

হয়। তারপর নিয়ে এস রুচিকে। রুচি তৈরি হয়ে থাকবে।'

চারটে নাগাদই গেল ভাস্কর।

আর চারটে নাগাদই এল ডাক্তার।

'এই যে তুমি এসেছ। ভালোই করেছ।' জগৎপতি ভাস্করকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে পড়লেন : 'খানিকক্ষণ আগে থেকে কী রকম একটা 'পেন' উঠেছে—'

'চলুন, দেখি—' বললে ডাক্তার।

দুজনে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে, ভাস্কর ভাবতে চেষ্টা করল অসুখটা কার। রুচিরার, না, তার মার।

আর, সন্দেহ রইল না কার, যখন উপর থেকে জগৎপতি ডেকে উঠলেন ভাস্করকে। এস, তুমিও চলে এস।

ভাস্কর নিচে থেকেই বললে, 'আমি 'পেন'-এর কী বুঝি?'

'এটিই বুঝি জামাই?' জিগগেস করলে ডাক্তার।

সানন্দ মুখে স্পষ্ট সায় দিলেন জগৎপতি। বললেন, 'নিয়ে যেতে এসেছে।'

নিচেই অপেক্ষা করতে লাগল ভাস্কর। খেলাটা শুধু দেখে যেতে হবে না, খেলাটা খেলে যেতে হবে।

কতক্ষণ পরেই স-ডাক্তার নামলেন জগৎপতি।

রুগীর কী অবস্থা, ব্যাধির কী গতি-প্রকৃতি সে-সব উপরেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে, এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা ভাস্করের সামনে বলা দরকার। তাই জগৎপতি প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে : 'এ অবস্থায় হাঁটা-চলা কি ঠিক হবে?'

'কখনো না। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

দোরগোড়ায় ডাক্তারকে বিদায় দিলেন জগৎপতি, আর যেহেতু রুচিরার যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল সেই হেতু বুঝলেন ভাস্করকেও কিছু যি দেওয়া দরকার। বললেন, 'একবার উপরে যাও। রুচি তোমাকে খুঁজছিল, কী যেন বলবে।'

'না, বলবে আবার কী! তার তো এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।' বলে সটান বেরিয়ে গেল ভাস্কর।

এপাশের ঘরেই বসেছিল রুচিরা, যাতে ভাস্কর হঠাৎ ঘরে ঢুকে রুচিরাকে না একা পায়। যদি একা ঘরে ঢোকে তাকে তো অনধিকার প্রবেশ বলা চলবে না, আর যদি নিয়ে যাবে বলে হাত ধরে টানাটানি করে তা হলেও বলা চলবে না বলাৎকার। শত হলেও আইনের চোখ অন্ধ, ডাকাত পড়েছে বলে চেঁচামেচি করলে তো সিন্ধ হবার নয়। তাই জোরে না পারি বুদ্ধিতে পারব।

জগৎপতি এসে বললেন, 'খুব চটে গিয়েছে।'

'তা চটুক। চলে গিয়েছে তো?' এপাশের বুক থেকে পাথর নামল : 'ও চলে গিয়েছে শুনলেই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়।'

'এখনো সম্পূর্ণ চলে গেল কই?' নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ করলেন জগৎপতি।

'তুমি এত পারো, এটা পারো না?' যাতে ভালো ঘুমুতে পারে না এপাশের, তাই এই দুরভিসন্ধিটা চোখে জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে কেমন পাগলের মত দেখাল।

'বিবেকের ভয় তো নয়, ভাগ্যের পরিহাসে ধরা পড়ে যাবার ভয়।' স্থির-মাথার লোক, বললেন জগৎপতি : 'যার জন্যে গোড়াতেই রুচির জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারলাম না।'

মোটেই তার জন্যে নয়। ভঙ্গিতে এই ভাবটা ফুটিয়ে রুচিরা চলল তার নিজের ঘরের দিকে। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু আসলে এ প্রতিবাদ। সে এই প্রতিবাদ, এই জীবন্ত প্রতিবাদ নিয়েই চেয়েছিল বেঁচে থাকতে। পরে ঘটনাটা যে ভাবে ঘুরল, তাতে তার কোনো হাত নেই। যে কোনো ভাবে, যে কোনো দিক থেকেই হোক, দুঃখ আসবেই। দুঃখ না এলে পাপকে পোড়াবে কে, কী করে হবে জীবনের শুদ্ধিস্নান!

রুচিরা তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

কোনো টান নেই কোনো আকর্ষণ নেই, গরিবানার মোহ তার ভেঙে গিয়েছে, তবু মানুষ হিসেবে ভাস্করের প্রতি একটু মায়া কোন না আছে রুচিরার। শত হলেও পরোপকার তো করেছে, প্রত্যাখ্যাতার কলঙ্কমোচন করেছে, একটা অপ্রার্থিত জন্মকে তো জীবনের অধিকারী করেছে, সেই দিক থেকে কিছু মূল্য তাকে দেবই, কিন্তু তাই বলে সামান্য বেগুনওয়ালা হয়ে সে যেন হীরের দাম না চায়, হাতের চেয়ে গ্রাস না বড় করে।

ডিক্রি করে বউ দখল নেবে? যেখানে প্রাণ নেই সেখানে তো মাংসপিণ্ডও নেই।

১০

আপিসে টেলিফোন করলেন জগৎপতি : 'কে ভাস্কর? হ্যাঁ, তোমার মাকে বোলো তাঁর একটি নাতি হয়েছে। নব-জীবন নার্সিং হোমে আছে। ভালোই আছে দুজনে। তোমার মাকে নিয়ে এক-দিন এস। আর, হ্যাঁ, বার্থ রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলো।'

'ঠিক আছে।'

মহালয়া তো পোনামাসই যাবার জন্যে পাগল। ছেড়ে দে, আমি আমার গোপালকে দেখে আসি।

'বউ দেখলি না, ছুটল নাতি দেখতে!' বিদ্রূপ করল ভাস্কর।

'বউয়ের উপর আমার অভিমান হতে পারে কিন্তু গোপালের উপর আমার অভিমান কী!'

'কিন্তু গোপালকে তুমি চিনবে কী করে?' ভাস্কর তরল পরিহাসের সুরে বললে, 'দেখলে এক ভদ্রমহিলা একটা ছেলে কোলে করে বসে আছে, তুমি কী করে বুঝবে ঐ ভদ্রমহিলা তোমার পুত্রবধূ?'

'তুইও চল, তুই সনাক্ত করে দিবি।' মহালয়া আবেগভরা মুখে বললেন, 'তুইও দেখে আসবি তোর গোপাল।'

'আমার বয়ে গেছে! আমি নতুন বাড়িতে, দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। ঘর-দোর সাজিয়েছি-গুছিয়েছি, কোনো অসুবিধেই রাখিনি, এবার সে আসবে সংসার করতে। আমি ততদিন অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু আমার যে তর সইছে না।'

'যে গোপাল তোমায় মান রাখল না, নিজের থেকে এল না তোমার কাছে, তোমার কোলে, তাকে দেখবার জন্যে কেন তোমার মাথাব্যথা?'

'আমার কত দিনের সাধ পাব আমার গোপালকে।'

'তার মানে আমাকে পাবার আগেই তোমার গোপাল পাবার ইচ্ছে। ধৈর্য ধরো। যদি সত্যিই গোপাল হয় সে নিজের থেকেই তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ফার্নিচারও জগৎপতিই কিনে দিয়েছেন, পর্দা-কার্পেটও তাঁর পয়সায়। এ সব ঠাট-ঠমক না হলে সে আসবে না। পরোক্ষে এটাই বলা যে, যেহেতু তোমার সাধ্য নেই এই সাজ-সজ্জার উচ্চ-স্বরটা বজায় রাখো, পুষতে পারবে না এই ঐশ্বর্যটাকে। আড়ম্বর ছাড়া কি ঠাকুরমশাই পুজো হয়? সুতরাং, ছেড়ে দাও, তপ্ত করলার টুকরো ফেলে দাও হাত থেকে, যে ঘরে যেতে এসেছে তাকে ঘরে যেতে দাও।

নতুন ফ্ল্যাটে বদলি হতে ইচ্ছে ছিল না ভাস্করের। এ যেন তারই অসামর্থ্যকে রঙিন পেন্সিলে দাগা দিয়ে দেখানো। কিন্তু ন্যায্য বিবাহেও তো স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে বিস্তৃত হবার তাগিদে বড় বাড়ির খোঁজ পড়ে। তা ছাড়া তার তো নগদ-বিদায়ের পালা, যা হাতে আসে তাই সে লুফে নেবে না কেন, কেনই বা

কাশ্মীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
গুণসমৃদ্ধ
তৈল

লক্ষ্মীবিলাস

এম. এল. বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

লুটে নেবে না? দুদিনের বৈরাগীই তো তাকে প্রসাদ বলে নেবে।

ভাস্কর জানে, দুদিন পরে সমস্ত কিছু তাসের ঘরের মত উড়ে যাবে, আবার সে নেমে আসবে তার বিবর্ণতায়। তাই সে পুরোনো বাড়িটা ছাড়েনি, পুরোনো বন্ধু, সদাব্রতকে এনে বসিয়েছে, ভাড়া চলছে আগের মত। ভয় আছে, সে দুর্দিনে বন্ধু আবার না বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্বপ্ন না থাক, মাত্র দখলের জোরে না পথ আটকায়।

আসতে হলে এখনেই আসত। কোনো অসম্পতাই বোধ হত না। কিন্তু কেন আসবে? কিসের টান কিসের আকর্ষণ কিসের প্রবলতা? কী তার আছে যাতে সে মূল্যবান বলে প্রতিভাত হতে পারে? কুড়িয়ে নিতে পারে সমস্ত মন, সমস্ত শরীর, সমস্ত সার-সত্তা? কিছুই নেই। শূন্য ফাঁকা আওয়াজে কার বুক সে বিদ্ধ করবে?

না, ফাঁকা আওয়াজ কে বললে? আইনের শিলমোহর করা দস্তখৎ। সে দস্তখতের পিছনে সমস্ত রাজশক্তি, সমস্ত উদ্যত বেয়নেট। সে-অধিকারই বা সে প্রতিষ্ঠিত করবে না কেন? কেন এক ক্ষণগর্বিতার ঔদ্ধত্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে না? কেন ক্ষুদ্র একটা খেয়ালের সামনে সে সমস্ত পুরুষ-শক্তিকে, সমাজশক্তিকে নিষ্প্রভ করে রাখবে? সে ছাড়বে কেন, সে ঠকবে কেন, কেন সে তার প্রাপ্তবাকে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে না? হোক তা এক পিণ্ড ইচ্ছাহীন মাংস, তাতেই সে অপূর্ব নৈপুণ্যে পারবে প্রাণ এনে দিতে, সমস্ত বৈমুখ্যকে নিয়ে যেতে আনুকূল্যে। পারবে না? পারা যায় না কোনদিন? একটা ভালো-লাগাকে ফলিয়ে তোলা যায় না ভালোবাসায়?

কত আর ধৈর্য ধরবে, বাধা-বিপদ ডিঙিয়ে সোমনাথকে নিয়ে মহালয়াই একদিন গিয়ে হাজির হল। সুবিধেই হল হয়তো, জগৎপতি ভাবলেন। বিয়েটা তাহলে একটা একক গাছে আবদ্ধ না হয়ে সমস্ত অঙ্গণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এণাক্ষীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এণাক্ষী নিয়ে গেল রুচিরার ঘরে। নবতোলা কোনো-কিছুর ধার-না-ধারা নির্বোধ শিশু খাটের আধখানার অনেক বেশি জায়গা জুড়ে রাজ্য বিস্তার করে ঘুমুচ্ছে, পাশে আধশোয়া রুচিরা।

পলকে বুকে নিল মহালয়া। 'এই যে আমার গোপাল!' পরিপূর্ণ কী স্নেহে কুঁকে পড়ল মহালয়া: 'আমার কত সাধনার ধন।'

একটা ফিটফাট পোশাকের ছিমছাম ধাই—সদ্ভ্রান্ত নাম অয়ান নার্স—পাশেই ছিল, শাসন করে উঠল: 'অত ঝুঁকবেন না।'

'না, ঝুঁকছি না।' একটু বুঝি সরে গেল মহালয়া: 'দেখছি আমার গোপালকে। মাথাভরা কী সুন্দর চুল! কী নাক-চোখ-কপাল! একেবারে আমার ছেলেবেলার ভাস্কর।'

এণাক্ষী রুচিরাকে বললে, 'ইনি ভাস্করের মা।'

'আমি তোমার শাশুড়ি। আর তুমিই আমার ঘরের লক্ষ্মী, যশোমতী।' রুচিরার চিবুকে ধরে একটু আদর করল মহালয়া: 'আমার বউমাও বা কী সুন্দর!'

রুচিরা হাত তুলে নমস্কার করল। পাশে চেয়ার দেখিয়ে বললে, 'বসুন।'

সোমনাথও স্নেহ-কৌতূহলে অক্লান্ত হবার আগেই নার্সের ইঙ্গিত দূরে সরে গিয়ে এক কোণে একটা সোফায় গিয়ে বসেছে।

মহালয়া সরল না, খানিক জায়গা করে নিয়ে বসল। নার্সকে বললে, 'গোপালকে একটু আমার কোলে দেবে?'

'দেখছেন না ঘুমুচ্ছে।' নার্স আবার শাসন করল।

'আহা, গোপাল খানিক জাগে খানিক ঘুমোয়, তাতেই তো রাত-দিন, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ। যদি একটু জাগেও, আবার আমার কোলে এসে গোপাল ঘুমিয়ে পড়বে।'

এণাক্ষীর অসহ্য লাগছিল, বললে, 'কী অমন একটা বিশ্রী নামে ডাকছেন?'

'গোপাল বিশ্রী নাম?'

'নিশ্চয়ই। গরু, গরুর পাল এ-সব আবার কী নাম? ও সব নাম আজকাল চলে নাকি?' এণাক্ষী গর্ব ফুটিয়ে বললে, 'আমরা অন্য নাম রেখেছি।' এমন একখানা ভাব করল, শিশু যেন ওদেরই একলার শিশু, আর কারু নাম রাখবার এক্তিয়ার নেই।

'কী নাম?' তবু জিগগেস না করে পারল না মহালয়া।

'অসীম।'

'বা, অসীম তো খুব ভালো নাম। আমার গোপালই তো অসীম—অনন্ত—অশেষ।'

তবু গোপালকে কেউ মহালয়ার কোলে তুলে দিল না। নার্সের চোখ পাহারা দিচ্ছে।

তখন মহালয়া রুচিরার দিকে মনোযোগ দিল। জিগগেস করল: 'নার্সিং হোম থেকে ফিরেছ কত দিন?'

এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকাল রুচিরা। বললে, 'দিন সাতেক।'

'নার্সিং হোমে ছিলে কদ্দিন?'

'দু সপ্তাহ।'

মহালয়া হিসেব করে দেখল, অনায়াসেই প্রণাম করতে পারত রুচিরা। প্রণাম কি আর পুরো করতে হত নত হয়ে? সেই নম্রতার ঠাণ্ডা ভঙ্গিটুকু করতে না করতে মহালয়াই তাকে নিরস্ত করত।

'নিজের ঘরে কবে যাবে?'

যা হোক রুচিরাই তো উত্তর দেবে, তা নয় এণাক্ষী বললে, 'সে ডাক্তার জানে। শরীর এখনো—'

'তা হলে আজ আসি।' আবার গোপালের কাছে এগিয়ে গেল। ছোট দুটি সোনার বালা তার হাতে ঠেকিয়ে রাখল বালিশের কাছে। শক্ত জিনিস এত কাছে রাখা উচিত নয় সেই ওজুহাতে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল নার্স।

মহালয়া চলে যেতে-যেতে আবার ফিরল। বললে, 'আমি আবার আসব। সেদিন নিশ্চয়ই গোপালকে জাগা দেখব। শুনব তার মিষ্টি কান্নার বাঁশির সুর।'

'যদি আসেন তা একটু জানিয়ে আসবেন।' মনে করিয়ে দিল এণাক্ষী।

নেমে যাচ্ছে, মহালয়া শুনতে পেল শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ। ওই, ওই আমাকে ডেকেছে। এবার সোমনাথ ধমকাল।

তাই আর ফিরতে গেল না মহালয়া।

বাড়ি এসে ভাস্করকে বললে, 'ওরা এমন একটা ভাব দেখাল যেন গোপাল ওদেরই সব, আমাদের কেউ নয়।'

'কবে আসবে তার কিছু আভাস দিলে?'

'কিছুমাত্র না। ডাক্তারের উপর বরাত দিলে।' মহালয়ার মুখ থমথমে হয়ে উঠল: 'মনে হচ্ছে আমাদের ওর সব কিছু অপছন্দ। স্বামী অপছন্দ, শাশুড়ি অপছন্দ, বাড়িঘর লোকজন আচার-বিচার নামধাম—সমস্ত।'

'শুধু ওর ছেলে পছন্দ।'

'কিন্তু ছেলে তো ওর নয়, ছেলে আমাদের। ও না আসে তো না আসুক,' মহালয়াও দৃঢ় হতে পারল: 'আমাদের ছেলে আমাদের দিয়ে দিক।'

কতদিন পরে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, দুপুর বেলা, রিকশা করে বেরিয়ে পড়ল মহালয়া। কে তাকে আটকায়, সোজা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে একেবারে তার গোপালের কাছটিতে।

'কেমন আছ বৌমা?'

ছেলেটা জেগে আছে, খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল রুচিরা, প্রশ্ন

শুনে চমকে তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'এ কি আপনি?'

'কেমন আছ?'

'ভালো নয়।' রুচিরা এক রাজ্যের অসন্তোষের মুখোস আঁটল মুখে।

'আর আমার গোপাল?' মহালয়া তাকিয়ে দেখল গোপাল আজ জেগে আছে, তাকিয়ে আছে, সমস্ত আকাশ চন্দ্র-সূর্যে আলো করে আছে। তাকিয়ে দেখল নার্সটা আজ নেই, বিদায় হয়েছে কুচকুচে কুচকুচটা। অবাধে তাই গোপালকে বুকে তুলে নিল মহালয়া, আদরে আনন্দে আঘ্রাণে অনুভবে নতুন এক আস্বাদের অধারে চলে এল।

'কেমন ঠাণ্ডা ছেলে, কেমন বড়সড় হয়ে উঠেছে।' তার গোপালের কত রূপ কত গুণ বলে শেষ করতে পারছে না মহালয়া।

রুচিরা ভাবছিল, সমস্তই কেমন মায়া আর মায়াই কেমন মধুময়। নইলে অজন্তে তারও চোখে ঘোর লাগে কেন? একটা বৈধতার আচরণ পড়েছে বলে নির্ভর হয়ে সেও তাকাতে পারছে শিশুর দিকে, চেখে বুকে আনতে পারছে মমতা। যা লজ্জার ছিল তা এখন আনন্দের হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, সমস্তই তা হলে ভ্রম-প্রমাদ-অসারল্য?

হঠাৎ তন্ময়তার ধাক্কা খেল যখন শিশুকে সরিয়ে রেখে মহালয়া জিগগেস করলে, 'এখন তো বেশ সুস্থ হয়েছে, এবার তবে কবে বাড়ি যাবে?'

'না এখনো সুস্থ হইনি।' মুখ নিচু করে বললে রুচিরা।

'তোমার সত্যি কি হয়েছে তাই বলো তো। কেন তুমি যেতে চাচ্ছ না নিজের জায়গায়?'

'তা হলে আপনাকে বলি।'

'বলো।' ঘেঁসে কাছে এল মহালয়া।

'আপনার ছেলে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।'

'প্রবঞ্চনা? সে কী?'

'বলেছিল সে হ্যানো ত্যানা পাস, কোন সদাগরী আফিসে বিরাট কী চাকরি করে, নিজেদের বাড়ি আছে, আরো কত কী। এখন বিয়ের পর দেখছি সমস্ত ভুয়ো, আগাগোড়া মিথ্যে। সে দেখছি পরিবের গরিব, অকর্মণ্য, অশিক্ষিত। যার জীবন এতবড় একটা মিথ্যার কারবার তার সংসার করতে আমার মন ওঠে না।'

'তুমি বলো কী? ভাস্কর আমার কখনো এত হীন হতে পারে?' মহালয়া রাগবে না কাঁদবে ভেবে পেল না: 'তাই যদি হবে তবে তোমার বাবা তাকে এত যৌতুক দিলেন কেন?'

'তারই জন্যে দিলেন। আশা করলেন আমি যদি যাই, কত কমে আমার চলতে পারে। আমি বলি কি, আমি যখন এই প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দিতে রাজি নই, তখন আমাকে আপনারা ত্যাগ করুন।' স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা: 'বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিন।'

'আর আমার গোপাল?'

মহালয়া চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনাদের ছেলে আপনারা নিয়ে নিন। আমার কিছু আপত্তি নেই।' রুচিরা কান্নার করুণ মুখ বলল, 'আমি অবার আমার কুমারী জীবন ফেরত চাই। আমার সেই পবিত্র জীবন, স্বাধীন জীবন।'

এ যেন কী রকম অন্য রকম হয়ে গেল। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। তবু চলে যাবার আগে একবার চেষ্টা করল প্রলেপের হাত বুলোতে, বললে, 'তেমন যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তা এখন ভুলে যাও। তোমার গোপাল এসেছে, তোমার আর কী দুঃখ! যাই হোক ভদ্রস্থ চাকরি-বাকরি হয়েছে এখন ভাস্করের, তাকে মার্জনা করে নিতে দোষ কী। তা ছাড়া তুমি এত বড় বাপের মেয়ে, একমাত্র ওয়ারিশ—তোমার কিসের ভাবনা?'

'না, না, আমি প্রবঞ্চকের ঘর করি না।' দু হাতে মুখ ঢেকে অঢেল কেঁদে ফেলল রুচিরা: 'যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে আমার শত্রু।'

তবু গোপালের দিকে ফিরে তাকাল মহালয়া। বলল, 'তুমি যখন এসেছ তখন সব গোলমাল মিটিয়ে দাও।'

বাড়িতে ফিরে এসে ভাস্করকে সব বললে মহালয়া।

ভাস্কর কিন্তুমাত্র উত্তেজিত হল না। শান্ত মুখে বললে, 'আদ্যোপান্ত মিথ্যে। নিজের অহঙ্কারকে ঢাকা দেবার ছলনা। তুমি ওদের ওখানে যাও কেন? যেও না।'

'যে স্ত্রী স্বামীর নামে এত মিথ্যে রটায় তাকে নিয়ে আবার ঘর করা কী। জানি না কী করে বিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় আজকাল। যদি দেওয়া যায়,' মহালয়া অতুষ্ট মনে বললে, 'তা হলে ছাড়িয়েই দেওয়া উচিত।'

ভাস্কর বুঝছে কেন এ মিথ্যের অবতারণা। শুধু বিয়ে ভাঙার প্রেরণাকে সচেতন করবার জন্যে। মাকেও সেই প্রেরণায় আরো জোগাবার কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে।

মুখে বললে, 'একশোবার উচিত।'

একটু বুঝি বা অসহিষ্ণু হয়েছে মহালয়া। 'তা হলে এখন তুই কী করবি?'

'আপাতত চুপ করে বসে থাকব।'

'চুপ করে বসে থাকবি? সে আমি সহ্য করতে পারব না। আমাকে তা হলে কালীতে দিদির বাড়ি পাঠিয়ে দে।'

ভাস্কর চুপ করে রইল।

কিন্তু চুপ করে থাকতে তাকে দিচ্ছে কে? কদিন পরে জগৎপতি এসে হাজির।

'বার্থ রেজিস্ট্রেশনের নকল নিয়েছ?'

'নিয়েছি। এই যে।'

দেখলেন, ঠিকই আছে। পিতা হিসেবে ভাস্করেরই নাম রয়েছে। তারিখও ঠিকঠাক। কিন্তু ছেলের নাম গোপাল রেখেছ বুঝি? হ্যাঁ, মায়ের প্রিয়তম নাম গোপাল। আমাদের অসীম নামটাই পছন্দ। তা বেশ তো, অসীম পোশাকি থাকবে, গোপাল ডাক-নাম।

'তোমার ব্যাঙ্কে তোমার নামে বাকি পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছি।' বললেন জগৎপতি: 'এবার তবে ডিভোর্সের মামলাটা ফাইল করে দিই।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আমি একটা আর্জি তৈরি করে দেব সেটা সই করে দেবে।'

'শুধু এইটুকু?' পরম আশ্বাসে বললে ভাস্কর।

'হ্যাঁ। আর বিয়ের পরেই তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে একটা স্পেশাল কেস করতে হবে। সে সব আমি দেখে নেব।'

'আর কিছুই আমাকে করতে হবে না?'

'সময়কালে একটা এক্সপার্ট এভিডেন্স দিতে হবে। ব্যস, শান্তি।'

'আর্জিটা এনেছেন?' যেন এখুনিই সই করে দেবে হাত বড়াল ভাস্কর।

'না, দিন-কতক পরে তুমি আমাদের বাড়ি যেও, সই করিয়ে নেব। ব্যাঙ্কে খোঁজ কোরো, টাকাটা ঠিক ক্রেডিট হল কিনা।' আশীর্বাদে ভরপুর হয়ে জগৎপতি বাড়ি ফিরলেন।

কদিন পরে সকালবেলা ট্যাক্সি নিয়ে জগৎপতির বাড়ির দরজায় এসে থামল ভাস্কর। ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢুকল ভিতরে। ডাকাত-পড়ার মত ঢুকল রুচিরার ঘরে। রুচিরা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে।

অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে রুচিরাকে। ভাঙা-ভাঙা শরীরটা আঁকাবাঁকা সুরের মতই মনোহর। কিন্তু, না, বিভ্রান্ত হবে না, বাস্তবভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজ।

'চলুন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' ভাস্কর যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে: 'উঠুন, চট করে তৈরি হয়ে নিন। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় যেতে হবে?' চোখ তুলল বৃচিরা।

'আমার বাড়ি।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে কী জানি না। তবু আপনাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।'

'তার আগে বিচ্ছেদের মামলার আর্জিটা সই করেছেন?'

'না, করিনি। কিন্তু, কাকে আমি বিচ্ছেদ করব?'

'কাকে, জানেন না? আমাকে।'

'মামলা স্ত্রী-বিচ্ছেদের। কিন্তু আপনি কি আমার স্ত্রী?'

'আমি কে তবে?' হাঁপধরা লোকের মত মুখ করল বৃচিরা।

'আপনি একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ওঠে কী করে?'

'ভদ্রমহিলা?'

'ভদ্রমহিলা বলেই তো 'আপনি' করে বলছি। স্ত্রী হলে তো তুমি বলতাম।' নিজের থেকেই ভাস্কর বসল সামনের চেয়ারে। বললে, 'তাই যদি সত্যিই বিচ্ছেদ চান তা হলে আপনাকে পুরো-পুরি স্ত্রী হতে হবে। আমার সংসার করতে হবে।'

গোপালকে শুইয়ে রাখল বিছানায়। কেশবাসে নিতেজাল পারিপাট্য আনল। যত পারল স্নিগ্ধ ঢালল কণ্ঠে। বৃচিরা বললে, 'বাকি টাকাটা পেয়ে গিয়েছেন বুঝি?'

'টাকা পাবার কথা—পাব না কেন?'

'তবে আর কী চান? চাকরিও তো একটা বাগিয়েছেন জুতসই। আসবাব-ওয়ালা ফ্ল্যাটও। যে শুধু টাকার কাঙাল তার আর কী দরকার?'

'টাকার কাঙাল?'

'টাকার দামে পরোপকার করতে এসেছেন!' আগুনের মত হয়ে উঠে পড়ল বৃচিরা : 'আমি তো ভদ্রমহিলা, আপনি তবে কেন ভদ্রলোক হতে পারছেন না? আর সকলের দাম আছে, নিজের কথার কেন দাম নেই? ব্লেকমেল করতে এসেছেন! অভদ্র কোথাকার!'

'এখন তেজ দেখানো খুবই সহজ।' ভাস্করও জিভকে ঘৃণার পাষাণে শান দিয়ে নিল : 'এখন যে ধৈর্যটায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এখন আমিই তো অভদ্র। আর আপনি—'

কী একটা কঠিন কুৎসিত কথা বলবে অনুমান করে দু কান দু হাতে চাপা দিল বৃচিরা।

কিন্তু, শুনুক বা না শুনুক, থামল না ভাস্কর। বললে, 'আর আপনি সতীশিরোমণির প্রতিমূর্তি। শুনুন, বছরের বাড়িতে মজাসে বসে থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না। আপনাকে মুক্তি নিতে হবে আমার ঘর থেকে, আমার বন্ধন থেকে।'

'কিন্তু আপনার ঘরে যে আমি যাব সেখানে আমার কিসের আকর্ষণ?' বৃচিরা প্রায় হাহাকার করে উঠল : 'আমি কি আপনাকে কোনো দিন চেয়েছি? কোনো দিন ভালোবেসেছি একফোঁটা?'

'ভালোবাসার কথা বলবেন না। আর চাওয়া? যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' ক্রোধ ছেড়ে দৃঢ়তায় নেমে এল ভাস্কর : 'ভালোবাসা ছাড়া স্বচ্ছন্দেই বহু স্বামী-স্ত্রী সংসার করে যাচ্ছে। একটুকু বাধছে না। ইচ্ছে করলে আপনিও পারবেন।'

'ইচ্ছে? আমার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে হয় না একফোঁটা। আপনার কী আছে যে হবে?'

'কী আছে?' ভাস্কর উঠে দাঁড়াল : 'সুখানি কাগজ আছে। স্নাতকের ইস্টাহার আর পিতৃত্বের সার্টিফিকেট।'

'যে দু টুকরো কাগজে সেই ঘোষণা করা আছে তার দাম ঐ দু টুকরো কাগজেরও সমান নয়। সমস্তই জলীক, অসার। সে আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

'আমার-আপনার জানায় না-জানায় কিছু এসে যাবে না। আইন কী জানে তাই দেখতে হবে।'

'খুব আইনজ্ঞান হয়েছে আপনার!'

'আমাদের কী করে হবে? সমস্ত আইনজ্ঞান আপনার আর আপনার বাবার!'

'ছোটলোক কোথাকার! ভেবেছিলাম কিছু মর্যাদা আছে আপনার, কিছু মহত্ত্ব। কিছু নেই। আপনার আছে শুধু টাকার খাঁকতি, কী করে আরো দুটো টাকা হবে। আরো যদি কিছু দরকার হয়, যান না বাবার কাছে, গিয়ে হাত পাতুন।'

'কে কার কাছে হাত পাতে দেখা যাবে।'

'আমরা হাত পাতি না, আমরা হাত বাড়াই। সে হাত স্বত্বের হাত, সত্যের হাত, আপনার মত গরিব কুণ্ঠাব্রস্ত ভিক্ষুকের হাত নয়।'

'তবে তাই। আপনি তা হলে যাবেন না আমার সঙ্গে?' খাটের দিকে দু পা এগুলো ভাস্কর।

'কক্ষনো না।' বৃচিরা খাটের বাজু ধরল।'

'বেশ, যাবেন না। কিন্তু আমি ছেলেকে নিয়ে যাই।' বলে মুহূর্তের মধ্যে ভাস্কর ছেলেকে খাট থেকে তোলে মেরে তুলে নিয়ে কাঁথায়-ন্যাকড়ায় বুকের মধ্যে পুঁটলি করে চেপে ধরে চলল সিঁড়ির দিকে।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না বৃচিরা। প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, পরে হৃৎপিণ্ডে হেঁচকা টান পড়তেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল : 'একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আমার বাড়িতে।'

সিঁড়ির কাছাকাছি বৃচিরাও এসে পড়েছে। বললে, 'সে কী, এ কি আপনার ছেলে?'

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নামতে-নামতে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'কার ছেলে তা কোর্টকে, আইনকে গিয়ে জিগগেস করুন।'

খুব একটা চেঁচামেচি করতে গলায় বুঝি আটকাল বৃচিরার। প্রথমত, নাটকীয়তার প্রতি অরুচি, দ্বিতীয়ত এলাকীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে কদিন। তেমন চেঁচামেচি করলে এলাকী নিশ্চয়ই উত্তেজিত হবে, হয়তো বা ছুটে আসবে, হাটের অবস্থা যা শোচনীয়, একটা কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর তৃতীয়ত, মনের গভীর স্তরে আছে বোধহয় শীতলতা—যাক নিয়ে, নিয়ে গেলে বাঁচি—এই নির্লক্ষ্য উপশম।

তবু জানল আর্সিতে নেমে এল নিচে। আর বুঝি নাগাল পেল না। সিঁড়ির প্রথম ধাপের উপর বিষবৃক্ষের মত বসে পড়ল বৃচিরা। একবার কেঁদে উঠল, 'বাবা' বলে—জগৎপতির উদ্দেশে।

জগৎপতি বৈঠকখানায় কাজ করছিলেন, ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন। এলাকীর কিছু হল নাকি? দেখলেন প্যাসেজ দিয়ে কে বেরিয়ে গেল ভাস্করের মত। বাইরে এসে নিশ্চিন্ত হলেন, ভাস্করই তো, রাস্তায় দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠছে।

'শোনো।' জগৎপতি ট্যাক্সিকে উদ্দেশ করলেন।

হতচকিতের মত ড্রাইভার দাঁড়িয়ে গেল।

রাস্তায় চলে এসে জগৎপতি দাঁড়ালেন ট্যাক্সি ঘেঁসে। বললেন, 'তুমি কখন এলে টের পাইনি। এখুনি চলে যাচ্ছ কী। নেমে এস। আর্জিটা তৈরি হয়েছে। সই করে দিয়ে যাও।'

'সই করব না।'

'সে কী, সই করবে না মানে?'

'সই করব না মানে সই করব না।' ভাস্কর ট্যাক্সিকে হুকুম দিল : 'চলো।' ট্যাক্সির স্টার্টার আওয়াজ ছাপিয়ে

ভাস্করের পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা কাঁচ কান্নার শব্দ উঠল।

'ও কে? ও কে তোমার ওখানে?' জগৎপতি স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন।

'ও আমার ছেলে।'

'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে। ওকে এই পাপপুরী থেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার ওখানে। আমারই ওকে মানুষ করবার কথা।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

১৪

মহালয়ার কোলে শিশুকে ঢেলে দিয়ে ভাস্কর বললে, 'এই নাও তোমার গোপাল।'

'নিয়ে এসেছিল? পেরেছিস আনতে?' অতর্কিত-আনন্দে মেশানো চেহারায় মহালয়া ঝাপটে ধরলেন, আঁকড়ে রইলেন গোপালকে।

'কেন পারব না?' ভাস্কর প্রায় বাঁয়ের মত বললে, 'মা নষ্ট বলে ছেলেকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। দেখ এখন পারো কিনা বাঁচিয়ে রাখতে।'

কী যে বলিস। মহালয়া একেবারে বুক দিয়ে পড়লেন। আঁতুড়ে মা মরে গেলে ছেলে কি আর বাঁচে না? খুব বাঁচে। দেখে এসেছেন মা বুকের দুধ খরচ করতে অনিচ্ছুক, তাই বোতলে টিনের দুধ খাচ্ছে ছেলে। তাই যদি হয়, মাকে আর তবে কিসের প্রয়োজন? বোতল আর টিনের দুধ মহালয়াও জোগাড় করতে পারে। এনে দিতে পারে দোলনা, ফানুস, ঝুমঝুমি, বিছানা-বালিশ, এনে দিতে পারে রঙিন মশারি। ডাক্তার ডাকতেও অপারগ নয় মহালয়া। যে সমস্ত সম্ভ্রান্তের অধীশ্বর তার কিছুরই অভাব হবে না।

কতক্ষণ কাঁদবে গোপাল! এই আবার হাসতে সুরু করেছে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে সুরু করেছে। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই খুঁজতে শিখেছে ঠাকুমাকে। ভাস্করকেও চিনতে শিখেছে। সোমনাথও যদি হাত বাড়িয়ে দেয় কোলে উঠতে আপত্তি করে না।

তবু ভয়ে-ভয়ে আছে মহালয়া। ডাকাতি করে এমনি ছেলে নিয়ে আসা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জগৎপতি। এত বড় একজন জবরদস্ত ধনী-মানী সহ্য করবেন না এ অপমান। মেয়ের মনোভাবে যুক্তি থাক বা না থাক, পিতৃস্নেহ স্বভাবতই মেয়ের পক্ষ নেবে। কিছুতেই মেয়েকে পরাভূত দেখতে চাইবে না। শূন্যকোলে রিক্তবুকে মেয়েকে শোকার্ত মুখে সংসারে ঘুরতে-ফিরতে দেখবে, সব থেকেও যার কিছু নেই, এ বাপের পক্ষে অমানুষিক যন্ত্রণা। প্রতিকার আসবেই আসবে।

কিন্তু কী প্রতিকার? পুলিশ নিয়ে আসবে? ভাস্কর বললে, বাপ তার ছেলে নিয়ে এসেছে এর মধ্যে দুরভিসন্ধি কোথায়? না, ফৌজদারির নামগন্ধও নেই। এক করতে পারে কোর্টে গিয়ে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানাতে পারে। বলতে পারে, দুধের শিশু, মার হেপাজতেই তার থাকা উচিত। শিশুর মঙ্গল দেখতে হলে, এক্ষেত্রে, মা-ই উপযুক্ত অভিভাবক, বাপ নয়। সুতরাং মার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক শিশুকে।

বেশ তো, যাক না কোর্টে, করুক না দরখাস্ত। সমগ্র কথাটা উঠে পড়ুক। কাপড়ের মর্যাদা ছিঁড়েখুঁড়ে খানখান হয়ে যাক।

কিন্তু কই, দশ-বারো দিন হয়ে গেল, ও পক্ষের কোনোই উচ্চবাচ্য নেই। কোথায় কোর্ট-পুলিশ! সামান্য একটা কেউ খোঁজ করতে পর্যন্ত এল না।

না, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। এবার বুঝবে বুঁচিয়া, এ বাড়িতে সাঁটাই তার কোনো আকর্ষণ আছে কিনা। আর এ টান, যেমন-তেমন নয়, একেবারে নাড়ীর টান, গর্ভারের কান্না। একেবারে মূল ধরে উপড়ে আনা।

এ শিশুই টেনে আনবে বুঁচিয়াকে। যেখান থেকেই আসুক সন্তান সন্তান। তার কাছে কিসের লজ্জা কিসের অহঙ্কার। ধৈর্য ধরো, আসবেই আসবে। প্রত্যাখ্যানের এক স্তূপ পাথর স্নিগ্ধ-গাঢ়ী হয়ে রবে। যদি কারু ক্ষমতা থেকে থাকে তবে এই এক শিশুরই আছে।

কতদিন পরে একটা শুধু ফোন এল আপিসে। হ্যাঁ, জগৎপতির গলা।

'কি, কী হল? কী ঠিক করলে?'

'কোন বিষয়ে?'

'ডিভোর্স বিষয়ে। সে কী, মনে করতে পারছ না?'

'না, তা কেন?'

'তবে? কী বলতে চাচ্ছ?'

উপচীয়মান উপহার

ভাবি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে; গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

'বলতে চাচ্ছি যার ডিভোর্স তিনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।' রিসিভার রেখে দিল ভাস্কর।

তারপর সটান ভাস্করের আপিসে চলে এলেন জগৎপতি। বাড়িতে যেতে পা উঠল না। যদি তাড়িয়ে দেয় তা হলে কী করে কোন মুখে ফিরে আসবেন?

আপিসে ধরাই সোজা। আপিসের পরিবেশই যথাযোগ্য গাম্ভীর্য আনবে।

ম্যানেজার নিভৃত দর্শনের ব্যবস্থা করে দিল। ভাস্করের মুখোমুখি বসলেন জগৎপতি।

'আমি সেই আর্জিটা নিয়ে এসেছি, কোর্ট-ফি চড়িয়ে। একবার কি পড়ে দেখবে?' জগৎপতি ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালেন।

'না। পড়বার দরকার নেই।' ভাস্কর বললে।

'তা হলে দস্তখৎ করে দাও।'

'বলেছি তো দস্তখৎ আমি করব না।'

'করবে না?'

'মানে এখন করব না।'

'কখন করবে?'

'চুক্তির সমস্ত সর্ত যখন পরিপূর্ণ হবে।' ভাস্কর পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত মুখে বললে।

'চুক্তির আর কী সর্ত? উঁচু চাকরি আর নগদ টাকা। ফ্ল্যাট যে ভাড়া করে দিয়েছি সেটা বাড়তি, অতিরিক্ত। এর বেশি আর কিছু ছিল না।'

'ছিল। সে সর্ত রুচিরার সঙ্গে।'

'মিথ্যে কথা।' জগৎপতি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'চুক্তির মধ্যে পঞ্চ শুধু আমি আর তুমি। রুচিরা আসতেই পারে না। রুচিরার সঙ্গে তোমার দেখা হল কখন? চুক্তি হয়ে যাবার পর।'

'চুক্তিটা কন্টিন্যু করছিল, কনক্লুডেড হয়নি। কাগজে-কলমে লেখা হয়নি তো, তাই ধরা যাচ্ছে না। আপনি রুচিরাকে জিগগেস করে দেখবেন।'

তর্ক করা অসম্ভব। কণ্ঠে মিনতি মাখালেন জগৎপতি। বললেন, 'কেন আর ঝামেলা বাড়াচ্ছ? বলো আর কত টাকা চাই। চেক-বই আমার সঙ্গেই আছে। আমি একদিকে চেক কাটি তুমি অন্যদিকে আর্জি সই করো। দুটো এক-সঙ্গেই হয়ে যাক।'

'টাকা?' মুখে তেতো-তেতো ভাব করল ভাস্কর: 'টাকার কথা রুচিরাও বলেছিল। আমাকে বলেছিল গরিব, ভিক্ষুক, বলেছিল ব্ল্যাকমেলার। আমি রাজি হইনি। কেননা টাকার চেয়ে মান বড়।'

'মান বড়? কিসের মান?'

'স্বামিত্বের মান।'

এর পরে আর কোন কথা বলা চলে? জগৎপতি তখন অন্য মূর্তি ধরতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি যদি কথা না রাখো, পরিণাম কী হবে ভাবতে পারো?'

'পারি। কিন্তু কথা আমি রাখব না আপনাকে কে বললে?'

'কোথায় রাখছ?' অস্থির হয়ে মাঝখানের টেবিলে কিল বসালেন জগৎপতি: 'আর্জিতে সই দিচ্ছ কই?'

'কোনো টাইম-লিমিট নেই।'

'নেই মানে? বলা ছিল বিয়ের দু-এক বছর পরে।'

'তার মানেই একটা ভদ্র, যাকে বলে ফেয়ার টাইম, ছেড়ে দিয়ে। ততদিন একটু অপেক্ষা করতে দোষ কী।'

'তোমার কী মতলব তা আমি বুঝেছি। স্কাউন্ড্রেল—'

'কে কাকে বলছে!' অনুকম্পার হাসি হাসল ভাস্কর।

ঝট করে উঠে পড়লেন জগৎপতি। বললেন, 'দেখি আর কী উপায় আছে।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল ভাস্কর। মহালয়াকে বললে সব কথা। বললে, 'সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তুমি গোপালকে নিয়ে আজ রাত্রেই বড় মাসিমার কাছে কাশী চলে যাও।'

'আর তোরা?'

'আমরা থাকব। আমার আপিস, সোমনাথের ইস্কুল। আমাদের জন্যে ভাবনা কোরো না। মর্তের এক অসহায় গোপালকে রক্ষা করেছি বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোপাল আমাদের রক্ষা করবেন।'

মহালয়া তৈরি হতে লাগল।

'মর্তের এই গোপালের জন্যেই আমার বেশি ভয়। হামলা করে ওকে না একদিন ছিনিয়ে নেয় তোমার বুক থেকে।' বলতে লাগল ভাস্কর: 'তুমি ভাবতে পারো মা, বুড়ো ঠাকুরদা এক-বারও নাতির কথা জিগগেস করলে না? ঠাকুরদাকে ছেড়ে দি, ওর মার জুড়ি নেই। যে বাড়িতে ওর ছেলে আছে, পেটের ছেলে, সে বাড়িও ওর আকর্ষণীয় নয়। আজকালকার মা-রাও বদলে গিয়েছে, মডার্ণ হয়েছে। আজকাল কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতাও কম নয়। মারে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে, আজকালকার মা-রা মামলা ছেড়ে দেয় না, বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়, তারপর ছেলেকে হারিয়ে ছাড়ে। নইলে ভাবতে পারো, ছেলেটাকে একদিন একটু দেখতেও আসে না? মনে হয় ছেলেটাকে যে নিয়ে এসেছি এতে ওর আরাম হয়েছে, ফুর্তি হয়েছে—'

'আমি বলি কী, তুই তোর ছেলে পেয়েছিস, বউকে তুই ছেড়ে দে।' মহালয়া বললে, 'যার এখানে মন নেই, যে অন্য রকম, তাকে জোর করে ধরে বেঁধে রেখে শান্তি নেই। ধরে বেঁধে রাখতে পারবিওনে।'

'আমার মনে হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে ও ছেলের খোঁজ নেয়।' আত্মতৃপ্তের মত বললে ভাস্কর: 'আর যখন বোঝে ছেলে ভালো আছে তখন আলসো হাই তোলে। এখন ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিলে এ বাড়ির লুনাতা যদি আকর্ষণীয় হয়।' এবার বুঝি আপন মনেই কথা বলে উঠল: 'ও যে অন্যরকম তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু ওর অহঙ্কার চূর্ণ হবার আগে ও ছাড়া পাবে এ হতে পারে না। এ কোন দিন হয়নি পৃথিবীতে।'

রাত্রের ট্রেনে মহালয়া গোপালকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে যে চলনদার বোনপোটি আছে সে কাশীর সব অলি-গলি জানে, কোনো ভয়-ভাবনার কিছু নেই।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, মহালয়া বললে ভাস্করকে, 'বউ যদি রাজি হয় আমাকে খবর দিস।'

'রাজি হল না, কিছুতেই না।' একটা স্তব্ধীভূত হাহাকারের চেহারায় জগৎপতি তাঁর শোবার ঘরের সোফায় ভেঙে পড়লেন।

এলাক্ষী বিছানায় শোয়া, ওঠবার চেষ্টা করেও পারল না উঠতে। বললে, 'আরো কিছু টাকা পেলেও না?'

'না।' তারপর গালাগাল দিতে লাগলেন। একেই বলে মোকদ্দমায় হার। হেরে গেলে গালাগাল দেওয়া। এমন হার জগৎপতি হারেননি জীবনে।

রুচিরা সামনেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি পারলাম না। তুমি এখন নিজে দেখ। নিজের পথ নিজে খুঁজে নাও।'

'তাই হবে।' রুচিরা সহজ স্বচ্ছ হবার চেষ্টা করল: 'তাতে ভাববার কী আছে?'

'কিন্তু তুমিও যে পারবে এমন মনে হয় না।' পরাভূতের মত শূন্যচোখে তাকিয়ে জগৎপতি বললেন, 'শেষ পর্যন্ত যদি তোমাকে ঐ নামটার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে হয় মরেও শান্তি পাব না।'

পারলেন না বসে থাকতে, উঠে পড়লেন। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আসলে আমার লোকনির্বাচনেই ভুল হয়েছিল।'

ক্রুর চোখে তাকাল এলাক্ষী।

সে দৃষ্টির সাক্ষাৎ হবার সাহস নেই জগৎপতির। তবু বলবার কথাটা বলতে

আর বাধা কী। তাই বললেন, 'লোকটা আসলে গরিব। লোভী।'

তত রাগে নয় যত ঘৃণায় জ্বলতে লাগলেন জগৎপতি। কুটিল মনের গহনে চিন্তার জট পাকাতে লাগলেন। প্রতিকার নেই প্রতিশোধ নেই।

কিন্তু নিমেষে সমস্ত বানচাল হয়ে গেল।

সেই রাতেই আবার নতুন স্ট্রোক হল এপাক্ষীর। আর দু দিন দু রাতের বিপুল সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিয়ে সে চোখ বুজল।

আবার হার খেলেন জগৎপতি।

মনে হল আদিগন্ত সমস্ত সংসার শাদা হয়ে গিয়েছে। কোথাও আর স্বপ্নের রঙ নেই, আশার রেখা নেই—সমস্তই ভোজবাজি, সমস্তটাই প্রবঞ্চনা। বাড়ি-ঘর মিথ্যে, টাকা-পয়সা মিথ্যে, নাম-যশ পদবী-প্রতিপত্তি সমস্ত। তরুণ সর্মিত, মন্ত্রীর, শঙ্কির মাদিরা সমস্ত অবস্তু। গন্ধর্বনগরে এসে আকাশকুসুম চয়ন করা।

একমাত্র সত্য বুঝি এই কান্না। ভাগ্যের রুক্ষ-স্তব্ধ লোহার দরজায় কপাল কোটা।

জগৎপতির কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে রুচিরা। মেয়ের মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন জগৎপতি। বলছেন, 'তুই ভেঙে পড়ছিস কেন? কত পথ তোর সামনে এখনো পড়ে আছে। তুই এগিয়ে যাবি। যে পড়ে ওঠে সেই-ই তো বাহাদুর। সমস্ত ভুলের বাইরেও ভালো আছে। তুই সেইখানে গিয়ে দাঁড়াবি। তুই থামবি কেন? আমিই আর পারব না উঠতে। আমারই আর ভবিষ্যৎ নেই।'

রুচিরাই তখন বাবাকে সান্ত্বনা দিতে বসল। কিন্তু কী সান্ত্বনা দেবে ভাবা খুঁজে পেল না।

তবু সান্ত্বনা আছে। পথ চলার সান্ত্বনা। পথের যে শেষ নেই এই-ই তো অনন্ত সান্ত্বনা। অনন্ত সামর্থ্য।

তাই লঘু পায়ে পথ চলতে-চলতে রুচিরা সিঁড়ি বেয়ে হঠাৎ একদিন এক সন্ধের দোতলায় উঠে এল। বাড়িটা কেমন ঘুমো-ঘুমো নিঝুম মনে হচ্ছে। না, কোণের ঘরটাতে পড়ছে সোমনাথ। ও দিকে বুঝি রান্নার ব্যবস্থা। কানে আসছে রান্নার ছাঁকছোঁক। আর সব কোথায়?

সোমনাথের ঘরের দরজার ওপারে এসে দাঁড়াল রুচিরা।

'কে?' চমকে উঠল সোমনাথ।

'আমি। চিনতে পাচ্ছ না?'

কী করে চিনবে। কত দিন হয়ে গেল সেই একদিন দেখেছিল। এতদিনে চেহারাও বদলে গিয়েছে অনেক।

'না। বলুন না কে?'

'আমি—আমি গোপালের মা।'

তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সোমনাথ। বললে, 'আপনি—তুমি, বৌদি?'

'হ্যাঁ। বাড়িঘর খালি দেখছি যে, গোপাল কোথায়?'

'মার সঙ্গে কাশী গিয়েছে।'

'একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তীর্থ-যাত্রা।' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা: 'তোমার দাদা কোথায়?'

'অফিস থেকে এসে কোথায় একটু বেরিয়েছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপনি আসুন, দাদার ঘরে এসে বসবেন।'

খাটে চেয়ারে টেবিলে আলমারিতে দাদার ঘর। পর্দা কার্পেটও ছিল বলে শুনেছিল তা এখন বেপাত্তা। চারদিকে তাকাল রুচিরা, কিছু আকর্ষণীয় আছে কিনা। একটা বই নেই, ম্যাগাজিন নেই, টেবিলে নেই কোন লেখার সরঞ্জাম। ধুলোমাখা একটা ফুলদানি আছে, ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার পর্যন্ত নেই। আগাগোড়া চিত্তদারিদ্র্যের রুক্ষতা।

কতক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। সোমনাথ গিয়ে বসল তার টেবিলে।

শান্ত স্থির মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রুচিরা। প্রবিশ্বাসী চোখকে শাসন করবার আগেই চিনে ফেলল ভাস্কর। বলে উঠল, 'এ কী, আপনি? কী ব্যাপার?'

'মা মারা গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন হল। শ্রদ্ধে নেমন্তন্ন না করলেও কানে এসেছে।'

'এবার আবার বাবা পড়েছেন। ডাক্তার যত বলছেন কিছু নয়, বাবা তত ঘাবড়াচ্ছেন তত কাহিল হচ্ছেন। শুনলে বিশ্বাস করবেন? কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। উকিল কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন মানেই বুঝতে পেরেছেন তাঁর ইতির রেখা ঘনিয়ে এসেছে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমি? আমি পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তাই বুঝি এসেছেন পথ ভুলে?'

রুচিরা শীর্ণ মুখে হাসল। বললে, 'পথ ভোলার পরেও যে পথ আছে তাই খুঁজতে।'

অনন্য মনে ভাস্কর সমগ্র করে দেখল রুচিরাকে। কেমন টলটল করছে মুখখানি। ঝুরো ঝুরো কয়েক গুচ্ছ রুখু চুল কপালের এখানে-ওখানে নেমে আসতে করুণ করে তুলেছে। গলায় হার নেই বলে কণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই স্পষ্টতা ঢাকবার জন্যে গলার কাছে আঁচল টানছে বারে-বারে। হাত দুখানি তেমনি খালি, কিন্তু আজ বুঝি তাতে দৃঢ়তার নয় বিস্তৃতির উল্লেখ। তার পরনের সাধারণ শাড়িটা আজ যেন ঔদ্ধত্যকে নয় দারিদ্র্যকে ব্যক্ত করছে।

'আজ এ বাড়িতে আসবার আপনার আকর্ষণ কী হল?' কথার সুরে বাঙ্গ আনতে গিয়ে আনতে পারল না ভাস্কর, কেমন যেন করুণায় মিশে গেল: 'আপনার অসীমও তো এখানে নেই।'

'থাকলে তো কবে আগেই আসতাম। ও আপনাদের কাছে আছে তাইতে আমি নিশ্চিন্ত।'

'তবে আর এ বাড়িতে আপনার আকর্ষণ কী?'

রুচিরা ভাস্করের চোখের উপর চোখ ফেলল। বললে, 'আমার একমাত্র আকর্ষণ তুমি।'

'আমি?' আশিবপলনখ শিউরে উঠল ভাস্কর।

'হ্যাঁ, তুমি, তোমার মহত্ত্ব। তোমার মহত্ত্বই আমার একমাত্র আকর্ষণ, একমাত্র আশ্রয়।' রুচিরার কথায় বুঝি আন্তরিক আন্তরিকতা লাগল কিন্তু শোনাল আদালতের মত: 'একদিন তুমিই এগিয়ে এসেছিলে, বন্দিনীকে উদ্ধার করতে। সেদিন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ বন্ধু ছিল না।'

'আর আজ?'

'আজও তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার নম্র যৌবন, দীপ্ত চরিত্রই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য।'

'অত কথার কী দরকার?' ক্লান্ত মুখে হাসল ভাস্কর: 'বলো কী করতে হবে? সেই তৈরি আর্জিটাতে সই করতে হবে?'

'হ্যাঁ, তাই। আরো প্রমাণ করতে হবে তুমি দরিদ্র নও, ক্ষুদ্রাত্মা নও, লালসাই তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না—'

'লালসা!' চোখের দৃষ্টি স্নেহ ভিজিয়ে রুচিরার গায়ের উপর রাখল ভাস্কর।

'একলোবার নয়। তুমি আধুনিক যৌবনকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে। মহৎ বলে প্রতিপন্ন করবে।' কথার ছটায় ঝলমল করে উঠল রুচিরা: 'অর্থের অনটন দারিদ্র্য নয়, চিত্তের কার্পণ্যই দারিদ্র্য।'

'সংক্ষেপে বলো না তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'কী এসে যায় একটা দুঃখিনী বর্ষিনী মেয়েকে ছেড়ে দিলে?' মিনতি-ভরা চোখ তুলল রুচিরা।'

'তা তো দিলাম। কিন্তু আমার কী হবে?'

'তোমার কী হবে মানে?' রুচিরা যেন কাঠ হয়ে গেল।

'আমি তবে কী নিয়ে থাকব? তুমি একদিন আসবে এই আশাটা ছাড়তে পারছি কই? শোনো মজার কথা। তার আগে তোমাকে একটু চা করে দিতে বলি।' বলে উঠে পড়ল।

'না, না, চায়ের দরকার নেই।'

'চা আমারও জন্যে। নর্মাল চা-টা তোমারই করে দেবার কথা। তা যখন হবার নয় তখন ঠাকুরকে বলা ভালো।' তাই বললে ভাস্কর। পরে আবার চেয়ারে এসে বসল। বললে, 'মজার কথাটা হচ্ছে, আপিস থেকে নোটিশ দিয়েছে, চাকরিটা ছাঁট হয়ে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তিন মাসের নোটিশ। সুতরাং, আমি বলতে পারি যেহেতু চাকরিটা থাকছে না, ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেই-হেতু আমি রাখব না প্রতিজ্ঞা।'

'না না, তুমি তা বলবে না।'

'বলব না। কেননা চাকরি চলে যায়, আবার চাকরি পাব। কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমাকে পাব কোথায়?'

'ছি ছি, আমি একটা কী!' নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে চাইল রুচিরা: 'আমি বাজে, পচা, কুচ্ছিত।'

সরল শিশুর মত শব্দ করে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'মেয়ে যখন পুরুষকে ভালোবাসে তখন মনে-মনে কিছু-না-কিছু সে হিসেব করে, রূপবান কিনা, ধনবান কিনা, বিদ্বান কিনা, সুবিধেজনক কিনা—কিন্তু পুরুষ যখন ভালোবাসে তখন সে চিন্তা করে না। মেয়ে পচা কিনা, বাজে কিনা, কুচ্ছিত কিনা। সধবা না বিধবা, স্বিচারিণী না কলঙ্কিনী এ সব বিচারও তার হিসেবের বাইরে।'

'এ সমস্তই কথার কথা।' রুচিরা একটু বুঝি কঠিন হল: 'কিন্তু এক্ষেত্রে ভালোবাসার কথা ওঠে কী করে?'

ভাস্কর হাসল: 'উঠে পড়লে কী করা যাবে? আর ভালোবাসা যদি একবার জাগে তা হলে কি তুমি আর তাকে লালসা বলতে পারো?'

রুচিরার গা কেমন ছমছম করে উঠল। বললে, 'কিন্তু যখন আপনি বাবার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন তো আলাপ হওয়া দূরে থাক, আমাকে দেখেনইনি মুখোমুখি।'

'তোমার কী বুদ্ধি! চেনা না জেনে ভালোবাসা যায় না। যদি না-ও যায়, পরে জাগতে দোষ কী! যখন তোমাকে পরে দেখলাম, পরে আলাপ হল—তখন।'

'কিন্তু ভালোবাসা তো আমারও মধ্যে জাগা দরকার!' রুচিরার গলায় ঝাঁজ ফুটল।

'নিশ্চয়। তারই জন্যে তো ঐ সর্তটা যোগ করেছিলাম। আর তুমি তা হাসি-মুখে মেনে নিয়েছিলে।'

'বা, আমি আবার কোন সর্ত মেনে নিয়েছিলাম?' প্রায় লাফিয়ে উঠল রুচিরা।

ঠাকুর দুই হাতে করে দুই পেয়ালা চা এনে রাখল টেবিলে।

ভাস্কর বললে, 'সার্ভিসটা ভালো হল না। চা-টা খাও, বলছি।'

'না, তুমি আগে বলো।'

ভয় নেই। চায়ে কোনো তুক করিনি যে চুমুক দিলেই তোমার ভালোবাসা জাগবে। যদিও সর্তটা সেইরকম ছিল। মনে নেই?'

নিচু হয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক নিল রুচিরা।

'কথা ছিল ইতিমধ্যে তুমি আমাকে একটা চান্স দেবে তোমার মধ্যে ভালো-বাসা জাগাতে পারি কিনা। শুকনো কাঠে ফুল ফোটাতে পারি কিনা। কথা ছিল আমার সাধনার ফলে তোমার শেষে এও মনে হতে পারে যে এ বিয়ে আর ভেঙে দিয়ে কাজ নেই, যাকে ঘৃণা করব ভেবেছিলাম সেই আমার বরণীয়।'

'তার মানে ভালোবাসা জাগে কিনা তা দেখবার জন্যে তোমার সঙ্গে আমি ঘর করি। তার মানেই আবার বেঁড়ি পরি। কী চমৎকার!' রাগ-রাগ মুখ করল রুচিরা: 'যে সর্তের পূরণ হয় না তা একজন স্বীকার করলেও কিছু এসে যায় না। অপূরণীয় অপূরণীয়ই থাকে।'

'বা, সহজ ঘর না করেও তো সে চান্স দেয়া যায়।'

'আমি তো তার উপায় দেখি না। শেষকালে আমি যখন ডিভোর্স নিয়ে যাই দেখি আমি আবার বন্দী।' রুচিরা কট করে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে: 'তা হলে আমি কী বুঝছি?'

'কী বিষয়? মহৎ হয়ে যাব কিনা?' ভাস্করও দাঁড়াল মুখোমুখি। বললে, 'কিন্তু, মহৎ হওয়া মানেই তো শাস্তি পাওয়া, চিরকালের জন্যে তোমাকে হারিয়ে ফেলা।'

'তা আর কী করা যাবে?' এক পা এগুলো রুচিরা। বললে, 'যা পাবার নয় তা কোনোদিনই পাবার নয়। এ কি, দরজা বন্ধ করবে নাকি?'

'না, বন্ধ করব কেন? পাশের ঘরে সোমনাথ পড়ছে। তাছাড়া তুমি স্ত্রী, আজও স্ত্রী, তোমার সম্পর্কে আড়ম্বরের দরকার নেই। তোমার দরজা সব সময়েই খোলা। বলছিলাম কী, আরো একটু বসে যাও।'

'না।' চঞ্চল হয়ে উঠল রুচিরা: 'আমার গাড়ি এসেছে। হর্ণ শুনছ না?'

'তা গাড়ি এলেও একটু বসে যাওয়া যায়।'

'অকারণে বসে লাভ কী।'

'বেশ তো আজ তাড়া থাকে, আরেক দিন এস।'

'তা হলে ঐ কথা রইল। আরেকদিন আসব।'

ভাস্কর রুচিরাকে এগিয়ে দিতে এল। দেখলে নিচে কে একজন স্যুটপরা ভদ্র-লোক গাড়িতে বসে সিগারেট টানছে।

রুচিরাই আলাপ করিয়ে দিল: 'ইনি ভাস্কর আর ইনি এঞ্জিনিয়র অরিন্দম।'

গাড়িতে উঠে অরিন্দমের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিল রুচিরা। ঠিক ধরালো কিনা দেখা গেল না—গাড়ি আগেই স্টার্ট নিয়েছে। তা সিগারেট খেলে কী হয়! রুচিরা যদি সিগারেট খায় তা হলে তো ওকে ভালোই দেখাবে।

কিন্তু মদ খেলে?

জানি না।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার চলে এল রুচিরা। কিন্তু আজ তার এ কী মূর্তি! পা টলছে চোখ মুখ লালচে। কথাও জড়ানো।

ঘরে ঢুকেই ভাস্করের গলা জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'তুমি আমার স্বামী, তুমিই আমাকে বাঁচাবে।' তুমিই মুক্ত করে দেবে আমাকে। তুমি—তুমি। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'এ কী, তুমি ড্রিংক করেছ।' ভাস্কর ধীরে সরিয়ে দিল রুচিরাকে।

'বাবার কথায় করেছি। বলেছেন এতেই তোমার কাছে কেস, মেড আউট হবে। বলো না, হবে? মাতাল দেখলে ছেড়ে দেবে তুমি?'

'ছি! তুমি শেষকালে এইরকম সুরু করলে?'

'কেন করব না? বাবার যা অসুখ হয়েছে উনি আর বেশিদিন নেই। উনি ট'সে গেলেই সমস্ত বাড়ি-ঘর-টাকা-পয়সা আমার হবে। ষোল আনা আমার। এত সম্পত্তি একটু-আধটু ওড়াব না? না ওড়ালে চলবে কেন? আর পাঁচজনে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সত্য হয়। গরিব হতে ওর এতটুকুও বাধ ব না, লাগবে না, আমিও একদিন মেয়েরও গরিব ছিলাম। আর, তারপরেও যদি ও তরুণ সমিতিতে থাকে, তখন দেখবে সে সমিতির উদ্দেশ্য মন্ত্রী যন্ত্রীর দিকে থাকবে না, থাকবে মানুষ যন্ত্রীর দিকে।'

কিন্তু আজ সকালে, এত সকালে, কে এল বাড়িতে? বারান্দা দিয়ে ঘুরে উপরে উঠে যাচ্ছে? কে, অরিন্দম?

র‍্যাটেস্কেন্ট বললে, 'না, অরিন্দম নয়।'

তবে, কে? আমি এখনো বেঁচে নেই? শুয়ে আছি বলে কি আমার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে? দলিল তো এখনো এক্সিকিউট করিনি।

কে?

'আমি শুভময়।'

সত্যি? বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি। শুভময় আলোয় এসে দাঁড়াতে স্পষ্ট করে দেখলেন, চিনলেন। বললেন, 'ফিরে এসেছ?'

'হ্যাঁ, শত বিপদ বাধা লাঞ্ছনার পরেও পেরেছি ফিরতে।' খুব হাসি-খুশি শুভময়: 'দমদম থেকে বাড়ি হয়েই—'

'হ্যাঁ, সেইটেই বড় কথা—ফিরে আসা, ফিরে-ফিরে আসা।' ধীরে ধীরে বিছানায় কাত হলেন জগৎপতি।

'কেউ রুখতে পারল না।' দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে শুভময় বললে, 'আরেকটা ফার্মে চাকরি নিয়ে এসেছি। আগের সেই শয়তান ফার্ম নয়, আরেকটা ফার্মে। বিদেশী ফার্মে।'

'চাকরি পাওয়া অবান্তর। তোমাকে যে আগের চেয়ে অনেক বেশি রাইট দেখাচ্ছে তাও অবান্তর।' আবার চিৎ হবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি: 'তুমি যে বেঁচে আছ তুমি যে ফিরে এসেছ তাই যথেষ্ট। যাও উপরে যাও, রুচি আছে, ভালো আছে—'

তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে গেল শুভময়।

জগৎপতি বললেন, দলিলটা এবার তাহলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। পেরেও পেল না বলে আর যারই দুঃখ হোক সন্ন্যাসীদের হবে না। তারা সমস্ত বিষয়-বাসনার ঊর্ধ্বে।

উপরে এসে দেখল, ম্লান হয়ে গিয়েছে রুচিরার। আর খোলা চুল অনেক লেখাপড়া নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তার টেবিলে।

শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে উথলে উঠল রুচিরা: 'আরে তুমি! তুমি কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'আরে বোসো, বোসো। কত কথা যে বলার আছে তোমাকে।'

'আমারই বেশি বলার আছে।' চেয়ারে বসল শুভময়: 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার আছে। কিন্তু একটা কথা যদি শোনো, যদি বোঝো, সব তোমার বাবার কারসাজি, বাবার ষড়যন্ত্র—'

'না, না, আজ শুধু ক্ষমা, চারদিকে ক্ষমা।' টেবিলের দিকে পিঠ রেখে উঠে দাঁড়াল রুচিরা: 'অমল ষড়যন্ত্রী ভাগ্য, তাকেও ক্ষমা। জীবনেরই এত ঔদার্য আছে যে মৃত্যুকে ক্ষমা করতে পারে; এমন কি সমস্ত কদর্যতি অপমানকেও পারে।'

'তবু আমার কথা সব শোনো।' বকতে সুরু করল শুভময়। বললে, 'আমার মধ্যে অন্ধ ঘৃণা ছিল, দ্রুততা ছিল, কিন্তু পালানো ছিল না। ইচ্ছে ছিল দ্রুত বড়লোক হবার উপায় খুঁজে নিয়ে আসব। তোমার বাবার কাছে সামাজিক যোগ্যতা সাব্যস্ত করব। কিন্তু তোমার বাবই পথে বসালেন। ফেলে দিলেন অকূল নিঃস্বতার মধ্যে। সকলের উপর অভিমান হল। কেন জানি না তোমারও উপর। নিজেরই ঠিকানা নেই, তোমার ঠিকানাও ভুলে গেলাম। আমার অবস্থাটা তুমি বোঝো তুমিই বুঝবে—'

'আর এদিকে আমার অবস্থাটা?' খিল খিল করে হেসে উঠল রুচিরা। কায়দা করে, কাটা কাটা করে, দিব্যি লাগল খবরগুলো। পরে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে খোলা চুলে উত্তাল আনন্দে বলে উঠল: 'সব চেয়ে বড় যে খবর সে হচ্ছে মুক্তি। মুক্তি।'

'অসীম কোথায়?'

'কে জানে কোথায়? কাশীতে না বৃন্দাবনে। না কি মরে গেছে। না কি মিশে গিয়েছে জনস্রোতে।'

'তা হলে আর ভাবনা কী।' শুভময়ও উঠে দাঁড়াল।

'না, আর ভাবনা কী।' আবার আরেক ঢেউ হাসি তুলল রুচিরা: 'অভিনয়ের চূড়ায় উঠে সিগারেট-মদও ছুঁতে হয়েছিল আমাকে। বাবা ভাবলেন পাঁক কুণ্ডে তলিয়ে গেলাম বোধহয়। পিছনে সন্ন্যাসী লাগালেন। উপসেদের ধোঁয়ায় দম আটকে আসে আর কী। কিন্তু সমস্ত উপসেদের থেকে দুটো জিনিস খুব মনে ধরল। এসব প্রেম সিগারেটের ধোঁয়া। কিছু ছাই ফেলে রেখে শূন্যে মিলিয়ে যাবার জিনিস। আর শরীরের মধ্যে যে রক্ত, যে বেঁচে থাকবার কাজ—সেই আসল মদ।'

'তা হলে এবার এস তোমার বাবাকে গিয়ে প্রণাম করি।' বললে শুভময়।

'মানে বিয়ে করি?' আবার এক পশলা হাসি ছড়াল রুচিরা: 'তুমি একা যাও।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আমি আবিষ্কার করেছি আমি তোমাকেও ভালোবাসিনি। শুধু একটা জেদ বশে, অপমানের প্রতিশোধ নেবার পাগলামিতে, প্রতিহিংসোয়, তোমাকে আঁকড়েছিলাম।' শান্ত, গম্ভীর, নিরুত্তাপ কণ্ঠে রুচিরা বললে, 'ওটা প্রেম নয়। তুমিও জানো, ওটা প্রেম নয়। ওটা সিগারেটের ধোঁয়া।'

'তা হলে?' দ্বিধায় দুর্বল হল শুভময়: 'ফিরে যাব?'

'ফিরে যাবে কেন, এগিয়ে যাবে। ফিরে গিয়েছে অরিন্দম। সে বিয়েতে রাজি নয়, অথচ কদাচারে রাজি। তাকেই দিয়েছি ফিরিয়ে।'

দৃঢ়, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল শুভময়। জগৎপতির সঙ্গে দেখা না করেই বারান্দা দিয়ে চলে গেল গেটের দিকে।

'কি, কী হল?' যতদূর সাধ্য চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

কোনো উত্তর হল না। জগৎপতি বুঝলেন, কিছুই হবার নয়।

এই বিরাট স্তব্ধতা এই বুঝি এক মুক্তির ডাক।

দলিল সম্পাদন করে দিলেন। আর সম্পাদন করে দিয়েই জগৎপতি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কখন প্রাণ যায় তারই অপেক্ষায় সন্ন্যাসীর দল তাঁকে পাহারা দিতে লাগল।

সেবা নয় পাহারা।

ভাগ্যের এমন রসিকতা, সাতদিনেও অজ্ঞানের শেষ হয় না। ছ ঘণ্টা করে চারজন সন্ন্যাসী সিফট ডিউটিতে কাজ করছে। মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাড়িটার দখল নিয়ে নিতে হবে। তাড়িয়ে দিতে হবে ঐ অলক্ষণা মেয়েটাকে।

স্যান্ডেল পায়ে রুচিরা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও কোনো সন্ধান হয় কিনা।

আর ওদিকে ভাস্করেরও চাকরি নেই, বাড়িওলাও ছেড়ে দেবার চিঠি ছেড়েছে। আগের বাড়িটা যে বন্ধুর কাছে ছিল সে খবর পাঠিয়েছে ঠিক এখুনি ছাড়তে পারছি না।

ভাস্করও পথে বেরিয়েছে। কোথাও কিছু সুরাহা হয় কিনা।

কে জানে মুক্ত পথ কোথায় কোন দূর বিদ্যুতে আবার এদের মিলিয়ে দেবে। কিংবা দেবে না।

(শেষ)

CENTRAL LIBRARY

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে তাসখেলার প্রচলন কত দিনের? প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ সমেত এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবর তাঁর আত্ম-জীবনীতে এ-কথা লিখেছিলেন—"শাহ্ হাসান তাস খেলার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। যে রাত্রে আমরা আগ্রা পরিত্যাগ করি, সেই রাত্রিতে আমি মীর আলি কচির মারফৎ কিছু তাস শাহ্ হাসানের কাছে পাঠাই।" ভারতবর্ষে তাস খেলার বিষয়ে এইটিই সম্ভবত সর্বপ্রাচীন দলিল। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে তৎকালীন এক প্রকার তাস খেলার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আকবরের সময়ের পূর্বে বারোটি রঙ ও প্রত্যেক রঙের বারোটি তাস, অর্থাৎ ১৪৪টি তাসের একরকম "গঞ্জিফা" উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। "গঞ্জিফা" কথাটি পারসীক; অর্থ তাস খেলা। আবুল ফজল আরও উল্লেখ করেন যে এই "গঞ্জিফা"কে সরল ও সহজসাধ্য করে আকবর বারোটি তাসে একটি রঙ ও এরকম আটটি রঙের অর্থাৎ মোট ৯৬টি তাসের এক খেলার প্রবর্তন করেন। দরবারের আমীর ওমরাহদের সঙ্গে আকবর বাদশা এই খেলাটিই খেলতেন।

বাবর ও আবুল ফজল "গঞ্জিফা" এই পারসীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই এ-সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ভারতীয় তাস খেলা পারস্য থেকে আমদানি। বরং, মুঘল যুগের অনেক আগে থেকেই যে ভারতবর্ষে তাস খেলার প্রচলন ছিল এমন অনুমান করবার অতিশয় সঙ্গত কারণ আছে। এই অনুমান প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক দলিল দিয়ে হয়ত প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক সত্যই তো যুক্তিসহ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কেননা কোন লিপি বা দলিলের সেখানে অস্তিত্বই নেই। তাসখেলার ভারতীয় উৎপত্তির বেলাতেও এই একই যুক্তি আশ্রয় করা অসমীচীন নয়।

কী সেই যুক্তিসহ অনুমান?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই অনুমানের সূত্র ধরে আমরা একেবারে পুরাকালের ভারতবর্ষে পৌঁছতে পারব না। কেননা, অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দাবা বা পাশা খেলার উল্লেখ থাকলেও, তাস খেলা বা তার অনুরূপ কোন খেলার কুত্রাপি উল্লেখ নেই। তৎকালীন কোন চিত্রে তাস খেলার ছবিও অঙ্কিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। এ-থেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবেই প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভারতে তাস খেলার মত কোন খেলার প্রচলন ছিল না; এর আমদানি পরবর্তী কালের।

পরবর্তী কাল বলতে, বহু শতাব্দী পরে পারস্য অঞ্চল থেকে মুঘল-কাহিত হয়ে তাসের ভারতবর্ষে প্রথম অনুপ্রবেশ যে বিশ্বাসযোগ্য নয় সে-কথা আগেই বলেছি। বাংলাদেশের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকার "দশাবতার তাস" নামে এক প্রকার তাস খেলার এখনও প্রচলন আছে যেটির উৎপত্তিকাল বেশ প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। অন্তত, মুঘল যুগের যে পূর্বে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের মুখপত্রে প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে এই স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল খৃষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দী। তাঁর যুক্তির আলোচনা করবার আগে দশাবতার তাসের সংক্ষিপ্ত একটু বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন সময়ে, পৃথক অবতারের রূপে বিষ্ণু যে দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ পুরাকাহিনী সর্বজনবিদিত। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি—এই দশ অবতারের রূপ অবলম্বন করে দশাবতার তাসের শ্রেণী বা রঙের বিভাগ। অবতার পিছু একটি করে রঙ ধরা হয় বলে এ-খেলায় দশটি রঙ; প্রত্যেক রঙে বারোটি তাস; মোট তাসের সংখ্যা একশো কুড়ি। এর রঙের বারোটি তাসের মধ্যে সম্মানিত বা "অনার্স" কার্ড মাত্র দুটি—সর্বোচ্চটিতে স্বয়ং অবতারের একটি বহুবর্ণ চিত্র উৎকীর্ণ থাকে আর দ্বিতীয়টিতে তার উজির বা মন্ত্রীর। পরবর্তী অল্পমূল্যের তাসগুলি, ইয়োরোপীয় তাসের মতই, দশ, নয়, আট ইত্যাদিক্রমে তিরি, দুরি, টেক্কা পর্যন্ত। এগুলিকে চিহ্নিত করবার জন্য প্রত্যেক অবতারের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকচিহ্নের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন, মীন-অবতারের প্রতীক—মাছ, কূর্ম-অবতারের কচ্ছপ, বরাহ-অবতারের শঙ্খ, নৃসিংহ-অবতারের চক্র, বামন-অবতারের কমণ্ডলু, রাম-অবতারের তীর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম আর কল্কির খড়্গ। অতএব, মীন-অবতার রঙ (বা রঙের) টেক্কায় আঁকা থাকবে একটি মাছের ছবি, তিরিতে তিনটি মাছের, নহলায় নটি মাছের এবং এই একই নিয়মে অন্য অল্পমূল্যের তাসগুলি চিহ্নিত হবে। বুদ্ধ বা জগন্নাথের প্রতীক পদ্ম। অতএব বুদ্ধ-অবতারের (বা রঙের) পঞ্জায় থাকবে পাঁচটি পদ্ম, আটায় আটটি—এই রকম প্রতীকভেদে সব অবতারেরই বেলায়।

এক রঙের (বা অবতারের) বারোটি তাসের রূপ বর্ণনার পরেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বিভিন্ন অবতারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কি? রাম বা রঘুনাথই হলেন অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর এত প্রতাপ যে রাম-অবতারের তাস দিয়ে যিনি খেলা আরম্ভ করবেন তিনি প্রথম পিটটি তো, সর্বোচ্চ কার্ড খেলে ছন বলে, পাবেনই, এমন কি পরবর্তী পিটটিও তার বাঁধা তা তিনি দ্বিতীয় পিটের খেলা যে-কোন তাস দিয়েই আরম্ভ করুন না কেন। খেলা অদ্ভুত নিয়ম সন্দেহ নেই।

আরও একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে। অবতারদের মধ্যে পাঁচজন হলেন "অভিজাত" আর বাকি পাঁচজন "অন্ত্যজ", "আভিজাত্য" অবতারেরা, যথাক্রমে, রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম (ভৃগুরাম), বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। আর "অন্ত্যজেরা" হলেন—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন। একটা

মুক্তকচ্ছ বলরাম

বিষয় এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে যে-সব অবতারদের হীন শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে তাদের আকৃতি কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর মত বা তার কাছাকাছি। মীন, কূর্ম ও বরাহের বেলায় এ-নিয়ম প্রযোজ্য। নৃসিংহ তো না-মানুষ না-সিংহ আর বামন, তাঁর সর্বজ্ঞাতির জন্যই বোধ হয়, পরাদন্তুর মনুষ্যের মর্যাদা পাননি। "অভিজাত" অবতাররা সকলেই পশু-প্রভাবের ঊর্ধ্বে। এইজন্যই হয়ত তাঁরা অভিজাত।

সে যাই হোক, যে-অদ্ভুত নিয়মটির কথা বলব বলে এ-প্রসঙ্গে এসেছিলাম সেটি হচ্ছে,—অভিজাত অবতারদের বেলায়, "অনর্স কার্ডের" পরেই টেক্কা হল সর্বোচ্চ তাস, তার পরে দুরি, তিরি ইত্যাদিক্রমে মূল্যহ্রাস হতে হতে দশ হল সবচেয়ে ছোট তাস। আর "অনভিজাত" অবতারদের বেলায়, অবতার আর উচ্চিংড়ের পরেই, দশ হল সর্বোচ্চ তাস আর একা সব থেকে ছোট। এ-নিয়মটির উৎপত্তি-রহস্য চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। এতে যে-অভিজাতের সাথে একটু কম মেলামেশা করবেন তার জন্য তার সাঙাই প্রয়োজন ছিল কিনা কে জানে।

আরও একটা নিয়ম আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে। দিনের বেলা খেলা হলে, রাম-অবতারের তাস খেলে খেলা সুরু হয় আর রাতে "স্টার্টার" হল মীন অবতার। কোনও কোনও গবেষক এ-থেকে রাতের অন্ধকার ভেদ করে জীবজগতের বিকাশের সূচনা ও দিনের আলোর ধনুর্বাণধারী মানুষের আবির্ভাবের এক

ধনু ও কুঠারধারী পরশুরাম

সুপরিকল্পিত বিবর্তন বলে মনে হয়।

দশাবতার তাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর আমরা পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই যুক্তিতে ফিরে যেতে পারি যার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে বিষ্ণুপুরের এই তাস খেলা এগার থেকে বার শ' বছরের পুরোতন।

তাঁর প্রথম যুক্তি এই যে দশ অবতারের যে পর্যায় বিষ্ণুপুরের তাসে স্বীকৃত তাতে বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। বুদ্ধের যে-প্রতিকৃতি চিরাচরিতভাবে তাসে আঁকা হয়ে আসছে তাতে পিণ্ডাকৃতি একটি অঙ্গের শীর্ষে একটি মানুষের মাথা ও দুটি মানুষের হাত আঁকা থাকে।

বুদ্ধ বিকল্পে জগন্নাথ-অবতারের হিসাবেও স্বীকৃত এবং তাঁরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব সুনির্দিষ্ট নয়।। এই না-মানুষ, না-অন্যকিছু গঠন নিয়ে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, বুদ্ধের স্থান অর্ধ-পশু নৃসিংহ ও বিকৃত-মানব বামনের ঠিক মধ্যখানেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, দশ-অবতার তাসে, প্রাণীজগতের সর্বপ্রাচীন জীব মীন থেকে শুরু করে কাল্কি অবধি যে-ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে তাতে আকৃতিগত বিবর্তনের বেশ স্পষ্ট একটা ছাপ আছে। এই সুপরিকল্পিত বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে বুদ্ধ বা জগন্নাথের

স্থান পঞ্চম ছাড়া অন্য হতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণুর দশ অবতারের যে-তালিকা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ তাতে বুদ্ধের স্থান নবম, তার পরেই কল্কি। শাস্ত্রী মহাশয় অতএব মনে করেন হিন্দু শাস্ত্রসম্মত এই তালিকা পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হবার পূর্বেই দশাবতার তাসের প্রচলন হয়ে থাকবে। তখন অবতারদের স্থান-পরিবর্তন ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ব্যাপার হত না; পারে হত।

এখন তা হলে দেখতে হয় দশ অবতারের এই নৈষ্টিক অনুক্রমণিকাটি কবে নাগাদ বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এরকম সিদ্ধান্ত করবার যথেষ্ট ঐতিহাসিক কারণ আছে যে একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্রের সময়ে বা দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের-কালে এই শাস্ত্রীয় তালিকাটি পাকা-পাকিভাবে কায়েম হয়। এ-থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল অনধিক দ্বাদশ শতক।

তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটিও অসঙ্গত মনে করবার কোন কারণ নেই। বুদ্ধ-অবতারের নিম্নমূল্যের তাসগুলিকে পদ্ম-চিহ্ন দিয়ে অঙ্কিত করাই চিরাচরিত রীতি। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে পদ্মকে বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে নিশ্চয়ই সেই সময়ে নির্বাচন করা হয়ে থাকবে যখন তথাগতের প্রচলিত নাম ছিল পদ্মপাণি। বাংলা দেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টীয় নবম থেকে এয়োদশ শতক অবধি পাল রাজবংশ যখন খ্যাতির শিখরে ও সমসাময়িক কালে বা তার কিছু পূর্বে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত তখনই বুদ্ধের পদ্মপাণি নামটি বহুল-প্রচলিত ছিল। অতএব, পালযুগের কোন সময়ে, মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, দশাবতার তাসের প্রথম প্রচলন খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। মল্লভূমে মল্লরাজরা তখন ভাল-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এমন কি অমিতবিক্রম পালরাজাদের কাছেও তাঁদের তখন নতি স্বীকার করতে হয়নি। আর, এ-বংশের নৃপতিরা যে সাংস্কৃতিক বিষয়ে সাধারণত উৎসাহী ছিলেন সে-কথাও সুবিদিত। সেজন্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে-সিদ্ধান্ত করেছেন যে এখন থেকে এগার কি বার শ' বছর পূর্বে এই দশাবতার তাস খেলার প্রথম প্রবর্তন হয় তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে এর থেকেও আগে তাস খেলার প্রচলন হয়েছিল বলে জানা যায়নি। তবে উড়িষ্যায় প্রচলিত তাস এই বিষ্ণুপুরী তাসের এতই অনুরূপ যে সেখানে বিষ্ণুপুরের প্রভাব বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মধ্যযুগে উড়িষ্যার সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের একটা নিরবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগা-যোগের প্রমাণ হিসাবে এখনও বাঁকুড়া ও মানভূম এলাকার অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের সাক্ষাৎ মেলে যেগুলির স্থাপত্যরীতি স্পষ্টতই উড়িষ্যা-প্রভাবিত। এই সংযোগের ফলে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের পরিকল্পনাটি সম্ভবত উড়িষ্যায় গৃহীত হয়েছিল।

পরবর্তীকালের "গঞ্জিফা" খেলার নিয়মকানুনগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেগুলি মূলত দশাবতার তাসের থেকে ভিন্ন নয়। সেজন্য একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে কবর বা আকবরের আমলের "গঞ্জিফা" পরসা-খেলাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনও খেলা নয়; এটি ইতিপূর্বে-প্রচলিত ভারতীয় খেলারই বহুরঙী রূপ।

বিষ্ণুপুরের এই তাস খেলার নিয়ম কি? এ-খেলা পাঁচজনে খেলতে হয় এবং তাঁরা কেউ কারও পার্টনার নন। মোট ১২০টি তাসকে প্রথমে ভাল করে ছেঁটে নেওয়া হয়। আধুনিক তাসের তুলনায় এটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার কেননা তাসগুলি গোলাকার ও এদের ব্যাস চার থেকে সাড়ে চার ইঞ্চির মত। (প্রবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত ছবিগুলি দ্রষ্টব্য।) যিনি তাস বাঁটবেন, তাঁর ডানপাশের খেলোয়াড় ছাড়া তাসগুলি ভাগ করে দিলে, খেলোয়াড়-পিছু একসঙ্গে চারখানা করে তাস নিয়ে কর্তনকারী প্রত্যেককে চোদ্দখানা করে তাস দেবেন। তাস দেওয়ার বেলায় ডানপাশ থেকে বাঁপাশে ঘুরে আসাই নিয়ম কিন্তু খেলোয়াড়দের অভিরুচি অনুসারে, ঘর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে বামে, নানারকম ভাবেই

যে কোনও পরিমাণ
চাউল
বাড়ীতে
পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।
পদ্মপতি দাস
এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
৪৩।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪
ফোন : ২৪-৪৩৮১

খেলা চলতে পারে। খেলা যদি দিনের-খেলায় হয়, তবে, যে-হাতে রাম-অবতারের তাসটি এসেছে সেই হাতই খেলা শুরু করবেন। রয়ে এই সম্মান মীন-অবতারের। আগেই বলেছি যে রাম-অবতারের তাসটি যখন সেই ভাগ্যবান খেলোয়াড়ের পর পর দুটি পিট বাঁধা। এর পর, তিনি হাতের অন্যান্য "অনার্স কার্ড" খেলবেন এবং যাবতীয় সম্ভাবিত তাস শেষ হবার পর, তিনি অল্পমূল্যের তাস পেলেও খেলা চালাতে পারেন বা অন্যকে পাস দিতে পারেন। দ্বিতীয় বা তাঁর পরবর্তী খেলোয়াড়দের খেলার নিয়ম একই। তাঁরাও প্রথমে হাতের যাবতীয় "অনার্স কার্ড" খেলে, ইচ্ছে হলে অন্যকে পাস দিতে পারেন। একজন খেলোয়াড় পাস দেবার পর যদি পরবর্তী পিটটি তাঁর ঠিক বাঁ-দিকের খেলোয়াড় পান তবে তিনি ভাগ্যবান কেননা এ-রকম পিটকে "টিপসহি" বলে অভিহিত করা হয় এবং তার মূল্য ধরা হয় দুটি পিটের (অথবা দশটি তাসের) সমান। ১২০টি তাসে পাঁচজন খেলোয়াড় বসে খেলায় মোট ২৪টি পিট। খেলার শেষে, কে কটি পিট পেলেন তার ওপর ফলাফল স্থির করা হয়। প্রথম পাঁচটি পিটে ধরা হয় এক পয়েন্ট। তারপরের প্রত্যেক বাড়তি পিটের মূল্য "প্লাস" পাঁচ পয়েন্ট এবং কমতির "মাইনাস" পাঁচ। অর্থাৎ কেউ যদি ছটি পিট পান তাহলে তাঁর পয়েন্টের সংখ্যা হবে ছয়, নটি পেলে একুশ আবার, পক্ষান্তরে চারটি পেলে "মাইনাস" চার, দুটি পেলে "মাইনাস" চোদ্দ ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পয়েন্টের উপর বাজি রেখে খেলা হয়।

এযাবৎকাল বিকুপুরের যে-সব শিল্পী দশাবতার তাস তৈরী করে এসেছেন তাঁদের বংশগত উপাধি "সূত্রধর"। সূত্রধর বলতে আমরা এখন কেবলমাত্র কাঠ-মিস্ত্রিদেরই বুঝি। কিন্তু মল্লরাজাদের আমলে বিকুপুরের যাবতীয় শিল্পীরাই সূত্রধর পদবীতে পরিচিত ছিলেন। রাজানুগ্রহে এঁদের মধ্যে কুশলীরা ফৌজদার পদবীতেও ভূষিত হতেন। গন্ধর্ব ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রমুখ অনেক শিল্পী একদা দশাবতার তাস-চিত্রণে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উৎকৃষ্ট পটচিত্র অঙ্কনের সমস্ত লক্ষণই তখন এ-কাজে দরকার হত। আনুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত এক প্রস্থ পুরাতন দশাবতার তাসের সঙ্গে বর্তমানকালে প্রস্তুত এই তাসের তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে অঙ্কনপটুত্ব এখনো অনেক হ্রাস পেয়েছে। শিল্পীর সংখ্যাও নগণ্য। বর্তমান লেখক ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিকুপুরে মাত্র কয়েক ঘর দশাবতার তাসের কারিগর দেখেছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় যে এই কুল-ব্যবসায়ে তাঁরা যে বেশীদিন টিকে থাকতে পারবেন এমন মনে হয় না।

দশাবতার তাস অঙ্কনরত শিল্পী

আমাদের আর পাঁচটা মনোরম কুটিরশিল্পের মতই দশাবতার তাস তৈরীর খেলায় বস্তুপাতির ব্যবহার নেই বললেই চলে। এখানে প্রধান মূলধন বংশগত নৈপুণ্য। পুরনো ধোয়া কাপড় পর পর কয়েক স্তর সাজিয়ে প্রথমে আঠা দিয়ে জুড়ে নেওয়া হয়। এই আঠা যাড়ির মেয়েরাই তেঁতুল বীচির গুঁড়ো সেদ্ধ করে তৈরি করে দেন। আঠা কিছুটা শুকিয়ে কাপড়ের স্তরগুলি অনেকটা পিচবোর্ডের মত শক্ত হয়ে উঠলে, দুপিঠে খড়িমাটির প্রলেপ লাগিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই খড়িমাটির জমিনের উপর পরে নানা রঙের ছবি আঁকতে হবে বলে এটি ক বহুব্যবহারে-মসৃণ একটি পাথরের নুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ ঘসে যতদূর সম্ভব চেলা করে নেওয়া হয়। অতঃপর নির্ধারিত আকারের একটি চাকতি এই কাপড়ের উপর চেপে ধরে কাঁচি চালিয়ে অনুরূপ আকারের চাকলা কেটে নেওয়া হয় অনেকগুলি। এইগুলির উপরেই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দশ অবতার, তাঁদের দশ উজির ও প্রতীক-চিহ্নিত অন্যান্য তাসগুলি আঁকা হয় রঙ-তুলি দিয়ে। বলা বাহুল্য, রঙগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত। বিকুপুরে এক সময়ে "পাটয়াড়া" নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন যাঁদের জাত-ব্যবসা ছিল স্থানীয় উপাদানে নানা রকম রঙ তৈরি করা। তাসের সামনের দিকের নকশা আঁকা শেষ হলে, পিঠের দিকে গালা ও মেটে সিঁদুরের এক মসৃণ প্রলেপ টেনে এগুলির অপসজ্জা শেষ করা হয়।

আমাদের নকশী-কাঁথা, আমাদের বালুচর শাড়ির মত একেবারে স্মৃতি-কথার কোঠায় এখনও গিয়ে না পৌঁছলেও, দশাবতার তাস-শিল্পের অমোঘ গতি সেইদিকেই। অবসর-ভিত্তিক জীবনধারা থেকে আমরাও অনোঘভাবে যে কর্মব্যস্ততার যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি তাতে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লেও, চোখের উপরে এ-রকম একাধিক চিত্তাকর্ষক কারুকলার অপমৃত্যু আমাদের বোধ করি সহ্য করতেই হবে। *

---

* প্রবন্ধের সহিত ব্যবহৃত আলোক-চিত্রগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিকুপুর শাখার সৌজন্যে লেখক কর্তৃক গৃহীত।

রেবা রোধসি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র তুণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল। রাজা শিববর্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইন্দ্রবর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুণীর যে অপরাধ করেছে তাতে মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু সে আমার পুত্র, তাকে চরম দণ্ড দিতে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। তাকে বলে দিও, আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না, সে যেন আর কখনো এ রাজ্যে পদার্পণ না করে।'

যুবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন,—যথা আজ্ঞা আর্য।'

ন্যূনাধিক সাত শত বছর পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে মহেশ্বরপাড় নামে এক রাজ্য ছিল। রাজ্য আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু সমৃদ্ধশালী। সাতশ বছর আগে ভ্রমণকারী বিনসেন্ট যখন নর্মদার রাজ্য সংস্থানের জন্য দক্ষিণাপথে গমন করেন তখন তিনি মহেশ্বরপাড় রাজ্যের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু তদ্দেশীয় লোকের আদর্শ হইতে রাজ্যটির সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন তাহা এই—

মহেশ্বরপাড় রাজ্যের এই সম্ভ্রান্ত ইতিহাস লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজশক্তি সৈন্যবল গঠন করিয়া দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইবার প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, কোনো দিগ্বিজয়ী অশ্বারোহী সৈন্য আসিল না। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সৈন্যদলও শিথিল হইতে লাগিল। সৈন্যদল ভঙ্গ পাইল, রাজপুরুষেরা বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অভ্যন্তরীণ কূট কূটনীতির খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। দুই চোখের অন্তরাল হইলেই মনের আড়াল হইয়া যায়। অরাতি যখন দূর প্রান্তরে মিলিয়া যায় তখন তাহা অপ্রত্যাশিত উৎপাত বলিয়া মনে হয়। আমরা অতীতকে বড় সহজ ভুলিয়া যাই, তাই বোধহয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।

মহেশ্বরপাড়ের রাজা শিববর্মার বয়স হইয়াছে। সেকালে রাজাদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, যিনি যতগুলি রাজকন্যা ঘরে আনিলেন তাঁহার মর্যাদা তত বেশি। শিববর্মার সাতটি মহিষী পুত্র-সংখ্যা তিনের উর্ধ্বে। তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী,

অন্য রাজকুমারদের কোনও কর্ম নাই। তাঁহারা আহার বিহার মৃগয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া জীবন-যাপন করেন। পুরুষানুক্রমে এই উদ্বৃত্ত রাজপুত্রেরা এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহজাত ক্ষাত্রতেজ ছিল; তাই অদ্যাপি রাজপুত পুরুষের শৌর্যবীর্য বাহুবল ভুবনবিখ্যাত এবং রাজপুত রমণীর গতিভঙ্গে রাজরাণীর গর্ব সুপরিস্ফুট।

তুণীরবর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বালাকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিত না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্মনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, দেহ তেমনিই বলশালী, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বতা করিতে কেহ সাহস করে না; উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দ-চারী হইয়া উঠিলেন। ভোগবাসনে তাঁহার রুচি রাজর্ষি ভর্তৃহরির পন্থা অবলম্বন করিল: জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।

রাজপুত্রেরা কেহই শান্তশিষ্ট মিতাচারী হন না; কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা অতিক্রম করিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তুণীরবর্মার আচার-আচরণ লইয়া রাজার নিকট নিত্য অনুযোগ অভিযোগ আসিতে লাগিল। রাজা পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে তুণীরবর্মা এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করিলেন।

এ মহাপাতকের মার্জনা নাই। রাজা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন, তারপর তাহার নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

কারাগার হইতে তুণীরবর্মাকে মুক্ত করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর-দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। আগে-পিছে দুই দল ধনুর্ধর রক্ষী চলিল।

রাজপথের দুই পাশে নাগরিকের ভিড় জমিয়াছে। অধিকাংশই নীরব, কদাচিৎ কেহ ধিক্ ধিক্ বলিয়া তিরস্কার জানাইতেছে। তুণীরবর্মার মুখ কখনও হিংস্র হইতেছে, তখনও খরশান বাক্য-হাস্য। তিনি পাশে মুখ ফিরাইয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—বধ্যভূমিতে?'

ইন্দ্রবর্মা ধীর স্বরে বলিলেন,—'না। মহারাজ তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছেন।'

তুণীরবর্মার অধর বিদ্রূপে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, তিনি বিকৃত হাস্য করিয়া বলিলেন,—'অসীম করুণা মহারাজের। তোমার যদি অধিকার থাকত তুমি বোধ-হয় আমার প্রাণদণ্ড দিতে।'

ইন্দ্রবর্মা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিলেন, উত্তর দিলেন না।

নগর হইতে রাজ্যের সীমান্ত বহু দূরে। নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা নর্মদার তীর ধরিয়া পূর্বমুখে চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজ্যের সীমান্তস্তম্ভ দেখা গেল। সীমান্তস্তম্ভের নিকট আসিয়া ইন্দ্রবর্মা অশ্ব স্থগিত করিলেন, একটি কোষবদ্ধ তরবারি তুণীরবর্মার হাতে দিলেন, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন,—'ভাই, এই অশ্ব এবং এই তরবারি মাত্র এখন তোমার সম্পত্তি। রাজার আদেশে তুমি নির্বাসিত হয়েছ; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ভুজবলই তোমার ভাগ্য। যাও, আর কখনো এ রাজ্যে ফিরে এস না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাতৃভূমিকে স্মরণ কোরো।'

তুণীরবর্মা তীব্রতিক্ত বাঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন,—'মাতৃভূমি! মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু। যদি কোনো দিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসব।'

ইন্দ্রবর্মা জানিতেন ইহা ক্রোধের আস্ফালন মাত্র, তিনি দুর্মদ সাহসী ও হঠকারী, কিন্তু সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব করা তুণীরবর্মার সাধ্যাতীত। ইন্দ্রবর্মা শান্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন,—'ছিঃ তুণীর ভাই, তুমি রাজপুত্র, নিজের বংশে কলঙ্কারোপ কোরো না।'

তুণীরবর্মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—'আমার বংশ নাই, মাতৃভূমি নাই। পৃথিবীতে আমি একা।' বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পূর্বদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সে-রাত্রি তুণীরবর্মা নর্মদাতীরের এক বৃক্ষতলে কাটাইলেন, পরদিন আবার পূর্বমুখে চলিলেন। নর্মদার তীর কখনও সমতল, কখনও শৈলবন্ধুর। কদাচিৎ দুই-একটি আরণ্যক জাতির গ্রাম। গ্রাম হইতে খাদ্য মিলিল।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তুণীরবর্মা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন; দেখিলেন নদীসৈকতে কয়েকটি আটবিক জাতীয় যুবতী গান গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বনজ ফুলের মালা, কেশ-কুণ্ডলিতে শিখিচূড়া।

তুণীরবর্মা অশ্ব দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর অশ্ব হইতে নামিয়া যুবতীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীরা ভয় পাইল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটি যুবতী হাসিল না, কাছে আসিয়া তুণীরবর্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর নিজের গলার মালা খুলিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য যুবতীরা কলহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

তুণীরবর্মা যুবতীকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম কি?'

যুবতী স্নিগ্ধ চক্ষুদুটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—'রেবা।'

কিছুক্ষণ পরে এক দল আটবিক পুরুষ ভল্ল লইয়া উপস্থিত হইল, তুণীরবর্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এ কে?'

যুবতী বলিল,—'ওর গলায় আমি মালা দিয়েছি, ও আমার পুরুষ।'

পুরুষেরা তখন তুণীরবর্মাকে প্রশ্ন করিল,—'তুমি কে?'

তুণীরবর্মা তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখিয়া বলিলেন,—'আমি রাজপুত।'

পুরুষদের মধ্যে যে সর্বাধিক বয়স্ক সে বলিল,—'রাজপুত! এখানে এসেছ কেন?'

তুণীরবর্মা বলিলেন,—'আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি।'

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি আমাদের গ্রামে থাকবে?'

তুণীরবর্মা বলিলেন,—'থাকব।'

গ্রামের একান্তে নর্মদার তীরে কুটির বাঁধিয়া তুণীরবর্মা রহিলেন। রেবা এই নূতন ঘরের ঘরনী।

রেবার শ্যামল দেহটি যেমন পরম কমনীয়, তাহার মনও তেমনি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রসন্ন। তুণীরবর্মা এমন রমণী পূর্বে দেখেন নাই; নাগরিকা রমণীদের অন্তরে ক্ষুধা অধিক, তৃপ্তি কম।

তৃণীরবর্মা। তাহাকে লইয়া সে আর কিছু চিন্তা করিতে পারিতেছে না।

আর্টবিকদের জীবনে প্রধান বৈচিত্র্য বলিতে ঋতু পরিবর্তন। বসন্তকালে নদীতে মাছ ধরে, বনবেণু লইয়া বাঁশি তৈয়ার করে। মহুয়া এবং কদম্ব হইতে মদ প্রস্তুত করিয়া তাহারা পান করে, নেশায় মত্ত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে মাতলামি করিতে করিতে কে তাহার স্ত্রী কে তাহার পুরুষ ভুলিয়া যায়। অবাধ অনিবন্ধ তাহাদের জীবন সাংস্কারের বন্ধনে তাহাদের মন বাঁধা হইয়া যায় নাই।

তৃণীরবর্মা বনমোরগ লইয়া তিনি যখন ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটেন, তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুক্ষেপে নর্মদার জল তোলপাড় হয়। কখনও তিনি তীরে বসিয়া প্রশান্তভাবে মাছ ধরেন। কখনও বা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে বনে গিয়া ময়ূর হরিণ বরাহ শিকার করিয়া আনেন। আর্টবিকদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহারাও রাজপুত্রকে আপন করিয়া লইয়াছে। তৃণীরবর্মা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, অন্তরে তিনি বন্য আর্টবিক মানুষ, এই জীবনই তাঁহার প্রকৃত জীবন; এতদিনে তিনি স্বক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। নাগরিক জীবনযাত্রার জন্য তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র পিপাসা নাই।

কচিৎ সূর্যাস্তকালে নর্মদাসৈকতে একাকী বসিয়া নানা জল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। নদীর স্রোত পশ্চিম দিকে বহিয়া চলিয়াছে, এখন যে-জল এখানে বহিতেছে সেই জল হয়তো কাল প্রাতঃকালে মহেশগড় নগরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইবে। মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমুখ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়। এই নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার আপন স্থান, এই বন্য অর্ধনগ্ন মানুষগুলি তাঁহার পরমাত্মীয়, রেবা নাম্নী ওই শ্যামলী মেয়েটি তাঁহার অন্তরতমা। জীবনে তিনি আর কিছু চাহেন না।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকে। বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া যায়।

একদিন হেমন্তের দ্বিপ্রহরে তৃণীরবর্মা রেবাকে বলিলেন,—'চল্ রেবা, বনে শিকার করতে যাই।'

রেবা উল্লসিত হইয়া বলিল,—'আমাকে নিয়ে যাবে?'

তৃণীরবর্মা বলিলেন,—'হ্যাঁ, আজ আর কেউ নয়, শুধু তুই আর আমি।'

'বেশ চল।' বলিয়া রেবার মুখে একটি শঙ্কার ছায়া পড়িল,—'কিন্তু

লণ্ঠন অপরিহার্য্য

সুদৃশ্য ও টেকসই

গোর মোহন দাস এণ্ড কোং

২৬৮,3রড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১, ফোন-২২-৬৫৮৩

ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা; বালক-বালিকার কৌতুক কুতূহলের সহিত যুবক-যুবতীর রতিরঙ্গ মিশিয়া বন-বিহার পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তুঙ্গবর্মা যখন সময় সম্বন্ধে সচেতন হইলেন তখন প্রণয়িযুগল বনের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং সূর্যাস্ত হইতেও বিলম্ব নাই।

তুঙ্গবর্মা বলিলেন,—'চল্ চল্, এখনো বেলা আছে, অন্ধকার হবার আগে বন পেরিয়ে যেতে পারব।' তিনি রেবার হাত ধরিয়া আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহাদের পতিরোধ হইল, উত্তর দিক হইতে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তুঙ্গবর্মা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দূরে যেন দুন্দুভি বাজিতেছে, তাহার সহিত সিংহনিনাদ। এ শব্দ তুঙ্গবর্মার অপরিচিত নয়—রণবাদ্য। তাঁহার নাসা-পুট স্ফুরিত হইল, তিনি শ্যেনচক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন।

দূরে এক সারি গুল্মের ফলক দেখা গেল; তারপর দেখা গেল অসংখ্য অশ্বারোহীর দল। তাহারা এই বনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

রেবা ভীতভাবে তুঙ্গবর্মার হাত টানিয়া বলিল,—'ওরা কারা? আমার ভয় করছে, চল পালিয়ে যাই।'

তুঙ্গবর্মা বলিলেন, 'সৈন্যদল আসছে, বোধহয় এই বনে রাত্রি যাপন করবে।—কিন্তু পালাব না। দেখতে হবে ওরা কারা।' তিনি একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া একটি বৃহৎ পত্রবহুল শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন,—'চল, ওই গাছে উঠে লুকিয়ে থাকি।'

দুইজনে শালবৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘন পত্রের অন্তরাল হইতে তুঙ্গবর্মা দেখিতে লাগিলেন, সৈন্যদল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিচিত্র তাহাদের লৌহ শিরস্ত্রাণ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি অস্ফুট স্বরে রেবাকে বলিলেন,—'ম্লেচ্ছ সৈন্য!'

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিতেছে। কয়েক স্থানে আগুনের চুল্লী জ্বলিয়া উঠিল। যে বৃক্ষে তুঙ্গবর্মা রেবাকে লইয়া লুকাইয়া ছিলেন সেই বৃক্ষতলে একদল নিম্নতন সেনানী আগুন জ্বালিয়া আহার্যদ্রব্য সিদ্ধপক্ক করিতে লাগিল। তাহাদের শূলপক্ক মাংসের ভোজ্য গন্ধ তুঙ্গবর্মার নাকে আসিতেছে। তাহারা বাক্যালাপ করিতেছে; তাহাদের ভাষা বর্ণিয়ানের দুর্বোধ্য, তুঙ্গবর্মা কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে যাহা বুঝিলেন তাহার মর্মার্থ এই: মালিক কাফুর নামক এক সেনাপতি এই ম্লেচ্ছ বাহিনীর অধিনায়ক; তাহারা দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু নর্মদা নদী পার হইবার পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে যত হিন্দু রাজ্য আছে, সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, যাহাতে পশ্চাৎ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।—

রাত্রি গভীর হইল। সৈন্যদল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, আগুন নিভিয়া গেল, বন আবার নিস্তব্ধ হইল। বৃক্ষশাখায় তুঙ্গবর্মা বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠার্পণ করিয়া নিঃশব্দে রেবাকে কোড়ে তুলিয়া লইলেন। রেবা যদি ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় কিংবা চীৎকার করিয়া ওঠে তবেই সর্বনাশ।

রাত্রি শেষ হইল। দুন্দুভি ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল।

তুঙ্গবর্মা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মুখে নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তিরেখা, কিন্তু আয়ত নেত্রে চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। রেবা তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে লইয়া চলিল। রেবার চক্ষু সতর্কভাবে চারিদিকে ফিরিতেছে, তুঙ্গবর্মা চিন্তায় আচ্ছন্ন। বন হইতে নির্গত হইয়া রেবা বলিয়া উঠিল,—"কৈ, আমাদের ঘোড়া কোথায়?"

তুঙ্গবর্মা চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন,—'ঘোড়া নেই! বনের মধ্যেও নেই?'

রেবা বলিল, 'না। থাকলে দেখতে পেতাম।'

তুঙ্গবর্মার মুখ কঠিন হইল, তিনি বলিলেন, 'ম্লেচ্ছ তস্করগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

ফুটিরে ফিরিয়া তুঙ্গবর্মা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। তারপর নর্মদার তীরে গিয়া বসিলেন। রেবা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া পাশে বসিল।

নর্মদার স্রোত কলকল শব্দ করিয়া চলিয়াছে; বেলাভূমে তুঙ্গবর্মার মাতৃভূমি সেইদিকে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তুঙ্গবর্মার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, হৃদয়ে অসহ্য আবেগ উন্মথিত হইয়া উঠিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গভীর স্বরে বলিলেন,—'রেবা!'

রেবা তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল,—'কি?'

তুঙ্গবর্মা বলিলেন,—'আমি চলে যাব। মহেশগড়ে সংবাদ নিতে হবে, শত্রু আসছে।'

রেবা কাঁদিয়া উঠিল,—'তুমি চলে যাবে!'

তুঙ্গবর্মা বলিলেন,—'আমাকে যেতেই হবে। আমার শরীরের সমস্ত নাড়ী আমাকে টানছে, না গিয়ে উপায় নেই।'

রেবা গলদশ্রুনেত্রে চাহিয়া বলিল,—'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার ঘোড়া নেই, শত্রু অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। তুমি কি ওদের আগে পৌঁছুতে পারবে?"

'পারব।' তুঙ্গবর্মা নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে।—রেবা কেঁদো না, যদি আমি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

তিনি রেবাকে একবার দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া লইলেন, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সেদিন সূর্যাস্ত কালে ম্লেচ্ছবাহিনী নর্মদার তীরে একটি অটবীতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিল, স্রোতের মাঝখান দিয়া একটা মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা নিরুৎসুক চক্ষে দেখিল, গ্রাহ্য করিল না। একটা কাফের যদি ডুবিয়া মরে, মন্দ কি?—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মহেশগড় রাজ-পুরীর পশ্চাতে বাঁধানো ঘাটে একটি মানুষ জল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় তাহার সিক্ত দেহ ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিল। ঘাটে প্রহরী নাই, রাজপ্রাসাদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।

কিন্তু তুঙ্গবর্মা জানিতেন কী করিয়া সুপ্ত প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়; তিনি গুপ্ত পথে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর যুবরাজ ইন্দ্রবর্মার মহলে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার খোলো—দ্বার খোলো—'

ইন্দ্রবর্মা নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তুঙ্গবর্মাকে দেখিয়া বলিলেন—'একি! তুঙ্গ—তুমি!'

তুঙ্গবর্মার দেহ এতক্ষণে অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন,—'শত্রু আসছে—ম্লেচ্ছ শত্রু মহেশগড় আক্রমণ করতে আসছে—তোমরা প্রস্তুত হও—' এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি জ্ঞান হারাইয়া সহসা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

•

সেবার মালিক কাফুরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

ভগবান ও যম

অনেকদিন পরে কাল রাত্রে দেশে ফিরেছি। ভোরবেলা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠি। সামন্ত-বাড়ি কান্নার রোল। সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেলাম। সমীরণ সামন্তর মা বুড়ো মানুষ, কাকীমা বলে ডাকি। আমায় দেখে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

হয়েছে কি কাকীমা?

সমীরণ মারা গেছে।

আমি স্তম্ভিত। রাত্রে এসেছি, এত বড় কথাটা কেউ বলল না! সামন্ত-কাকা মারা গেলেন, সমীরণ তখন পাঁচ বছরের। তারপরে তারও টাইফয়েড। একুশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি। যুবা বয়স তখন আমার, রাতের পর রাত জেগেছি এই কাকীমার সঙ্গে। যম পরাস্ত হয়ে পালাল। বছর দুই আগে বিয়ে হয়ে গেছে সমীরণের। আমি সেই সময়টা বিষম এক জরুরী কাজে আটকা। আসব না, আসার কোন উপায় নেই। কাকীমাও নাছোড়বান্দা। চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছেন —একফোঁটা বয়সে বাঁচিয়ে তুলেছিলে, সংসারধর্মে মতিও তোমার কথায় হল। তুমি সামনে না থাকলে, কখন পাকাছাট মারে বলা যায় না। সম্বন্ধটা তাহলে ভেঙে দিতে হয়। হোক তাই তোমার যদি সেই রকম ইচ্ছা।

সমস্ত ফেলে চলে এলাম কাকীমার জেদাজেদিতে। বরকর্তা হয়ে বিয়ে দিয়ে আনলাম। সেই ফুটফুটে কচি বউটা— আহা রে, তারই বা কী দশা এখন!

বড় সৎ ছেলে সমীরণ। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কাকীমা তার গুণের কথা বলছেন। যাকে সে চোখে হারাত। একবার কাকীমাকে বিছের না কিসে কামড়েছিল। একফোঁটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বিল ভেঙে ওঝার বাড়ি ছুটল। ইনিয়ে-বিনিয়ে এমনি সব বলে যাচ্ছেন। পুরনো দিনের কত ঘটনা। তুচ্ছ জিনিসটাও বড় হয়ে আজ চোখের উপর ভাসে।

আচ্ছন্ন হয়ে কলে বসে শুনি। এ কী, সমীরণের বউ এক পেয়ালা চা আমার সামনে রেখে প্রণাম করে ধীর-পায়ে চলে গেল। এই বয়সের বউরা যেমনধারা সাজগোজ করে অবিকল তাই, বিধবার লক্ষণ দেখা যায় না। কাকীমা-ই সাজ বদলাতে দেন নি, বুঝতে পারি। একমাত্র ছেলের বউ নিরাভরণ হয়ে সামনের উপর ঘুরবে, সে বড় মর্মান্তিক— ছেলে নেই, পলকে পলকে সেই শোক মনে তুলে দেয়।

ক্ষণপরে, কী আশ্চর্য, খোদ সমীরণই ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়ার গায়ের একটা ডেয়েন্ডায় ডাল ভেঙে নিল। চোখ কচলে ভাল করে দেখে নিই— সমীরণই। আমি যেন কে না কে—একটি কথাও না বলে মুখ ফিরিয়ে দাঁতন করছে।

কী সমীরণ, আমায় চিনিস নে বুঝি?

সমীরণ জবাব দেয় : মরে গেছি তো শুনলে। মরা মানুষ কোন আক্কেলে জ্যান্তদের কাছে যাবে বলো!

ঝগড়াঝাটির ব্যাপার অতএব। কাকীমাকে ধমক দিই : যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে! অমন কথা বলে কখনো—বিশেষ এই নিজের ছেলের সম্বন্ধে! একমাত্র ছেলে তোমার।

কাকীমা ডুকরে কেঁদে ওঠেন : মিছে বলিনি বাবা। নিজের ছেলে আর নেই। মরে গেছে, মরা ছাড়া কী আর বলি! এতদিন সে ছিল বটে আমার—

চা দিয়ে বউ রান্নাঘরে ঢুকেছে। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন এত সাধ-আহ্লাদের ছেলে ঐ হারামজাদী

গুণ করে নিয়েছে। কাল সমস্ত দিন একাদশী করে আছি—তা একবার যদি তাকিয়ে দেখে, মা-বুড়ি থাকল কি মরল।

সমীরণ সকাতরে আমার দিকে চেয়ে বলে, শুনলে তো? জানতাম সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার মা? লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে ছিলাম। গাড়িক যা দাঁড়িয়েছে, একমুখো ছুটে বেরুবে। উঃ, কী সর্বনাশ যে করেছ দাদা—এবারে বলতে এলে রক্ষে রাখব না।

কাকীমা ফরফর করে ওঠেন : কাল ছিল না আমার একাদশী? বল্ ভেড়া-কান্ত, ভোর মুখেই শুনি।

রাত্রে সেজন্য ছানা আর মিষ্টি-মিঠাই এনে দিয়েছি—এনেছি কিনা সেটাও বল দাদার কাছে।

সে হবি আমার জন্যে : সমীরণের কথার জবাব কাকীমা আরও উস্কে দিচ্ছেন : কোঁচার তলে মালসা ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যের পর বাবু টিপিটিপি ঘরে গিয়ে উঠল। বুড়ো হয়েছি বলে চেহারাও গেছে। এক মালসা রসগোল্লা বউকে ধরে ধরে গিলিয়েছে। একেবারে না নিলে মন রাখার, পাঁচরের বাটিতে করে এই টুকু-টুকু চারটে গুলি ঠকাস করে আমার সামনে ফেলে দেয়। মিঠাই বলে তাই আবার খোঁটা দিতে এসেছে তোমার কাছে!

বৈদ্য হারিয়ে সমীরণ গর্জন করে উঠল : এনেছি মোটমাট ছটা, তাই এখন পুরো মালসা হয়ে গেল। তুমি একবার বসন্ত ময়রার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ দাদা। সে তো অচেনা মানুষ নয়, তোমার কাছে মিথ্যাও বলবে না।

আমিও রাগ করে বলি, মিষ্টিমিঠাই বাড়ি এলে বউ খাবে না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাবে—এই বুদ্ধি বিচার করেছ, বেশ করেছে। ছিঃ!

কাকীমা বলেন, আমি খেতে দিই না : কত পর অপর বলে আমার বাড়ি চিরকাল আমার কাছ থেকে নিচ্ছে-খাচ্ছে—

দেখেছি বলেই তো বলি। কাঁচ মেয়ে বাপ-মা ভাই-বোন ছেড়ে তোমার বাড়ি এসেছে—

কাকীমা আবার জ্বলে উঠলেন : কাঁচ ঐ চোখেই দেখতে। মিটমিটে শয়তান, বিষপুটুল। বাইরে থেকে একদিন এসে কি বুঝবি? দুটো বছরের মধ্যে ছেলে আমার পর করে দিয়েছে। সাত নয় পাঁচ নয়, পেট-মোছা কোল-মোছা এক ছেলে আমার।

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সত্যি তো চোখে দেখেছি, কত কষ্টে মানুষ করেছেন সমীরণকে। একটা দিনের ছাড় দিতে পারিনে। ক্রোশ দুই দূরে বড় ইস্কুল। বৈশাখ মাসে মর্নিং ইস্কুল—খুব জোরকেলা আকাশে পেছাতি তারা থাকতে গাঁয়ের ছেলেরা রওনা হয়ে পড়ে। বড় হয়ে গেছে, শেষরাত্রে উঠে আম কুড়াতে গেছি। দেখলাম, কাকীমাও ছেলেদের পিছু পিছু যাচ্ছেন। মাঠের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—বড় মাঠ ধীরে ধীরে পার হয়ে তারা বড় রাস্তায় উঠল। একা নয় সমীরণ, চার-পাঁচ জনে বেশ একটা দল হয়ে যাচ্ছে। কাকীমা নিশ্চল মূর্তি হয়ে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছেন না এত দূর থেকে—কিন্তু নিশ্চিত জানি, দুটি চোখের পলকহীন দৃষ্টি সমীরণের উপর সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে। কখনো যদি ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, খর-দুপুরে একবার বাড়ি একবার ঐ মাঠ করে বেড়াচ্ছেন, তা-ও দেখেছি।

কাকীমা বলছেন, এই দেখ বাবা, তোর পরের কাপড়ের দিকে তাকাও একটিবার—

সমীরণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, কী মহাপাপের ফল ভুগছি, দেখ দাদা। যে আসে তাকে ঐ ছাড়া কাপড় দেখাবে। ও কিনিষ সেই জন্যেই পরে থাকে। নতুন কাপড় এনে দিলাম, ছুড়ে আস্তাকুড়ে ফেলল।

ফেলব না : কী কাপড় এনেছিস, সেটাও বুকে হাত দিয়ে বল্। হাতে নেই বহরে নেই, জালের মতন একটু ছিপ-ছিপে ছেপটি। তেমন কাপড় মানুষ রাস্তার কানা-খোঁড়াকেও ভিক্ষে দেয় না। বউয়ের বেলা তো জোড়ার জোড়ায় বানারসি-বোম্বাই। ছেলের জিনিষ না হয়ে কি জন্যে তবে নিতে যাব?

সমীরণ বলে, হে কাপড় পরে, ঐ যে তোমার চা দিয়ে গেল। জোলার বেনা ডুরেশাড়ি—তাই নাকি বেনারসি-বোম্বাই। যা অবস্থা করে তুলেছ, কোন দিন আত্মঘাতী হব, মরার সাধ বউকে তখন কিবার গুনেকাপড় পরাব। সেই কটা দিন একটু ক্ষমা দিতে বলো দাদা।

একটুখানি দম নিয়ে আবার বলে, এই ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেই সেবারে বেরিয়ে পড়ছিলাম। তোমরা সেটা হতে দিলে না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কাতে গেলে। বিয়ে আমি করতে চাই নি। দেখেশুনে মা-ই মেয়ে পছন্দ করল, কলকাতার কাজকর্ম ফেলে তুমি তার উপর এসে পড়লে—

কাকীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কনে চিনতে ভুল করেছি, ভাল ঘরের মেয়ে বলে আনলাম, ঘরে তুলে দেখি ডাকিনী। ডাকিনীর হাতে পুত সমর্পণ করলাম, এর চেয়ে যমের হাতে দিলে ভাল ছিল। সেই যখন টাইফয়েড হয়ে একুশ দিন একুশ রাত্রি লড়ালড়ি চলল—

আমার উপর হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেন : তুমিই তো ডাক্তার-কবরেজ অষুধপত্তর টাকাপয়সা নিয়ে এসে পড়লে। আমার এই বুড়ো বয়সের খোয়ারটা দেখবে বলে বুঝি? ডাকছি সেই যমকে—একবার ভুল হয়েছে, আর হবে না। যম এসে নিয়ে যাক, যমকে তাতে প্রবোধ দিতে পারব।

আর একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। সমীরণের বিয়ের মাস পাঁচ-ছয় আগেকার কথা। সামন্তবাড়ি এমনি কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার। কাকীমা মুখ ছেড়ে কাঁদছেন : মেয়ের যম এক ছেলে—সে না থাকলে বাপের বাড়ি নিয়ে আদর-যত্নটা কে!

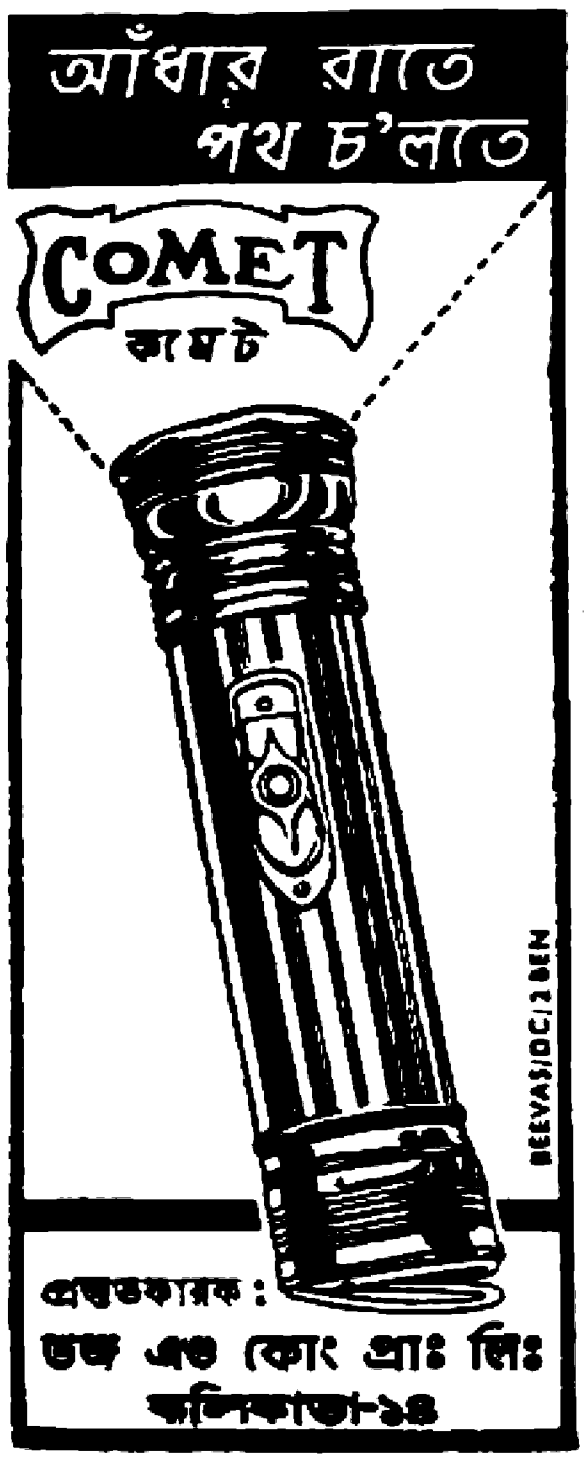

কান্নার মধ্যে অনেক সুরে অনেক কথা বলছেন—প্রধান কথাটা এই।

আমার মুশকিল, বড় এক জটিল মামলার দলিলদস্তাবেজ নিয়ে বসেছি, দলিলের খুচরো-কথাগুলো সতর্কভাবে টুকে নিতে হচ্ছে। উঠব বললেই ওঠা যায় না। জীর্ণ কাগজ যথোচিত যত্নে তুলে পেড়ে রাখা অনেকক্ষণের ব্যাপার।

গ্রামের একজনকে মুহুরি হিসাবে রেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদেন কেন কাকীমা, কী হল? কী সমস্ত ঐ বলছেন—

সামন্তবাড়ির অদূরে বিশাল দীঘি। ধুক করে আমার জলের কথাটাই মনে হয়।

দীঘিতে ডুবেটুবে গেল নাকি?

দীঘির দু-শ হাতের মধ্যে সমীরণ যায় না। জলের নামে ভয়। সদরে জজের সেরেস্তায় একটা চাকরি হয়েছিল—নৌকোয় স্টিমারে জলের উপর দিয়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে গেলই না সেখানে?

গাছ থেকে পড়ল না তো? উঠোনের পরেই তো গোলাপখাস গাছ।

মুহুরি বলে, বাপ-পিতামহ দোতলায় ঘর তুলে গেছেন, জ্ঞান হবার পর সে ঘরেই গেল না কখনো। চামচিকে আর ইঁদুরের বাসা হয়ে আছে। উপরে উঠলে মাথা ঘোরে। গাছে চড়বে সেই মানুষ তাবেই হয়েছে! উঠোনের ঐ নিচু গোলাপ-খাসের আম পাড়তে মা-বুড়ি পাড়ানি ডেকে ডেকে হয়রান।

তবে কান্না কিসের—এই আকাশ-ফাটানো কান্না? পুলিসের হাঙ্গামায় পড়ল না তো? বেচারামের বউটা সেবারে এমনি মাথা-ভাঙাভাঙি করছিল। অনেক-দিন আগে আমার ছেলেবয়সে অহিভূষণের পিসিমাকেও ঠিক এমনি ডাক ছেড়ে কাঁদতে দেখেছিলাম।

বহুদর্শী মুহুরি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল : উঁহু, তা কেন হবে? বেচারাম সিঁদেল চোর, সিঁদের মুখে ধরা পড়ল। হাতকড়ি পরিয়ে টানতে টানতে বাড়িতে বউয়ের কাছে নিয়ে গেল। অহিভূষণ স্বদেশি—পুলিশ রিভলভার পেল, আর বন্দেমাতরম-লেখা নিশান। সমীরণ সৎ ছেলে, ঐসব কোন ঝামেলায় নেই। চুরি করে না, স্বদেশিও করে না। তাকে পুলিশে কেন ধরতে যাবে?

কাকীমার কান্না আরও তীব্র হয়ে কানে বাজে : তুই গেলে কী নিয়ে থাকব রে বাবা—

চলে যাচ্ছে নিশ্চয় কোনখানে। চাকরিবাকরি করতে বিদেশ যাচ্ছে, তা-ও হতে পারে। কি বল মুহুরিমশায়?

মুহুরি বলে, তা হলে কাঁদছে যাবে কেন? বুড়ি তো চাচ্ছে তাই। বলে, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে রোজগারপত্তর করু, বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে আসি—

আর্তনাদ ক্রমেই বাড়ছে। যাওয়া উচিত, তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গোছাই। এমনি সময় দেখি, অমূল্য ডাক্তার যাচ্ছেন সেইদিকে।

শুনুন, ও ডাক্তারবাবু, অসুখবিসুখ নাকি সমীরণের?

মুহুরি জুড়ে দিল : জীবনের ভয়?

অমূল্য ডাক্তার হনহন করে আমার দিকেই চলে আসেন। ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, হয়ই যদি অসুখ—টি, বি, ক্যান্সার, ডিপ্থেরিয়া, যার চেয়ে বড় অসুখ নিদানে নেই। তা বলে, জীবনের ভয়—এই অমূল্য সিংহি হোমিওপ্যাথি বাক্সসহ গ্রামের উপর বর্তমান থাকতে? শহর থেকে ডাকাডাকি—সিবিল-সার্জন অবধি হাত ধরে বললেন, বসে যান এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি আমরা। তবু গ্রাম ছেড়ে নড়িনে। কেন? আমার জ্ঞাতগুষ্ঠি গ্রামবাসী—আমি চলে যাবার পর একটি প্রাণী কেউ বেঁচে থাকবে? যমদূতের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি। মহামারী জলস্তম্ভ খাণ্ডবদাহনে দুনিয়া উৎসন্ন হয়ে যাক, এ গাঁয়ের গাছের পাতাটি খসবার উপায় নেই। আপনি তো গাঁয়ে থাকেন না, যারা সব আছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ডাক্তার চলে গেলেন। কাগজ-পত্র গুছিয়ে আমিও উঠলাম। কাকীমার আর্তনাদে দস্তুরমতো ভিড় জমে গেছে। ঠিক আজকের মতোই গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হয়েছে কি কাকীমা?

ভগবানে পেয়েছে সমীরণকে। সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

ভিড়ের মধ্যে ভস্ম-মাখা সাধু বিশালানন্দ। সেইদিকে কাকীমা কটমট করে তাকালেন।

ভাল ছেলে তোমার কাকীমা। ভগবান পাদপদ্মে টেনেছেন। তাই নিয়ে কান্না-কাটি করে তুমি লোক জমাচ্ছ। ছিঃ!

কাকীমা লজ্জা মানেন না। সাধুর দিকে চেয়ে বলেন, ছেলে আমার এমন ছিল না কস্মিনকালে। ঐ বাবাজী ফুস-মন্তর দিয়ে করেছে।

ভালই তো। চতুর্দিকে যা সমস্ত হরদম দেখি—সন্তান বাপ-মায়ের হাড় ভাজা-ভাজা করে দিচ্ছে। ভগবানে মতি গেছে, এমন ভাগ্য ক-জনের হয়?

কাকীমা বলেন, ভগবান কি চাকরি দেবেন, খেতে পরতে দেবেন? এক ছেলে আমার, বিয়েথাওয়া দিয়ে ঘরসংসার ভরভরন্ত করব—কতদিনের সাধ। ভগবান গোড়াতেই তো বালতা দিয়ে বসবেন।

পুনশ্চ বিশালানন্দকে দেখিয়ে বলেন, সে যদি যাযাবরের পোষাক। রজত-কান্তির বাড়ি আস্তানা, ভগবান বানের জলের মতো দিচ্ছেন যার যেখানের। আমাদের এই এঁদো ঘরবাড়ি, কোন দুঃখে ভগবান যত্নে আসবেন? ঢুকতেই তো মাথা ঠুকে যাবে।

হাতে জপের থলি। বললেন, নাম-জপ করছিলাম একটু পুকুর-ঘাটে বসে। নেতার মা গিয়ে বলল, দেখ গিয়ে ও ঠাকরুন, ছেলে তোমার সন্ন্যাসীঠাকুর ভাগিয়ে নিয়ে চলল। জপ ছেড়ে ছুটে এসেছি। ইহকাল তো দুঃখকষ্টে দাসী-বৃত্তি ঠেঙাবৃত্তি করে গেল—পরকালের একটু সুরাহা করে নেব, সে কি আর হতে দেবে হতচ্ছাড়া বাবাজী? তোমরা সব এসে পড়েছ বাবা—এই জন্যেই চেঁচা-মেচি করছিলাম। জপটা তাড়াতাড়ি সেরে আসিগে এইবার। বাবাজীর সঙ্গে তোমরা বুঝেসমঝে করতে লাগো। ফিরে এসে তখনো যদি হাইমুখোটাকে দেখি, থ্যাবড়া পেটা করে ছাড়ব। ওর ভগবানের নিকুচি করেছে।

কাকীমা অন্তর্হিত হলে বিশালা-নন্দকে চুপিচুপি বলি, সরে পড়ুন বাবাজী। কাজ নেই সমীরণের পারলৌকিক হওয়ালে। একটুখানি যদি বিনয় হন—এই পাঁচ টাকা। জপ সেরে কাকীমা ফিরলে কি হবে জানিনে। ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ঠেকতে পারবেন, তা-ও কিন্তু ভরসায় আসে না।

বিশালানন্দ বুদ্ধিমান, প্রস্তাবটা বুঝে দেখলেন তিনি। আশীর্বাদ করে পাঁচ টাকা দক্ষিণা নিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কাকীমা এসে বললেন, বিশ্বাস নেই বাবা। চলে গেছে, কিন্তু রজতকান্তির বাড়ি তো রয়ে গেল। আড়ালে আবডালে ফুসফুস-গুজগুজ করবে। কনের জোগাড় দেখ তুমি, সাদামাটা যা-হোক একটা হলেই হল। বিয়ে সামনের বোশেখে। যমের হাত থেকে বাঁচলে তো ভগবানের হাত থেকে বাঁচাও এবারে।

কনে আমায় দেখতে হয়নি, কাকীমাই সব করলেন। আজকে সেই কনের হাত থেকে যমের হাতে পুনশ্চ চালান করবার কথা বলছেন। তাড়ে নাকি প্রবোধ পাবেন।

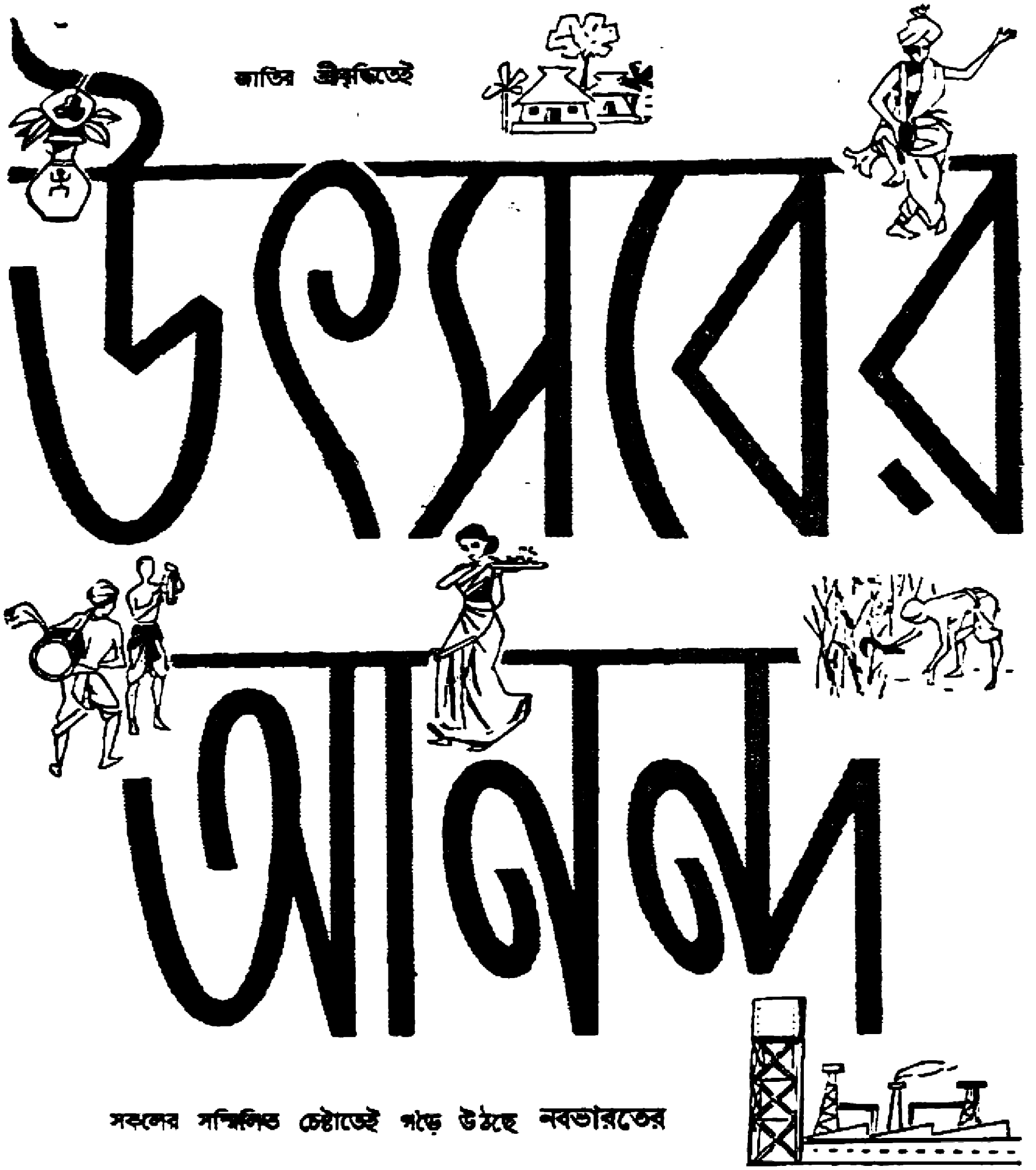
জাতির শ্রীবৃদ্ধিতেই
গড়ে উঠছে
সকলের সম্মিলিত চেষ্টাতেই গড়ে উঠছে নবভারতের
সোনার বাংলা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

CENTRAL LIBRARY

কবিতা

বাজপাখি

অজিত দত্ত

হঠাৎ কোন্ মহাশূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
কঠিন অব্যর্থ নৃশংস ঠোঁটে
অসহায় দুর্বল পাখির ছানাটাকে
মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাজপাখিটা।
তারপর ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে উঠে
মেঘরাজ্যে দৃষ্টির সীমানায় ভেসে গেল,
যেন একটা কালো চাঁদের ফালি।

ছোট পাখিটার উষ্ণরক্ত ওর রক্তে মিশে গেল,
তার প্রাণ ওর ডানাদুটিতে দিল বলিষ্ঠ গতি,
ওর নখর আরো একটু তীক্ষ্ণ হল।
আবার ও পৃথিবীতে নেমে আসবে
তাজা রক্তের পিপাসায়।

কী সুন্দর বাজপাখিটা ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো!
ওর দেহে পৃথিবীর উষ্ণ রক্ত
ওর মাথায় স্বর্গের আশীর্বাদ,
ওর ডানায় বায়ুলোকের অনাহত বীণা বাজছে॥

শবরী

বিষ্ণু দে

অপ্রাকৃত শিল্প যবে মূর্তি পায় জীবন্তে, বাস্তবে,
তখনই নন্দিত মন বাঁধে তাকে স্মৃতির শাশ্বতে।
চৈত্রের সন্ধ্যায় কবে তাঁবু ছেড়ে রুপালি গৌরবে
বেরিয়ে দেখেছি তাকে—শবরীকে, হিরণসৈকতে,

কোয়েলের পাড়ে পাড়ে সে চলেছে, তাম্রঘট দেহে
আলোর কঙ্কণ কিংবা লোকনৃত্যে অন্য কোনো দোলা।
প্রকৃতির প্রিয় যে সে, খুলে পড়ে সামান্য মেখলা—
জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল ওঠে অঙ্গ বেয়ে স্নেহে।

সম্ভবত শবরীও প্রকৃতির আত্মীয় প্রজ্ঞায়
জেনেছিল আছে তার নির্বিশেষ বিমুগ্ধ দর্শক—
সেও নৈর্ব্যক্তিক, নগ্ন, বিমূর্ত সে সৌন্দর্য-সংজ্ঞায়
তাকাল, ছিটাল জল, যেন সেও নিজে সমর্থক।

জানি সেই সমর্থনে প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ,
সেই উৎসেই শুধু সব সৌন্দর্যের মৌলিক বসতি,
কারাচিত্র ভাস্কর্যের যা কিছু পরম শুভক্ষণ
সবই সেই লীলায়িত চেতনার চূড়ান্ত প্রগতি।

শবরীর স্নান কিংবা খেলা দেখে চলেছি তাঁবুতে—
রুপালি পূর্ণিমা আর বালির সোনায় ক্ষিপ্র জল
ধাতুর সংহতি পায়। আজও দেখি সে অষ্টধাতুতে
বন্য প্রকৃতির তাম্র কন্যা জ্বলে বিমূর্ত, উজ্জ্বল॥

শরতের রাত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আশাভঙ্গের রঙ ভাদ্রশেষ পশ্চিম আকাশে
সব শূন্য একাকার। বুদ্বুদের মতো শুধু ভাসে
নানান চোখের স্মৃতি। জলভরা টলটলে
বৈশাখের বুক-খাঁখাঁ। শ্রাবণের জলে জলে
অতল গভীর স্বাদ।
আশাভঙ্গের ক্ষণ
অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরো না।
ফিরে নাও কৃপণের মতো
মিলনের ক্ষণকাল। বিচ্ছেদের মোহনা-বিস্মিত
তন্বীর তনিমা। ফিরে নাও মুখ চোখ হাত
আর স্বেদবিন্দু। আর মহুয়ার রাত॥

জিজ্ঞাসা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এ জিজ্ঞাসা থেকে গেল মনে :
কেন প্রেম, তার অন্বেষণে
ভ্রান্ত এ হৃদয়!
সব যদি দু' দণ্ডের হয়,
এতো ফুল কেন ফোটে চারপাশে তবে?
মনে গন্ধ র'বে!
রয় না ত, সবি মুছে যায়;
প্রগল্‌ভ ভাষায়
যতো কথা বলা সব দু'দণ্ডে শেষ,
শরীরের অবশ আবেশ
মুহূর্তে উধাও।
কী পাও, কী পাও
প্রেম-যন্ত্রণায়?
শুধু জিজ্ঞাসাই থেকে যায়॥

নেপথ্য সভায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১

তাহলে একাকী যাবো নেপথ্যের গোপন সভায়।
তোমরা এখন কেউ সেখানে যেয়ো না।
আমি আগে গিয়ে দেখি
টবে ফুল আছে কিনা, পুকুরের জলে
আয়নার মতো মুখ দেখা যায় কিনা।
গাছগুলো উত্তোলিত বাহুর শোভায়
ছায়া-লীন স্নেহে মমতায়
উচ্ছ্বসিত কিনা।

২

গত অজন্মার স্মৃতি অত্যন্ত করুণ।
সমস্ত আকাশ খাক, যতো নদীনালা
শুকনো মরুর মতো, আর্দ্র গাছপালা
জ্বলে পুড়ে একাকার, নারীর শরীর
ধূসর পাংশুল। এবং পুরুষ যুবা, শিশু
রক্তের ক্ষতের চিহ্ন মুখে পলাতক।
কেউই ছিল না কাছে। মেঘের ফোঁটাও
কোনোখানে নেই। এক ফোঁটা বৃষ্টি না পেয়েই
ধীরে ধীরে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে
ঝরলো বাগানে যতো অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া।

৩

আজ কি আবার সেই ঝরাপাতা স্তূপে
নতুন প্রাণের সাড়া। শাখায়, প্রাঙ্গণে
নিবিড় সবুজ। টবে ফুল হাসছে কি ফের
প্রাণের দীপ্ততে।
দেখে আসি একবার নেপথ্যের গোপন সভায়॥

গ্রীষ্মকেই তারা

অরুণ মিত্র

গ্রীষ্মকেই তারা উৎস ব'লে জানে।

তাদের প্রণয় বা বন্ধুত্ব কোনো ধারাজলে পুষ্ট হয়নি। রক্তের মুখে উষ্ণ হাতের চাপ তাদের অনুভবে রয়েছে। কাঁকরে আর আগাছায় তাদের শরীর ছিঁড়েছিল এবং সেই প্রথম তারা দিনের ভগ্নাংশগুলোকে একত্র হ'য়ে তপ্তকাঞ্চন বর্ণে ফুটতে দেখেছিল। তখন থেকেই মমতার ছাদু তাদের সামনে দুপুরের আচ্ছন্ন বীথি মেলে রেখেছে। তারা রোজ সেখানে দু' দণ্ড গা এলিয়ে দেয় এবং স্মরণে আনবার চেষ্টা করে কোন্ কোন্ উত্তাপের লগ্নে তারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আরও বড় ক্ষত যখন গোপনে বুকের ভিতর হয় তখন আঁধি আছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে উত্তাল বাঁচার আস্বাদ তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নেয়। সেখানে অবশ্য একটুও স্থিতি নেই। কিন্তু তারপরই তো চুম্বনের লালে শেষ বেলাকে ঢলতে দেখার শান্তি।

কোথায় এক রাজ্যে নাকি বিশল্যকরণী জন্মায়, তার অলৌকিক কাহিনী তারা প্রায়ই শোনে। কিন্তু রোদের বাস্তব থেকে মেরুসমান দূরে সে কি কোনো মৃত দেশ নয়? হঠাৎ উন্মনা হ'য়ে যাওয়ার পর তারা আবার স্পষ্টতায় ফিরে আসে। গ্রীষ্মের কাছে বিদায় নিলে ভীষণ একলার পথ শুরু হয়, তারা ভাবে।

শারদ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শরৎ হল যে কোকিল সময়—কি অপরূপ
ধুয়ে নীল হল ঘনপুঞ্জিত মেঘধূপ।
ঘুম মেখে নিয়ে পদ্মগন্ধে
প্রজাপতি-পাখা নিঝুম সন্ধে
স্তব্ধ নিতল; এই সুশীতল
পরম চেতনা ধরে না
কোনো ইতিহাসে। কোনো মন্দিরে
গভীরে মগ্ন রূপবন্দীরে
এতটা করুণা করে না।

এমন কি ওই ভরা কল্লোলে
ফোলা পচা পাতা পাঁক পল্বলে
যেন হৃতসাজ ভ্রষ্টাচারী—
তারও ঠাঁই আছে; রূপের ঝারি
ঝরে নিঃশেষ হয় না বুঝি।
হেলায় ছড়ানো পুরানো বিষম
তারি পাশে ফের নূতন সুষম
কেবলি খুঁজি।
আর, কি আশ্চর্য,
এ ঐশ্বর্য
তোমার-আমার সবারি পুঁজি।

মুখার্জি সাহেব

দিনেশ দাস

রাত্রির প্রশান্তি নামে :
উত্তপ্ত চৌরঙ্গীপাড়া ক্রমে শান্ত হয়।
এখন অফিস শূন্য,
এবার মুখার্জি ওঠে :
পিছনে ভ্রূকুটি করে বুড়ো দরোয়ান।

আকাশের বুকে
কুয়াশা-চাদরে ঢাকা শ্বেত শিশু-চাঁদ :
রাজপথে কিছু আলো, কিছু অন্ধকার।
শূন্য বেলুনের মত ফুটপাথ ধরে হাঁটে মুখার্জিসাহেব!
গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে বইয়ের দোকানে
দাঁড়ায় কিছুক্ষণ সোনালী বাতাসে,
কখনো বা বই কেনে।
ভীরু বালকের মত কখনো চকিত হয়
একক্রোড়া রাতের পাখির ডাকে :
আঙুর-শীতল রাতে ভাবে শুধু
নিজের অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কথা।

একথা গৃহিণী জানে
অকারণ রাত্রি ক'রে কেন বাড়ি-ফেরা,
কেন এই ম্লান নিঃসঙ্গতা!
সে শুধু নিঃশব্দে রাখে টেবিলের 'পর
রাতের আহার্য আর এক গ্লাস চকোলেট-দুধ।
বিষণ্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মুখার্জিসাহেব পান করে
পাশে সেই মহিলাও পান করে
হারানো দিনের যত সুরভি পানীয়।

অনেক দূরত্ব নিয়ে পাশাপাশি দুজনেই শোয় :
মধুজোর হাতে থাকে বই,
সে-নারী খাটের উপরে চেয়ে থাকে ছায়ার দিকেতে
নীরব, শীতল।
অদ্ভুত নৈকট্য আর দূরত্বও নিয়ে
কাছাকাছি শুয়ে থাকে তারা
দুমুঠো ছাইয়ের মত।
যেখানে একদা
জ্বলেছিল দুটি লাল আগুনের শিখা॥

সময় পালক হ'য়ে উভয়কে ছুঁয়ে যায়,
ঘুমোয় শয্যায় দুটি উত্তর-যৌবন—
ঘুমোয় তাদের সাথে সকালের তারা॥

আশ্বিনের কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

মনে আছে সেই ফাঁকা চাঁদপুর,
দূর থেকে দেখা
বালিতে-জলে—
ডাইনে ফিরতে হঠাৎ বিকল
গাড়িটা,
বোধের অন্য তলে
এক লহমায় পৌঁছেছিলাম।
দেখতে-দেখতে শরীর-ঘটে
শাদা জামাটার রক্তের লাল
ঢেউ ছুঁয়ে গেল।
অন্য পটে—
সাড়ে-দশটার সময়চিহ্নবিলোপ থেকে সে
সময়ে ফেরা,
মনে আছে সেই ফাঁকা চাঁদপুর
স্নায়ুঝংকার-স্মৃতিতে ঘেরা!

সেদিন যেমন,—আজকেও তাই
প্রথাবিলোপের প্রবল ঘাতে
এলো আশ্বিনে নতুন শিউলি
চির-আবর্তে নতুন হাতে—
লাগে সোনারঙ অবাক রোদের
বর্ণাভা,—তাই
নিজেকে বলি—
থেমে আছি। তবু হয়তো আমরা
থামি না কখনো,
গভীরে চলি।

বাঁকা পথের যাত্রী

গোপাল ভৌমিক

কি আমার চাই হয়নি তা জানা বলে
পৃথিবীর পথে চলি শুধু টলে টলে।
এ পথ সে পথ বহু ঘোরাঘুরি করে
নিয়তিকে নতি জানিয়ে যাই নি মরে।

শ্যামলকে দেখি, সেতো মহা ধনবান,
শুনি অরুণের পড়ানোর জয়গান:
রাজনীতিবিদ্ অমিতাভ কম কিসে?
শুনে খুশী হই, ভরে না এ মন বিষে।

তুলনায় আমি কিছুই হইনি জানি,
তবু এ হৃদয়ে নেই এতটুকু গ্লানি।
বহু পরাজয়ে একথা শিখেছি ঠেকে,
আমার চলার পথটি গিয়েছে বেঁকে।

ঘুর পথে তাই চলতে করে না ভয়,
হই না আহত দেখেও সহজ জয়।

রাত্রির আকাশ

উমা দেবী

নগরীর রাত্রির আকাশ—
ও যেন স্পর্শের অতীত এক নীল কোমলতা,
স্বপ্নের অতীত এক বাস্তব পূর্ণতা—
হে রাত্রি আমাকে আজ জানাও কি কথা!

ঘোরা মন, বাক্য তার হারিয়ে গিয়েছে
হৃদয়-অরণ্যে নীল ফুলেরা যেখানে
বিষ-বিষ রাঙা রেণু ঝরিয়ে দিয়েছে—
যেখানে পড়ন্তবেলা শেষ রোদটুকু নিয়ে
প্রান্তরের প্রান্তে পালিয়েছে।
কাজের বোঝাই-হারা ক্লান্ত গো-শকট
তবুও রাত্রির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছে।

সন্ধ্যা কেন আসে বল এ শহরে?—সন্ধ্যা কেন আসে?
যেখানে শ্রান্তির ধুলো
ঘুরে ঘুরে এসে সর্পিল বাতাসে হৃদয় কাঁদায়—
না জানি কত কি ফুল ফুটে ফুটে
সৌরভ ছড়ায় কোনোখানে ঠিক সেই মুহূর্তেই।
ঠিক সেই মুহূর্তেই সান্দ্রতম প্রেমের বাসনা
নিজের বিবর থেকে ভীরু ভীরু শলকের মত
দুচোখে সারল্য জেলে কী যেন বা খুঁজে ইতস্তত
আবার গহনে ডুবে যায়!
আলো জ্বলে পথে পথে—
সারি সারি—রক্তচক্ষু মাতালের মত
—শহরের এই সন্ধ্যা আমাকে কাঁদায়!

হে রাত্রি তুমি তো আজও রেখেছ বিশ্ব
আমাকে ডুবাও তাই হৃদয়ের নীল শূন্যতায়
আজও নীহারিকা যার স্বপ্ন দেখে নূতন গ্রহের
হয়তো বা পেতে চায় নূতন আকাশ—
দিয়ে এক অফুরন্ত সতেজ আশ্বাস
কাঁপাও সৃষ্টির চেতনায়—
কাঁদাও কি তিক্ত-মধু সে গভীরতায়?

মানুষ

ধীরেন্দ্র মল্লিক

মৃত্যুঞ্জয় জানি তুমি, তবুও পেতেছি কত ছল,
গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নেড়ে রচিয়াছি গ্রন্থিভাঙা কত না কৌশল,
করিয়াছি কূট তর্ক, সভাগৃহে সমাবেশে কত না বিচার,
তোমাকে হত্যার অস্ত্র তীব্র হতে তীব্রতর করি আবিষ্কার
পরেছি জরের টিকা; তারপর হুড়োহুড়ি মানপত্র
বিদগ্ধজনের,
প্রথমেই মোর নাম বড় বড় হরফেতে সংবাদপত্রের।
তবু তুমি মরিবে না এ কথাটা সার সত্য জানি;
মরে যদি কেউ সে তো, প্রথমেই আমি যাব, মনে মনে মানি;
সব মেকি, সব ফাঁকি—ফাঁকির প্রাসাদ এ তো
তিলে তিলে গড়ি,
একদিন মাটি কাঁপে, ইঁট কাঠ চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ মরি।
মৃত্যুহীন তুমি দেখ, ঊর্ধ্বাকাশে ঊর্ধ্ব হতে
নিম্ন পানে চাহি;
হেসে বল, 'অমর অব্যয় আমি, মোর মৃত্যু নাহি।'

শতবর্ষ পরে

ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো অন্তহীন আলো
গভীর গভীর মানবতা
মুছে গেলে আমাদের রক্ত লাগে ভালো
হিংসা দ্বেষ অপ্রেমের কথা।
অমল শতাব্দী থেকে নির্বাসিত হ'য়ে
অন্ধকার সব অন্ধকার
কাঁধে নিয়ে ক্লান্তি ক্লান্তি ক্লান্তির বলয়ে
আমরা সাজাই শবাধার।

শিকারী চিলের মত চারদিকে অসুখ
পুঁজ মাছি বসন্ত কলেরা
ঈর্ষার অমোঘ মার, রক্তে ভাসা মুখ
কাগজের মত ক'রে ছেঁড়া।

উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো অন্তহীন আলো
ভালোবাসা, ভোরের সবিতা
মুছে গেলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের কালো
কথাগুলি জ্বালে শুধু চিতা॥

অমৃত-স্বপনে

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তোমারে বাসিতে ভাল যদি মন চায়,
প্রাণের সাগরে যদি ওঠে কোন ঢেউ,
ফিরায়ে দিও না তারে দেহের সীমায়,—
সন্ধ্যাকাশে শুকতারা দেখিবে না কেউ
এ দেহ রচিল কোন্ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর—
এ বেদনা কেন জাগে দুস্তর বাধায়;
আকাশ বাতাস আজি হয়েছে অধীর,
ধরণীরে বন্দী করি' প্রকৃতি-লীলায়!
বসুধারে সাক্ষী মানি তাই নিশিদিন
এ দেহ-ইন্ধনে নিতি প্রজ্বলিত হয়
সৃষ্টির অগ্নিতে সেই অপার বিস্ময়—
অচঞ্চল প্রেম মোর বাধাবন্ধহীন।
অকম্পিত রূপ তার জাগে শুধু মনে,
মুক্তির আনন্দ লাগি' অমৃত-স্বপনে।

বন্ধুতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

'একটি কথা উড়লো কোথা?'—শুধায় মেঘদূত।
বাতাস বলে, 'হাসুনোহানা হোক না যতো ক্ষীণ
একটু শ্বাস সুরভি হয়ে রয়েছে তাতে লীন।
আমি তো তারই খবর রাখি; কথা সে কোন ভূত?'
সেকথা শুনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো বিদ্যুৎ—
'জানো কে আসে?—প্রতীক্ষায় কাঁপছে লোক তিন;
একটি কথা গানের মতো বাজছে, নয় বীন।
একটি তারা প্রদীপ জেবলে আকাশ প্রস্তুত।'
সে-সংলাপ আড়াল থেকে শুনলো এ-আঁধার
ঝিঁঝিঁরা শুনে বাগানময় লাগালো হৈ চৈ—
পথের দীপ নিষ্পলক বলে—'প্রহর গণি।'
কে এলো ভেবে অবাক্ মানি; কে এলো কোথা, কই?
আসার সুরে অনেক দূরে কী এক আগমনী
শুনতে পেয়ে তাই তো আমি রেখেছি খুলে দ্বার।

গল্প পড়ি তেলেনাপোতাটার—
শেষটা দেখি, কেউ না, আসে মশকসুন্দরী।
সে বলে—'অভিসারের পথে তোমাকে নিতি স্মরি
এসো হে প্রিয়, আলিঙ্গন করি।'
মুক্তদ্বারে ঢোকেন ঘরে, স্ক্রিটের ভয় নেই—
এত যে প্রেম লেপ্‌টে গেলো একটি চড়েতেই।

শিকড়

আলোক সরকার

স্তূপীকৃত ইঁট-পাথরের অবহেলা। পরিশ্রান্ত কাণ্ডের উপর
শেওলা জমেছে। আর রক্তমাটি বিদীর্ণ ঘোষণা।
বলিষ্ঠ শিকড় যেন প্রতিজ্ঞার দীপ্ত। ম্লান সমস্ত প্রহর
একাগ্র ভাবনা, কোন হীরা-জ্বলা অন্ধকারে কীর্ণ সমারোহে
শিকড় নেমেছে? গ্রামে-গ্রামে এখন শরৎকাল
রৌদ্রের সম্পূর্ণে, নদী মূর্ত অঙ্গীকারে যায় ব'হে।

কোনোদিকে আলোড়ন নেই শান্ত হাওয়া এলো,
সবুজ পাতার অন্তরালে
পরিপূর্ণ ফলের প্রশান্ত স্বাভাবিক।
অন্ধকারে রক্তিম উৎসবে মূর্ত বিদ্যুতি বৈশাখ,
প্রতিষ্ঠ প্রবালে
একটি তন্ময় ধ্যান নির্নিমেষ। খড়ের চালের ন্যূব্জতার
স্বর্ণিল ধূসরে কোন অবসাদ, যেন অবসাদ যেন
সপ্রাণ অলীক
যেন প্রতিবিম্ব সব উচ্ছলতা হেমন্তআঁধার।

সপ্রতিভ একটি অস্তিত্ব গাঢ় জাগরণ,
দ্যুতিময় সবুজ স্ফুরিত
ডালপালা স্পর্ধিত একক।
প্রতিটি শাখার হীরা আকাশের প্রান্তে উপনীত।
কেবল দুইটি পাতা বিবর্ণ হলুদ, মাটির ভীষণ অস্বীকারে
কাকে খোঁজে? উৎসব মুখর গ্রাম শূন্যতায় স্নিগ্ধ অপলক
কাকে খোঁজে? ভাবনা নিমগ্ন,
মাটি তাপিত ইঙ্গিত জ্বলে লুপ্ত অধিকারে।

নয়নে নয়নে তুমি

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

স্নিগ্ধ কালো নয়নের আকুল আহ্বান
শেষ বিদায়ের ক্ষণে—অজানা জীবনে,
বিচিত্র করিয়া তোলে রঙীন স্বপনে;
অলক্ষে জীবনী-শক্তি করিছে প্রদান।
নূতন করিয়া একী ফিরে এলো জ্ঞান—
হেরি দীপ্ত-দিবজ্যোতি নিশীথ শয়নে,
অতল পরশে কাছে নিরালা গোপনে,
দিতেছে আঁধির আলো সুধার সন্ধান।

নীরব নয়নে হয় কত পরিচয়,
বলে যায় কত কথা দৃষ্টি আঁখিতারা।
নিখিল প্রিয়ার সাথে আঁখি বিনিময়,
অবিরল বহে তাই প্রেম অশ্রুধারা।

একী খেলা দৃষ্টি হানো নত আঁখি ঠারে,
প্রলয় খেলার হেরি লীলায় তোমারে।

শব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তখন দরজার বাইরে স্পষ্ট শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ,
শারীরিক মিলিত হবার আগে বাসনার
ভিতরে শিশুর হাসি—সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দু দিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহুলক্ষ
ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠহীন,
বারান্দায়
শার্ট প্যান্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে,
ডাকবাক্সে চিঠি দিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাসাকর শুয়ে আছি টেবিলে ধুলোয়,
এমনকি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে
হাসি, কান্না, ক্রোধ, পোকার মতন
খেলা করছে, টেলিপ্রিন্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট
মন্ত্রী, বন্যা থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে প্রতিনায়িকার কণ্ঠে
আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজাত শিশুর হাসি
এবং ঘড়ির
গূঢ় আলোচনা, দূরে ফুল ফোটার কলরব,
জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

জ্যোৎস্না নিতে গেলে তবু অন্ধকার নেই,
আঃ, শব্দ থেমে গেলে তবু অমোঘ গোলমাল
জেগে থাকে; হৃৎপিণ্ড ছিন্নকরা ভালোবাসা
ঘুমোতে পারে না কবিতায়,
স্বপ্নে, শোকে—কুমারী মেয়ের গন্ধে দূষিত বাতাস
চতুর্দিকে ঘোরে, প্রতি মানুষের মুখ ভাটফুলের মতন
অশ্লীল মনে হয়
আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই,
মাতৃজঠরের স্মৃতি নেই।

সে দিবি আঙুল

রাম বসু

সে দিব্য আঙুল করে করোটিকে উদ্ভিন্ন কুসুম,
সূর্য আর কুয়াশার পরিপূর্ণ ভরাট গলায়
শব্দ পায় অবয়ব। হৃদয়ের জ্বলন্ত নির্মম
চন্দন অরণ্যে শুভ্র আলোকিত কপোত ওড়ায়।

ভূমি যত রুক্ষ হোক, আবিষ্কৃত গেরুয়া চূড়ায়
টের পাই ঋতুরক্ত। অভিষিক্ত অঙ্গে ধীরে নামে
পুরুষ প্রগাঢ় দীপ্তি। অনুভবে, স্থাপত্য কায়ায়
ললিত কঠিন রাগ; সুসঙ্গতি দক্ষিণে ও বামে।

কাঁকর বৈদূর্যমণি। নষ্ট বীজ কবিকণ্ঠে শ্লোক
শ্মশান চাঁপায় কাল, দ্বীপগুলি আহত বিচ্ছিন্ন
চিতা তোলে সাদা পাল। বৈঠা, হাওয়া নাচায় আলোক।

ভালবাসা কুশবিদ্ধ ভালবাসা রক্তাক্ত দাক্ষিণ্য।

উৎসব পালন করি অশ্রু পূর্ণিত মাটির তিমিরে,
বৃক্ষ ফলবতী হলে নদী হলে অপরূপ পরী
মানুষের পতনের উৎস মুখে নীরন্ধ্র গভীরে।
ইচ্ছা হও শুশ্রূষার মত শান্ত বিবর্ণ সুন্দরী।

সে দিব্য আঙুল কটি মন্ত্রপূত আমাকে বাজায়
হিরণ্য আকাশ: নিচে অনুমান—কেন্দ্রস্থ বিশ্বের
মাঝখানে প্রবাহিত প্রাণ, শক্তি। সমবেদনায়
আমরা আকাশ হলে ঢেউগুলি হবে আমাদের।

আড়চোখে দেখি

অরবিন্দ গুহ

আড়চোখে দেখি মেঘের তলায়
পাকা রাস্তার দু-পাশে আলো:
ভালো লেগে গেল, ভীষণ ভালো।
কেউ কি দেখল আমার এ-দেখা মেঘের তলায়?
কারো কিছু দেখা না-দেখায়,
বলা না-বলায়,
কিছু এসে যায়?
যায় না, তবুও আড়চোখে ভালো।

কেউ কি শুনল আধফোটা স্বর আমার গলায়?
কারো কিছু শোনা-না-শোনায়,
বলা না-বলায়,
কিছু এসে যায়?
যায় না, তবুও চুপচাপ দেখি—আমার ইচ্ছে।
এখন অনেক পাচ্ছি—আমাকে অনেক দিচ্ছে
মেঘের উপরে করুণ তারা:
যদিও অনেক সঙ্গী, এখন সঙ্গীহারা—
একলা এখন উজ্জ্বল নীল মেঘে আসক্ত।
আড়চোখে দেখি তারার মাংসে মেঘের রক্ত॥

অবশ্য তোমাকে

মৃগাঙ্ক রায়

কেননা পৃথিবীতে প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়
তাই তোমার প্রেমে আমার প্রয়োজন।
বাড়ন্ত ছায়ার মাথায় মাথায় কাক
ডেকে ডেকে ওড়ে, কুকুরের নখর বাজে
ধূমল গলিতে; পাতাল, স্রোতস্বনিত
প্রভূত পাতালে পিছলে প'ড়ে যায় সূর্য।

কেননা সে স্বাদু অন্ধকারে সৃষ্টির ত্রিকোণ
গলে যায়; সব রূপ, বাড়ি জাহাজ জেটি
জানালার কাঁচে চৌকো আলো, গাছ গঞ্জ,
মানুষের অস্থি এবং মেদের সংস্থান—
সব গ'লে গ'লে গ'লে প্রকাণ্ড শূন্যতা
পিঠ ঠেকিয়ে থাকে আকাশে।

তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন
কেননা তুমি এক ব্যবহার্য অন্ধকার;
তোমাকে ললিত ক'রে প্রেম এবং ভোরের ত্রিকোণ॥

এই স্রোতে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শঙ্খমালা নদী আমার শিথান হোক, জল
শীতল-পাটি শয্যা রচে আমায় যদি ছুঁলো—
ঘিরলো আমায় কী অপরূপে নিবিড় কল্লোল,
যাক ধুয়ে এই স্রোতের মুখে সাত-রাজ্যের ধুলো।

দিক নেই: সাত-সাগর শোনায় বজ্র-বিষাণ ডাক
আমার জড়ায় হাসনসখী তেরো নদীর বাহু,
ঘাটে ঘাটে পেরিয়ে যাবো, অচিন দেশের বাঁক—
ভাসানো মান্দাসে আমার লখীন্দরের আয়ু।

নানান জলে গুজব রটায়, গায়ে হিটায় কালি,
তপ্ত দেহ জুড়িয়ে যাক, স্নিগ্ধ হোক মন,
স্রোতের ঘোড়ার কেশর ধরে বাজাই করতালি;
ও বেহুলা, তোমাকে দিই প্রথম যৌবন।

উজল হীরার ফুল ভেসে যায়, চাঁদের ঝালর দোলে
বাসর সাজে মীনকন্যার কোমল করপুটে,
সাঁতালি পর্বতের মারণ-মন্ত্র নেই এ জলে—
কুটিল-কালো কাল-নাগিনী মরুক মাথা কুটে।

এখন চতুর্দিকেই ঢেউয়ের ডম্বরু শোন্, ওরে!
জীবন জুড়ে নাচে আমার তরঙ্গ চঞ্চল,
জন্ম-মৃত্যু নাচে যুগল বুকের চূড়ার পরে
ও বেহুলা, তুমিই আমার কবচ-কুণ্ডল।

চৈত্র সন্ধ্যায়

বাণী রায়

সুদীর্ঘ চুম্বন এক করি অনুভব
আমার বঞ্চিত ওষ্ঠ-অধর সে ভরে;
শরীর পাগল করে,
মন সিক্ত প্রেমে,
সে চুম্বনে দিনে দিনে জাগে বসন্ত-উৎসব।

অদেহী চুম্বন এক চৈতালী সন্ধ্যায়
আকাশী জোয়ারে ভাসে নীলের সাগরে,
বৈশাখী রাত্রির রূপে আচম্বিতে ঝরে,
ফাল্গুন বাতাসে দোলে ঝাউএর শয্যায়।

প্রবাস হিমেল সিন্ধু পার হয়ে এল,
তাই কি পালঙ্কে তার শীতার্ত বেদনা?
উষ্ণ সূর্যের ঋতু জাগাক সান্ত্বনা,
সূর্যের প্রসাদ সে তো এতদিনে পেল!

বিরহবিধুর দিনে প্রণয়ভাবনা,
স্বপ্নের চুম্বনে আজ মিশে গলে' গেল।

এলসিনোরে ঝড়

কৃষ্ণ ধর

এলসিনোরের চূড়োয় সেদিন ভীষণ ঝড়
বিশ্বাস দোলায়িত, আকাশে জিজ্ঞাসা
অস্তিত্বে অনস্তিত্বে অসম্ভব দড়ি টানাটানি
বিপর্যস্ত চেতনা সেই ঝড়ে
মানুষের প্রকৃতি পায়চারি করে এলসিনোরে।

প্রশ্নের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ফেরে
আহত নেকড়ের মতো, প্রতিহিংসা তারে
দিনরাত্রি দগ্ধেছিল, প্রশ্নের অন্ধকারে
চমকিত মেঘের প্রাসাদে,
অলৌকিক কণ্ঠস্বর বাজে
কণ্ঠস্বর ডাকে জিঘাংসোরে।

সময় শিথিল গ্রন্থি, নড়বড়ে অস্তির সংকট
তাকে উন্মোচন করে
ধর্ষিত কুমারী রাত্রি ভোন্তা সূর্য আরক্তিম ভোরে
পায়ে হাঁটে ঝড়ে জলে এলসিনোরে আজ
এলসিনোরে।

বিদেহ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রথম পাপ করার মতো বিবেক এল মনে,
চক্ষু বুজে সেই নারীকে নিলাম আলিঙ্গনে;
সে কি হর্ষ, প্রাত্যহিক অপস্মারগুলি
পালিয়ে গেল পিলসুজের অঙ্গুলিহেলনে।

'আমায় তুমি অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী করো'
ব'লে আমি প্রথমে তার উরোগুঞ্জাহার
ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলাম জানালার বাহিরে:
কিন্তু তবু তার আনন্দ আকাশগঙ্গায়।

'নির্জন করো আমায় তোমার কালো চুলে'
বলতে গিয়ে অকস্মাৎ আমার স্বরলিপি
নিষাদ গুহায় অবরুদ্ধ; অনর্পিত তবু
বিস্ফারিত ইন্দুলেখা ব্যস্ত বাহুমূলে।

'আমার কাছে সূর্য আছে' কৃত্রিম শপথে
কাছে এনে দিলাম তাকে অন্তর্বেদনা,
তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না হংসনা,
অন্ত আকৃতি ছিল রক্তকোকনদে।

'তুমি আমায় এখনো কি নগ্ন কিশোর ভাবো?'
এই ব'লে যেই অস্নাত মুখ বিকীর্ণ আঙুলে
স্নান করালাম, সে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হলো
সুবিনীত গৃহদাহ সিতকঞ্চনাভ।

'কে তুমি? কমলে কামিনী? কার ঘরে বিদ্রোহ
সংঘটিত ক'রে এলে' এই ব'লে ফুৎকারি;
আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি
আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী।

তুমি আমার কবিতা

কবিতা সিংহ

ঈশ্বর! আমাকে তুমি যৌবন যাবার আগে দিও না মরণ
যদিও সামান্য এসে থেমে গেছে ক্ষীণ আয়ুরেখা
কে তবে, কে তবে আর এই সব রজনীর কালোমুক্তা
গুণে গুণে যাবে?
কে খুলবে, এ নির্জনে উপাধানে, চুলের-ঝরোকা—!

আর চুল কালোফুল অন্ধকারে আরো অন্ধকার
স্মৃতির আশ্চর্য দীপ জেবলে রাতে মণিমুক্তা গুনি
যুগল ভুরুর নীচে ঢাকা দুটি নীলকান্ত মণি!

নিরুপম বেদনায় বিনিদ্র রজনী যেন সিঁড়ি
শামুকের ভিতরের অপরূপ কারুকার্য হয়
ক্রমাগত নেমে যাই উঠে আসি সেই কালো গোলক-ধাঁধায়।

ঈশ্বর আয়ুর পাত্রে ঢেলে দাও নির্জলা-নির্জন
পান করি রাত' ভরে পান করি গায়ে বড় জ্বর
জ্বর বড় ভালো লাগে অনুপম স্বপ্নের মতন

ঈশ্বর আমাকে তুমি যৌবন যাবার আগে
দিও না মরণ!

সত্তা

তরুণ সান্যাল

ব্রেকের মতন বস্তুরহস্যের মধ্যে যেতে হবে,
প্রশান্তিকে ভৃত্য বলে অতএব মনে করা ভালো—
মুখ তার স্নিগ্ধ...শুচি, রীতি নিয়মানুগ উৎসবে
—যথাসময়ে অন্ধকার, ছায়া, শোক...জ্যোৎস্নাধারা,
অনেক গভীরে আরো বাস্তবের মধ্যে যেতে হবে,
যেখানে কেবল সত্তা ইঁট লোহা মেদ মাংস নয়
এমন কি পরমাণু, ইলেকট্রন নয়, কিন্তু রবে
যাকে ঘিরে অস্তিত্বের রূপময় ধ্বনিত তন্ময়।

যেমন সমুদ্র জাগে বালুবেলাভূমে অন্ধকারে,
যেমন লবণগন্ধে সাপের মাথার মণি, জল,
যেমন অরুণা রয় সজীব সবুজে অন্ধ তারে
প্রবল বাহুর টানে ছন্দোময় জটিল...সরল.....
অথবা তুহিন শুভ্রে মরুভূমি শীতলে.....বা বালু
দর্শায় সত্তার কেন্দ্রগামী অবতরণের ঢালু॥

আমলকী তলা

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

এমন বিরহ-ঘৃণা ঘৃণাবিরহের অর্থ হয়—
পৃথিবীতে কোনোদিন ভুলে যাওয়া হয়নি সৌরভ
অথবা বৃষ্টির দিন, আমলকীর বিস্তারিত বনে।
অথবা ভুলিনি মৃত্যু ঝাঁট দেয় আমলকীর তলা!

সেই আমলকীগুলি, রাখা আছে গোপনে আমার;
মনে নেই কুড়ায়েছি অথবা আমারে কুড়ায়েছে
ঐসব আমলকী; মনেরও তো গোপনতা আছে?
মন বড় পক্ষপাতদুষ্ট, কিন্তু আত্মসাবধানী!

ভালোবেসে সুখ ছিলো, ভালোবেসে দুঃখ কি ছিলো না?
মহিলা বাসিবে ভালো, আমিও তো বাসিব তাহারে
ভালোমন্দ কোনো এক? নতুবা, হে বিষমানুপাতী
বিরহ, তোমারে এসে তুচ্ছতাই শ্মশানে সাজাবে।
মহিলা বাসিল বলে ভেসে গেলে? ফিরে চাহিলে না?
পরস্পর ক'রে আছো অধিকার এই অনুভবে।

অদ্ভুত মুখোশ মুখে

মণীন্দ্র রায়

অদ্ভুত মুখোশযুখে কেঁপে ওঠে মন।
শাণিত বল্লম হাতে ও কে
আততায়ী আক্রমণে নিঃশব্দে ধাবিত!
আমি তার প্রকৃতি কি মুখের গড়ন
জানি না, হিংসায় তনু মত্ত।

এবং বিচিত্র আরো, যে মুহূর্তে আমি
বুঝেছি প্রাণের মূলো—নিহিত জিজ্ঞাসা
ক্ষরিত রক্তের চেয়ে দামী,
তখনি মুখোশ খুলে সেই হন্তারক
দেখাল, কী প্রগাঢ় তামাশা

জীবনের পর্বে পর্বে সশস্ত্রে লিখিত।
যখনি জ্বালার দিন নিভে আসে, আমি
নিজে বধ্য এবং জহ্লাদ।
মৃত্যুর নরকে নেমে শুদ্ধ, স্বয়ংবৃত,
মুছে ফেলি প্রাচীনা বিষাদ॥

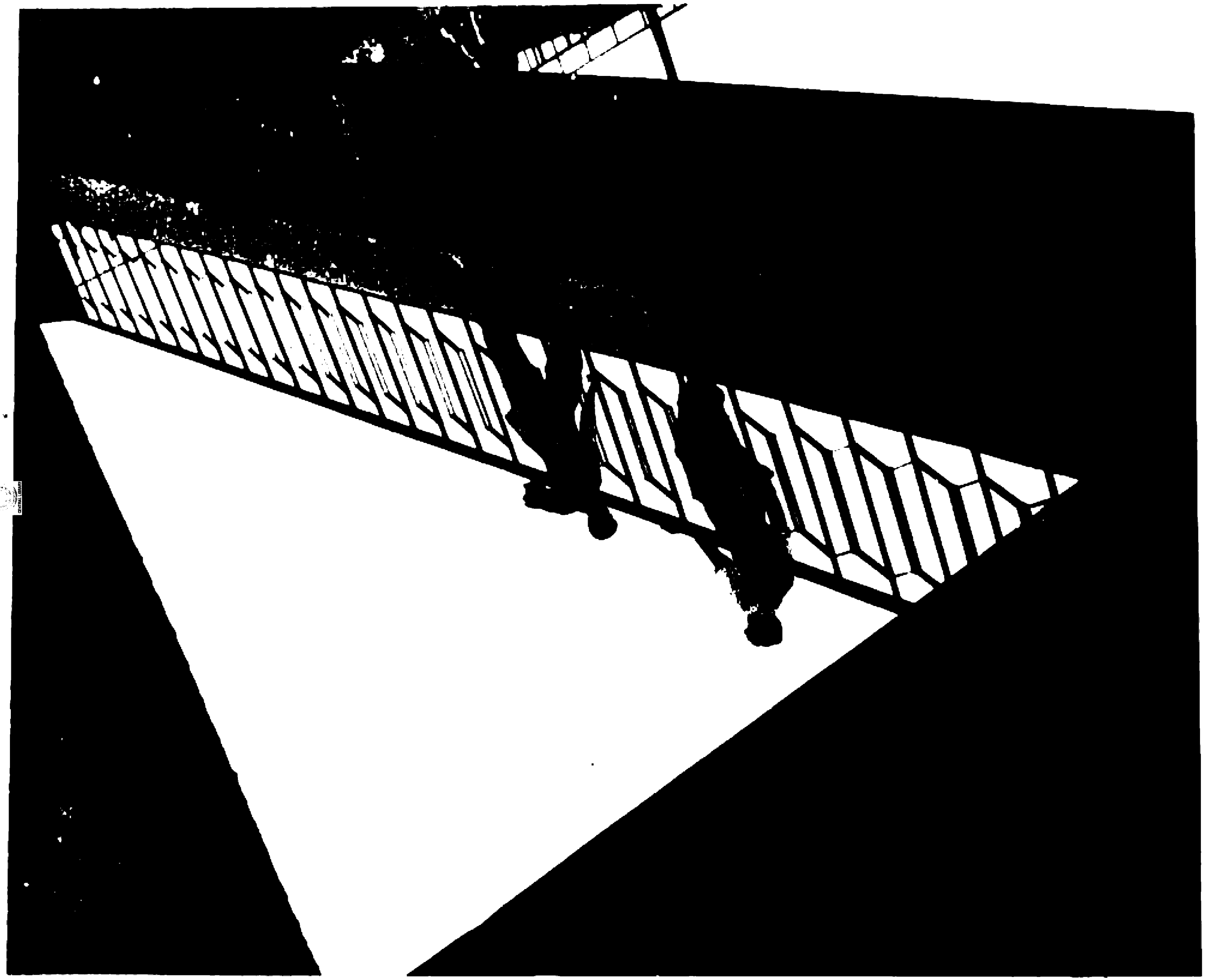

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

কাজের ফাঁকে

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৪৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ● ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

CENTRAL LIBRARY

বসুন্ধরা

(উপন্যাস)

গ্রামের গল্প আপনারা শুনতে চান না। কিন্তু গ্রামের গল্পই আমি আপনাদের শোনাবো। কারণ গ্রাম ছাড়া আমি কিছু জানি না।

বর্ধমান জেলার কুলটিকরি গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ওই যে দেখছেন রূপাই নদী—শান্ত শিষ্ট ছোট্ট নদীটি—শুধু বর্ষার সময় ওর চেহারা যায় বদলে। শুনেছি নাকি ছোটনাগপুরের পাহাড়-ধোয়া জল যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই রূপাই-এর বুকে। গেরুয়া রং-এর ঘোলাটে জল হুড় হুড় করে বয়ে যায় ওর দুকূল ছাপিয়ে।

এই নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মুখে ছিল বিঘে-দশেক জমি। জমিতে ফসল ফলতো প্রচুর।

তাই বোধ হয় ওই জমিটার নাম ছিল—বসুন্ধরা।

মাটির এমন চমৎকার নাম কে যে কখন রেখেছিল তার হদিস মেলা ভার।

কিন্তু এই নামের সঙ্গে আমাদের গল্পের একটু সম্বন্ধ আছে, তাই আমার এত কথা বলা।

এই জমির মালিক ছিল কুলটিকরি গ্রামের আনন্দ হালদার।

আর সেই আনন্দ হালদারের স্ত্রী কাজল-বৌ এই জমির নামে নাম রেখে বসলো তার ছোট মেয়েটার।

নাম রাখলো বসুন্ধরা।

আনন্দ হালদার বলেছিল, করলে কি কাজল-বৌ, মেয়েটার বসুন্ধরা নাম রাখা উচিত হলো না।

কেন?

বসুন্ধরার মত ফলবতী হয়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথাও দু' চারটে কইতে হয়েছিল বই-কি!

—কি গো, কেমন যাত্রা শুনলে?

বাসন্তী এসেছিল আসন পেতে আনন্দের খাবার ঠাঁই করে দিতে। কথাটার জবাব দেয়নি বাসন্তী। চোখ তুলে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে, গায়ের কাপড়টা টানতে টানতে চলে গিয়েছিল সে।

দুরাত্রি যাত্রা হয়ে গেছে শ্বশুর বাড়ীর কাছেই। কাল রাত্রে বাসন্তী গিয়েছিল যাত্রা শুনতে। অর্জুন সেজেছিল আনন্দ। আর সুভদ্রা সেজেছিল মেয়ে-মেয়ে চেহারার একটি ছেলে। সুভদ্রাকে তার ভাল লাগেনি।

ভাতের থালা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো বাসন্তী।

আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করলে, যাত্রা কেমন শুনলে কই বললে না তো?

বলতে হলে তার মুখের দিকে তাকাতে হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক সে। তাকাতে লজ্জা লজ্জা করে। বাসন্তী তবু বললে—

—এ-মা, ওই কি তোমাদের সুভদ্রা নাকি?

আনন্দ হেসেছিল বাসন্তীর কথা শুনে। বলেছিল, তা তোমার মত সুভদ্রা পাব কোথায় বল!

রীতিমত হেঁচকি তুলে বাসন্তী বলেছিল, আ-মর, মুখপোড়া!

বলেই সে ছুটে পালিয়েছিল সেখান থেকে। গিয়েই বলেছিল বাড়ীর গিন্নিকে। বলেছিল, মামী, আমি আর যাব না ওখানে। এবার যেতে হয় তুমি যাও।

কি বললি? আমি যাব? শোনো গো শোনো—মেয়ের কথা শোনো!

গিন্নি জানিয়ে দিলে বাড়ীর কর্তাকে। উঠোনের পেয়ারাতলায় খাটিয়া বিছিয়ে বাড়ীর কর্তা তামাক টানছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কি বলছে?

বলছে, তুমি যাও ওই যাত্রার দলের লোকটার কাছে।

কেন?

কেন তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর না।

মামা কিন্তু বাসন্তীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। 'দুর্গোহি' বলে গিয়ে দাঁড়ালেন আনন্দ হালদারের কাছে।

আনন্দ তখন খেতে বসেছে। মুখ তুলে বললে, আসুন।

যেরকম ভেবে গিয়েছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাঁধাবেন। কিন্তু কিছুই তিনি করলেন না। খাটের ওপর ভাল করে চেপে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, খাচ্ছো কেমন?

ভাল।

রান্না কেমন?

খুব ভাল।

মামা বললেন, সব রান্না করেছে ওই মেয়েটা।

কোন্ মেয়েটা?

আনন্দ মুখ তুলে তাকালে একবার।

মামা হাসলেন। হাসিটা কেমন যেন বাঁকা হাসি। বললেন, ছলনা করছো কেন? জানো তো সবই। আচ্ছা, খেয়ে নাও, তারপর বলছি।

ভাল করে খাওয়া আর হলো না আনন্দ হালদারের। পুকুরের ঘাটে আঁচিয়ে এসে বসলো মামার পাশে। বসেই বললে, নিন, কি বলছেন বলুন।

মামা বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

কুলটিকুরি।

আমাদের এই কুলটিকুরি?

আনন্দে মামার কালো মুখখানা যেন আরও কালো হয়ে গেল। এখান থেকে হাঁটাপথে ছ' সাত ক্রোশ দূরে কুলটিকুরি গ্রাম। এত কাছে যে অর্জুন সাজবার মত এত বড় একজন অভিনেতা থাকতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না।

ভাল, ভাল। পৈতে রয়েছে যখন বামুন তো নিশ্চয়ই। তা বিয়ে-থা হয়েছে তো? ছেলেপুলে ক'টি?

আনন্দ বললে, বিয়েই করিনি আমি।

কেন?

আনন্দ হেসে বললে, সে-সব কথা আর নাই-বা শুনলেন!

তবু শুনিই না!

এই যেমন ধরুন আপনি, দরদ দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এরকম কেউ নেই যে আমার। মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আমি একা। বিয়ে আমায় দেবে কে?

মামা কি যেন ভাবলেন। ভেবে বললেন, খাবার ব্যবস্থা আছে বাড়ীতে?

তা আছে। বাড়ী আছে, কিছু জমিজমা আছে। বেশ আছি মনের আনন্দে, খাইদাই ঘুরে বেড়াই—

মামা বললেন, না, তা চলবে না।

কী চলবে না?

এই রকম বাউণ্ডুলের মত বাজার দলে দলে ঘুরে বেড়ানো চলবে না।

কি করতে হবে?

বিয়ে করতে হবে।

বাস, হয়ে গেল আনন্দ হালদারের বিয়ে।

যাত্রার দলে বক্তৃতা করতে গিয়ে গাঁয়ে ফিরলো বৌ নিয়ে। বেশ ডাগর-ডোগর সুন্দরী বৌ। যেমন সুন্দর গড়ন তার তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি যৌবন। কানে দুটি দুল ছাড়া সোনার নামগন্ধ নেই সারা গায়ে। মাথায় এক-মাথা ভোমরা-কালো চুল, আর টানা-টানা কাজল-পরা দুটি চোখ।

বিয়ের কনের সেই কাজল-পরা চোখ দেখেই তার নাম হয়ে গেল কাজল-বৌ। কেউ আর তাকে বাসন্তী বলে ডাকলে না।

বৌ ছিল না তো ছিল না, নিজেই রাঁধতো-বাড়তো খেতো, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো, বেশ ছিল আনন্দ হালদার। কিন্তু এখন আর সে বাড়ী থেকে বেরোতে চায় না। যাত্রা-পার্টি ভাঙলে বুঝি সে টাকা পায় না বলে যেতে চাচ্ছে না। রীতিমত টাকা কবুল করলে তারা। গা-হাত-পা টিপে দেবার জন্যে একজন চাকর দেবে বললে, আর দেবে ফার্স্ট-ক্লাস 'অনার'। সপ্তাহে একদিন মাংস আর রাত্রে দেবে লুচি। তবু যেতে চাইলে না আনন্দ হালদার।

সবাই বললে, বাট্টা বৌ-পাগ্‌লা হয়ে গেছে।

কিন্তু না, বৌ-পাগ্‌লা সে হয়নি।

দু'জনেরই শরীরে মনে তখন যৌবনের মাদকতা। কাজল-বৌকে তখনও সে ঠিক চিনতে পারছিল না।

অসম্ভব মুখরা এই কাজল-বৌ।

মুখরা, কিন্তু ভুলেও কোনোদিন একটা মিথ্যা কথা বলে না।

আনন্দ একদিন বলেছিল, তুমি এমন টাকৃ টাকৃ করে কথা বল, অথচ তোমার মামার কথা তো বেশ মিষ্টি মিষ্টি।

কাজল-বৌ বলেছিল, ও আমার নিজের মামা নাকি?

কই, সে-কথা তো উনি আমাকে বলেননি!

বলতে হলে যে অনেক কথা বলতে হয়।

এই বলে সেই অনেক কথার সব কথা-গুলোই কাজল-বৌ বলেছিল আনন্দ হালদারকে।

প্রথমে বলেছিল, নাই-বা শুনলে সে-সব কথা।

না, আমি শুনবো।

কথাগুলো কিন্তু ভাল নয়।

আনন্দের জেদ গেল চড়ে।—তাহলে তো শুনতেই হবে।

কাজল-বৌ বললে, আচ্ছা বিপদে

পড়লাম তো দেখছি। কথা বলাও জ্বালা, না বলাও জ্বালা! স্বামীকে সবাই নাকি দেবতা বলে। না বললেও পাপ হবে। শোনো তবে। শুনে যদি মন খারাপ করেছ তো তোমারই এক-দিন কি আমারই একদিন!

হেসে হেসে আনন্দ বললে, না না, মন খারাপ করব না। তুমি বল।

কাজল-বৌ বললে, আমার বাবা আর মা—বিয়ের আগেই প্রেমে পড়ে-ছিল। দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল পূব-বাংলার কোথাকার কোন্ এক গাঁ থেকে।

তোমরা তাহ'লে বাঙাল?—আনন্দ বলেছিল, তাতে কি হয়েছে? এর জন্যে মন খারাপ করব কেন?

আরে বাবা দাঁড়াও, কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও আগে। আমার বাবা বামুন, মা কায়েত। আর শুনবে?

কথাটা শুনে মাথাটা চম্ করে ঘুরে গিয়েছিল পাড়াগাঁয়ের ছেলে—গোঁড়া সংস্কারাবদ্ধ আনন্দ হালদারের। দাঁত দিয়ে জিব কেটে বলেছিল, ছি ছি, তুমি আমার জাত মেরে দিলে!

তুমিই জানলে শুধু, আর কেউ জানে না সে-কথা।

আনন্দকে শুধু চুপ করে থাকতে দেখে কাজল-বৌ বলেছিল, কি ভাবছো? ছেড়ে দেবে আমাকে?

আনন্দ মুখ তুলে তাকিয়েছিল কাজল-বৌএর দিকে। এই রূপ, এই যৌবন! না না, ছেড়ে দেবার কথা ভাবতেই পারে না।

আরও শুনতে চাও?

আরও আছে নাকি?

আছে বই-কি! নইলে তোমার হাতে পড়বো কেন?

ধপ্ করে জ্বলে উঠলো আনন্দ!—আমার হাতে—মানে খুব খারাপ হাতে পড়েছ নাকি?

না, হাত খারাপ নয়, তবে মনটা খারাপ। ঘর-বসা মন নয়। উড়ু-উড়ু ভাব। উড়তে পারছো না শুধু আমার জন্যে।

আনন্দ ঠান্ডা হলো। বললে, ঠিক বলেছ। এইবার বল তোমার আরও কি ব্যাপার আছে।

আমার ব্যাপার নয়।—কাজল-বৌ বললে, আমি আমার মা-বাপের কথা বলছি। আমার মার হাতে ছিল টাকা, আমার বাবার মাথায় ছিল বিদ্যে। বাবা ইস্কুলে ইস্কুলে হেড-মাস্টারী করে করে বেড়াতো। একজায়গায় বেশিদিন থাকতো না কিছুতেই। কেন থাকে না তখন কি আর জানতাম কিছু! জান-লাম—বাবা যখন ধরা পড়ে গেল।

ধরা পড়ে গেল?

হ্যাঁ, ওই যে-গাঁয়ে তোমার বিয়ে হলো ওখানকার ইস্কুলে বাবার তখন পাঁচ বছরের চাকরি। এক নাগাড়ে পাঁচ বছর আমরা কোথাও থাকিনি। বাবার তখন বয়েস হয়ে গিয়েছিল, আর চারদিকে খুব নাম-ডাক! এই সুখ্যাতিটাই দিলে বাবার সর্বনাশ করে। বাবা ধরা পড়লো—তার এক বি-এ বি-টি বন্ধুর নাম-ধাম ভাঁড়িয়ে বাবা নাকি কুড়ি বছর মাস্টারী করে আসছে, অথচ আমার বাবা আসলে নাকি ম্যাট্রিক পাশ।

আনন্দ বলে উঠলো, সে তো তোমার বাবার বাহাদুরী বলতে হবে!

হ্যাঁ, সেই বাহাদুরীর পুরস্কার বাবা পেলে। একটি বন্ধুর মামলা চলবার পর বাবার হলো আট বছর জেল।

তোমার বাবা কি এখনও জেল খাটছে?

না। ছ' মাস পরে বাবা জেল-খানাতেই মারা গেছে। মার তখন খুব অসুখ। ওই যে আমার মামা, উনিই দেখাশোনা করতেন, নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন আমাদের, মামলা-মোকর্দমা তদ্বির করেছিলেন উনিই। মাকে দিদি বলে ডাকতেন।

আনন্দ বললে, ওঁকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম—মানুষটা ভাল।

হ্যাঁ ভাল বই-কি! এ-যুগের উপযুক্ত মানুষ। উনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন—মার হাতে টাকা আছে। মামলার তদ্বির করতে গিয়ে দশ-পনেরো হাজার টাকাকে একেবারে তিন হাজার টাকায় এনে ফেললেন। সেই তিন হাজার টাকা আর এই আমার মতন ধাড়ী আইবুড়ো মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মা আমার মারা গেলেন ওঁরই বাড়ীতে।

সে কি কথা?—আনন্দ একটু অবাক হয়ে গেল। তোমার মার গয়না-গাঁটিও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু বিয়ের সময় কিছু তো দিলে না!

কাজল-বৌ বললে, দেবার জন্যে তো নেয়নি।

RAKHALDASS MULLICK & CO.
Leading Iron Merchant - Registered
Tata, Iisco & Hindusthan Steel Dealers.
D/14, Jagannath Ghat (Lohaputty), Calcutta-7
331685 ● Telephone ● 672225

Reputed over 69 Years
N. BANDURI & BROS.
Pioneer Mfgrs. of Bolts, Nuts, Rivets etc.
Govt. & Rly. Contractors ● General Order Suppliers.
WORK & OFFICE
33, Mohendra Bhattacherjee Road, Santragachi Howrah.
CITY OFFICE
71A, Netaji Subhash Road. Calcutta-1. Room No. B/23.
67-2068 TELEPHONE 22-7377

আনন্দ বললে, তুমিও তো কিছু বললে না তখন?

কাজল একটু হাসলে কাজলবৌ। বললে, বলবার না আনন্দকে পাবার আনন্দে। ওখান থেকে পালিয়ে আসবার সুখে।

সেই সুখে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কাজল-বৌ-এর একটি মেয়ে হলো।

মেয়ের বচন যাতে মিষ্টি হয় তাই তার নাম রাখলে—সুবচনী।

তার পরের বছর আবার একটা মেয়ে।

তার পর আবার।

এবার কাজল-বৌ বিদ্রোহ করলে। বললে, তোমার বসুন্ধরার জমির ফসলে আর চলবে না। এবার বেরোও তুমি বাড়ী থেকে। চাকরি-বাকরি একটা দাখো কোথাও।

আনন্দ বললে, আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও চাকরি করেনি। গোলামী আমি করতে পারব না।

বেশ তবে ব্যবসার দলেই যাও।

সে বল্লটা উঠে গেছে। যেতে হলে কলকাতায় যেতে হয়।

তাই যাও। আমি আর তোমাকে বাড়ীতে থাকতে দেবো না।

সত্যিই দিলে না থাকতে। কাজল-বৌ-এর কথার জ্বালায় আনন্দ হালদারকে বেরোতে হলো।

কলকাতায় দলে পাত্তা পাওয়া সহজ নয়।

আনন্দ যায় আর ফিরে আসে, আবার যায় আবার ফিরে আসে।

ঘরের সুখ পেয়েছে আনন্দ। বাইরে এসে তার মন বসছে না।

কাজল-বৌ বলে, এ কী হলো বল তো তোমার? আগে ভেবেছিলাম বাড়ী থেকে বেরোলে আর তুমি বাড়ী ঢুকবে না, এখন দেখছি,—ঠিক তার উল্টো।

আনন্দ বলে, এমন তো ছিলাম না আমি। তুমিই তো করেছ।

আমার দোষ দিও না বলছি। আমি কিছু করিনি।

করতে বাকি কি রেখেছো? জলের জাত পর্যন্ত মেরে দিয়েছ।

কাজল-বৌ বলে, তাতে তোমার তো কিছু আটকাচ্ছে না। আমারই ভয়ে বুক দুর-দুর করছে।

ছেলেমেয়ের ভয়ে মেয়েদের বুক দুর দুর করে এই তো আমি প্রথম শুনছি।

থাক আর শুনে কাজ নেই। কাজল-বৌ বলে, এখন তুমি বাড়ী থেকে বেরুলে বাঁচি।

নিবারণ শুধু সেই এক কথা! বেরোও, আর দূর হও! এমন করলে মানুষ আর কাঁহাতক বাড়ীতে থাকে।

এবার সত্যি-সত্যিই রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেল আনন্দ। দুটি বছর আর বাড়ীমুখো হলো না। প্রথম প্রথম দু'তিনখানা চিঠি লিখেছিল, তিরিশটে টাকা পাঠিয়েছিল, তারপর আর চিঠিপত্র খবরাখবর না দিয়ে কাজল-বৌকে অনেক ভাবনা ভাবিয়ে অনেক কান্না কাঁদিয়ে আনন্দ হালদার বাড়ী যখন এলো, দেখলে ছোট মেয়েদুটো মরে গেছে। বড় মেয়ে সুবচনী শুধু ফন্ ফন্ করে দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে।

কাজল-বৌ এবার আর তাকে কিছু বললে না। মেয়েদুটোর শোকে কাঁদলে খানিকটা। তারপর বললে, ধনি মানুষ যা হোক্।

আসুকারা পেয়ে গেল আনন্দ হালদার।

এবার কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল সে।

মনে হলো যেন তার সেই আগের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে।

আবার আর একটি মেয়ে হলো কাজল-বৌএর।

এই মেয়েটির নাম রাখলো সে—'বসুন্ধরা'।

কাজল-বৌ এবার আর তাকে বেতে বলেনি। কিন্তু কি জানি কেন, আনন্দ নিজেই একদিন বলে বসলো, আমি চললাম।

তারপর বছরের পর বছর পেরিয়েছে, আনন্দ হালদার মরেছে কি বেঁচে আছে তার কোনও সন্ধান নেই।

কাজল-বৌএর দু'পাশে দুটো মেয়ে। সুবচনী আর বসুন্ধরা। দুটোই দেখতে ভাল। দুটোই সুন্দরী।

ছোটটাও আজকাল ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরছে। বড়টার বিয়ে তো আজ দিলেও হয়, কাল দিলেও হয়।

বসুন্ধরা জমিটুকুর ফসলে আর কতদিন চলে?

তবু ভগবান রক্ষা করেছেন—তিন-জনেরই অটুট স্বাস্থ্য। মাও যেমন, মেয়ে দুটোও তেমনি।

মা যদি-বা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এর-ওর বাড়ী কাজকর্ম করে বেড়ায়, মেয়েদুটোকে বাড়ীর বার করতে ভরসা হয় না। সংসারের দুঃখ-ধান্ধার বড়টা একটুখানি লড়কচা মেরে গেছে সত্যিই, কিন্তু বসুন্ধরা একে-বারে আগুনের মত। যেমন গায়ের রং তার তেমনি সুন্দর চেহারা।

কাজল-বৌ বলে, এর ওর বাড়ী টং টং করে ঘুরে বেড়াস না মা, কে কোন্‌দিন কি কথা বলে বসবে, সহ্য করতে পারব না।

সুবচনী বলে, বলুক না, কই দেখি কেমন বাহাদুর! লাথি মেরে মুখ তার ভেঙ্গে দেবো না!

বসুন্ধরা খিল্ খিল্ করে হাসে আর বলে, আমি কিন্তু চললুম মা বাবুদের বাড়ী, আমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সুবচনী বলে, ওই দাখো মা, তোমার আদরিণী কন্যা চললো বাবুদের বাড়ী। ওদের তিন বৌএর তিনটে ছেলেকে কোলে পিঠে নিয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াবে সারাদিন।

যাক্‌গে মরুক্‌গে আর পারি না আমি।

সুবচনীকে একটা ভেংচি কেটে দিয়ে বসুন্ধরা পালিয়ে যায়।

দেখলে মা?

সুবচনী তার মায়ের কাছে গিয়ে বলে, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মা, তুমি ভাবো তোমার এই বসুন্ধরার জন্যে।

আমি ভাববো?

কাজল-বৌ তার বড় বড় চোখ-দুটি তুলে বলে, আমি যদি আজ মরে যাই, তুই ওর বড় দিদি—তোকেই তো ওর কথা ভাবতে হবে।

বেশ তাহ'লে আমাকে কিছু বোলো না। কাল থেকে মায়ের চোটে আমি ওর বাবুদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দেবো।

এইবার কাজল-বৌএর চোখদুটি জলে ভরে আসে।

পারবি মারতে? ওর গায়ে হাত তুলতে তোর কষ্ট হবে না?

তাই বলে বাবুদের বাড়ী ও ঝিয়ের কাজ করবে? ওদের ছেলে কয়ে ঘুরে বেড়াবে?

ছেলে কয়ে বেড়াতে ও ভালবাসে।

পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো কাজল-বৌএর।

ওর নাম যখন রাখলাম বসুন্ধরা, তোর বাবা তখন বলেছিল—বসুন্ধরা নাম রেখে খুব ভুল করলে কাজল-বৌ, দেখবে ও বসুন্ধরার মত ফলবতী হবে। ছেলেতে-মেয়েতে ঘর ওর ভরে যাবে।

তা বিশ্বাস নেই মা, পাড়ার বাচ্চা-গুলো বসুন্ধরাকে একবার দেখলে হয়, ছুটে ওর কোলে গিয়ে উঠতে চায়।

কাজল-বৌ বলে, দাঁড়া আগে বিয়ে দিই, তারপর ছেলে! ওর বিয়ে না হয়

দুদিন পরে নিজেও চলবে, এখন তোর বিয়ে কেমন করে দেবো তাই ভাবছি।

ভাবতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না কাজল-বৌকে।

বর্ষাকাল। অবশ্য বর্ষা বলে মনেই হয় না। চারিদিকে কাঠ-ফাটা রোদে মাঠের মাটি একেবারে শুকিয়ে গেছে। দিনের মধ্যে বার দুইতিন শুধু আকাশ অন্ধকার করে মেঘ উঠছে, ঝিপ্ ঝিপ্ করে একটুখানি বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর আবার যে-কে সেই!

এমন দিনে আমাদের আনন্দ হালদার এলো একজন ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। বললে, সুবচনীর বর নিয়ে এসেছি দাখো।

কাজল-বৌ বললে, দাঁড়াও আগে তোমাকে দেখি।

তা দেখবার মত চেহারা নিয়ে এসেছে বটে আনন্দ হালদার। চট করে দেখে আর তাকে চেনবার উপায় নেই। মুখে একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, মাথার চুল নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত। পরনে গেরুয়া রঙের ধুতি পাঞ্জাবি।

তা সন্ন্যেসী হলে কবে থেকে?

আনন্দ বললে, ঘরছাড়া করে তুমিই তো আমাকে সন্ন্যেসী করে দিয়েছ।

তা বেশ করেছি। চিঠিপত্তও তো এক-আধখানা লিখতে হয়!

সন্ন্যেসীদের চিঠিপত্র লিখতে নেই।

ঢং দাখো! তাহলে এলে কেন?

আনন্দ বললে, সুবচনী বড় হয়েছে। বিয়ে দিতে হবে না?

এত ভাবো তুমি আমার জন্যে?

ভাবি বলেই তো পাত্রটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

কাজল-বৌ পাত্রটিকে তখন দেখে নিয়েছে। তা মন্দ নয়। দেখতে শুনতে ভালই।

কিন্তু হ্যাগা, ছেলেটির যে একটি চোখ কানা!

আনন্দ বললে, দু'চোখওলা ছেলের দাম অনেক।

কাজল-বৌএর কেমন যেন সন্দেহ হলো। খাওয়াদাওয়ার পর একটু নিরিবিলি হয়ে কাজল-বৌ একটু হেসে বললে, আমি তো জানি তুমি কত বড় সন্ন্যেসী! এখন সত্যি করে বল তো স্বামীজি, ব্যাপারটা কি! তুমি কিছু খেয়েছ নাকি ছোঁড়াটার কাছ থেকে?

আনন্দ বললে, সত্যি বলছি টাকা-কড়ি কিছু খাইনি, তবে দু'বেলা ভাত খেয়েছি ওর বাড়ীতে।

ভাত খেতে দোষ নেই। এখন বল কি হয়েছে।

আনন্দ তখন বললে সব কথা খুলে। বললে—

সন্ন্যাসী-মানুষ, বিনা টিকিটে ট্রেণে চড়ে সারা ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন হরিদ্বার থেকে আসছিল কলকাতার দিকে। ইচ্ছে ছিল, দক্ষিণেশ্বরে যাবে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া তার সম্ভব হলো না। শ্রীরামপুরের কাছাকাছি ছোট্ট একটি ষ্টেশনে টিকিট-চেকার তাকে নামিয়ে দিলে গাড়ী থেকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কোথায়-বা যাবে। ষ্টেশন-ঘরের একপাশে কম্বল বিছিয়ে চুপ করে বসেছিল আনন্দ। এমন সময় এই ছোকরাটি এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোথায় যাবেন স্বামীজি?

আনন্দ বললে, যাচ্ছিলাম একবার দক্ষিণেশ্বরে। মাকে দর্শন করতে।

রাতটা কি এইখানেই কাটাবেন ভেবেছেন?

তাছাড়া আর উপায় কি বল!

রাতে কি খাবেন আপনি?

কিছু না। এমনিই কাটিয়ে দেবো। এর পরে কখন ট্রেণ পাব বাবা?

ছেলেটি বললে, সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি কাল সকালে যান।

তাই যাব।

আনন্দ শুয়ে পড়ছিল, ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বাঙ্গালী?

হ্যাঁ বাবা, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বর্ধমান জেলায় আমার বাড়ী। আমার নাম আনন্দ হালদার।

তাহলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়ীতে চলুন। কাছেই আমার বাড়ী। কাল সকালে আপনাকে আমি ট্রেণে তুলে দেবো।

আনন্দ গিয়েছিল তার বাড়ীতে। ইটের তৈরি ছোট্ট একখানি মাত্র ঘর। পাশেই একটুখানি রান্নার জায়গা। সুমুখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠোন। উঠোনে নানা রকমের গাছ। চারিদিকে রাশিকৃত গাছের বেড়া। ছোকরাটির সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম খুলন চক্রবর্তী। সেও ব্রাহ্মণ। ইস্টিশানের পাশে ভীমাশলী রাইস মিলের ম্যানেজার সে।

আনন্দকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে মহা সমাদরে বসিয়েছিল খুলন চক্রবর্তী।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, বাড়ীতে তোমার আর-কাউকে দেখছিনে কেন বাবা?

হাতজোড় করে খুলন বসেছিল আনন্দ হালদারের সামনে। গড় হয়ে একটি প্রণাম করে বলেছিল, আপনারা সাধু-সন্ন্যেসী মানুষ, আপনারা তো সবই বুঝতে পারেন বাবা। আমার হাতটা দেখে কই বলুন দেখি—আমার বংশরক্ষা হবে?

এই বলে সে তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিল আনন্দ হালদারের সুমুখে।

একটুখানি চুপ করে থেকে খুলন

আনন্দ উৎসবে
কোহেড়ের
প্রসাধন সামগ্রী

লক্ষ্মী জুয়েলার্স
৮৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (মেডিকেল কলেজ) কলিকাতা-৪

চক্কোত্তির মুখের দিকে তাকিয়েছিল আনন্দ।

তবে কি এইজন্যই তাকে সে ডেকে আনলে বাড়ীতে? চুলদাড়ি আর সাধু-সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া রঙের কাপড়জামা দেখেই বোধকরি তার ধারণা হয়েছিল—আনন্দ বুঝি একজন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি।

আনন্দ বলেছিল, হাত দেখতে তো আমি জানি না ঝুলন, কিন্তু তোমার এত বংশরক্ষার তাগিদ কেন?

কথাটায় ঠিক জবাব দিতে পারেনি ঝুলন। ভিখা হয়ত এত বড় চুল-দাড়িওলা একজন স্বামীজির সামনে কথাটা বলতে তার লজ্জা হয়েছিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, বিষয়-সম্পত্তি কি তোমার খুব বেশি আছে—যার জন্যে তুমি একজন উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চাও?

অত-সব ভাবেনি ঝুলন চক্কোত্তি। ধানের জমি কিছু আছে আর আছে এই এতখানা জায়গা জুড়ে তার ভদ্রাসন। গ্রামটা ধীরে-ধীরে শহর হয়ে উঠছে। জায়গা-জমির দাম বাড়ছে। তার ওপর আছে ওই উমাশশী রাইস্ মিলের চাকরি। ঘরে বসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়।

আর এই যে একটি চোখ তার নেই দেখছেন, ওতে তার আটকায় না কিছু। উমাশশী রাইস্ মিলের ধান-চালের হিসেব, কুলি-কামিনের হাজিরি—সবই সে তার এই একটি চোখ দিয়েই নিখুঁত চালিয়ে দেয়।

আনন্দ বললে, বিয়ে তাহলে তুমি একটি করতে চাও?

হ্যাঁ স্বামীজি, দু' দুটো বিয়ে করে-ছিলাম। পট্ পট্ করে বছর ঘুরতে না ঘুরতে দুটোই মরে গেল। তারপর এই দেখুন না—

নিজে উনোন ধরিয়ে, জল তুলে, বাট্না বেঁটে নিজেই রান্না করে খাওয়া!

সুতরাং আনন্দ বুঝলে—ঝুলনের একটি বৌ দরকার।

দু'জনের জন্যে উনোনে ভাত চাপিয়ে দিয়ে ঝুলন আবার এসে বসেছিল আনন্দর কাছে।

পয়সা চাই না কড়ি চাই না, শুধু চাই একটি মেয়ে। আর পয়সা আমাকে দেবেই-বা কে? দিতে চায় না শুধু এই চোখটার জন্যে।

তা এটা আমার রোগ-ব্যাধি কিছু নয়। জন্ম থেকেই এমনি।

তারপর ধরুন না কেন, আমার বাড়ীতে কলহ-কচ্কচির কিছু নেই। ননদ নেই ভাজ নেই, ভাই-ভায়াদের ঝগড়া-ভাগাভাগি কিছু নেই, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, একা ঘরের একা বৌ।—যে আসবে সে থাকবে একেবারে মহারাণীর মত। তাছাড়া আমার ওই আমগাছে আম, জামগাছে জাম, পেয়ারা গাছে পেয়ারা, লেবুগাছে লেবু। পেড়ে পেড়ে এনে দেবো, বসে বসে খাবে। বাড়ীর পাশেই ধীরুর ঘাট-বাঁধানো পুকুর। চানেরও বড় সুখ, মাছেরও তত সুখ। ছিপ্ ফেলে মাছ ধরে এনে দেবো, উনোন ধরিয়ে দেবো, বাট্না বেঁটে দেবো, ঘরকন্নার আর্ধেক কাজ আমি নিজে করে নেবো।

এমনি সব সুখের কথা গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো ঝুলন, আর আনন্দ তার আঙুল গুণে গুণে হিসেব করতে লাগলো—তার সুবচনীর বয়স কত হলো।

বিয়ের বয়স তার নিশ্চয়ই হয়েছে। কাজল-বৌ কোনও বাধাই করতে পারেনি। শুধু তাকে গালাগালি দিচ্ছে বসে বসে।

কাজল-বৌ বললে, দিচ্ছিই তো! সুখ করবার বেলা নিজে, আর ঝক্তি-ঝঞ্ঝাট পোয়াবার বেলা আমি।

জানি। কিন্তু আমি খুব সুখে থাকি না কাজল-বৌ।

কাজল-বৌ বললে, সুখের জন্যে তো ঘর ছাড়োনি তুমি। আমাকে বাঁচাবার জন্যে আমার কাছ থেকে তুমি পালিয়েছ।

কিন্তু এই কি বাঁচা কাজল-বৌ। নিজের ভেতরের জানোয়ারটাকে মারবার জন্যে নিজের ঘরে নিজেই পালালাম। না পারলাম তোমাকে বাঁচাতে, না পারলাম নিজে বাঁচতে।

ও-সব কথা বোলো না বলছি। এখুনি কি বলতে কি বলে ফেলবো।—এই দাখো, বুড়ো বয়েসে চোখটাও কি খারাপ হলো নাকি? ঝপ্ ঝপ্ করে জল পড়ছে।

এই বলে দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে চোখ খারাপের ছুতো করে কাজল-বৌ খানিকটা কেঁদে নিলে।

আনন্দ বুঝতে সবই পারলে। বুঝতে পেরেও আবার সেই বিয়ের কথাই পাড়তে হলো। মেয়ের বিয়ে।

তাহলে কি করবে? সুবচনীর বিয়ে এই ছেলেটির সঙ্গে দেবে?

তুমি বাপ্, তুমি যা বলবে তাই হবে।

আনন্দ বললে, এর চেয়ে ভাল আর কোথায় পাবে বল—দিয়ে দাও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

আনন্দ তার দু'দিনের অন্নের ঋণ পরিশোধ করলে ঝুলনকে তার কন্যাদান করে।

ঝুলন চক্রবর্তী বিয়ে করলে তার বংশ রক্ষার জন্যে। বংশ না থাকলেও যাদের চলে তাদের চলে, কিন্তু উমাশশী রাইস্ মিলের ম্যানেজার শ্যামানন্দপুর গ্রামের একচক্ষু ঝুলন চক্রবর্তীর বংশ থাকবে না—সেরকম অগৌরবের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্তত লেখা নেই।

সুতরাং বিয়ে তাদের নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

কাজল-বৌ বললে, ছেলেটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু আর-একটি চোখ যদি থাকতো—

ওই একটি চোখই ভালো, তুমি জানো না কাজল-বৌ!—আনন্দ বললে, দু'চোখ থাকলে মেয়ের পিতৃকুল মাতৃ-কুল—এ-কুল ও-কুল—দু'কুলের খবর নিতে চাইতো। তোমার বাপ-মায়ের খবর নিতে গেলেই—ব্যাস্, বিয়েটি যেতো বন্ধ হয়ে।

কাজল-বৌ আর কোনও কথা বললে না। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, একার আর একটা রইলো।

আনন্দ বললে, ভাবছো বুঝি ওর জন্যেও এমনি একটা কানা-খোঁড়া ধরে আনবো?

এত দুঃখেও ম্লান একটুখানি হাসি দেখা গেল কাজল-বৌ-এর মুখে। বললে, যেরকম সুন্দরী হয়ে উঠছে মেয়েটা, কি যে হবে কে জানে।

বাবুদের বাড়ীতেই তো থাকে দেখছি, ওইখান থেকেই একটা ধরেটরে নেবে বোধহয়।

কাজল-বৌ বললে, ধরেটরে নেবে কি বলছো গো! খারাপ যদি কিছু করে বসে, তো করবে তোমার রক্ত ওর গায়ে আছে বলে।

আনন্দ বললে, আমি খারাপ কিছু বলছি না কাজল-বৌ, আমি বলছি ভাল চেহারা আছে, ভালটালো খেসে যদি কাউকে বিয়ে-থা করে তো আমরা বেঁচে যাই।

সেরকম ভাগ্য নিয়ে কি এসেছে বসুন্ধরা?

বিয়ের পর কাজল-বৌকে যেমন এনেছিল আনন্দ হালদার, তেমনি আবার কাজল-বৌএর মেয়ে সুবচনীকে নিয়ে গেল ঝুলন চক্রবর্তী। নিয়ে গেল তাদের সেই শ্যামানন্দপুর গ্রামে।

বাপ আনন্দ হালদার গেল তাদের সঙ্গে।

গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

সুবচনী চিঠি লিখলে তার মাকে: আমার জন্যে তুমি ভেবো না মা। আমি বেশ ভালই আছি। বাবা এখানে সাতদিন

ছিল তারপর এখান থেকে যাবার সময় আমাকে বলে গেল—তোর মাকে একটা খবর দিয়ে দিস, আমি এখন বাড়ী ফিরবো না।

চিঠি পেয়ে মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল কাজল-বৌএর। এখন তাদের বয়স হয়েছে, মেয়েরা বড় হয়েছে, কাজল-বৌ ভেবেছিল অনন্ত ফিরে আসবে। এবং বাড়ীতেই থাকবে।

আশায় আশায় রইলো কিছুদিন।

মাসের পর মাস গেল, বছরের পর বছর।

অনন্ত আর ফিরলো না।

ফিরলো না, কোনও খবরও দিলে না।

কাজল-বৌএর শুধু এই অনুশোচনাই হতে লাগলো যে সে-ই ঘরছাড়া করলে মানুষটাকে।

এক একবার মনে হতে লাগলো—হয়ত বা হুট্ করে এসে একদিন হাজির হবে। এসেই বলবে—বসুন্ধরার বিয়ে দেবার সময় হয়েছে তাই এলাম।

চুলদাড়িওলা সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই কাজল-বৌ থমকে দাঁড়ায়। কোন ভিখিরী এসে দাঁড়ালেই ছুটে গিয়ে দেখে আসে।

ছি ছি এ কেমনধারা স্বেচ্ছানির্বাসন!

একদিন যাকে সে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, আজ মনে হয় সে ফিরে আসুক!

অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে পথে পথে মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথার ওপর কোনও আশ্রয় নেই, রোগে সেবা করবার কেউ নেই, সময়ে চারটি খেতেও পায় না হয়ত।

বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কাজল-বৌ সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করছে।

বসুন্ধরা বললে, তুমি বৃষ্টিতে ভিজছো কেন মা? অসুখ করবে যে!

না না—কিচ্ছু হবে না আমার। এই বলে মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে সে ভিজতে লাগলো। চোখের জলে আর বৃষ্টির জলে এক হলে গেল। মেয়ে বুঝতে পারলে না মা কাঁদছে।

আর-একজন এমনি ভিজছে না? কাজল-বৌ মনে-মনেই বললে কথাটা। মেয়ের কাছে মুখ ফুটে কিছু বলাও যায় না।

এমনি করে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, মাটিতে শুয়ে আর রাত্রি জেগে কাজ করে কাজল-বৌ।

কাজ করে আর বসুন্ধরার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

বসুন্ধরা বলে, কি দেখছো মা অমন করে?

কি দেখছি?

মেয়েকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, দেখছি এরই মধ্যে কত বড়টি হয়ে গেলি তুই!

অন্তরে অনাদরের মানুষ, তবু তার উঠেছে যেন অগ্নিশিখা! তেমন গায়ের রং তার তেমনি স্বাস্থ্যসুন্দর নেই। পিঠ ছাপিয়ে কোমর পেরিয়ে গেছে মাথার চুল। যেমন সুন্দর মুখ তার তেমনি সুন্দর দুটি চোখ! একবার তাকালে আর সেদিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না—এত রূপ!

এই তো বিয়ে দেবার সময়। কিন্তু কার হাতে দেবে যে তোকে?

কাজল-বৌএর শুধু সেই এক চিন্তা।

সুবচনীর বর নিয়ে এসেছিল তার বাপ। এবারেও হয়ত সে আসবে। স্বামী তার এত নিষ্ঠুর হতে পারে না কখনও।

ভোর ভোরে আর নদীতে ওপর অভ্যেসমত করে করে স্নান সুন্দর স্বাস্থ্য কাজল-বৌএর—তাও যেন গেল ভেঙে।

পাড়াপড়শী সবারই নজরে পড়লো সেটা।

কে যেন সেদিন বললে, শরীরের দিকে নজর দাও কাজল-বৌ, তুমি মরে গেলে মেয়েটার কি হবে?

কাজল-বৌ বলেছিল, আমি মরবো না মা, আমি ঠিক বেঁচে থাকবো। আমি মরে গেলে শান্তিভোগ করবে যে?

মুখে যাই বলি, কিন্তু বুঝতে পারে—মরলে তার চলবে না। বসুন্ধরার ব্যবস্থা একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে তাকে থাকতেই হবে।

কিন্তু মরা বাঁচা মানুষের হাতে নেই। ভাগ্যের অধিদেবতাকে চোখেও দেখা যায় না। চোখে দেখা যায় শুধু তার বাড়ীর কাছে মুখুজ্জেদের রাধাগোবিন্দ-মন্দিরের যুগল মূর্তিটিকে।

কাজল-বৌ কোনোদিন যায় না সেখানে। হঠাৎ সেদিন বসুন্ধরাকে বললে, চল্ যাই মুখুজ্জেদের মন্দির আরতি দেখে আসি।

কাজল-বৌ ভেবেছিল তার মনের কথা মরুতে জানাবে, কিন্তু সেখানে

গিয়ে যা ঘটলো সেরকম ঘটনা যে ঘটবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

মুখুজ্জেদের অবস্থা এককালে ভালই ছিল। মন্দিরের সুমুখে নাটশালটি পুরনো হলেও দেখতে সুন্দর। আর রাধাশ্যাম বিগ্রহের কথা তো সবাই জানে। ওরকম বিগ্রহ এ-তল্লাটে কোথাও নেই। কষ্টিপাথরের শ্যাম, আর অষ্টধাতুর রাধা। গ্রামের মেয়েছেলে অনেকেই সন্ধ্যেবেলা এখানে বেড়াতে আসে। গাছপালায় ঢাকা জায়গাটি বড় মনোরম।

কাজল-বৌ সোজা মন্দিরের কাছে গিয়ে প্রণাম করছিল। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। আরতি হতে দেরি আছে।

প্রণাম করে যেই মাথা তুলেছে, দেখলে, বাবুদের মেজ-বৌ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

বিজ্ঞানসম্মত

জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্বার্ষব, সাম্মুদ্রিকরত্ন এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), ৫০-২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশপথ ওয়েলসলী ষ্ট্রীট), কলিকাতা — ১৩। ফোন : ২৪-৪০৬৫ প্রেসিডেন্ট অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ)।

জ্যোতিষ-সম্রাট

ইনি হস্তরেখা, কোষ্ঠী বিচার ও গ্রহশান্তি প্রভৃতির দ্বারা মানব জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অব্যর্থ ও দ্রুত গ্রহশান্তির প্রতিকার-কল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি পাশ্চাত্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত। প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ ধনদাকবচ—সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য—৭৷৷০, লক্ষ্মীপদী বৃহৎ—২১৷৷০, সরস্বতী কবচ—পরীক্ষায় সুফল লাভ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য—১৷৷০, বৃহৎ—৩৮৷৷০, বশ্যমুখী কবচ—প্রবল শত্রুনাশ ও সর্ব-প্রকার মামলায় জয়লাভ এবং কর্মোন্নতি হয়—১৷৷০, বৃহৎ—৩৪৷৷০। মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়—১১৷৷০, বৃহৎ—৩৪৷৷০। প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

বলি হ্যাঁ গা, কাজল-দিদি, মেয়েটাকে পাঠাওনি কেন? আমার ছেলেমেয়েরা যে ওর জন্যে হেদিয়ে মলো! ওই দাখো না! বসুন্ধরাকে দেখবামাত্র ওর কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছে।

কাজল-বৌ দেখলে, নাটশালার এক-পাশে বছর-চারেকের একটা ছেলে আর বছর-খানেকের একটা মেয়েকে নিয়ে বসুন্ধরা বসে পড়েছে খেলা করতে।

ও তো যেতে বললেই যায়। আমিই ওকে যেতে দিইনি।

কথাটা ভাল করেই বলেছিল কাজল-বৌ। কিন্তু মেজ-বৌ তার জবাব দিলে অন্য রকম করে। বললে, তা দেবে কেন? মেয়ে এখন তোমার বড় হয়েছে, খুঁটে খেতে শিখেছে, এখন আর তোমার ভাবনা কি?

মন-মেজাজ ভাল ছিল না কাজল-বৌএর। কথাটা শুনে ফিরে দাঁড়ালো। বললে, খুঁটে খেতে শিখেছে মানে? কী বলতে চাও তুমি?

মেজ-বৌও কম যায় না। বললে মানেটা আর বুঝতে পারলে না? যখন দরকার ছিল তখন পাঠিয়েছ। তোমার বসুন্ধরা যখন এই এতটুকু মেয়ে—তখন থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ও তো আমার ঘরেই খেয়ে-পরে মানুষ! ভাল ভাল জামা দিয়েছি, কাপড় দিয়েছি, খেতে দিয়েছি—তবে হ্যাঁ, তার জন্যে ও আমার উপগার কিছু করেছে বই-কি! আমার যেমন পোড়া কপাল, বছর-বছর ছেলেমেয়ে হয়েছে, ও-ই তাদের মানুষ করেছে। আমিও যেমন করেছি, ও-ও তেমনি করেছে। কিন্তু আজ যদি তুমি বল—বসুন্ধরা, বাবুদের বাড়ী যাসনে। নিমকহারামী হবে না?

কাজল-বৌ বললে, কিন্তু কেন যেতে বারণ করেছি সেটি তো বুঝলে না মেজ-বৌ।

কেন বারণ করেছ শুনি?

কাজল-বৌ বললে, বসুন্ধরার ওই বয়েস আর ওই চেহারা, আর তোমাদের বাড়ীতে হুদো হুদো ব্যাটাছেলে।—কার মনে যে কি আছে কিছু তো বলা যায় না।

মেজ-বৌ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, বুঝেছি। বসুন্ধরা আমার ছোট ঠাকুরপোর কথা বলেছে বুঝি তোমাকে?

কাজল-বৌ বললে, কই না, কারও কথা তো বলেনি।

নিশ্চয়ই বলেছে, নইলে তুমি জানলে কেমন করে?

আমি কিচ্ছু জানি না মেজ-বৌ, এই ঠাকুর-ঘরে দাঁড়িয়ে বলছি—

মেজ-বৌ বললে, বয়েস-কালে অমন কত হয়। সে কি আর গায়ে লেখা থাকে কারও! তোমার মেয়েটিও তো কম নয়। ছোট ঠাকুরপোর গায়ে জল ছুঁড়ে দেয়, ভেংচি কাটে, আরও কত কী করে।

মন দিয়ে শুনছিল কাজল-বৌ। শুনতে শুনতে বললে, তারপর?

তারপর আর-কি! তোমার অমন সুন্দরী বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, চোখের সামনে দেখছে সব সময়, পুরুষে-বাটা-ছেলে ছোট ঠাকুরপো মাথার ঠিক রাখতে পারেনি, কি যেন সব ফস্টিনস্টি করেছিল ওর সঙ্গে।

ব্যস্, কাজল-বৌএর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল। বজ্র-টজ্র পড়লো নাকি কোথাও? আর কোনও কথা সে শুনতে চাইলে না। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল নাটশালার দিকে।

বাবুদের মেজবৌ—মানে যখন তখন জমিদারী ছিল, কুলটিকুরি গ্রামের জমি-দারের মেজ-বৌ পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো 'থ' হয়ে। কথাটা তার তখনও শেষ হয়নি। তার সেই অসমাপ্ত কথার মাঝ-খানে নিতান্ত নির্বিষ্ট এক বাউণ্ডুলের বৌ সিংহিনীর মত গিয়ে দাঁড়ালো বসুন্ধরার কাছে।

হাতে ধরে টেনে তুললে বোধকরি অশোভন হয়, তাই সে শুধু গম্ভীরমুখে বললে, বসুন্ধরা, আয়!

মাকে সে দেখতেও পায়নি এতক্ষণ। বুকের আঁচলটা ঘোমটার মত করে মাথায়-মুখে ঢাকা দিয়ে বসুন্ধরা ছেলে-মেয়ে দুটোকে বোধকরি ভয় দেখিয়ে হাসাহাসি করছিল, মার ডাক শুনে মাথার কাপড়টা তুলে মা'র মুখের দিকে তাকাতেই তার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

মা বললে, ওঠ্। চল্ বাড়ী চল্।

কিন্তু এই বাচ্চা মেয়েটা? ছেলেটা?

বসুন্ধরা সুমুখে তাকিয়ে দেখলে, মেজ-বৌ এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সেইদিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা।

কাজল-বৌ তার একখানা হাত চেপে ধরে একরকম টেনেই নিয়ে গেল সেখান থেকে।

সারা রাস্তা বসুন্ধরার সঙ্গে একটি কথাও বললে না কাজল-বৌ।

শারদীয় অভিনন্দন জানাই

সাহা এণ্ড কোং প্রমিক লৌহ ও করগেট বিক্রেতা

৮/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিঃ (৭) ● ফোন : ৩৩-৩৭৬১

মায়ের হাবভাব দেখে খানিকটা আঁচ করেছিল বসুন্ধরা।

ঠিক, যা ভেবেছিল তাই চলো।

বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। মা আর মেয়ে। তবু বাড়ী ঢুকেই দরজার খিলটা বন্ধ করে দিলে কাজল-বৌ। তারপর আলো জ্বেলে সন্ধে দেবার পর্যন্ত তর সইলো না তার। উঠোনের ওপরেই বসুন্ধরাকে কাছে ডেকে বললে, বাবুদের সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে কী তুই করেছিস বল্!

কিচ্ছু করিনি মা।—আমার—আমি—

কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল বসুন্ধরা।

কাজল-বৌ তখন থর থর করে কাঁপছে। ঘট্ করে বসুন্ধরার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, আমি যা ভয় করেছিলাম, তাই।

আদরের মেয়ে বসুন্ধরা।

চোখ দুটি তার জলে ছল্ ছল্ করে এলো।

কাজল-বৌ বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বল্। বলেই তার মনে হলো, পাশের বাড়ী থেকে কেউ যদি শোনে!—এইদিকে সরে আয় হতভাগী।

হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে ঘরের দাওয়ায়।—বল্ কি সর্বনাশ করেছিস! আগে আমি শুনবো, তারপর আলো জ্বালবো।

বসুন্ধরার গোলাপী দুই গালের ওপর সুন্দর দুটি জলের ধারা নেমেছে তখন। অভিমানে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। তবু লজ্জার কথা বলতে হলো তাকে।

সেদিন থেকে আমি আর গেছি ওদের বাড়ী?

আজে-বাজে কথা বলছিস কেন, কি হয়েছে তাই বল্।

কিচ্ছু হয়নি মা। এই আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে—

না তোকে পায়ে হাত দিতে হবে না। তুই কি করেছিস তাই বল্।

কিচ্ছু করিনি।

আবার বলে কিচ্ছু করিনি। আমি সব শুনেছি মেজ-বৌএর কাছ থেকে।

কিচ্ছু শোনেনি। আমি তো সব বলেছি মেজ মাসীমাকে।

কী বলেছিস?

রোজই তো বলতাম—শম্ভুদা ভারি অসভ্য। আমাকে দেখলেই কিরকম করে।

মেজবৌ কি বলতো?

খালি-খালি হাসতো আর বলতো, করুকগে। তারি তো একটু জল ছুঁড়ে দিয়েছে গায়ে, তাতে কি ফোস্কা হয়ে গেল নাকি তোর?

তারপর?

তারপর সেদিন বড়ী আনছিলাম, সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়েছিল শম্ভুদা, আমি দেখতে পাইনি। আমাকে ধরে ফেললে।

তুই চেঁচালি না কেন?

চেঁচালাম তো। মেজ মাসীমা এসে দাঁড়াতেই আমাকে ছেড়ে দিলে। আমি ছুটে বাড়ী চলে এলাম। সেদিন থেকে আর গিয়েছি?

আর কিছু করেনি?

না। জোনো!

বলেই সে তার মায়ের মাথাটা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে কানে-কানে চুপিচুপি কি যেন বলে চুপ করে রইলো।

ঠিক বলছিস তো? পাপে কামুতে গিয়েছিল, আর কিছু করেনি?

বসুন্ধরা মাথা নেড়ে বললে, না মা না, তুমি ভেবো না।

ভাববো না কি রে! মেরে হয়ে জন্মেছিস যে!

এই বলে কাজল-বৌ উঠলো। উঠে বললে, নে আর বসে থাকিসনে, কপাল জ্বালা, জ্বালিয়ে উনোনে আগুন দে। আমি ততক্ষণ তুলসীতলায় প্রদীপটা দিয়ে আসি।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে কাজল-বৌএর মনটাই হালকা হয়ে গেলো—বসুন্ধরা বড় হয়েছে। তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কার হাতে তুলে দেবে তার ওই সোনার প্রতিমাকে? কানা একটা ছেলের হাতে তো দিয়েছে এক-জনকে তুলে।

৮ বছর বিয়ে হয়েছে তার।

৮ বছরে হয়েছে তিনটে ছেলে। এখন সে তিন ছেলের মা।

দেখতে ইচ্ছে করে তবু সে একটি-বারের জন্যও আসে না এখানে।

আসে না শুধু ঘরের জন্য তবে বলে।

চিঠি লেখে—তুমি বেশ আছো মা, আমার জন্যে ভেবো না।

না, ভাববে না। সুরেশ্বরীর জন্যে ভাববে না, বসুন্ধরার জন্যে ভাববে না, নিশ্চিন্তে স্বামীর জন্যে ভাববে না, আর ভাববার ভাবনা কিসের?

সেদিন বছর শেষে আম হয়েছিল খুব। একটা লোক দিয়ে নিজের গাছের এক ঝুড়ি আম পাঠিয়ে দিয়েছিল সুরেশ্বরী। সঙ্গে চিঠি লিখেছিল,—আমার বাড়ীর গাছে এত এত ফল হয় মা, পাড়া ফুরিয়ে যায়, আমি কিন্তু একটাও মুখে

বঙ্গলক্ষ্মীর গায়ে মাখা সাবান

নীম

পাইলট

গ্লিসারিন

সুচন্দন

ব্যবহারে আনন্দ ও লাভ দুই পাবেন
বাঙলার বঙ্গলক্ষ্মীর সাবান অতুলনীয়

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

দিতে পারি না। খালি খালি মনে হয় আমার মা আছে না, বোন আছে না।

বাস্ আর সে পড়তে পারেনি চিঠিখানা। টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়েছিল চিঠির ওপর। চিঠিখানা বসুন্ধরার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—নে তুই পড়।

বসুন্ধরা বাকি চিঠিখানা পড়ে শুনিয়েছিল মাকে।

—"বসুন্ধরা এতদিনে নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে উঠেছে। এবার তার বিয়ে দিতে হবে। তোমার জামাইকে বলেছি—ভাল একটি ছেলের খোঁজ করছে সে। বলেছি টাকাকড়ি কিছু দিতে পারবো না, শুধু মেয়েটিকে দেখে নিতে হবে। তা বসুন্ধরাকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।

আমিও কম চেষ্টা করছি না। আমাদের বাড়ীর একেবারে গায়ে-লাগা যে-বাড়ী, সেই বাড়ীতে একটি ছেলে আছে মা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা। ছেলেটি বি-এ পাশ করে কলকাতায় চাকরি করছে। কলকাতা তো আমাদের শ্যামানন্দপুর থেকে বেশি দূরে নয়। লোকজন সব রোজ যায় রোজ আসে। সেই ধীরু-ঠাকুরপোর সঙ্গে আমাদের বসুন্ধরার যদি বিয়ে হতো মা, কি ভাল যে হতো তা আর বলবার নয়। বাড়ীতে শুধু বিধবা মা। দিব্যি দোতলা বাড়ী, ঘাট-বাঁধানো পুকুর, তার ওপর ধীরু-ঠাকুরপো চাকরি করছে কলকাতায়। আমার মতন যদি বছরে বছরে ছেলে হয় বসুন্ধরার, ছেলে-মেয়েতে ঘর যদি ওর ভরেও যায় তবু ভাববার কিছু নেই।

আমি সেদিন কপাল ঠুকে বলেছিলাম ধীরু-ঠাকুরপোকে। বলেছিলাম তুমি শুধু একটিবার দ্যাখো আমার বোনটিকে। তা সে কি বললে জানো মা, বললে, তোমার বোন কতদূর পড়েছে। হায় রে কপাল, সবাই আজকাল লেখা-পড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। বসুন্ধরা যদি লেখাপড়া জানতো! ভাগিস তুমি আমাদের মেয়ে মেয়ে নিজে পড়িয়েছিলে। তাই আজ বাংলা বই পড়তে পারি, চিঠি লিখতে পারি।

আমি এখনও ধীরু-ঠাকুরপোর পেছুতে লেগে আছি মা। তুমি কিছু ভেবো না। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। ইতি।

তোমার সুরচনী।"

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে!

কাজল-বৌ জানে সবই, তবু তার ভাবনার অন্ত নেই। মেয়ে করে তাকে পাঠিয়েছে ভগবান, মা হবার জন্যেই তার জন্ম, তবু সেই মা হবার ভয়েই স্বামীকে সে তাড়িয়েছে বাড়ী থেকে। তাহলে আর তার সন্তানের জন্মটা বিধাতার হাতে রইলো কোথায়? দুটো মেয়ে তার মরে গেছে। মৃত্যুও যে বিধাতার হাতে—দুদিনের জন্য পৃথিবীতে এসে কীট-পতঙ্গের মত মরে গিয়েই কি সেকথা তারা প্রমাণ করে দিয়ে গেল? আর বিয়ে? তার মায়ের মত সে নিজেও কি কাউকে ভালবেসে দেহ দান করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারতো না?

যাত্রার দলে অর্জুন-সাজা আনন্দ হালদারের বাড়ীতে তাকে কি আসতেই হতো? সুরচনীকে একচোখ কানা কুলীন চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া তার কি কোনও পথ ছিল না?

সুরচনী লিখেছে—ভেবো না মা।

তবু সে তার পেটের মেয়ে, লিখেছে এই যথেষ্ট।

কাজল-বৌ বললে, রান্না আমি করছি বসুন্ধরা। তুই বই নিয়ে বোস্, একটু লেখাপড়া কর্।

বসুন্ধরা বললে, সুনীতি পাঠ তো আমার শেষ হয়ে গেছে মা, আর তো বই নেই, কি পড়বো?

কাজল-বৌ বললে, খাতা-পেন্সিল নিয়ে হাতের লেখা অভ্যেস্ কর্।

মা তার হঠাৎ এ-কথা কেন বললে, বসুন্ধরার বুঝতে দেরি হলো না। খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসলো বসুন্ধরা। বললে, দিদিকে একখানা চিঠি লিখি মা।

তাই লেখ্। অনেকদিন তার খবর পাইনি।

খুব মন দিয়ে চিঠিখানা লিখছিল বসুন্ধরা। কাজল-বৌ জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখলি, পড়, শুনি।

মা-রে আমি তো হাতের লেখা অভ্যেস করছি।

তবে যে বললি—দিদিকে চিঠি লিখি।

তার মানেই তাই।

কাজল-বৌ আর কোনও কথাই বললে না। রান্না করতে করতে একসময় দেখলে মেয়েটা লিখতে লিখতে পেন্সিল হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কাজল-বৌ। ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর মুখ। নিখুঁত সুন্দরী বসুন্ধরা। সারা দেহে তার যৌবনের সাড়া জেগেছে। এ-মেয়ের আর বিয়ে না দিলে চলে না। কিন্তু হে ভগবান! যতই মা ভাবি না কেন, জন্ম মৃত্যু আর বিয়ে—এই তিনটের অধিকার তুমি মানুষের হাতে ছেড়ে দাওনি। তাই যদি সত্য হয় তো এই হতভাগীর বিয়ের ভাবনা থেকে আমাকে নিশ্চিন্ত কর!

ঘুমন্ত বসুন্ধরার হাতখানা সরিয়ে খাতাটা তুলে নিলে কাজল-বৌ। দেখলে বসুন্ধরা লিখেছে—

দিদি,

মাকে নিয়ে কি মুস্কিলে যে পড়েছি দিদি তা আর তোকে চিঠি লিখে কি জানাবো। আমি বড় বড় হয়ে উঠছি মা ততই আমার জন্যে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে। যে-কোনও একটা পুরুষ-

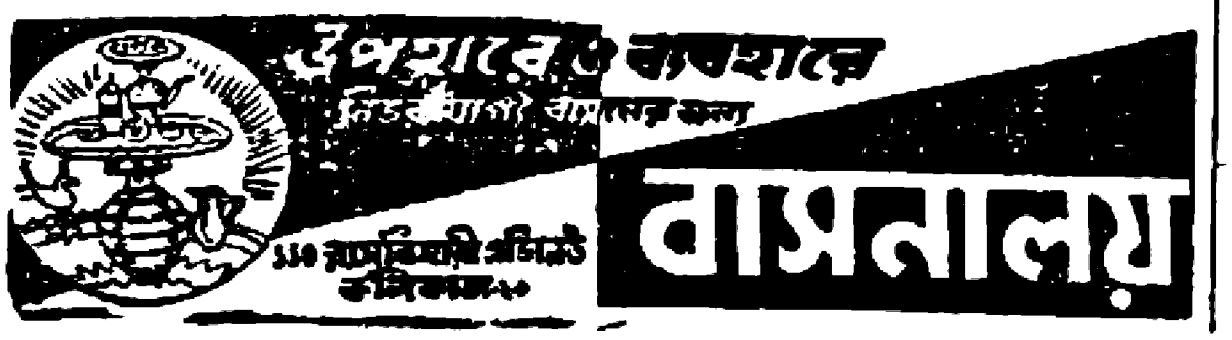

বাটাছেলে এখন যদি এসে বলে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবো, পরসাকড়ি কিছু চাই না, মা বোধহয় তাহলে তখনই তাকে তুলে দেবে। আমি কিন্তু দিদি ঠিক করেছি—বিয়ে আমি করব না। মার কাছে সেকথা বলবার জো নেই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জ্বালা কি কম? তবু তুই যে চৌদ্দিস—তোর তিনটে মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়েছে। মেয়ে হলে মরতিস। ভগবান তোকে যেন এতটাও মেয়ে না দেয়!

গত বছর তোর বাগানের আমের সঙ্গে তুই যে চিঠি লিখেছিলি, সেই চিঠির কথা আজকে মায়ের হঠাৎ মনে পড়েছে। লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছে তোর সেই ধীরু-ঠাকুরপো না কে, এতদিন হয়ত সে কোনও ইস্কুল-মাস্টারণীকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। তবু আমার মায়ের ধারণা সে বুঝি তার এই সুনীতিপাঠ-পড়া মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে বসে আছে। তাই মা আজ আমাকে বলে বসলো—একটু বই নিয়ে বোস, লেখা-পড়া কর্।

আমার ওই একখানি বই দিদি—'সুনীতিপাঠ।' সে পাঠ আমার শেষ হয়ে গেছে। তাই তোকে এই চিঠি লিখে, লেখার অভ্যেস করছি।

তোর সেই রূপকথার রাজপুত্তুর ধীরু-ঠাকুরপোকে বলিস, খুব ভুল করলে সে লেখাপড়া জানা মেয়েকে বিয়ে করে। রাজকন্যা না হোক্ রূপবতী বসুন্ধরা বরণমালা হাতে নিয়ে বসে ছিল তার জন্যে।

তোর অরুণ, বরুণ, তরুণকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে দিদি। পারিস তো একবারটি আসিস। ইতি।

বসুন্ধরা

বসুন্ধরার চেহারার মত তার হাতের লেখাটি হয়েছে সুন্দর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজল-বৌ'এর লেখা যেন আর শেষই হয় না! লজ্জায় যদি সুবচনীকে চিঠিখানা সে পাঠাতে না চায় তাই খাতা থেকে পাতাটা সে ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখে এলো ঘরের ভেতর। তারপর বসুন্ধরাকে বললে, ওঠ্। খেয়ে নে। এ-সব এখন রাখ্।

বলেই খাতাটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিলে সেখান থেকে।

বসুন্ধরা বুঝতেই পারলে না তার দিদিকে লেখা চিঠিখানা তার খাতার ভেতর নেই।

বুঝতে যেদিন পারলে, কাজল-বৌ তার আগেই খামের ঠিকানাটা নিজের হাতে লিখে চিঠিখানা সুবচনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বসুন্ধরা বললে, আমার খাতা থেকে পাতা কে ছিঁড়লে মা?

কাজল-বৌ বললে, বাইরের লোক তো কেউ আসেনি ছিঁড়তে, আমিই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ছি! অমনি করে লেখে নাকি?

বসুন্ধরা বললে, তুমিও যেমন! আমি কি দিদিকে সাতা-সাতাই লিখছিলাম নাকি? হাতের লেখা মক্স করছিলাম।

তা হাতের লেখাটি তোর ভালই হয়েছে।

এই বলে কথাটা কাজল-বৌ পালটে দিলে।

বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে, কেমন মাস্টারণীর কাছে শিখেছি দেখতে হবে তো! তুমি যে ভাল মাস্টারণী মা। তোমার বাবা মাস্টার ছিল যে! —আচ্ছা মা, তুমি তো অনেক লেখাপড়া শিখতে পারতে, শেখোনি কেন?

আমার বাবা চেয়েছিল শেখাতে। মা দেয়নি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার এমন হেওয়াজও ছিল না তখন। মা বলতো, কি হবে বাসন্তীর লেখাপড়া শিখে, সারাজীবন হয়ত ভাতই রাঁধবে আর ছেলে মানুষ করবে। তা মা বেঁচে থাকলে এই দুর্গতি আমার হতো না হয়ত। মার হাতে অনেক টাকা ছিল, অনেক সোনার গয়না ছিল।

মনের দুঃখেই এই সব কথা বলছিল কাজল-বৌ।

তা বসুন্ধরার চেহারাও যেমন সুন্দর তার বুদ্ধিও তেমনি ধারালো। চট করে অমনি ধরে বসলো তার মাকে—আচ্ছা মা, তুমি যে কথায় কথায় দুঃখু-দুঃখু দুর্গতি-দুর্গতি করো, এই তো বলছো তোমার মায়ের হাতে টাকা ছিল সোনা ছিল, কিন্তু তাতে তোমার দুর্গতি ঠেকাতে পেরেছে?

মা যে আমার মরে গেল!

বসুন্ধরা বললে, তবেই দ্যাখো, ও সব মানুষের হাতে নয়।

কাজল-বৌ বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকালো। এমন করে মেয়েকে সে কোনোদিন যেন দেখেনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বসুন্ধরার কাছে। বললে, এ-সব কথা এই বয়েসে কোথায় তুই শিখলি রে?

বসুন্ধরা দুহাত দিয়ে মাকে তার জড়িয়ে ধরে বললে, তোমার কাছে।

মাও তখন মেয়ের মুখখানি নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললে, এগুনি কথাগুলো যদি বলিস তাহলেও অনেকটা নিশ্চিন্তি হই।

বলতে বলতে কাজল-বৌ'এর বুক থেকে কেমন যেন একটা স্বস্তির দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনের কথা তার খুলেই বলে ফেললে মেয়ের কাছে। —আমি ছাড়া তোকে দেখবার যে আর

দেখতে চমৎকার
পায়ে আরাম
টেকেও বহুদিন

মোজা

মঙ্গলা এও কোং-র তৈরী

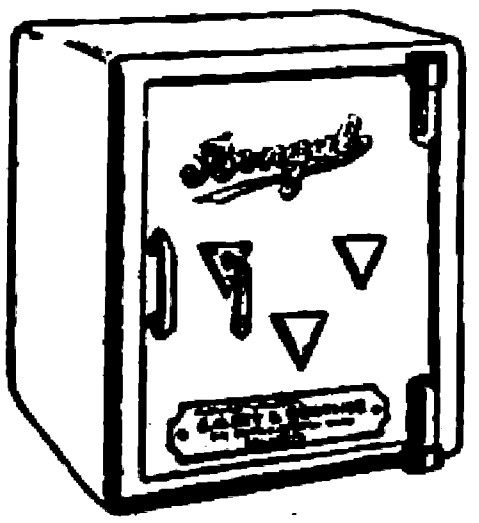

চোর ডাকাতের হাত হইতে মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি রক্ষা করিবার জন্য "বেঙ্গল" ব্রান্ড লোহার সিন্দুক ও কেবিনেট-ই নির্ভরযোগ্য।

—প্রস্তুতকারক—

শচীন্দ্রনাথ দে এণ্ড ব্রাদার

১১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

কেউ নেই বসুন্ধরা তাই ভাবি এই ভাবে। হাসতে থাক—আমি মরে গেলে তুই তোর পথ ঠিক বেছে নিতে পারবি।

খুব দুঃখের কথা। তবু বসুন্ধরা তার মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বোধহয় জোর করে বলল, খুব পারবে। তুমি ভেবো না।

কাজল-বৌ আবার বলল, শম্ভুর মত ওই সব জানোয়ারগুলো তোকে টেনে ছিঁড়ে খেতে পারবে না বসু।

বসুন্ধরা বলল, আমি যদি ছিঁড়ে খেতে দিই, তাহলেই খাবে। আর যদি না দিই তো ওর চৌদ্দপুরুষের সাধ্যি নেই তোমার কিছু করে।

এই তো কথার মত কথা। কাজল-বৌ এইটুকুই যেন শুনতে চেয়েছিল বসুন্ধরার মুখ থেকে। মেয়েকে বুকের ওপর আরও জোর করে চেপে ধরে একটু, আরও কাছে টেনে সেই আপেলের মত নরম সুন্দর গালের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, সেদিন খুব জোরে একটা চড় মেরেছিলাম। যা দেখি, গাছ থেকে মেচটা কেটে আন্। আজ একটা নতুন রান্না তোকে শিখিয়ে দিই।

বসুন্ধরা বাটি হাতে নিয়ে কলাতলার দিকে যেতে যেতে কাজল-বৌ ঢুকলো রান্নাঘরে। খুব সাদা কথা বলেছে মেয়েটা। আমার ইচ্ছে না থাকলে কে আমাকে কাবু করতে পারে? কিন্তু 'ইচ্ছে'—'ইচ্ছে' এই যে এক সর্বনাশ কথা—ইচ্ছে। এই ইচ্ছেটা তো আর জন্তু-জানোয়ারের নেই। তাদের আছে শুধু দেহ। মানুষের আছে দেহ আর মন। দেহের ইচ্ছে আর মনের ইচ্ছে। এই দুটো মানুষকে ছিঁড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দিনরাত।

এমনি ভাবনার সূত্র ধরে কাজল-বৌ অনেক দূরে চলে গেল। ভাবনা-চিন্তার আর যেই খুঁজে পেলে না কোথাও। এই পুঁথিপড়া-মেয়েটা বসুন্ধরা, তার ওই ভাবনা সুন্দর দেহ! দেহের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে, মনের একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মা হবার দুর্বার বাসনাকে সে রুদ্ধ করবে কিসের জোরে? তবে শুধু তাকে একটা কথা, লিখিয়ে রাখা দরকার

ও মা, তুই এখনও রান্নাঘরে বসে উনোনে? কি ভাবছো বসে বসে?

লোহাটা মায়ের সামনে নামিয়ে রেখে বসুন্ধরা বললে, কেমন করে কুটবো বল।

মা বললে, শোন্, তার আগে তোকে একটা কথা বলে রাখি। দ্যাখ্, মানুষের ভেতর জন্তু-জানোয়ার অনেক আছে। জন্তু-জানোয়ারের ছেলে জন্তু-জানোয়ারই হয়। তুই যেন জন্তু-জানোয়ারের মা হতে চাস্ না কোনোদিন।

হুঁ! কী যে সব ভাবো আর কী যে সব বলো! সরো। তুমি আর কোটো। আমি আগুন দিই।

এই বলে বসুন্ধরা তার কোমরের কাপড়টা পাছকোমর করে বেঁধে কাজল-বৌকে কোর কাছ সরিয়ে নিলে সেখান থেকে।

সুরঞ্জনীর চিঠির জবাব এলো শ্যামা-নন্দপুর থেকে। কাজল-বৌ এর শরীরটা আজ কদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। রোজ সকালে মাথা ধরে, বিকেলে গা-টা গুদ্-গুদ্ করে। বসুন্ধরা গিয়েছিল সরলাদের বাড়ী মার জন্যে পেয়ারা আনতে। উঠোনের গাছটা তাদের পেয়ারায় পেয়ারায় ভরে গেছে। বসুন্ধরা গাছে উঠতে জানে। নিজেই গাছে উঠে এক আঁচল কাঁচা-পাকা পেয়ারা পেড়ে নিয়ে একটা পেয়ারা খেতে খেতে বাড়ী ফিরছিল, পিয়ন তার হাতে চিঠিটা দিলে। হাতের লেখা দেখেই বুঝেছিল দিদির চিঠি। পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিঠিটা খুললে সে রাস্তার মাঝখানেই। পড়লে চিঠিখানা। দিদি লিখেছে—

"তোর চিঠি পেলাম বসুন্ধরা।"

ও-মা, সে আবার কখন চিঠি লিখলে দিদিকে?

আরও কয়েকটা লাইন পড়তেই রহস্য বুঝতে তার আর বাকি রইলো না। তার সেই খাতায় লেখা চিঠিখানা ছিঁড়ে নিয়ে মা ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে দিদিকে।

—"তোর বড় কপাল মন্দ বসুন্ধরা। নইলে আমি ঠিক পাটিয়ে এনেছিলুম ধীরু-ঠাকুরপোকে। ধীরু-ঠাকুরপো চাইছিল একটি লেখাপড়া জানা মেয়ে, আর তার মা চাইছিল একটি বড়লোকের মেয়ে। কপালগুণে জুটেও গেল। কলকাতা থেকে এক বড়লোক এসেছিল তাদের ঘাট-বাঁধানো পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে। ধীরুকে দেখে মনে ধরে গেল তাঁর। ভদ্রলোকের একটি মাত্র মেয়ে। আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছে। কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি যা-কিছু আছে সবই ওই মেয়ে-জামাই পাবে। এমন সুযোগ ছাড়ে? ধীরু-ঠাকুরপোর মা—আমি তাকে মাসীমা বলে ডাকি, তিনি তো দু'পায়ে লাফাচ্ছেন। বোধহয় আসছে-মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে

যাকগে। রূপবতী বসুন্ধরার মন আমি জুটিয়ে দিচ্ছি। আশীর্বাদে তুই

দি বেঙ্গল ডেকরেটর
ফোন: ৫৫ ৪০১২
২২৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-কলিকাতা-৬

পূজার আকর্ষণ!
বড়বাজারে
ন্যায্য মূল্যে পছন্দসই
বস্ত্র ও পোষাকের
জন্যে
শতাব্দীর উপর সুপরিচিত
ঈশ্বর চন্দ্র পাল
গঙ্গাপ্রসাদ পাল এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-৩৬৬১

কেশুত
ভেষজ কেশ তৈল
লিপ্যান্স ড্রাগ্স কলিকাতা-৭

মাকেও ভাবতে বারণ করিস্। অরুণের বাবা চেষ্টা করছে খুব। দুটি পাত্রের খবর এনেছিল। আমার ভাল লাগেনি।

অরুণ, বরুণ, তরুণ ভালই আছে। ভারি দুরন্ত হয়েছে তারা। মাকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। এই চিঠি-খানাই দেখাস মাকে। ইতি। তোর দিদি।"

এ চিঠি আর মাকে দেখিয়ে কি হবে? মার খুশী হবার মত কোনও খবর নেই। ধীরু-ঠাকুরপোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। দুটি পাত্র দেখেছিল জামাইবাবু। দুটিই অচল।

বাড়ী ঢুকে দেখে, জুবুথুবু একেবারে নেহ'স হয়ে পড়ে আছে কাজল-বৌ। গা যেন আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে। বসুন্ধরার আঁচলের পেয়ারা আঁচলেই রইলো, জামার নীচে লুকনো চিঠিখানা আর বের করতে হলো না, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসুন্ধরা ডাকলে, মা!

এক ডাকে সাড়া পেলো না তার। তিন চার বার ডাকবার পর চোখ চেয়ে তাকালো কাজল-বৌ। চোখদুটো লাল। শুধু একবার বললে, উঁ। বলেই আবার চোখ বুজে এলিয়ে পড়লো।

মা'র এরকম অসুখ বসুন্ধরা কখনও দেখেনি। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগলো।

তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে মা? জল খাবে?

উঁ।

জল খাবে?

না।

থাক্ আর বকিয়ে কাজ নেই। মা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক্। বসুন্ধরা তার আঁচলের পেয়ারাগুলো রাখলে। চিঠিখানা রাখতে গিয়ে আর-একবার খুলে পড়লে। গ্রামে দু'জন ডাক্তার আছে। হোমিও-প্যাথী ডাক্তারকে ডাকলে নেবে এক টাকা, আর এ্যালোপ্যাথী ডাক্তার নেবে দু'টাকা।

কিন্তু টাকা কোথায়?

আজকের রাতটা পার হোক্, কাল দেখা যাবে।

ঠাণ্ডা ভাত বসুন্ধরা খেতে পারে না বলে রোজ রাত্রে কাজল-বৌ গরম ভাত রান্না করে। বসুন্ধরার সেদিন ইচ্ছে করলো না রান্না করতে। হেঁসেলে দেখলে, দিনের ভাত ডিজনো রয়েছে অনেকগুলো। মা আজ খায়নি। ডাল ছিল খানিকটে, আর ছিল একটা পাথরের বাটিতে এক বাটি টক। বসুন্ধরা টিন থেকে ঢেলে আনলে কতকগুলো ঘুঁড়, আনলে খানিকটা সরষের তেল, আনলে কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। তারপর সব একসঙ্গে মাখিয়ে পরমানন্দে খেলে সেইগুলো।

সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে, এঁটো পরিষ্কার করে, থালাবাটি মেজে ধুয়ে পরিপাটি করে রেখে রান্নাঘরের শেকল তুলে দিয়ে বসুন্ধরা এলো তার মাকের কাছে।

আজ সে-ই হয়েছে মা, মা হয়েছে মেয়ে।

রোজ রাত্রে কাজল-বৌ যেমন করে বসুন্ধরাকে জড়িয়ে ধরে শোয়, সেদিন বসুন্ধরা তেমনি করে তার মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো।

মাকে ভাল করে নাও ঠাকুর, মা ছাড়া আর যে কেউ নেই!

চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো বসুন্ধরার।

রাত্রে জ্বর যদি না ছাড়ে, কাল সকালেই সে যাবে ডাক্তারের কাছে।

নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগলো তার।

এ সময় তার বাবা যদি থাকতো!

পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটে যা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

ঘটে হয়ত এমনিই, কিন্তু মানুষের মন নানা রকম তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। কেউ-বা করে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, কেউ-বা করে অন্য-কিছু।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বসুন্ধরার।

এক চট্‌কা ঘুমের পর যেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখেছে—তখনও তেমনি গরম। রীতিমত ভয় হয়েছে বসুন্ধরার। ভয়ে ভয়ে শুধু ভগবানকে ডেকেছে আর ভেবেছে—মা যদি মরে যায়, তাহলে তার কি হবে? কোথায় সে যাবে?

এ পৃথিবীতে একা থাকবার উপায় নেই তার। সব সময়েই তাকে আগলাবার জন্য একজন লোক মানুষ চাই। কিন্তু কেন? কেন? সেই বর্বর যুগ থেকে মানুষ কি এক চুলও এগোয়নি এখনও! ব্যবধেরা কি চিরস্থায়ী?

আবার কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল বসুন্ধরা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, তার

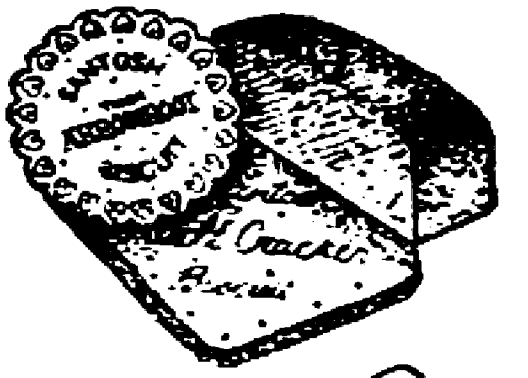

সন্তোষের প্রাণঢালা আশীর্বাদ আনে
সন্তোষ
বিস্কুট ও রুটী
সন্তোষ বিস্কুট কোঃ প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১১

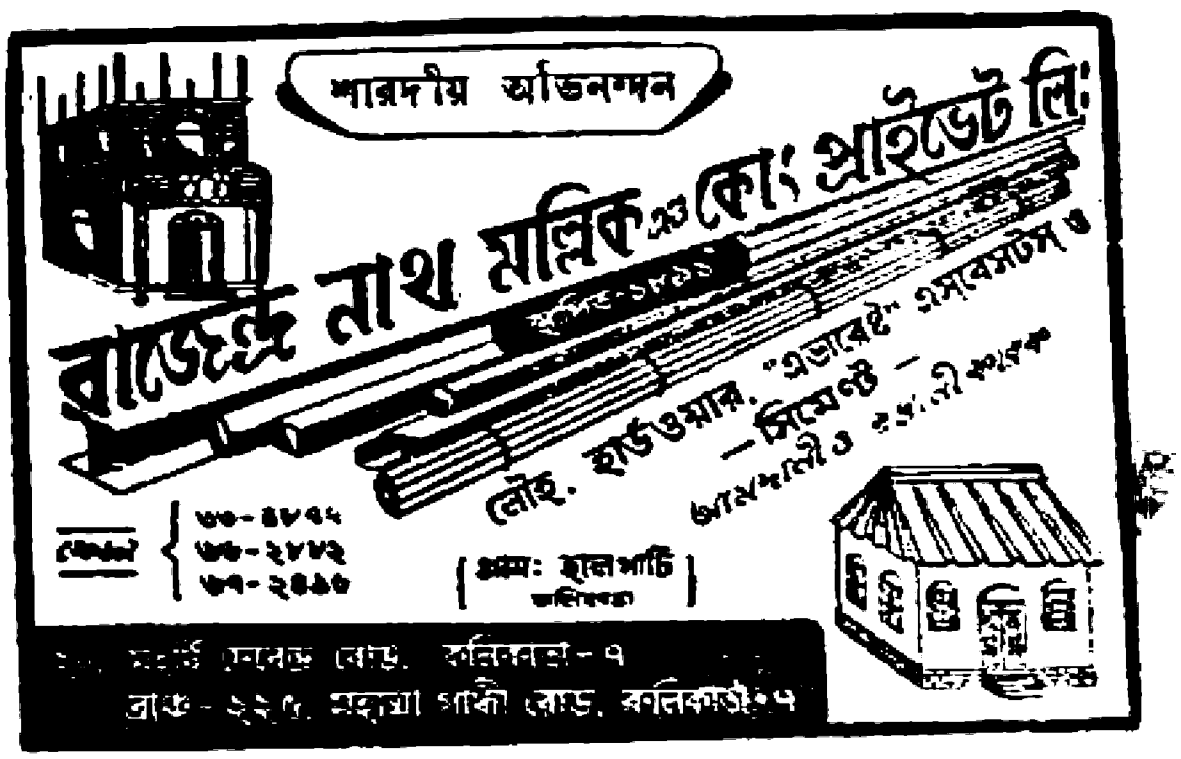

বাবা এসেছে। ঘুমের ঘোরেই সে চেঁচিয়ে উঠেছিল 'বাবা' বলে। তারপর কখন সকাল হয়েছে বুঝতে পারেনি।

মায়ের কপালটা একটু ঠাণ্ডা মনে হলো। মা ঘুমোচ্ছে।

পাশেই খিড়কির পুকুর। বসুন্ধরা গিয়েছিল কাপড় কাচতে।

ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে ভিজে কাপড়টা উঠোনে মেলছিল বসুন্ধরা, সদর দোরের বাইরে কে যেন এসে নাম ধরে ডাকছে মনে হলো।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলে সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে! বসুন্ধরার বাবা—আনন্দ হালদার।

তার স্বপ্নের সঙ্গে এমন হুবহু মিলে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। আনন্দর মুখের দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বসুন্ধরা। আনন্দ বললে, অমন করে তাকিয়ে রয়েছিস কেন মা, চিনতে পারিসনি?

বসুন্ধরা বললে, না বাবা, অনেক আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। আর ঠিক আজই তুমি এলে। কাল থেকে মায়ের জ্বর হয়েছে।

এই বলে সে ঘরে ঢুকলো মাকে এই খবরটা দেবার জন্যে।

ঘাম দিয়ে কাজল-বৌ-এর জ্বরটা ছাড়ছে তখন। বসুন্ধরা সেবা করছিল মা-র। কপালে হাত রাখতেই কাজল-বৌ বলে উঠলো, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, বাবা এসেছে মা।

"হ্যাঁ, আমি এসেছি।"

আনন্দ ঘরে ঢুকলো। দাড়ি চুল আরও বড় হয়েছে। চেহারাটা আরও সুন্দর হয়েছে আনন্দ হালদারের।

"জানি তুমি আসবে।"

কাজল-বৌ-এর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আনন্দ এগিয়ে গেল। মুখে কোনও কথা বললে না। শুধু তার হাতটি বাড়িয়ে কাজল-বৌ-এর কপাল রাখলে। কাজল-বৌও তার একটি হাত তুলে আনন্দর হাতটিকে চেপে ধরলে। চোখ বুজে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কিছু-ক্ষণ। তারপর তার চোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসতেই হাতটি ছেড়ে দিয়ে ডাকলে, বসুন্ধরা।

যাই মা!

আসতে হবে না। তোর বাবাকে চা করে দে।

কাজল বৌ-এর কপাল থেকে হাতটা তুলে নিয়ে আনন্দ বললে, তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি চট করে আসি।

অনেকদিন পরে তার নিজেরই খিড়কির পুকুরে স্নান করে এলো আনন্দ হালদার। নিজেরই বাড়ীতে অতিথি সে অথচ অপরিচিত। কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত মনে হচ্ছে সব-কিছু।

সারা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পরিক্রমা করেছে সে তিনবার। তার এই বড় বড় চুলদাড়ি, দীর্ঘায়িত দেহ, গৈরিক বস্ত্র দেখে অনেক ভেবেছে—সে একজন সিদ্ধ সাধক। যাত্রার দলে অভিনয় করতো সে। ভক্ত অভিনেতা বলে তার নাম হয়েছিল। সিদ্ধ-সাধকের অভিনয় করে সে তার জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তা সে কোনোদিন করেনি। হাতে পয়সা ছিল না বলে চুলদাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছিল, সাদা জামাকাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায় বলে কাপড়জামা গেরুয়া রঙে ছুপিয়েছিল প্রথমে। কোনও গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেনি, কারও কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেবার মোহ তার কোনোদিন হয়নি। পাঠ নিয়েছিল সে তার নিজেরই জীবনের কাছে। সংগ্রাম করেছিল নিজেরই জীবনের সঙ্গে। শরণাপন্ন হয়েছিল জীবন-দেবতার। জানতে চেয়েছিল জীবনের রহস্য। জানতে চেয়েছিল আনন্দ হালদার নামে যে-মানুষটি জগতে বিচরণ করছে, কী তার সত্য পরিচয়!

মনে হয় এতদিন পরে সে তা জেনেছে।

স্নান করে ফিরে এসে আনন্দ দেখলে, কাজল-বৌ উঠে বসেছে।

বসুন্ধরা চা তৈরি করেছিল। মাকে বাবাকে চা দিয়ে নিজেও সে খেতে বসলো। চা খেতে খেতে বললে মা তার আমার হয়েছিল কাল! মা ভাল করে কথা বলছে না, বাড়ীতে একটা মানুষ নেই—

আনন্দ হাসছিল।

কাজল-বৌ বললে, তুমি হাসছো? আচ্ছা ভাবো তো, আমি যদি মারা যেতাম, একা ও মেয়েটা কি করতো?

আনন্দ বললে, কেন ভাবছো কেন? কল্পনার দুঃখ তৈরি করে কষ্ট পেতে যাও কেন?

কাজল-বৌ বললে, বেশ আনন্দময় পুরুষ যা-হোক্! বাপ্-মা নাইটিও রেখেছিল কেড়ে-বেড়ে—আনন্দ।

ফিক্ করে হেসে ফেললে বসুন্ধরা।

—ও মা, এ তুমি করলে কি? বাবার নাম মুখে আনলে?

কাজল-বৌ বললে, থাম্ মুখপুড়ী! বিয়ে হোক্, তারপর বুঝবি—নাম মুখে আনলে দোষ হয় না।

বলেই সে তার স্বামীকে নিয়ে পড়লো। বললে, শোনো, আমার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে—আমি আর বাঁচবো না। ভালই হলো—তুমি এসেছ, তোমার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে এবার চলে যেতে পারলেই আমার ছুটি।

আনন্দ বললে, বেঁচে থেকে কেন মরতো বল তো?

তুমি মেরে রেখেছ তাই মরছি।

কেউ কাউকে মেরে রাখে না কাজল-বৌ। মানুষ নিজের দুঃখ নিজেই তৈরি করে।

কাজল-বৌ বললে, তাহলে বলতে চাও বসুন্ধরার বিয়ের ভাবনা আমি ভাববো না?

না ভাববে না। ভেবেছ তো এত-দিন ধরে, কিছু করতে পেরেছ? নিজের মন খারাপ করেছ আর শরীর নষ্ট করেছ। এর বেশি আর কিছু করতে পারনি।

কী বলছো পাগলের মত? আগুনের মত ওই মেয়েকে নিয়ে চুপ করে বসে থাকা চলে?

আনন্দ বললে, চলে কাজল-বৌ চলে। বসুন্ধরা আমাদের মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যটা ওর নিজের। এই অদৃষ্ট দিয়েই আমরা জন্মান্তর বুঝতে পারি।

কাজল-বৌ বললে, কাল থেকে কিছু খাইনি, তোমার সঙ্গে বকতেও পারব না, তোমার ও-সব কথা আমি বুঝতেও পারব না। তোমার এই মেয়ের সঙ্গে তুমি কথা বল। ও-ও ঠিক তোমারই মতো কথা বলে। সেই যে সেই কথাটা বল্ না তোর বাপকে। সেই যে সুবচনী লিখেছিল!

বসুন্ধরা বললে, বাবা জানে। বলেই সে চায়ের কাপগুলি হাতে নিয়ে সেগুলো ধোবার ছুতো করে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

কাজল-বৌ বললে, বিয়ের কথায় লজ্জায় পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার শুধু কি ভয় হয় জানো? ওরও তো শরীর-মনের একটা স্বাভাবিক খিদে আছে। ও যদি বোঝে—বাপ্-মা তার বিয়ের কোনও চেষ্টাই করছে না, ওর ভাগ্যের ওপর ওকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে অথচ ভাগ্যেরও সাড়াশব্দ কিছু পাচ্ছে না, তখন যদি হট্ করে কিছু করে বসে তাহলে মেয়েদের সব চেয়ে যেটা বড় জোর—সেই জোরটা ওর থাকবে না।

আনন্দ একটু হাসলো। হেসে বললে, জয় রামকৃষ্ণ!

কাজল-বৌ বললে, তুমি এখন অনেকখানি ওপরে উঠে গেছ। আমি কিন্তু এখনও মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কাজেই আমি ভাবছি একরকম, তুমি ভাবছো আর-একরকম।

এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাজল-বৌ আবার বলল কতরকম করে যে কথাগুলো ভাবি তার আদি-অন্ত নেই। ভাবনা ছাড়া আমার আর কাজ কি বল। এক এক সময় ভাবি—এ কী হলো আমাদের? এই কি জীবন? এই কি সংসার? এরকমটি হলো কার দোষ? তুমি ঠিক সংসারী মানুষ নও। আমিই তোমাকে জোর করে সংসারী করতে চেয়েছিলাম। আমার কোনও দোষ ছিল না। আমার ধর্ম আমি ঠিক পালন করেছি। তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, সুন্দর দুটি মেয়ে দিয়েছি, হয়ত আরও দিতে পারতাম, কিন্তু দেখলাম তুমি উপার্জনী পুরুষ নও। সন্তান দেবে, কিন্তু তার মুখে অন্ন দেবে না। উপার্জন করবে না। তাই আমি তোমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিলাম বাড়ী থেকে।

আনন্দ বললে, চুপ কর। তোমার জ্বর হয়েছে। কাল থেকে কিছু খাওনি। দুর্বল হয়ে পড়বে।

তাহলে এবার তুমি বল, আমি শুনি।

আনন্দ বললে, তাহলে চল তুমি ঘরে গিয়ে চুপটি করে শোবে চল। এখানে বসুন্ধরা আসা-যাওয়া করছে। ওর সামনে সব কথা বলা চলে না।

সেই ভাল।

কাজল-বৌ ডাকলে, বসুন্ধরা!

বেশি দূরে ছিল না সে। উনোনে আগুন দিচ্ছিল। রান্না করবে। সেইখান থেকেই সাড়া দিলে।

কাজল-বৌ বললে, এইখানে আয়। শুনে যা। আমি চেঁচাতে পারি না।

মেয়ে এসে দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গ-সুন্দরী বসুন্ধরা। গাছকোমর দিয়ে শাড়ীটা ভাল করে কোমরে জড়িয়েছে। দু'হাতে দুটি সোনার চুড়ি, কানে দুটি দুল, আর কোথাও এতটুকু সোনার চিহ্ন নেই শরীরে, তবু যেন মনে হচ্ছে কত-ই না সেজেছে। আনন্দ প্রাণ ভরে চেয়ে দেখছিল তাকে। কাজল-বৌ বললে দেখছো কি? এই বয়েসের মেয়েরা কত গয়না পরে, শাড়ী পরে, কিন্তু কোনও সাধই আমি ওর মেটাতে পারিনি। তোমার বসুন্ধরার ফসলে আমরা দুমুঠো খেতে পাই—এই পর্যন্ত।

আনন্দ বললে, বসুন্ধরা সর্বংসহা। সব-কিছু সে সহ্য করে।

কাজল-বৌ বললে, সন্ন্যাসী বাপের ওইটুকুই সম্বল। বসুন্ধরা, বাপ যখন এসেছে বাড়ীতে, ভাল করে খাওয়া। মাছটাছ খাও তো?

জোটে যদি তো না বলি না।

কাজল-বৌ বললে, তাহলে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রাখালকে একবার ডাক্। আমার ওই ছেঁড়া টিনের বাক্সটায় খুচরো পয়সা কিছু আছে—

আনন্দ বললে, টাকা-পয়সা আমিও কিছু সঙ্গে এনেছি।

কাজল-বৌ হাসলে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ম্লান একটুখানি হাসি। বললে, সাধু-সন্ন্যাসীর পয়সা না নেওয়াই ভাল।

হাসতে হাসতে বসুন্ধরা গেল রাখালকে ডাকতে

আনন্দ বললে, মেয়েটা আমাদের ভালবাসার সন্তান কাজল-বৌ। ও কখনও

দেখছো কি?.....কোনও সাধই আমি ওর মেটাতে পারিনি

ভূত-প্রেতের ভাগ্য নিয়ে আসেনি এ-পৃথিবীতে। ওর মন্দ কিছু হবে না। ভালই হবে।

কাজল-বৌ বললে, সুবচনী বুঝি আমাদের ভালবাসার সন্তান নয়? ওর সুখ তো খুব হলো!

তোমার সুখের কল্পনা অন্য রকম কাজল-বৌ। তুমি ভাবো বুঝি খুব বড়-লোকের বৌ হলেই সুখে থাকে। আমি সারা ভারতবর্ষ বহুবার ঘুরেছি, অনেক বড়লোকের মেয়ে-বৌকে দেখেছি, আবার অনেক গরীবের ঘরেও আতিথ্য গ্রহণ করেছি। দেখেছি—যে অসন্তুষ্ট, সে-ই অসুখী। তোমার সুবচনী বড়লোক না হতে পারে, কিন্তু অসন্তুষ্ট নয়।

কাজল-বৌ বললে, আমি বুঝি অসন্তুষ্ট?

না, তুমি অসন্তুষ্ট নও। —আনন্দ বললে, তুমি লক্ষ্মী।

আমি লক্ষ্মী?

অনাস্বাদিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যেন কাজল-বৌ'এর মুখখানি। পরিপূর্ণ হয়ে সব এই স্বীকৃতি তার চিরতৃষ্ণিত মনে দিল অনন্তর সান্ত্বনা। কাজল-বৌ'এর চোখ দুটি ছল-ছল করে এলো। বললে, সত্যি বলছো তোমার মনের কথা? আমি লক্ষ্মী তো তুমি কী?

আনন্দ বললে, তুমিই বল, আমি কি!

তুমি? কাজল-বৌ খানিক ভেবে বললে, তুমি একটি উড়ো পাখী। খাঁচার ঘর তোমার জন্যে নয়।

আনন্দ হাসতে লাগলো। বললে, তার চেয়ে বল—লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলে।

কাজল-বৌ বললে না না ওটা গালা-গালি হয়ে গেল। গালাগালি তোমাকে আমি কম দিইনি। কিন্তু সে বয়স আর নেই। লক্ষ্মীমন্ত হতে পারেনি বলে লক্ষ্মীছাড়া হতে যাবে কেন দুঃখে? উড়ো পাখী তুমি, তোমাকে তো আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম আকাশে। সেখানে থাকতে তো পারোনি, ঘুরে ফিরে আবার সেই ছোট্ট বাসাটিতে ফিরে এসেছ।

এসেছি তোমার ভালবাসার টানে। তোমার ভালবাসা না পেলে আমি যে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে। আমি উদাসীন হতে পারি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই।

কাজল-বৌ বললে, তুমি যে শিল্পী। শিল্পীরা উদাসীন হয়েই থাকে।

সেই উদাসীন শিল্পীকে ভাল-বেসেছিলে তুমি। তাই তোমার এই দুঃখ।

হায় রে নিরাসক্ত শিল্পী! আনন্দ মনে-মনেই বললে, লক্ষ্মীর কৃপা তুমি পাবে না কোনোদিন।

আনন্দ হালদার আসবার পর কাজল-বৌ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বসুন্ধরার বিয়ের কথা আর একটি বারও মুখে আনলে না। যার মেয়ে তারই হাতে ফেলে দিলাম। সে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

আনন্দকে বললে, কোন-কিছু ভাবতে বারণ করেছে যখন, তখন আর ভাববো না।

এই বলে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্বামীর সেবাযত্ন করতে লাগলো প্রাণ-পণে। বসুন্ধরাকে বললে, অনেকদিন পরে তোর বাবা এসেছে বাড়ীতে। দেখিস যেন তার কোনও কষ্ট না হয়!

আনন্দ যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

এ কি করছো কাজল-বৌ, তোমরা দুই মা-মেয়ে আমার পেছনে এমন করে কেন লাগলে বল তো?

কাজল-বৌ বললে, কেন, কি মনে হচ্ছে তোমার?

মনে হচ্ছে আমি যেন গুরুদেব এসেছি তোমাদের।

কাজল-বৌ বললে, সত্যি বলছি—তোমাকে ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে আমার।

অনেকদিন পরে এলাম কিনা, তাই—

না, তা নয়। মনে হচ্ছে তুমি যেন নিজেকে ভেঙেচুরে আবার নতুন করে গড়ে ফেলেছো। এই মানুষটিকেই আমি খুঁজেছিলাম।

হেসে বলেছিল আনন্দ হালদার, আমি সেই আনন্দ হালদারই আছি কাজল-বৌ।

কাজল-বৌ জোর করে বলেছিল, না নেই। সে হালদারকে আমি ভালবেসে-ছিলাম, কিন্তু শ্রদ্ধা করিনি। এখন আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়, তবু কেমন যেন একটি অনাবিল আনন্দে এই তিনটি প্রাণীর কেটে গেল প্রায় মাসাধিক কাল।

সুবচনীকে চিঠি লিখেছিল বসুন্ধরা লিখেছিল, বাবা এসেছে।

সুবচনী জবাব দিয়েছে। লিখেছে, বাবাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিস। অনেকদিন দেখিনি বাবাকে। দেখতে ইচ্ছে করে।

আনন্দ বলেছিল, যাব।

কিন্তু কে জানতো তাকে এমন করে যেতে হবে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একদিন কাজল-বৌ বললে, আমার বিছানাটা পেতে দে তো বসুন্ধরা, শরীরটে কেমন যেন খারাপ মনে হচ্ছে।

বসুন্ধরা তার কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, তেমন গরম বলে মনে হলো না। বললে, কই জ্বর তো আসেনি!

এখনও আসেনি। কিন্তু আসবে।

রাত্রে কিছু খেলে না কাজল-বৌ।

সকালে উঠে বসুন্ধরা দেখলে তার মার সারা গা যেন আগুন। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। বাবা কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে সে বুঝতেও পারেনি।

খানিক পরেই আনন্দ হালদার বাড়ী ঢুকলো ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে।

—মার কখন জ্বর এসেছে বাবা?

—রাত বারোটার পর।

বসুন্ধরা বললে, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আনন্দ বললে, সারারাত বকেছে। ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন।

রাত্রে জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে লাগলো কাজল-বৌ।

—বসুন্ধরাকে ধর ধর—পড়ে যাবে যে!

—তা আমি কি করবো বল। মেয়েটা এমনিই।

খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো কাজল-বৌ। কি বলে কিছুই বোঝা যায় না। অস্পষ্ট প্রলাপ। মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো বসুন্ধরা। আনন্দ বললে, এবার তুই শুয়ে পড় মা। আমি বসি। অক্লান্ত ভাবে সেবা করলে বাপ আর মেয়ে।

তিনদিনের দিন ডাক্তার বুঝতে পারেনি, কিন্তু আনন্দ বুঝতে পারলে, কাজল-বৌ আর বাঁচবে না। বসুন্ধরাকে বোঝাতে আরম্ভ করলে, মানুষকে এমনি করে একদিন চলে যেতে হয় মা, মানুষ চিরদিন থাকে না।

তাহ'লে তুমি কি বলছো বাবা, মা আর বাঁচবে না?

না।

বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

দাঁতে দাঁত চেপে আনন্দ জোর করে বললে, না। তোমার মা অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

বসুন্ধরা আর থাকতে পারলে না সেখানে। ছুটে পালিয়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে গিয়ে খানিকটা কেঁদে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলে।

কাজল-বৌ মারা গেল চারদিনের দিন সকালে।

মেয়েটা পাছে কাতর হয় তাই আনন্দকে চুপ করে থাকতে হলো।

বসুন্ধরা যতখানি কাতর হবে ভেবেছিল, ততখানা কাতর অবশ্য হলো না। অনেক কান্নাই কাঁদলে সে, কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে পড়লো না।

বাড়ীখানা খাঁ-খাঁ করছে।

কাজল-বৌ নেই।

বাড়ীতে বাপ আর মেয়ে।

যেমন পারলে চারটি রান্না করলে বসুন্ধরা। বাপকে খাওয়ালে। নিজেও খেলে। তারপর দিদিকে চিঠি লিখলে, দিদি, আমাদের মা আর নেই।

সুবচনীকে চিঠি লিখে বসুন্ধরা তার বাবাকে নিয়ে পড়লো।

ঘর-সংসারের কাজ করে আর বলে, আচ্ছা বাবা, মা এখন কোথায়?

আনন্দ বললে, কোথাও নেই। যে দেহটা তোমাদের মা ছিল, সে দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন তোমাদের মা আছে তোমাদের স্মৃতিতে। এখন তোমরা সেই স্মৃতির পুজো করবে। তোমরা যে অকৃতজ্ঞ নও, তোমরা যে মানুষ—তাই প্রমাণ করবে তার শ্রাদ্ধ শান্তি করে।

যদি না করি?

না করলেও তার কিছুই এসে যাবে না।

তাহ'লে মা আর কিছু দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না, আমাদের সঙ্গে তার আর কোনও সম্বন্ধই নেই?

না। যতদিন দেহ ছিল ততদিন সবই ছিল, চোখ ছিল, কান ছিল, ইন্দ্রিয় ছিল। সেই দেহটাই ছিল তোমাদের মা। এখন সে বিদেহী আত্মার সঙ্গে কারও কোনও সম্বন্ধ নেই। সে আর তোমাদের মা নয়।

সে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে তো বাবা?

আনন্দ বললে, ও-রকম প্রশ্ন করতে করতে শুনলে জন্মান্তর রহস্য বুঝতে পারবি না বসুন্ধরা। এইখানে এসে বোস্, মন দিয়ে শোন্ ভাল করে—বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বসুন্ধরার বুঝবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। চা তৈরি করছিল সে। চায়ের কাপ দুটি হাতে নিয়ে আনন্দর কাছে

ওকে বসতে কে বলবে। ও যে কত বড় তা ও নিজেই জানে না।

ডাক্তার বলছে, ওর ৩৭ কি ৩৮ বছর বয়স। অথচ ও ছোট্ট একটি কিশোরী। বসন্তরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দৃষ্টি ওর মুখে থমকে গেল। প্রথম ছেলেটি ওদের একজন সুবক্তা। প্রথম একটি সম্বোধন। তোমাদের চোখে, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, স্বভাবে, চালচলনে, কথা বলার ধরনে খুব ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে তোমাদের বয়সের আর মানে। তার মানেই তোমরা অমানুষের সন্তান। আর কেউ নয়। অথচ অমানুষের শাস্তি বলছে পূর্বজন্মে তোমরা অন্য কেউ ছিলে।

বসন্তদের বলছে, এ কেমন করে হয় স্যার? এতক্ষণ যা বললেন তাতে তো বুঝতে পারছি না তারা অমানুষের মধ্যে ঢুকলো কখন? আর কেমন করেই বা ঢুকলো?

ডাক্তার বলছে, ঢুকলো প্রকৃতির নিয়মে। ঢুকলো তোমাদের অজান্তে ভাল হয়ে। তাই তোমরা কোনদিন বুঝতে পার না। বুঝতে পার না বলেই ওকে বলা হয় অভিশাপ। তোমরা দুটি বোন—

ছেলেটি এই পর্যন্ত বলে থামল। ওর চোখে এক ঝলক অশ্রু। কিন্তু তোমাদের সুরক্ষার জন্য ওকে কঠিন হতে হবে।

ওকে ধরে ফেলে বসন্তদের উঠতে হবে বারান্দা করতে হবে।

আমি চাঁদ বলে যাচ্ছি ৭৫৮, বারান্দা উঠছে।

ডাক্তার বলছে, ৭৫৯ মন্দির উঠছে। ৭৬০ কোরে না কোরে না। মনের আকাশ অথবা চলে যায় এই জগতের নিচে।

ছেলেটি এবার ওর ভিতর থেকে নিয়ে। সাদা একটা খাম।

মন্দির ডাক্তার অনেক কান্নাই কাঁদলো অনেক কথা বলছে অনেক দুঃখ করছে সব চেয়ে বড় দুঃখ, তার এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমাদের অভিশাপ দিতে হচ্ছে।

ছেলেটি বলছে, ডাক্তার আমাদের সুরক্ষার জন্য।

এই বলে সে খুলল চিঠিটা। তারপর পড়তে লাগল।

বসন্তদের বলছে, ওকে ছাড়া চলবে না। ওকে ছাড়া ওরা বাঁচবে না। ওকে ছাড়া ওরা কিছুই করতে পারবে না। ওকে ছাড়া ওরা কিছুই করতে পারবে না।

এই বলে সে খুলল চিঠিটা। তারপর পড়তে লাগল।

বসন্তদের বলছে, ওকে ছাড়া চলবে না। ওকে ছাড়া ওরা বাঁচবে না। ওকে ছাড়া ওরা কিছুই করতে পারবে না। ওকে ছাড়া ওরা কিছুই করতে পারবে না।

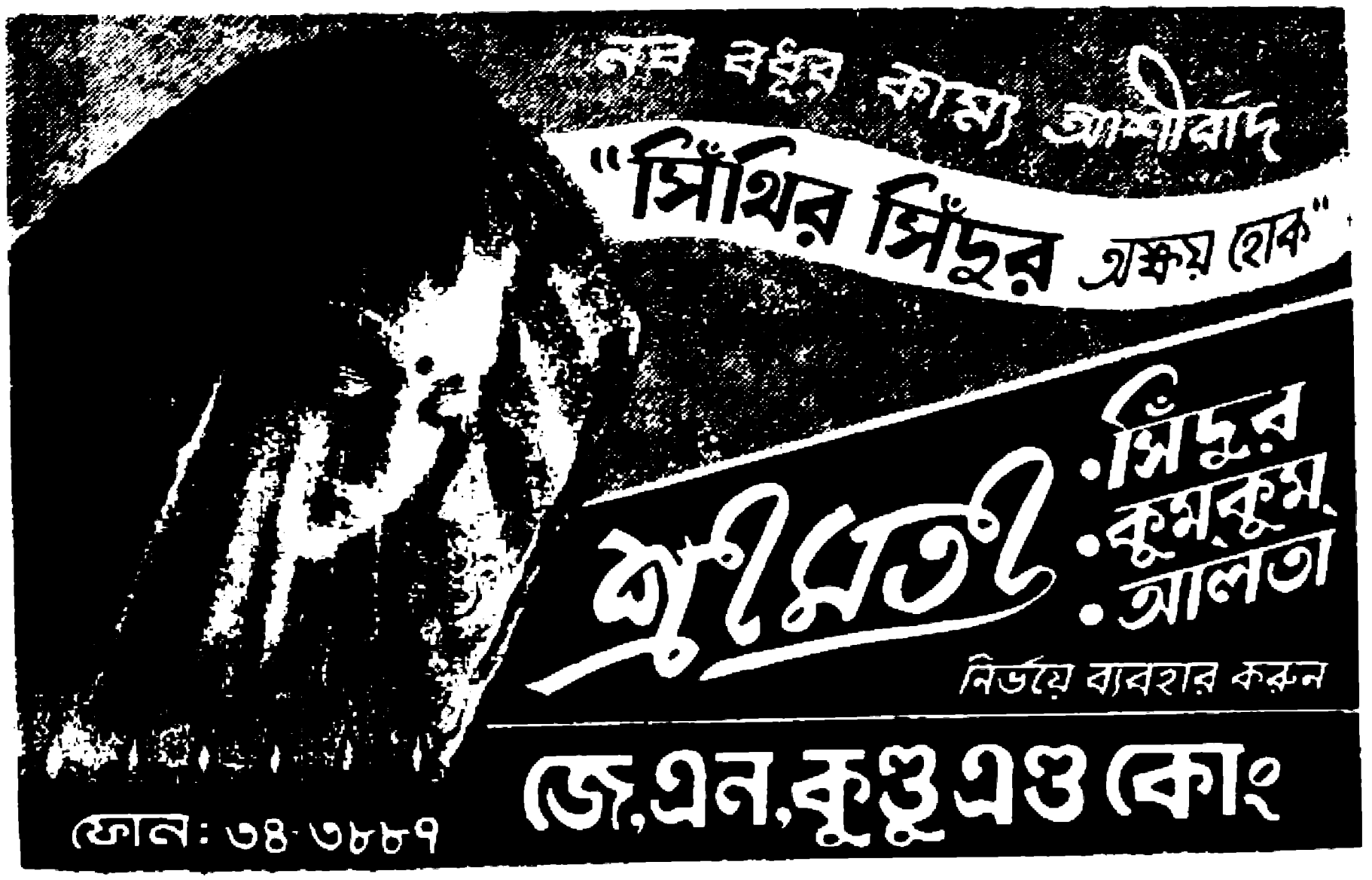

সে হারামজাদা চুরি করে ফুটিনাশি করে দেবে। তা করুক না চুরি। তাতে তোমার কি। বুড়োর মেলা টাকা।

স্বলন বসেছিল আনন্দর কাছে। বললে, শুনুন, আপনার মেয়ের কথা শুনুন। বুড়ো আমাকে নিজের ছেলের মত দেখে, তার ভাল আমাকে দেখতে হবে না?

সুবচনী বললে, ওর কথা শুনো না বাবা, বুড়ো দুটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর ও একেবারে গলে জল হয়ে যায়। ওখানে আর-একটা ধান-কল হয়েছে, ওকে হাতে পায়ে ধরে সাধাসাধি করছে: বলছে—একশ' পাঁচশ টাকা মাইনে দেবো, তা' ও যাচ্ছে?

স্বলন বললে, থামো থামো, ও-রকম নিমকহারামী করতে বোলো না আমাকে।

সুবচনী চেঁচিয়ে উঠলো: এইটে নিমকহারামী হলো?

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, বসুন্ধরা তাকে তুলে নিয়ে গেল রান্না-ঘরে। —ছেলেরা ঘুমিয়েছে, এই সময় তুই চারটি খেয়ে নে দিদি।

কি রেঁধেছিস, কই দেখি!

সুবচনী রান্না দেখছিল, বসুন্ধরা বললে, তুই খুব সংসারী হয়েছিস দিদি।

না হলে চলবে কেন লা! তিন-তিনটে ছেলে হয়েছে, আরও কটা হবে তার ঠিক নেই। তাও ভগ্নিপতি জমি-জমা পুকুর বাগান বেশ ভালই আছে তাই এখন কিছু ভাবতে হচ্ছে না: কিন্তু এর পর? আরও দুটো পাঁচটা হলে তখন কি হবে?

বসুন্ধরা দিদিকে খেতে বসিয়ে বললে, আর দুটো পাঁচটা চাস্ না দিদি, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর্। আমি তো একা থাকতে পারব না, তুই এইখানে এসে থাক্। জামাইবাবু মাসে-মাসে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাবে। অসুখ বসুখ হলে তাদেরকে আমরা দুবোনে ঠিক মানুষ করে তুলতে পারব।

এই মরেছে! মায়ের রোগ দেখছি তোকেও ধরেছে বসুন্ধরা। তুই ছোট ছিলি তুই জানিস না, মা আমাদের বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ী থেকে ছেলেপুলে হবার ভয়ে। তুই আমাকে মায়ের পাটে বসাতে চাস্?

বসুন্ধরা সেকথার জবাব দিল না। চুপ করে রইলো।

সুবচনী বললে, তোকে অতসব ভাবতে হবে না। সে সব আমরা পরা-মর্শ করেই এসেছি। তোর বিয়ে দিতে হবে না?

বসুন্ধরা এবারও চুপ করে রইলো।

কি রে কথা বলছিস না যে?

বসুন্ধরা বললে, বিয়ে আমি করব না।

বিয়ে করবি না তো কি করবি? ছি! ও-কথা বলতে নেই। আমি বড় বোন—বেঁচে যখন রয়েছি তখন আমাকেই সব করতে হবে। আমাদের বাপ তো ওই!

এই বলে খানিক থেমে আবার বললে, মরবার সময় মায়ের সঙ্গে যদি আমার দেখা হতো তো দেখতিস মা আমার হাতে ধরে বলতো—ছোট বোনটা রইলো—ওকে দেখিস্।

বলতে বলতে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে সুবচনী।

দিদির কান্না দেখে বসুন্ধরার চোখ দিয়েও টস্ টস্ করে দুফোঁটা জল পড়লো।

তিন ছেলের মা সুবচনীকে দেখে বুঝবার জো নেই যে তার ছেলেপুলে হয়েছে—এমনি যৌবন মেয়েটার। কিন্তু মুখে একেবারে হয়ে উঠেছে পাকা গিন্নি। বাপ্‌কে বললে, শোনো বাবা, মাকে তো চিরটা কাল জ্বালিয়েছ। তাও ভাগ্যি ভাল যে মরবার সময় দয়া করে একটিবার দেখা দিলে। এখন বল তুমি কি করবে! আবার পালাবে না থাকবে?

আনন্দ চোখ বুজে বললে, বড় কঠিন প্রশ্ন মা।

আবার তক্ষুনি চোখ চেয়ে সুবচনীর কাঁধে হাত রেখে বললে, আমি এক্ষুনি কি করব তা আমি জানি না।

এই দ্যাখো, সাধু-সন্ন্যাসীর মত কথাও বলতে শিখেছ। তুমি জানবে না তো কে জানবে?

আনন্দ বললে, আমার ভাগ্য-বিধাতা। তাঁর হাতে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি যখন যা বলেন আমি তাই করি।

সুবচনীর বড় বড় চোখ আরও বড় বড় হয়ে গেল। অবাক্ হয়ে তার বাবার মুখের দিকে একবার তাকালে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলে স্বলন কাছাকাছি কোথাও রয়েছে কিনা। দেখলে নেই। তখন বললে, অতিথ-ফকিরদের মতন গাঁজা-টাজা খাও নাকি?—আচ্ছা বেশ, তোমার সেই তিনিকে জিজ্ঞাসা করো। আমি ততক্ষণ না হয় এইখানে বসি।

আনন্দ হাসলে। —তুই সেই সুবচনীই আছিস দেখছি!

হ্যাঁ, সেই। সুবচনী থাকবার জো আছে? বিয়ের তো একটা কাল-খোঁড়ার হাতে তুলে! তারপর মেয়েটা হলো কি বাঁচলো কেউ একবার ফিরেও তাকালে না।

আনন্দ বললে, সুখে-শান্তিতে আছ তো মা, তাহলেই হলো।

সুবচনী বললে, সে আছি কার জোরে বাবা, নিজের জোরে। আমি শক্ত না হলে তোমার জামাইটি কি কিছু করতো নাকি? ও শুধু ভূতের মত খেটেই মরতো। তা হ্যাঁ, পরের ছেলে, নিন্দে করবো কেন? খাটতে পারে তোমার জামাই। খেটে খেটে সুখে রক্ত তুলে দিলে। এত যে বলি, দিনরাত খাটছো, একটু দুধ খাও। তা শোনে আমার কথা? একটা কথা শোনে না। কোনদিন এক ছটাক দুধ আমি খাওয়াতে পারলাম না ওকে। খালি খালি বলে—ছেলেদের খাওয়াও। আচ্ছা তুমিই বল তো বাবা, ছেলেরা কত খাবে? দু'দুটো গাইএ দুধ দিচ্ছে, আট সের করে দুধ। পাশের বাড়ীর মাসীমাকে আমি বিক্রি করি দু'সের।

বসুন্ধরা বোধকরি শুনছিল দিদির কথাগুলো। পাশের ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, দুধ তুই বিক্রি করিস দিদি?

হ্যাঁ করি। বড়লোকের বাড়ী দেখে বাবা তো দেয়নি আমার বিয়ে! তাই দুধ বিক্রি করি, আম বিক্রি করি, কাঁঠাল বিক্রি করি, কলা বিক্রি করি, পুকুরের মাছ বিক্রি করি। আরও কি করেছি শুনবি? বিয়ের সময় জমি ছিল মোটে পাঁচ বিঘে। এখন জমি কিনেছি পঁচিশ বিঘে, দুটো পুকুর কিনেছি, বাগান কিনেছি। এই সব মাকে আমার দেখাবার ইচ্ছে ছিল রে, কিন্তু হলো না আমার কপাল মন্দ, আর হলো না আমাদের এই সন্ন্যেসী বাপটির জন্যে।

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এলো।

আনন্দ হাসতে হাসতে বললে, আমার জন্যে কেন হলো না মা?

তুমি এসে বাড়ীতে থাকবে, তবে তো মা-ষোলকে নিয়ে যাব, নইলে এই ফাঁকা বাড়ী ফেলে মা আমার যেতো কেমন করে? কপালগুণে যদি-বা এখন এলে তো মা আমার চলে গেল।

আবার খানিকটা কাঁদলে সুবচনী।

তারপর আঁচল দিয়ে চোখদুটো মুছে তার বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কই, কি ঠিক করলে তুমি বল বাবা।

আনন্দ বললে, না মা, কিছুই এখনও ঠিক করিনি।

থাক্ আর তোমাকে কিছুই ঠিক করতে হবে না। আমি কি ঠিক করেছি

শোনো। বসুন্ধরাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ীতে। তোমাকেও আমি নিয়ে যেতাম বাবা, সারাজীবনটা তো ছাটে-মাঠে কাটালে, বুড়ো বয়েসে তোমারও একটু সেবার দরকার, কিন্তু এ-বাড়ী ছেড়ে যদি সবাই চলে যাই তো এ-বাড়ীতে ভূত নাচবে।

আনন্দ বললে, খুব ভাল। আমি এই বাড়ীতেই থাকবো।

বসুন্ধরা বলে উঠলো, বলে তো দিলি খুব! বাবাকে রান্না করে দেবে কে?

সুবচনী বললে, তুই দিবি? শ্যামানন্দপুর থেকে রান্না করে দিয়ে যাবি রোজ! কাঁচ খুঁকি! সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ দেখে লোকে হয়ত' বাড়ীতে ডেকে দুদিন দুবেলা খাইয়েছে বাবাকে, তাই বলে বারোমাস তিরিশ দিন খাওয়াবে নাকি? হ্যাঁ বাবা, নিজে রান্না করে তোমাকে খেতে হয়নি?

আনন্দ বলল, হয়েছে। কতদিন রান্না করে খেয়েছি।

ওই শোন্ বসুন্ধরা!

তাহলে এই কথা রইলো বাবা, তুমি রইলে এইখানে। বসুন্ধরাকে আমি নিয়ে গেলাম। তারপর সেই অঘ্রাণ-পৌষ মাসে মাঠের ধান যখন খামারে উঠবে তখন আমি একবার আসব, এসে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। দেখো যেন ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যেয়ো না। চাষের ফসল তাহলে আর কিছু পাওয়া যাবে না।

আনন্দ হাসতে লাগলো। বললে, না না আমি কোথাও যাব না। তোরা যা।

বসুন্ধরাকে নিয়ে সুবচনী চলে গেল।

কুলটিকরী গ্রামে রইলো আনন্দ হালদার তার কাজল-বৌ-এর স্মৃতি নিয়ে।

ট্রেণ থেকে যখন নামলো তারা, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

"নিয়েছে তো একটা কানা খোঁড়ার হাতে তুলে!"

বসুন্ধরা কখনও ট্রেণে চড়েনি। শহর দেখেনি।

সুবচনীর বড় ছেলে অরুণ তার মাসীকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল। বসুন্ধরার কোলে ছিল সবচেয়ে ছোট তরুণ। সেও কম দুরন্ত নয়। সবে সে হাঁটতে শিখেছে। মাসীর কোল থেকে নামবার জন্য সে ছটফট করছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমে সেও হাঁটবে।

বসুন্ধরা আলো দেখবে, শহর দেখবে না ছেলে সামলাবে?

ষ্টেশনটি ছোট হলে কি হবে। ইলেকট্রীকের অনেক আলো জ্বলছে।

বসুন্ধরা চুপিচুপি তার দিদিকে বললে, একেই বিজলী বাতি বলে, না দিদি?

সুবচনী বললে, হ্যাঁ।

বলেই সে দাঁড়ালো। ছোট ছেলেটা ছিল সুবচনীর কোলে।

ওগো শুনছো?

অনেক খানিকটা কুলির পিছু-পিছু। ডাক শুনে তাকেও দাঁড়াতে হলো। সুবচনী তার কোল থেকে বসুকে নামিয়ে দিয়ে বললে, নাও একে। কেমন স্বর্গপুরীর মানুষ সামলাও! ছেলেগুলোকে আমাদের কাছে ঠেলে দিয়ে নিজে বেমক্কা বিড়ি টানতে টানতে চললো। আবার বিড়ি টানছো?

বিড়িটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বসুকে কোলে তুলে নিয়ে অরুণ বললে, তোমাদের গাঁয়ে যে সিগ্রেট পাওয়া গেল না।

ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে মতিলালের দোকান থেকে নাও। নিজের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে চাইবে না কিছুতেই। বিড়ি টানলে মাইনে পাবে কখনও?

বলেই সে বসুন্ধরার কোল থেকে তরুণকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বললে, নে এবার তুই দেখতে দেখতে চল্। ছেলেটা বিরক্ত করছে তোকে। ওগো শুনছো?

আবার দাঁড়াতে হলো অরুণকে।

দুটো সাইকেল-রিক্সা করবে। ছেলেদের নিয়ে একটাতে তুমি চড়বে, আর একটায় আমরা দুবোনে চড়বো। বসুন্ধরাকে দেখতে দেখতে নিয়ে যেতে হবে।

বসুন্ধরা বললে, তবে যে মা বলতো তোর পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী!

সুবচনী বললে, পাড়াগাঁ আর রইলো কোথায়? প্রথম যখন আসি এখানে, তখন ছিল। তবে আমাদের সেটা এখনও পাড়াগাঁ আছে। এখনও আমরা পুকুরে চান করি, টিপ্-কলে জল ধরি, বাড়ীতে লণ্ঠন জ্বালাই।

বসুন্ধরার মুখে হাসি ফুটলো। —পুকুরে চান করিস? সাঁতার কাটলে কে না তো কেউ?

সুবচনী বললে, বকবে আবার কে? ও তো মাসীমার পুকুর। সেই যে ধীরু-

ঠাকুরপোর কথা লিখেছিলাম তোকে—এই মাসীমার ছেলে ধীরু-ঠাকুরপো।

ধীরু-ঠাকুরপো?

নামটা বেশ ভালই মনে আছে বসুন্ধরার। বিয়ে তার এতদিন নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। কথাটা তার জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিল, সুবচনী নিজেই বললে, বিয়ে বোধহয় আসছে মাসেই হবে। পাকাদেখা হবে শুনে এসেছিলাম।

ষ্টেশনের বাইরে সারি সারি দোকান। সাইকেল-রিক্‌শার চড়তে চড়তে বসুন্ধরা বললে, এইটে বুঝি তোদের বাজার?

সুবচনী বললে, না এটা আমাদের বাজার নয়। গাঁয়ে আমাদের দোকান আছে, হাট আছে। আর ওই যে দেখছিস—খুব জোর আলো জ্বলছে, ওইটে তোর জামাইবাবুর উনিশশো রাইস মিল। ওইখানে ও কাজ করে। আবার এইদিকে তাকা। —আঙুল বাড়িয়ে সুবচনী দেখিয়ে দিলে, ওইখানে আবার আর-এক মুখপোড়া আর একটা খানকল করেছে। ওরাই ওকে ডাকছে। বলছে, দেড় শ' টাকা পর্যন্ত মাইনে দেবে। টাকা থাকলে আমরাই একটা ধানের কল বসাতাম। খুব ভাল। ঢেঁকি-টেঁকি সব উঠে গেল তো! বাঁচা গেল। রাঙা-রাঙা ভাত আর খেতে হবে না কাউকে! আমার বাড়ীর ভাত দেখবি সাদা ধপ্‌-ধপ্‌ করছে একেবারে পদ্মফুলের মত।

এমনি করে কথা বলতে বলতে ষ্টেশন-বাজার পেরিয়ে সাইকেল-রিক্‌শা গ্রামের পথ ধরলে।

ও মা এ কি হলো? আলোগুলো নিবিয়ে দিলে যে!

দূর মুখপুড়ী! এ যে আমাদের গাঁয়ের রাস্তা। এখানে আলো কোথায় পাবি?

বসুন্ধরা বললে, গাঁগুলো বুঝি অন্ধকার?

অন্ধকার আর বেশিদিন থাকবে না। এখানে অমনি বিজলীবাতি দেবে বলছে।

তারপর খানিকটা ভাল, খানিকটা খারাপ রাস্তার ওপর দিয়ে, ডানদিকে বেঁকে বাঁদিকে ঘুরে আবার খানিকটা সোজা গিয়ে দু'খানা রিক্সা-গাড়ীই এসে পৌঁছলো ঝুলন চক্কোত্তির দরজায়।

ব্যস্, এবার নামতে হবে। এই আমার বাড়ী।

জোরে ডাকা বন্ধ। ঝুলনের পকেটে চাবির গোছা। রিক্সার ভাড়া মেটাবে, তারপর তালা খুলবে। কোলে ছেলে নিয়ে ঝুলনের অসুবিধে হচ্ছিল।

সুবচনী বললে, ছেলেদের দাও আমাদের কাছে। তুমি ভাড়া মিটিয়ে, দোরের তালা খুলে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই হ্যাজাক্ বাতিটা জ্বালাও।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোরের তালা খুলতে খুলতে ঝুলন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, লখাই! লখু! লখু!

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, লখু কে দিদি?

লখু আমাদের মুনিষের ছেলে। গরুগুলো দেখে, ঘরের কাজকর্ম করে দেয়। ওকেই রেখে গিয়েছিলাম বাড়ীতে।

ঝুলন বললে, লখু ওর বাড়ীতে খেতে গেছে বোধ হয়।

ঘর খুলে ঝুলন লণ্ঠন জ্বালছিল।

সুবচনী বললে, ওই ন্যাখ্ লণ্ঠন জ্বালছে। হ্যাজাক্ জ্বালতে বললাম না?

ঝুলন বললে, হ্যাজাক্ কি হবে?

শোনো কথা! বসুন্ধরা এলো, ওকে সব দেখাবো না? তাছাড়া পুকুরে যাব, নতুন জায়গা, ও যদি আছাড় খেয়ে পড়ে? কেন জ্বালবো, কি হবে, হেনো-তেনো সাত-সতেরো জিজ্ঞাসা না করে আমি যা বলছি তাই কর। হ্যাজাক্‌টা আমাদের কাছে রেখে লণ্ঠন নিয়ে তুমি পুকুরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, আমি চা করে দিচ্ছি। —আর হ্যাঁ, কান দিয়ে শোনো, পুকুরে যাবার আগে উনোনে আগুনটা দিয়ে দাও। লখু দুধ রেখেছে কিনা দ্যাখো। গরম করে ছেলেদের খাইয়ে দিই। নইলে একদুনি ঘুমিয়ে পড়বে ওরা। বড় বড় মাগুর মাছ জিয়োনো আছে চারটে। লখু যদি জল না পাল্‌টেছে তো দ্যাখো হয়ত মরেই গেছে। আমরা এ কদিন বাড়ীতে ছিলাম না—চারদিক ঘুরে ফিরে একবার দ্যাখো—সব জায়গায় সব জিনিসটি ঠিক আছে কিনা!

বসুন্ধরা হ্যাজাক্ বাতি কখনও দেখেনি। একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। বাতিটা জ্বলে উঠতেই দিনের মত আলো হয়ে গেল।

এ তো লণ্ঠনের মত দিদি। হাতে করে নিয়েও যাওয়া যায়।

সুবচনী বললে, ওইটিই সুখ আমাদের। কলকাতার কাছেই থাকি তো!

কলকাতা তুই দেখেছিস দিদি?

দেখেছি। একদিন কালীঘাট গিয়েছিলাম আর একদিন মাসীর সঙ্গে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বর—তাও ভাগ্যিস্ ধীরু ঠাকুরপো নিয়ে গিয়েছিল। তোর জামাই-বাবুর কি ছুটি আছে যে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে!

বসুন্ধরা বললে, আমাকে একদিন কলকাতা দেখিয়ে দিস দিদি।

সুবচনী বললে, দেখাবো দেখাবো—সব দেখাবো।

বলতে বলতে তার নজরে পড়লো—জামা খুলে গামছা আর লণ্ঠন নিয়ে ঝুলন বেরিয়ে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছ? ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলে না? চরের জলটা চাঁড়িয়ে দিয়েই আমরা পুকুরে যেতাম তাহলে।

লণ্ঠন নামিয়ে ঝুলন ষ্টোভ জ্বালাতে বসলো।

ছেলে তিনটি আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। অরুণ বরুণ দুজনে মিলে ষ্টোভটি আনতে যাচ্ছিল। অরুণ বললে, তুই বোস, আমি আনবো।

দাদার কথা শুনে বরুণ বসে পড়লো।

বসুন্ধরা বললে, তরুণ যে ঘুমিয়ে পড়লো দিদি।

ঘুমোক্। দুধ খেতে বললেই উঠবে।

বসুন্ধরা বললে, ভারি সুন্দর ছেলে ঘরখানি দিদি।

দাঁড়া এখনও তো কিছু দেখিসনি তুই। সকাল হোক্, সব দেখাবো।

সুবচনী বললে, খুব কষ্ট করে সব করতে হয়েছে। একটি একটি করে সব করেছি আমি।

জামাইবাবুর কথা তুই একটিবারও বলছিস না দিদি। জামাইবাবু কিছু করেনি?

ষ্টোভ জ্বালতে জ্বালতে ঝুলন তার একটি চোখ দিয়ে বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলে।

তা না বললে পাপ হবে। খেটেখুটে ও টাকা এনে দিয়েছে তবে তো করেছি।

সুবচনী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা তার উজ্জ্বল করে বললে, তা অমন করে শালীর দিকে মিট্ মিট্ করে তাকাচ্ছো কি, তোমার নিন্দে আমি করি না কারও কাছে। —তবে হ্যাঁ, একটি অভাব আমার এখনও ঘোচেনি। আর একখানি ঘরের অভাব। ও অবশ্য চেয়েছে ঘর করতে, আমিই করতে দিইনি। সে টাকাটা অন্য-দিকে খরচ করেছি।

ঘরের কথায় বসুন্ধরা অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। দিদি তাকে নিয়ে তো এলো এখানে, কিন্তু বয়েসটা তার এমনিই যে একঘরে সবাই মিলে শোবারও উপায় নেই। শুধু তাই

সৌন্দর্য্য রসিকা
যুগে যুগে.....

... এবং
Trojan
ট্রোজন
প্রসাধনী
সৌন্দর্য্য বিকাশে

এজেল কসমেটিক্স কর্পোরেশন
কলিকাতা - ১

BEEVAS/EX/13

জন্যে জামাইবাবুকে হয়ত দিনের পর দিন বাইরে শুতে হবে।

ট্রেনের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো বসুন্ধরার।

চোখ চেয়ে দেখলে, ঘরের দরজা জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। সকাল হয়নি এখনও। বাইরে গাছে গাছে দোয়েলকুলের পাখী ডাকছে।

দিদি বলছে, ওঠ্। পাঁচটার ট্রেনটা পেরুলো।

বসুন্ধরা গায়ের কাপড়চোপড় সামলে উঠলো। বললে, তোদের বুঝি ঘড়ি দেখতে হয় না।

সুবচনী বললে, না। আমরা ট্রেন দেখেই সব কাজ করি।

ঘরে স্টোভ জ্বলছে। ছেলেরা উঠছে। বিছানার ওপরেই তিন ভাই খেলা করছে।

কুলনের স্নান হয়ে গেছে এরই মধ্যে। কাঁধে গামছা নিয়ে মুড়ি খেতে বসলো কুলন।

বসুন্ধরা বললে, খুব খিদে পেয়ে গেছে বুঝি?

সুবচনী বললে, ও তো এক্ষুনি চা-মুড়ি খেয়ে কাজে চলে যাবে। খেতে আসবে সেই বারোটার সময়।

বসুন্ধরা বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। কাল রাত্রির অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পায়নি। চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। কত রকমের কত গাছ, কত রকমের পাখী, কুলন চক্কোত্তির রান্নাঘর, গোয়াল, খামার, বাঁদিকে একটা আম কাঁঠাল আর নারকেলের বাগান। কুলটিকরিতে একটা নারকেলের গাছ দেখা যায় না, আর এখানে কত নারকেলের গাছ। ঘাট-বাঁধানো এই পুকুরটা বুঝি দিদির ধীরু ঠাকুরপোর—আর এই ছোট্ট লোতলা বাড়ীখানি। ও মা, ওদেরও উঠোনে যে একটা মস্ত জামের গাছ। কালো কালো জাম থরে থরে রয়েছে ডিগডিগে। বসুন্ধরার ইচ্ছে করতে লাগলো—এক্ষুনি গাছে উঠে গিয়ে এক-আঁচল জাম পেড়ে নিয়ে আসে।

বসুন্ধরা, পুকুরের ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে কাপড় কেচে আসে। চা খাবি।

বসুন্ধরা তখন সদর দরজা খুলে সুমুখে ট্রেনের লাইন দেখছে। রাস্তার ধারে আর-একটা পুকুর। মনে হচ্ছে যেন পুকুরের পাড়ের ওপর দিয়েই লাইনটা চলে গেছে।

খুব ভাল লাগছে বসুন্ধরার।

কুলন কাজে বেরিয়ে গেল। ললিতের দুধ দুইলে।

ধীরুদের পুকুরে গিয়ে নামলো বসুন্ধরা। যেমন সুন্দর জল তার তেমনি নির্জন ঘাট। বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামতে নামতে সে অনেকখানি জলে নেমে গেল। গায়ের জামা কাপড় খুলে ফেলতেও কোনও লজ্জা নেই এখানে। কেউ দেখবে না।

সাঁতার কাটার লোভ সম্বরণ করে তাড়াতাড়ি উঠে এলো বসুন্ধরা।

দিদি ডাকছে।

সে কাপড় জামা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নে। দুধ দিতে যাব মাসীমাকে। না, আমি চা খাচ্ছি।

সুবচনী বললে, তোকেও নিয়ে যাব যে সঙ্গে করে! মাসীকে দেখিয়ে আনি। চুলটা ভাল করে আঁচড়ে নে।

সব চেয়ে ভাল যে-শাড়ীখানা ছিল বসুন্ধরার, মিলের সেই চওড়া ফুল-ফুল-পাড় শাড়ীখানি, সেইটি পরলে বসুন্ধরা। নিজের হাতের সেলাই-করা লাল পপলিনের জামাটি পরলে। তারপর কপালে একটি ছোট্ট সিঁদুরের টিপ পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, না দিদি আমি যাব না। আমার লজ্জা করছে।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে সুবচনী বললে, চা যে জুড়িয়ে গেল। —তা লজ্জাটা কিসের শুনি?

তুই আমার সেই চিঠিখানা দেখিয়ে দিয়েছিলি তোর ধীরু-ঠাকুরপোকে।

তা ধীরু-ঠাকুরপোকে দেখিয়েছিলাম দেখিয়েছিলাম; তার মাকে তো দেখাইনি।

চা খেতে খেতে বসুন্ধরা বললে, সেও তো আছে বাড়ীতে! দেখবে তো আমাকে!

কে? ধীরু-ঠাকুরপো?

হুঁ।

সুবচনী বললে, তোকে বলিনি বুঝি সেকথা। ধীরু-ঠাকুরপো তো থাকে না বাড়ীতে। কলকাতায় থাকে, শনিবার আসে আবার সোমবার চলে যায়। আজ তো বুধবার।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেরা কি করবে?

ওরা ঠিক থাকবে বাড়ীতে। এইটেকে নিয়ে যাব শুধু।

সুবচনী তার ছোট বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে। দুধের জাবনাটা বসুন্ধরা নিতে যাচ্ছিল, সুবচনী বললে, সে ওটা আমার হাতে দে। তুই থালি হাতে চল্।

ধীরুর বাড়ী যেতে হলে রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে হয় না। দুটো বাড়ীর মাঝখানে খাটো প্রাচীরটা কুলন চক্কোত্তির।

তারই মাঝখানে ছোট্ট একটা দরজার শেকল খুললেই ধীরুদের কুয়োতলা। আর সেই কুয়োর পাশেই প্রকাণ্ড একটা জামের গাছ। তার বাঁদিকে সান-বাঁধানো পুকুরের খিড়কি, ডানদিকে ছোট্ট একটু উঠোনের পাশেই বাড়ী।

সুবচনী বললে, শেকলটা খোল।

শিকল খুলে বন্ধ কপাট দুটো ঠেলতেই হাতে ধুলো লেগে গেল বসুন্ধরার। হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বসুন্ধরা বললে, ভাল কাপড়টা আজ মিছেই ভাঙলাম।

কেন যে সেকথা বললে সুবচনীর বুঝতে দেরি হলো না।

মুচকি একটু হেসে সুবচনী বললে, তা হোক্। শনিবার আমার একখানা ভাল শাড়ী দেবো তোকে।

বসুন্ধরা ফট্ করে একটা চড় মেরে বসলো দিদির পিঠে। বললে, আমি যেন সেইজন্যে বলছি!

মাসী কোথায় গো—মাসীমা!

কুলনের বৌ সুবচনীর গলার আওয়াজ মাসীমা ভাল করেই চেনে। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বুধের জায়গা হাতে নিয়ে।

তুমি যে কাল এসেছ বৌমা, তা আমি কাল রাত্তিরেই—

হঠাৎ বসুন্ধরার ওপর নজর পড়তেই মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইলো।

ও, এই বুঝি তোমার সেই বোন?

সেই বোন, মানে যে-বোনের এত প্রশংসা তুমি কর। যার কথা উঠলে কথা আর শেষ হতে চায় না!

হ্যাঁ মাসীমা, এই আমার সেই বোন। মা মরে গেল, কোথায় আর ফেলে রেখে আসবো এই সোমত্ত মেয়েকে, তাই সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম।

মাসীমা দুধটা ঢেলে নিলে নিজের পাত্রে।—হাঁরে, তোর জন্যে নিজে খেয়ে নিয়ে জল-টল ঢেলে দেয় না তো দুধে? তুমি যে-কদিন ছিলে না বৌমা, সে কদিন কি কষ্ট যে গেছে আমার তা আমিই জানি।

কেন মাসীমা? কি হয়েছিল?

হয়নি কিছু। সময়ে আসতো না, তাকলে সাড়া দিত না—এই আর-কি! ধীরু এলো তো বললুম—আধ সের দুধ বেশি দে। তা কিছুতেই দিলে না হতভাগা। বললে, আমার হিসেব-করা দুধ। মা এসে আমাকে বকবে। তা—বোনটির বিয়ের কথাবার্তা কোথাও কিছু হলো?

সুবচনীর মনে হলো যেন মাসী তাকে বিদ্রূপ করলে।

না মা, কোথায় আর হবে? ধীরু-ঠাকুরপোর সঙ্গে দিতে চাইলাম, তা তুমি তো দিলে না আমরা গরীব বলে। কেন, বৌ কি তোমার বাপ পতো?

খারাপ ভাল কথা কানে না তুলে, প্রজাপতির নির্বন্ধ, যেখানে কপালে ছিল সেইখানেই হলো। ধরো—অত বড়-লোকের একটিমাত্র মেয়ে, বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি বাপের যা কিছু সব ওই মেয়েই পাবে তার ওপর ধীরু চেয়েছিল লেখাপড়াজানা মেয়ে তাও হলো। এখন ভালয়-ভালয় বিয়েটি চুকে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। তা হাঁ রে—

কি যেন বলতে গিয়েও মাসীমা বললে না। দুধের জাবণাটা ঘরের ভেতর রাখতে গেল। বসুন্ধরা তখন চোরের কাছ থেকে সরে পড়েছে। বিয়ের কথা হচ্ছে, সরে তো যাবেই।

সুবচনী বললে, হাঁ রে বলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলে মাসী?

মাসীমা বেরিয়ে এসে বললে, হাঁ, বলছিলাম কি, নিয়ে তো এলে বৌনটিকে, ঘর তো একটি, কাল রাতে তোমরা সব একসঙ্গেই শুয়েছিলে তো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো সুবচনীর। সামান্য যা কিছু আছে তার, এতদিন তাইতেই সন্তুষ্ট ছিল সুবচনী। মনে হতো তার অভাব যেন কিছুই নেই। আজ যেন প্রথম তার মনে হলো সে দরিদ্র।

অরুণের বাপকে তো জানো মাসী, গাছতলায় শুতেও তার আটকায় না। কাল ওকেই দিয়েছিলাম বাইরে ঠেলে। একটা মাদুর বিছিয়ে বাইরের চালায় শুয়েই রাতটা দিলে কাটিয়ে। আমরা দু'বোনে শুয়েছিলাম ঘরের ভেতরে।

মাসীমা কি যেন ভাবলে। ভাবলে, তার এই বাড়ীটার ঘরগুলো সব খাঁ খাঁ করছে। অন্ধকার রাত্রে লাইনের ধারে শেয়াল ডাকে। রাত-বিরেতে জামগাছের তলায় কুয়োতলায় কেতে গা ছম্ ছম্ করে। ঝুলনের বৌ বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল, ধীরু ছিল না বাড়ীতে, মনে হচ্ছিল যেন জনমনুষ্যহীন এই নির্বান্ধব পুরীতে চোর-ডাকাত এসে সন্ধ্যেবেলায় যদি তাকে খুন করে দিয়ে যায় তো কেউ জানতেও পারবে না। তার চেয়ে—

শোনো বৌমা, ঝুলন বাইরে শুয়ে থাকবে আর তোমরা দুবোন ঘরের ভেতর শোবে—সে ব্যবস্থা একদিন চলতে পারে। তাই বলে তো বারো মাস চলে না।

সুবচনী বললে, তা তো চলে না মাসী, কিন্তু কি করবো বল। আর-একখানা ঘর করতেও তো টাকার দরকার।

মাসী বললে, তার চেয়ে এক কাজ কর। আমি তো একাই থাকি। তোমার ঘর যতদিন না হয়, সন্ধ্যেবেলা খাইয়ে-দাইয়ে ওকে আমার বাড়ীতে দিয়ে যেয়ো। আমার কাছেই শোবে।

সুবচনী কার মুখ দেখে উঠেছে আজ কে জানে। যে-মাসীর কাছ থেকে এতটুকু সুবিধে কেউ আদায় করতে পেরেছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই যে হলপ্ করে বলতে পারে। সেই মাসীর আজ এই অনুগ্রহে সুবচনী যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

কই রে, কোথায় গেলি বসুন্ধরা! বোন আমার খুব ভাল, বুঝলে মাসী। আমাকে দেখে ওকে বিচার কোরো না। আমি একটু ঝটপটে টাকটাকে চির-কাল। আর বসুন্ধরা আমাদের যেমন সুবুদ্ধি তেমনি ঠাণ্ডা।

বসুন্ধরা যে কত ঠাণ্ডা সে-কথা বুঝতে অবশ্য খুব বেশি দেরি হলো না। সুবচনীর রান্নাবান্না আছে, ঘরকন্নার কতকর্ম আছে, বসে বসে গল্প করবার কেউ নেই। সে তাই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাড়ীর দিকেই চলে যাচ্ছিল, জাম-গাছের তলাটা তখনও পেরোয়নি, হঠাৎ বসুন্ধরার গলার আওয়াজ: জাম খাবি দিদি? ভারি মিষ্টি জাম।

ওমা তুই গাছে উঠেছিস? নাম্ নাম্ শীগ্গির নাম্। মাসী দেখতে পেলে—

পেছনে ফিরে দেখে, মাসী দাঁড়িয়ে।

ওই দাখ্, পেড়ে দেবার লোক অভাবে গাছের জাম আমার গাছেই রইলো। ধীরু এসেছিল যেদিন, তোর ওই লক্ষ্মীছাড়াটাকে বললুম যে বাবা চারটি পেড়ে, তো শুনলে আমার কথা? বললে, বর্ষার পেছিল হয়েছে গাছটা, পা হড়্কে পড়ে যাব। বলেই ছুটে পালালো।

বসুন্ধরা বললে, ভল কাপড়টার জামের দাগ লাগলে আর উঠবে না দিদি, একটা গামছা-টামছা দে। মাসীমার জন্য ভাল ভাল জাম কিছু পেড়ে নিই।

সুবচনীকে কিছু বলতে হলো না।

মাসীই বললে, দিচ্ছি। দাঁড়া। নামিস্‌নে।

বলেই মাসী বোধকরি গামছা আনতে গেলে।

সুবচনী বললে, জাম পেড়ে দিয়ে তুই আয় বসুন্ধরা। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

মাসী গামছা আনলে। গামছাভর্তি জাম পেড়ে নিয়ে বসুন্ধরা নেমে এলো গাছ থেকে।

এত জাম পাড়লি কেন?

বসুন্ধরা বললে, সব জাম তো পেকে গেছে। পাখীতে আর বাদুড়ে খেয়ে সব নষ্ট করে দেবে। পরিষ্কার কুলো আছে বাড়ীতে?

কুলো কি করবি?

দেখুন না কি করি!

অতি যত্ন করে কুলো ধুয়ে জামগুলি ধুয়ে নুন মাখিয়ে রৌদ্রে শুকোতে দিলে বসুন্ধরা।

মাসী সব দেখলে চেয়ে-চেয়ে। বললে, ভালই হলো। আজ বুধবার। আর দুদিন বাদে শনিবারে ধীরু আসবে পাঁচটার গাড়ীতে, তখন বেশ মজে থাকবে জামগুলো। তা বাছা তোর দিদির জন্যে দুটো নিয়ে গেলিনে কেন এই থেকে? গাছে উঠে তোকে জাম পাড়তে দেখে গেল, বলবে মাসী দিলে না। ওর ভারি টাঁকিটেকে কথা!

বসুন্ধরা বললে, না, এতে কেউ হাত দেবে না বলছি। ওজন দিতে হয় আমি আবার পেড়ে দেবো।

কথাটা ভালই লাগলো মাসীর। কিন্তু গাছে উঠে জাম পেড়ে দিলে মেয়েটা, তার বদলে ওকে এক পেয়ালা চা অন্তত খাইয়ে দেওয়া উচিত।

চা খাবি তো বল্। আমি চা করতে যাচ্ছি। জল একটু বেশি নিই তাহ'লে।

বসুন্ধরা মুখ তুলে তাকালে মাসীর দিকে। বললে, উনোন ধরিয়ে চা করবেন?

হ্যাঁ বাছা, ওই উনোনেই দুধটা গরম করে রাখবো। তারপর নিজের জন্যে চারটি ভাতে ভাত বসিয়ে দেবো।

টালির-ছাউনী রান্নাঘরটা আলাদা। কুলো আনতে গিয়ে বসুন্ধরা সব দেখে নিয়েছে। চা খাবে কি খাবে না কিছু না বলেই বসুন্ধরা উঠে গেল সেখান থেকে।

থাক্‌গে। মাসী চা চিনির কৌটা আর দুধের ভেক্‌চিটা নিয়ে রান্নাঘরে এসে দেখে বসুন্ধরা উনোন ধরাতে বসে গেছে।

করলার উনোনটা ধরাতে গেলি কেন? কাঠের উনোনে চা করে নিলেই হতো।

বসুন্ধরা বললে, আপনি দুধটা এ সময় নিয়ে এলেন কেন মাসীমা? দুধে ধোঁয়া লেগে গেলে আর খেতে পারবেন না। দুধটা রেখে আসুন, যান।

আরে! মেয়েটা হুকুম করে যে! বিরজাসুন্দরী হুকুম সবাইকে করেই এসেছে চিরকাল। কারও হুকুম তাকে কোনোদিন তামিল করতে হয়নি। কাজেই সামান্য একটুখানি অনুরোধও তার কাছে কেমন যেন হুকুম-হুকুম মনে হয়।

দুধটা মাসী শেষ পর্যন্ত রেখেই এলো। কিন্তু এসে দেখে মেয়েটা চলে গেছে। এরই মধ্যে উনোনের ওপরে আঁচ উঠেছে। মেয়েটা তাহ'লে উনোন ধরাতে জানে!

কোথায় গেলি রে তুই? নামটাও তো মনে পড়ছে না। কি যেন বলেছিল— বৌ! বৌ! বলি ও অরুণের মা! কেট্‌লিটা কোথায় রাখলে জিজ্ঞাসা কর তো তোমার বোনকে!

যাচ্ছি।

বসুন্ধরার গলার আওয়াজ!

ঠিক। দিদির কাছে গিয়ে উঠেছে। আমি ভাবলুম বুঝি উনোন ধরিয়ে চা করবে। মিছেই ওকে বাড়ীতে শুতে বললুম। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে। গাছে উঠে জাম পাড়তেই জানে শুধু।

জামগাছটার দিকে তাকিয়ে এমনি-সব কথাই ভাবছিল মাসী উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমন সময় দেখা গেল, বসুন্ধরা আসছে তার দিদির বাড়ী থেকে। পরনের কাপড় দিয়ে ধরেছে কেট্‌লিটা। বোধকরি জলটা গরম করে নিয়ে এলো সুবচনীর উনোনে।

দিদির বাড়ী ছুট্‌লি কেন? এ-উনোনটাও তো ধরে এসেছে।

দিদির ষ্টোভ জ্বলছে যে! আপনার তো ষ্টোভ নেই।

ষ্টোভ নেই কে বললে? আমার সব আছে।

আছে তো আছে। আসুন তাড়াতাড়ি চা দেবেন আসুন।

চায়ের কৌটাটা বের করে দিয়ে মাসী বললে, দিদি তোর ষ্টোভে রান্না করছে নাকি?

গরম জলে চা ছেড়ে দিয়ে বসুন্ধরা বললে, হ্যাঁ। দিদির কয়লা ফুরিয়ে গেছে।

এখান থেকে চারটি নিয়ে গেলেই পারতো।

বসুন্ধরা বললে, কাজ কি বাবা, সময়ে না দিতে পারলে আপনি আবার সাত-কাণ্ড করবেন। না নিয়েছে ভালই করেছে।

সাতকাণ্ড করবো? এই কথা বলছিল বুঝি তোর দিদি?

বসুন্ধরা তাকালে একবার মাসীর মুখের দিকে।—না না খারাপ কিছু বলেনি। বলছিল মাসী খুব হিসেবী। ওই রকম হিসেবী হতে পারলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।

চায়ের সরঞ্জাম একে একে বসুন্ধরার হাতের কাছে নামিয়ে দিতে দিতে মাসী বললে, তোর দিদি বুঝি খুব বেহিসেবী? কই দুধের হিসেব একচুল এদিক ওদিক হোক্ দেখি। টাকাটি কই একদিন দেরি হোক্ দেখি দিতে! অমনি হু হু করে ছুটে আসবে—মাসী, আজ কত তারিখ মনে আছে?

সুন্দর মুখে বড় সুন্দর হাসি হেসে উঠলো বসুন্ধরা। বললে, গরীবের অনেক জ্বালা।

উনোন ধরে গেছে। দুধটা একটুখানি গরম করে এনে বসুন্ধরা চা খেতে দিলে মাসীকে। নিজেও নিলে এক কাপ। জিজ্ঞেস করলে, চা খারাপ হয়েছে?

চা খেতে খেতে মাসী বললে, এ তো শ্যামানন্দপুরের চা নয় যে খারাপ হবে? এ চা ধীরু এনেছে কলকাতা থেকে।

বসুন্ধরা বললে, আপনার ধীরু কলকাতা থেকে চা এনেছে— সেইটেই বড় কথা হলো, আর যে করলে, তার কিছু নয়?

মাসী বললে, খুব দামী চা যে!

যতই দামী হোক্ মাসীমা, চা করতে না জানলে খারাপ হবেই।

না না চা তুই ভালই করেছিস।

চা খেয়ে কাপদুটো ধুয়ে রাখলে বসুন্ধরা। বললে, নিন্ এবারে কি রান্না করতে হবে বলুন। উনোন ধরে গেছে।

তুই কি আমার রান্নাও করে দিবি নাকি?

তা নয় তো কি করবো আমি বসে বসে! একটা কাজ তো করতে হবে।

মাসী বললে, আমি তো ভাতে ভাত খাই বাছা। আমার আবার রান্না কি? আমার রান্না তোকে করতে হবে না। যা তুই তোর দিদির ছেলে ধরগে।

ধরবার মত ছেলে দিদির কোনোটাই নয় মাসী। বাচ্চাটা তো কাঁদতেও জানে না। এক জায়গায় বসিয়ে দিলে চুপ করে খেলা করে।

এই বলে বসুন্ধরা মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে বললে, আপনি আমাকে তাড়াতে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?

এ তো বড় সাংঘাতিক মেয়ে! তাড়াতে চাইবো কি রে? তোকে আমি রাত্তিরে শুতে বলেছি আমার কাছে। তা জানিস?

কথাটা শোনেনি বসুন্ধরা। শুনে খুব খুশী হলো।

সত্যি বলছি, কাল রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হয়নি মাসীমা। ঘুমে নয়ন খানি ঢেকেছি—কেন মিছে এমন দিব্যিকে কষ্ট দিতে।

তাই তো বললুম তোর দিব্যিকে। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে নিয়ে আয় তোর বোনটিকে। কি নাম বললি তোর? নামটি ভুলে গেলাম।

বসুন্ধরা।

নীচে তিনখানা, ওপরে তিনখানা ঘর। থাকিই তো পড়ে থাকে। তুই যেই কিন্তু, আজ আমি আপনাকে ঘি-ভাত খাওয়াবই।

না রে না, ঘি-ভাত খেতে হয় না।

খুব খেতে হয় মাসীমা, আপনি খাবেন নাতো খাবে কে? আপনার ছেলে রেঙ্গুনায় রয়েছে, বড়লোকের মেয়ে বৌ হয়ে আসছে বাড়ীতে, ভাল-মন্দ খেয়ে শরীরটাকে ঠিক করে ফেলুন। বড়লোক কুটুমজনের কাছে বেরুতে হবে তো!

কথাটা সত্যি। কিন্তু খরচটাও তো

বসুন্ধরা আসছে তার দিব্যি বাড়ি থেকে। পরনের কাপড় দিয়ে ধরেছে তেইশিটা।

বললুম—বসুন্ধরা শোবে আমার ঘরে। একাই তো থাকি এত বড় বাড়ীটায়।

বসুন্ধরা ছাড়লে না কিছুতেই। বল্লা সে করবেই।

ঘি আছে আপনার ঘরে?

ঘি কি হবে?

আছে কিনা বলুন না!

আছে। তোর দিদির কাছেই কিনেছি। ঘি তো আজকাল পাবার জো নেই। তা তোর দিদির যা গলাকাটা দাম। আমি বলেছিলাম ঘি খাব না। ধীরু ছাড়লে না। কিনে দিলে তোর দিদির কাছ থেকে।

তা সে আপনার ধীরুই কিনুক আর যেই কিনুক, আজ আমি আপনাকে ঘি-ভাত খাওয়াবই।

না রে না, ঘি-ভাত খেতে হয় না।

খুব খেতে হয় মাসীমা, আপনি খাবেন নাতো খাবে কে? আপনার ছেলে রেঙ্গুনায় রয়েছে, বড়লোকের মেয়ে বৌ হয়ে আসছে বাড়ীতে, ভাল-মন্দ খেয়ে শরীরটাকে ঠিক করে ফেলুন। বড়লোক কুটুমজনের কাছে বেরুতে হবে তো!

কথাটা সত্যি। কিন্তু খরচটাও তো

বসুন্ধরার কাল-কলা থেকে চোখিয়ে চোখিয়ে বলে দিলে, দিদি, আমি আজ এইখানে খাব।

মাসী বললে, তোমার বোন আজ আমাকে পোলাও রান্না করে খাওয়াবে।

এই মরেছে! মাসীকে অত খরচ করিয়ে দিদিকে হতচ্ছাড়ী, ধীরু-ঠাকুরপো এলেই বলে দেবে—মেয়েটা উড়নচণ্ডী।

তা বলুক দিদি, তুই চুপ কর।

সুবচনী আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু খেতে বসে মাসীমার পুলকিত হেন আর ধরে না!

এ-রকম বলা কোথায় শুনি দিদিকে বসুন্ধরা?

আমার মায়ের কাছে।

মাকে আজ হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। সেই কাজল-বৌএর কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসুন্ধরা চুপ করে কি যেন ভাবছিল। মাসী বললে, শনিবার বাড়ির সব নাহয় তো রবিবার ধীরুকে এমনি করে খাইয়ে দিস তো মা!

বসুন্ধরা বললে, মাছ আনিয়ে রেখো তাহলে।

মাছ তো সমর এই পুকুরে। এই তো চাষের কাজ।

কিন্তু মাসীমা, একটা কথা বলে রাখছি আপনাকে। আমি কিন্তু রান্না করে দিয়ে পালাব। আপনি ধরে বেঁধেও খাওয়াতে পারবেন না।

মাসীমা বললে, লজ্জা করবে বুঝি? আমার ছেলে কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মত নয়। যেমন চেহারা তার তেমনি স্বভাব চরিত্র—

বসুন্ধরা বললে, জানি।

তুই জানিস কেমন করে? তুই তো দেখিসনি তাকে।

দিদি আমাকে চিঠি লিখেছিল যে।

কি লিখেছিল?

লিখেছিল, খুব ভাল একটি পাত্র ছিল হাতে, হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তার-পর লিখেছিল—ওই আপনি যা বললেন, মানুষের মতন চেহারা, দেবতার মতন চরিত্র—এমনি-সব আরও কত-কি!

বলেই ফিক্ করে হাসতে লাগলো বসুন্ধরা। এখন আর হাসতে দেখে কি? তার সঙ্গে বিয়ে হবার যদি আশা থাকতো তাহলে লজ্জায় হয়ত কোনও কথাই সে বলতে পারতো না।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে—তার ভাবী পুরুষটি যে আকাশের চাঁদ এবং সে চাঁদ যে কেমন করে তার হাতে এসে ধরা দিয়েছে তারই সবিস্তার বর্ণনা একটি একটি করে বসুন্ধরাকে সবই শুনতে হলো।

আকাশের চাঁদই হোক আর যাই

CENTRAL LIBRARY

হোক্, এখন আর বসুন্ধরার তাতে কিছু এসে-যায় না। এখন আর বিয়ের কামনা সে ভাবেই না। গরীব বাপের মেয়ে হয়ে জন্মেছে সে বাংলাদেশে—তার অভিশাপ তাকে বহন করতেই হবে।

মুখখানা তার সুবচনী দেখলে পরে দিদির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, তাই সে হেসে খেলে ছুটে ছুটে বেড়ায়। মাসীমার যাবতীয় কাজ সে করে দেয়, দিদির ছেলেদের নিয়ে খেলা করে, পুকুরে সাঁতার কাটে, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, আম পাড়ে, জাম পাড়ে, কাঁচা আম নুন দিয়ে দিয়ে খায়।

দুদিন পরেই শনিবার এলো।

সকালে পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বিরজাসুন্দরীর নামে খামের চিঠি।

অন্যদিন হলে চিঠিখানা নিয়ে মাসীমা হয়ত সুবচনীর কাছে যেতো, সেদিন সে ডাকলে, বসুন্ধরা।

রান্নাঘরে বসুন্ধরা কি যেন কাজ করছিল। 'যাই মাসীমা' বলে বেরিয়ে এলো।

পড়তে জানিস?

জানি বই-কি! কই দেখি কার চিঠি!

চিঠিখানা একরকম কেড়েই নিলে বসুন্ধরা। খুলে দেখে একখানা চিঠির সঙ্গে একটি মেয়ের ফটো।

বসুন্ধরা চিঠিখানা মনে মনে পড়লে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে ছবিখানা। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলে, দিদি! দিদি!

মাসী বললে, দিদিকে ডাকছিস কি না? আগে বল্ কার চিঠি।

সেকথার জবাব না দিয়ে বসুন্ধরা আবার বললে, ছুটে আয় দিদি, চট্ করে দেখে যা।

মাসী আবার জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখবে?

বসুন্ধরা বললে, দিদির ধীরু-ঠাকুরপোর বৌ।

তুই তো তারি কাজিন মেয়ে বসুন্ধরা। রাগে যেন ফেটে পড়লো বিরজাসুন্দরী। চিঠিখানা বসুন্ধরার হাত থেকে একরকম জোর করে কেড়ে নিয়ে বললে, আমার বৌএর ছবি আমাকে আগে না দেখিয়ে তুই তোর দিদিকে ডাকছিস?

বসুন্ধরা বললে, আপনার বৌকে তো আপনি সারা জীবন দেখবেন মাসীমা, দিদি একবার দেখুক।

ছবিখানা তন্ময় হয়ে দেখছে লাগলো বিরজাসুন্দরী। কিন্তু কোত্থেকে এসেছে, কে পাঠিয়েছে তাও তো জানা দরকার!

সুবচনী এসে দাঁড়িয়েছে।

কই দেখি কেমন বৌ হলো ধীরু-ঠাকুরপোর।

মাসীর হাত থেকে ছবিখানা নেবার জন্যে সুবচনী হাত বাড়ালে।

ছবি না দিয়ে চিঠিখানা সুবচনীর হাতে তুলে দিয়ে মাসী বললে, তুমি আগে আমাকে চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে দাও তো বৌমা। এ-হুঁড়ি শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

সুবচনী চিঠিটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে।

পূজনীয়া বেয়ান-ঠাকরুণ, আমার প্রণাম জানিবেন।

এই পর্যন্ত পড়েই সুবচনী বললে, বিয়ের আগেই তুমি বেয়ান হয়ে গেলে মাসী।

মাসী বললে, বিয়ে তো একরকম হয়েই গেছে বাছা। নাও পড় তারপর কি লিখেছে।

সুবচনী পড়লে—নিরুপমার একখানি ফটো পাঠাইলাম। তাহাকে নিরুর জন্য-মান, কাজেই সেদিক দিয়া বিবাহের একটু অসুবিধা আছে। সুতরাং আগামী অগ্রহায়ণেই বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।

কথাবার্তা সবই হইয়া আছে। আর নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। নিরুপমার মা শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথকে একবার দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আপনি যদি তাহাকে একবার আমার বাড়ীতে আসিতে বলেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। লজ্জায় সে বোধ-হয় একা আসিতে চাহিবে না। আপনার অনুমতি পাইলে আমি নিজে গিয়া তাহার আপিস হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারি।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীপরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিখানি মাসীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুবচনী বললে, দাও এবার ফটোটা দেখি।

ফটো দেখে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল সুবচনীর। মনের কথা নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলাই তার চিরকালের অভ্যাস, কিন্তু আজ সে হঠাৎ বুঝতে পারলে সব জায়গায় সব কথা অকপটে প্রকাশ করা চলে না।

কাজ ফেলে এসেছি মাসী। বলে সুবচনী চলে যাচ্ছিল, মাসী বললে, মেয়েটি কেমন তা তো বলে গেলে না বৌ?

ভালই তো। বলে চলে যাচ্ছিল সুবচনী। আবার ফিরে দাঁড়ালো। মনের কাঁটা সঙ্গে-সঙ্গে উপড়ে ফেলাই তার স্বভাবধর্ম। বললে, সব সুখ কি সব সময় হয় মাসী? তুমি টাকা পয়সা দেখে, বিষয়-সম্পত্তি দেখে, আবার মেয়েটিও পরমাসুন্দরী হবে—তা কেমন করে হয়?

এই বলে আর দাঁড়ালো না সুবচনী।

কথাটা ভাল লাগলো না মাসীর। সুবচনীকে দুকথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। বসুন্ধরা সেটা বোধ করি টের পেলে। বললে, দিদির কথা আপনি শুনবেন না মাসী। খুব ভাল বৌ হয়েছে আপনার।

এইটিই যেন শুনতে চাইছিল বিরজাসুন্দরী।

সত্যি বলছিস?

সত্যি মিথ্যে জানি না মাসী, আমার যা মনে হয়েছে তাই বলছি।

মাসী বললে, ধীরুকে বলিস্।

বসুন্ধরার রাঙা মুখখানি যেন আরও রাঙা হয়ে উঠলো কথাটা শুনে। —ধীরুদার সঙ্গে আমি কথাই বলতে পারবো না।

কেন পারবি না? ধীরু তো তোর দাদার মত। দাঁড়া আসুক ধীরু, আজই তো বিকেলে আসবে, দেখবি সে তোকে কত ভালবাসবে। ধীরু যখন খুব ছোট ছিল তখন কি বলতো জানিস? বলতো, আমার একটা বোন নেই কেন মা? আমি বলতুম—বোন একটা তোর কিনে এনে দেবো।

এই বলে হাসতে হাসতে মাসী হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বললে, আসবামাত্র ছবিটা আমি দেখাবো না ধীরুকে। তুই সেই যেমনি করে চা করে দিবি, ধীরু বসে বসে চা খাবে, তখন দেখাবো ছবিটা। কেমন দেখলি? জিজ্ঞাসা করলে আমাকে তো লজ্জায় কিছু বলবে না। তুই তখন বলবি যা বলতে হয়। কেমন?

বসুন্ধরা বললে, না মাসী না। আমি আসবোই না বিকেলবেলা। চা আপনি করে দেবেন। রাত্রে ধীরুদা কি খাবে বলুন।

খায় তো ভাত। সেদিনের মত ঘি-ভাত করে দিতে পারিস।

বসুন্ধরা বললে, আপনি দেখছি সব ভুলে যাচ্ছেন। জেলেকে বললেন, কাল সকালে এসে সে পুকুরে মাছ ধরে যেন, সেই মাছ দিয়ে—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না মাসীমা। মনে পড়েছে। মাথাটা তার

গড়িয়ে নিয়ে গেছে সুবচনী। সব সময় নাকি একসঙ্গে হয় না। বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি আর পরমাসুন্দরী বৌ নাকি একসঙ্গে পাওয়া যায় না। মেয়েটি যে পরমাসুন্দরী নয় তা তার চলনে-বলা চেয়েও ছবি দেখে বুঝতে পেরেছে বিরজাসুন্দরী। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি যদি না থাকে তো পরমাসুন্দরী বৌ নিয়ে খাই হবে। ধীরু অবশ্য তা জানে। জানে বে তাকে মানুষ করতে গিয়ে, লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে, জমিজমা যা কিছু ছিল সবই গেছে। এখন তার বৌ-এর চেয়ে বিষয়-সম্পত্তির বেশি প্রয়োজন।

মাসী বললে, ঘি আছে বাড়ীতে। রাত্রে লুচিও করে নিতে পারিস।

সেই ভালো। বসুন্ধরা বললে, আমি চুপিচুপি এসে লুচি-তরকারি করে দেবো। খেতে দেবেন আপনি। খেয়েদেয়ে মশা ঠাণ্ডা হবে যখন, তখন ছবিটা হাতে দিয়ে বলবেন, আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

পরামর্শটা মন্দ নয়। মাসী বললে, বাড়ির তাহলে ছোকে আর বিস্কুট কাজ খেতে হবে না। এইখানেই খাবি।

না মাসীমা, আপনি বড্ডো বাড়াবাড়ি করছেন। এসে অবধি তো একবেলা এইখানেই খাচ্ছি—

তা হোক্। নিদিকে বলে আসবি।

যেমন করে হোক্, ধীরুকে রাজী করাতেই হবে।

বিরজাসুন্দরী তাই সংগে নিলে বসুন্ধরাকে।

আপনি ভাবছেন কেন মাসীমা। কেমন মিল হয়েছে বলুন তো? নিরু আর ধীরু।

মাসী বললে, দেখেছিস? এরকম করে তো আমি বলতে পারব না বাছা!

পাচটার ট্রেণটা বাড়ীর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল।

এই ট্রেণের প্যাসেঞ্জার নিয়ে কতক্ষণ পরে সাইকেল-রিক্সা শ্যামানন্দপুরে এসে পৌঁছোয় এখানকার সবাই তো জানে।

জানতো না শুধু এখানকার নতুন মেয়ে বসুন্ধরা।

মাসীকে সে বলেই রেখেছে সে আসবে না। আপনি চা করে দেবেন।

ধীরু এলো। হাতের কাজটা সেতলার তার নিজের ঘরে রেখে এসে চটি পায়ে দিয়ে গামছা নিয়ে ধীরু পুকুরের দিকে গেল হাত-মুখ ধুতে।

মা তখন চা করতে বসেছে।

ওদিকে কে জানতো বসুন্ধরা ঠিক সেই সময়েই ঘাট-বাঁধানো পুকুরের সাবান মেখে গা ধুতে যাবে। সবে তখন সে কাপড়টা নিঙড়ে ভিজে কাপড়টা গায়ে জড়াচ্ছে।

ধীরুকে সে দেখতে পেয়েছিল না কপাট খোলার আওয়াজ পেয়েছিল কে জানে, তাড়াতাড়ি সাবানটা তুলে নিয়ে সে ছুটলো। ছুটলো পুকুরের পাড়ে পড়ে জোড়া নারকেল গাছের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ ধরে।

কপাটের ফাঁক দিয়ে ধীরু দেখতে পেয়েছিল সুবচনী। প্রথমে ভেবেছিল সুবচনী নয়। তারপর দেখলে না, সুবচনী নয়।

হাত মুখ ধুয়ে এসে চা খেয়ে ধীরু তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে, বৌদিরা এসেছে?

মা বললে, এসেছে।

অন্যদিন ধীরু তার ওপরের ঘরে উঠে যায়, সেদিন কিন্তু সোজা সে জমগাছের তলা দিয়ে কুয়োতলার রোয়াকে চলে—উঠলো গিয়ে সুবচনীর বাড়ীতে।

এই মরেছে! ছবির কথা সুবচনী দেবে হয়ত ফাঁস করে!

ধীরু বললে, বৌদি, এসেছ?

হ্যাঁ ভাই এসেছি, বোসো।

না আর বসবো না। জানতে এলাম তোমরা এসেছ কিনা!

বিয়ের নেমন্তন্ন করবে নাকি?

বিয়ে যখন হবে তখন করব।

সুবচনী ধীরুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বৌটি দেখেছ?

না।

কলকাতার মেয়ে, যাও একদিন গিয়ে দেখে এসো। বাপের বিষয়-সম্পত্তি কি কি আছে ভাল করে একবার খবর নিয়ে এসো।

ফটোর কথাটা বলবার জন্যে যেন ছট্‌ফট্ করছে সুবচনী। ওদিকে ঘরের ভেতরে কাপড় ছেড়ে চুলটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বসুন্ধরা রেগে রেগে মরছে।—হে ভগবান, দিদি যেন চিঠির কথা—ফটোর কথা ওকে কিছু না বলে।

ধীরু নিজেই কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই বোনটির খবর কি বৌদি? বিয়ে হয়ে গেছে?

গলাটার ভেতর না-ছিল বিদ্রূপ, না ছিল কোনও ফাঁক, তবু সুবচনীর কানে কেমন যেন বিদ্রূপের মতই শোনালো কথাটা।

সুবচনী সহ্য করে থাকবার মেয়ে নয়। তক্ষুনি জবাব দিয়ে বললো—হ্যাঁ ভাই বিয়ে হয়ে গেছে। এদিককার ছেলেরা কিরকম হয়েছে জানি না, তবে আমাদের ওদিকের ছেলে-ছোকরারা আজকাল লেখাপড়া শিখে বেশ মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে। তাদেরই ভেতর একটি ছেলে পয়সাকড়ি কিছু চাইলে না, বাপের বিষয়-সম্পত্তি কি আছে দেখলে না, লেখাপড়া বেশি শেখেনি বলে নাক সিঁটকোলে না, চুপচাপ বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল।

এমন গম্ভীর হয়ে কথাটা বললে

সুবচনী যে ধীরুর মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। তাহলে পুকুরের ঘাটে কাকে দেখলে সে?

তবের পুকুরের ঘাট থেকে আর কোনোদিকে যাবার কোনও পথ নেই। যে-পথ দিয়ে তাকে সে যেতে দেখেছে সে-পথ একমাত্র বুলন চক্রবর্তীর বাড়ীতে আসবার পথ। মেয়েটি নিশ্চয়ই এই ঘরের ভেতর আছে.. কিন্তু যে-অবস্থায় তাকে সে দেখেছে সে-কথা বলাও চলে না। মেয়েটি শুনলে লজ্জা পাবে, কাজেই মনের কৌতূহল মনেই চেপে রাখতে বললো ধীরুকে।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, পরশু সকালেই তো চলে যাবে?

ধীরু বললে, না। দুদিন ছুটি আছে।

একটু চা কর। খাও।

না বৌদি, এইমাত্র চা খেয়ে এলুম।

ঠিক এমনি সময় মার ডাক শোনা গেল।

ধীরু! শোন্।

মা ডাকছে। আসি বৌদি, আবার দেখা হবে।

ধীরু চলে যেতেই সুবচনী ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বসুন্ধরা দেখলি?

বসুন্ধরার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। সে তখন হাত-আশীটা নিয়ে কপালে টিপ পরছিল। সুবচনী ঘরে ঢুকলো। বললে, দেখলি ধীরু-ঠাকুরপোকে?

দিদির দিকে না তাকিয়েই বসুন্ধরা বললে, দেখলাম।

সুবচনী বললে, ওই ছেলের ওই বৌ! আমার ইচ্ছে করছিল আরও কিছু শুনিয়ে দিতে, কিন্তু সময় পেলাম না।

না দিদি শোনাস্‌নে।

শোনাবো না কি রে? টাকাই ওদের সর্বস্ব হলো? ধীরু-ঠাকুরপোর মত ওই ছেলে—ভালবাসতে পারবে ওই হাবলা-মুখো কেবলি-কেবলি মেয়েটাকে?

ভালবাসা তো পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে! টাকা-পয়সাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিস্।

বলেই বসুন্ধরা কেমন যেন বিশ্রী হাসি হাসতে হাসতে বললে ভালবাসা! জানি—বাসা!

ওদিকে ধীরু গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি জন্যে ডাকলে মা?

বৌ কিছু বলছিল?

কই না, কিছু তো বলেনি।

মা আশ্বস্ত হলো। বললে, দুধের হিসেবটা করে দিস তো বাবা। মাসের পয়লা তারিখেই টাকার জন্যে ছিঁড়ে খাবে। মেয়েটা টাকা টাকা করেই মলো।

প্রোগ্রাম ঠিক করাই ছিল। বসুন্ধরা আসতে দেরি করেনি। রান্নাঘরেই সব কিছু এনে রাখা হয়েছে। টু শব্দটি না করে বসুন্ধরা রান্না করছে।

বর্ষা প্রায় ধরে এসেছে। কোনোদিন বৃষ্টি হয়, কোনোদিন-বা হয় না। আজও ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি একবার হয়ে গেল। তারপরেই সব ফরসা।

আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠোনে, জামগাছের মাথায়, আর বাড়ীটার আনাচে-কানাচে। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। উনোনের কাছে বসে বসেই বসুন্ধরা সব দেখলে।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বাইরের ওই আবছা জ্যোৎস্নায় কেমন যেন একটা রঙিন স্বপ্নের আবেশ। বসুন্ধরারও স্বপ্ন দেখবার বয়স। কিন্তু তার মায়ের মৃত্যুর পর কী যে হয়েছে বসুন্ধরার—মনে হয় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার সব সাধ সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে গেছে। পৃথিবীটা তার কাছে যেন শুধু পদার্থময় হয়ে উঠেছে। শুধু যেন জল, মাটি গাছপালা আর কাঁকর পাথর ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। মানুষ আছে তার মন নেই, কথা আছে তার ছন্দ নেই, শব্দ আছে তার সুর নেই, ঘুম আছে তার স্বপ্ন নেই।

মাসীমা আসতেই বসুন্ধরা বললে, আপনি খেয়ে নিন মাসীমা। আমিষ নিরামিষ সব আমি আলাদা করে রেখেছি।

বেশ করেছিস। ধীরুর জন্যে করবো?

কোথায় করবেন?

এইখানে করি। এখান থেকে সব জিনিস ওই দোতলায় তুলতে কষ্ট হবে।

একেবারে এই চোখের সামনে? বাইরে করলে হতো না?

মাসীমা বললে, অত লজ্জা কেন রে? বাইরে জায়গা কোথায়, বর্ষাকাল, যদি বৃষ্টি আসে?

বসুন্ধরা আর আপত্তি করতে পারলে না।

মাত্র হাত-চারেক দূরে বসে বসে খাবে দিদির সেই ধীরু-ঠাকুরপো, আর বসুন্ধরা এই উনোনের কাছে বসে বসে লুচি ভাজবে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো বসুন্ধরার। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিলে। কিসের লজ্জা?

মাসীমা নিজে গিয়ে ডেকে আনলে ধীরুকে।

কুমারী মেয়ে, মাথার কাপড় টেনে ঘোমটা দেওয়া চলে না। শাড়ীর আঁচলটা যেমন পাট দিয়ে কোমরে জড়ানো ছিল তেমনিই রইলো। পিঁড়িটা টেনে নিয়ে উনোনের আড়ালে বসতে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। আবার পিঁড়িটাকে টানাটানি করে পাশ ফিরে বসা তখন আর সম্ভব নয়।

ধীরু তো ঘরে ঢুকে আসনে বসতে গিয়ে অবাক্!

হ্যাঁ, এই মেয়েটিই তো! একেই দেখেছে সে পুকুরের ঘাটে।

ধীরু তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বৌদির বোন না?

মাসীমা বললে, হ্যাঁ, এই তো বসুন্ধরা। কেন তুই দেখিসনি তখন?

কখন?

সেই যে বিকেলে—তুই যখন গেলি বৌমার বাড়ী—

কই না তো! ও তখন বোধহয় লুকিয়ে বসেছিল ঘরের ভেতর। বেরোয়নি।

মাসীমা বললে, বড় ভাল মেয়ে। এসে অবধি আমারই কাজকর্ম করে, বুলনের তো একখানি মাত্র ঘর তাই আমার কাছেই শোয় এসে রাত্রে।

ধীরু ও ও করছে, যাচ্ছে আর একবার করে তাকাচ্ছে বসুন্ধরার দিকে। আগুনের আভায় মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিটোল সুন্দর হাতে মাত্র একগাছি করে সোনার চুড়ি। কানে দুটি পাথরের দুল। লাল সস্তা পাথর। মাঝে মাঝে আগুনের মত চিক্ চিক্ করছে। সস্তা একটা ছুতে শাড়ী, তাও মনে হচ্ছে কেন কত দামী।

বসুন্ধরাকেও এক-আধবার তাকাতে হচ্ছে বই-কি!

দেখতে হচ্ছে লুচি আর দরকার হবে কিনা! মাসীমা তুলে তুলে দিচ্ছে আর সে শুধু ভেজেই চলেছে।

না না আর দরকার হবে না।

ধীরুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

মাসীমা হঠাৎ বলে উঠলো, ও মা, আসল কথাটাই তোকে আমি বলতে ভুলে গেছি। দাঁড়া আসছি নিয়ে আসি।

এদের দুজনকে একলা ফেলে রেখে মাসীমা চলে গেল তার সেই ভুলে-যাওয়া জিনিসটা আনতে। কি সে জিনিস বসুন্ধরা জানে।

পালাতে ইচ্ছে করলো বসুন্ধরার। কিন্তু পালাবার আর পথ নেই। দুধের বাটিটা ধরে দিতে ভুলে গেছে মাসীমা।

দাঁড়ান। উঠবেন না।

দুধের বাটিটা দুহাত দিয়ে ধরে

বসুন্ধরা হেঁট হতে নামিয়ে নিল ধীরুর হাতের কাছে।

ধীরু কি যেন দেখলে। কি দেখলে বসুন্ধরার নজর এড়ায়নি। পেছন ফিরে মুখ টিপে একটুখানি হেসে বসুন্ধরা আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসলো।

তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না বসুন্ধরা। কি জবাব দেবে তাও সে বুঝতে পারলে না। মোক্ষম একটা জবাব তার ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে রইলো। কড়াইটা সে উনোন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কাজ করবারও কিছু নেই। মাথা হেঁট করে বসে রইলো বসুন্ধরা।

তোমার দিদি তখন বললে—কে একটি ছেলে যেন—

দিদি আর তার বিধাতা দুজনেই তার সঙ্গে রসিকতা করেছে সেকথাও সে মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

সব কিছু রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। খামখানা হাতে নিয়ে মাসীমা ঘরে ঢুকলো।

খাওয়া হয়ে গেছে? যা আঁচিয়ে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

আঁচিয়ে এলো ধীরু।

মা তার হাতে খামখানা দিয়ে বললে, চিঠিখানা আগে পড়। নিরুপমার ছবিটি সে বের করে রেখেছিল।

ধীরু আবার তার আসনের ওপর বসে লণ্ঠনের আলোয় চিঠিখানা পড়লে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, চিঠির সঙ্গে আর-কিছু ছিল না?

আর-কিছুটি আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল মাসীমা। বের করে দিলে ধীরুর হাতে। ধীরু একবার দেখলে ছবিখানি। তারপর ছবি আর চিঠি একসঙ্গে নিয়ে চট্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাসীমা বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিছুই বললে না যে রে?

আপনিও তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

আমার বাপু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। তুই জিজ্ঞাসা করবি চল্।

বসুন্ধরা বললে, আপনি খেয়ে নিন আগে।

নে তবে তুইও বোস। ধীরু এখন ঘুমোবে না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে বই পড়বে।

খেতে বসে বসুন্ধরা বললে, কী আর জিজ্ঞাসা করবেন মাসীমা, বিয়ের তো পাকাপাকি কথাবার্তা সব ঠিক হয়েই আছে।

হাঁ হাঁ সব ঠিক। এই মাসেই হতো। হলো না এই যে মেয়ের জন্মমাস না কি-কেন লিখেছে—

বসুন্ধরা বললে, তবে আর কেন মিছে ঘাঁটাচ্ছেন ছেলেকে? পছন্দ না হলেও সে কি আর আপনার মুখের ওপর বলবে কোনদিন যে এ-মেয়ে চলবে না?

মাসীকে একটু ভাবতে হলো। বললে, নাঃ, তা কোনোদিন বলবে না। তাছাড়া ধরু কলকাতায় একখানা দোতলা বাড়ী, বেহালায় না কোথায় যেন দশ কাঠা জমি, মায়ের তাও নেই নেই করেও হাজার-পাঁচেক টাকার গয়না, তার ওপর ধর এত-এত সম্পত্তি যার, তার নগদ টাকা পনেরো-বিশ হাজার নিশ্চয়ই আছে। এই সবই পাবে ওই মেয়ে-জামাই।

বসুন্ধরা বললে, এ সুযোগ কখনও ছাড়তে আছে? বিয়ে আপনি এইখানেই দিন।

দেবো তো নিশ্চয়ই। তবু তুই এক-

বেরোতে হবে? চুল শুকিয়েছে তো?

ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। চুলেও কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না কারণ ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল শুকোবার আগেই আপনাকে বেরোতে হবে তবে ভাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করুন, তারপর পরিষ্কার করে আঁচড়ে চুল বেঁধে ফেলুন। জবাকুসুম তেল চুলের একটি মস্ত বড় খাদ্য আর এ তেল মেখে জল না ঢাললে কোন ক্ষতি হবেনা। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে দেবে। জবাকুসুমের অপূর্ব তেজ-গুণাবলী মাথা ও স্নায়ু স্নিগ্ধ করে।

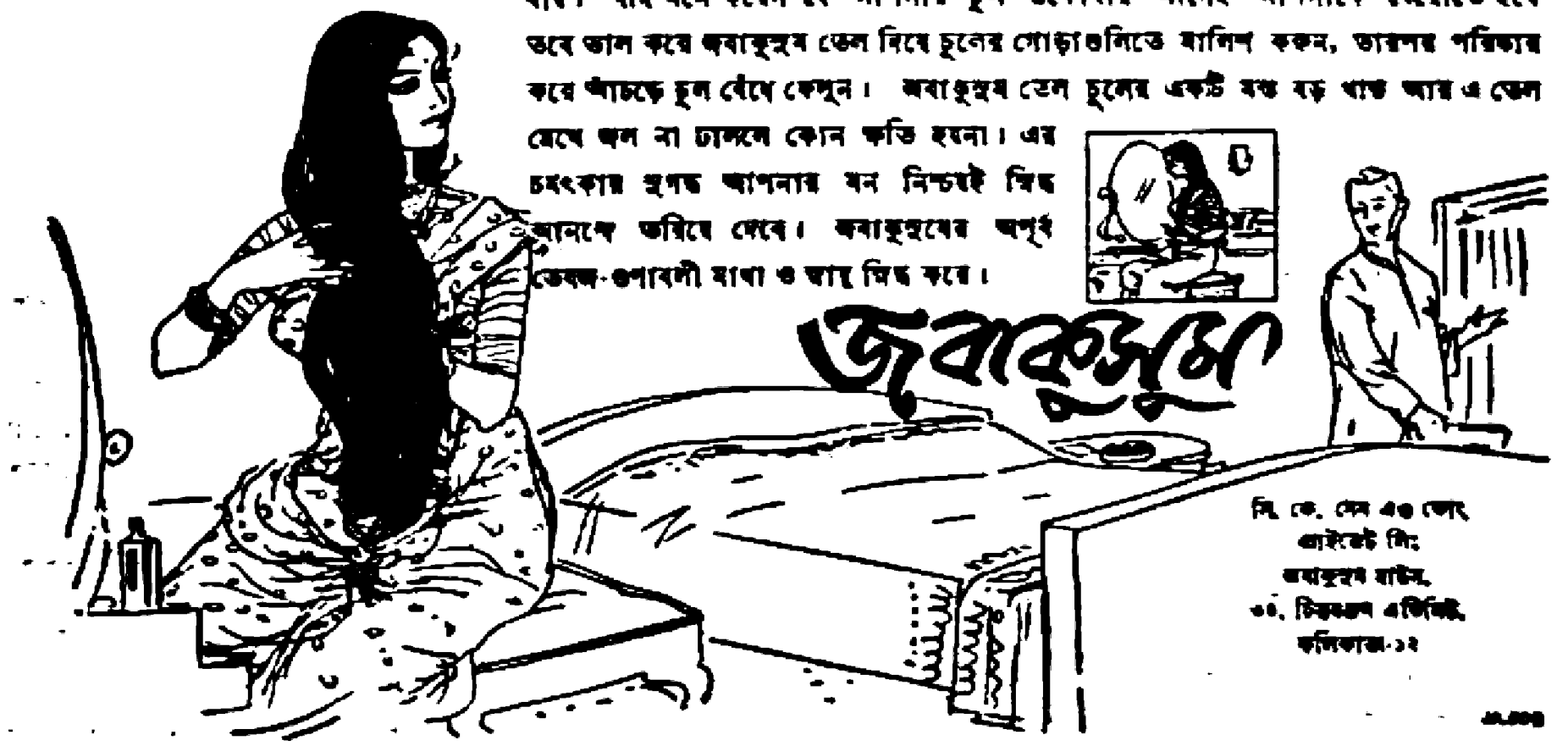

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২

বার ধীরুকে জিজ্ঞাসা করবি চল্। আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

খেয়েদেয়ে হেঁসেলের পাট চুকিয়ে দুজনেই ওপরে উঠে গেল।

মাসী দাঁড়ালো একটু দূরে। বসুন্ধরাকে বললে, যা তুই আগে ঢোক্, জিজ্ঞাসা কর্ তোর পেছনে পেছনে আমি যাচ্ছি।

বসুন্ধরা গিয়ে দেখলে ধীরু তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ডাকতে ভরসা হলো না। ফিরে গেল মাসীর কাছে। বললে, মাসীমা দোর বন্ধ।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল বসুন্ধরার।

পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখে দিদি কাপড় কাচছে।

বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে, কাল ভারি মজা হলো দিদি।

দিদির গায়ে হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ে আর বলে, কাল তুই বললি তো ধীরুদাকে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কথাটা উনি ঠিক বিশ্বাস করে বসেছেন। খালি খালি আমার সিঁথির দিকে তাকান আর বলেন, সিঁথিতে তোমার সিঁদুর কই?

তুই কি বললি?

কথাটা আমি ভেঙে-চুরে কিছু বলিনি। চুপ করে ছিলাম।

সুবচনী বললে, বুড়ী ঠিক বলে নেবে। নইলে একটা ভারি মজা করতাম ঠাকুরপোর সঙ্গে।

হাঁরে, ফটোটা ও দেখেছে? সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে।

বসুন্ধরা বললে, দেখেছে।

কি বললে?

কিছু না বলে ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুলো।

ওর মা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

বসুন্ধরা বললে, আমাকে বলছিল—তুই জিজ্ঞেস কর্। নিনি, আমার কি জিজ্ঞাসা করা উচিত? আমার লজ্জা করে না? তোর ধীরু-ঠাকুরপো হয়ত ভাবতে পারে—আমি বলতে চাচ্ছি তোমার বৌএর চেয়ে দ্যাখো আমি কত সুন্দরী।

সুবচনী বললে, তোকে কিছু বলতে হবে না, আমি জিজ্ঞাসা করব।

না দিদি তোরও কিছু বলা উচিত নয়।

সুবচনী অবাক হয়ে তাকালো বসুন্ধরার মুখের দিকে। মেয়েটা বলে কি?

তোর বিয়ে দিতে হবে না? তুই কি এমনি আইবুড়ী হয়ে থাকবি নাকি চিরকাল?

বসুন্ধরা বললে, তাই বলে এমনি করে? রূপ দেখিয়ে? লোভ দেখিয়ে?

সুবচনী তাকে এক ধমক দিলে। খুব কথা শিখেছিস, তুই থাম্।

বসুন্ধরা আর কথা বলেনি। সুবচনী বললে, জলে দাঁড়িয়ে থাকিস না, অসুখ করবে। আয়, আমার ঘরে চা খাবি আয়।

এই বলে বোনকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললে, কাপড়চোপড় ছেড়ে বোস্, চা খা। দুধ দিতে গিয়ে আমি ওই মাতৃভক্ত শিশুটিকে একবার ডেকে আনবো আমার বাড়ীতে।

বসুন্ধরা কাপড় জামা পরতে পরতে ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠলো। —মাতৃভক্ত শিশু কাকে বলছিস দিদি? তোর ধীরু-ঠাকুরপোকে?

তা না তো কি?

সুবচনী স্টোভ জেলে চা করতে বসলো। বসুন্ধরাকে বললে, অরুণের বাপের জন্যে একথালা মুড়ি ঠিক করে রাখ্।

থালায় মুড়ি ঢালতে ঢালতে বসুন্ধরা বললে, জামাইবাবু এখনও চান করেনি?

আমাদের আগে করেছে। সে গেছে দুধ আনতে।

স্টোভের আওয়াজে আস্তে কথা শোনা যাচ্ছিল না, তাই সুবচনী জোরে-জোরে বললে, এই সময় অরুণের বাপ এখানে নেই, ছেলেরা এ-সব কথার মানে বুঝতে পারবে না, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, সত্যি জবাব দে। কাল প্রথম যখন তার চোখে তোর চোখ পড়লো, কী সেখানে দেখেছিলি?

বসুন্ধরা বললে, কী আবার দেখবো?

এই দ্যাখ্ তুই পাশ কাটাবার চেষ্টা করছিস। আমার কাছে লুকোসনি বসুন্ধরা। আমিও মেয়ে। পুরুষের চোখের ভাষা পড়তে আমাদের দেরি হয় না। এমন চোখের চাউনি আছে যা দেখলে জোর চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। আবার এমন চাউনি আছে যা দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বসুন্ধরা বললে, কেমন চাউনি জানিস? মনে হলো যেন মানুষটি অবাক হয়ে গেছে আমাকে দেখে। মনে হলো যেন বলতে চায়—তোমাকে পেলে আমি মাথায় করে রাখতে পারি, তোমাকে আমি পুজো করতে পারি।

এইবার তোর কথা বল্। লুকোসনি বসুন্ধরা। সব্বনাশ হয়ে যাবে। তুই ওকে পেলে ভালবেসে ঘর-সংসার করতে পারবি?

বসুন্ধরা বললে, যাঃ!

বলেই সে মুড়ির টিনটা রাখতে গেল।

যা নয় বসুন্ধরা, সত্যি কথা বল।

বসুন্ধরা এগিয়ে এলো তার দিদির কাছে। বললে, জেনে তুই কি করবি বল্।

সুবচনী বললে, দুজন দুজনকে ভালবেসে যদি বিয়ে করে তো সংসার খুব সুখের হয়।

তুইও এই কথা বলছিস দিদি? তোর দেখেই আমি বুঝেছি—ওপরের চেহারাটা কিছুই নয়। এ রূপ দুদিনেই নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট যা হবে না তা হচ্ছে—ভেতরের মানুষটা। সেই ভেতরের মানুষটিকেই মানুষ ভালবাসে। ওপরের চেহারাটা ভাল হলে ভাল লাগে এই পর্যন্ত।

সুবচনী বললে, ওরে বাবা, এ যে বড় বড় কথা বলছিস তুই। এই বয়েসে ও-সব তুই শিখলি কোত্থেকে?

তোর কাছ থেকে। মা বলতো সুবচনী আমার সুখী হলো না। বলতো তোর বাবা দিলে একটা কানা মানুষের সঙ্গে জুটিয়ে, ওকে সুবচনী ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু কি হলো দিদি? তোদের যা ভালবাসা দেখছি—খুব কম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকমটি হয়।

ছোট বোনের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি—সুবচনীকে কেমন যেন বিহ্বল করে দিলে। হাত বাড়িয়ে বসুন্ধরাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না, ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো, চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো।

খানিক পরে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে সুবচনী বললে, তাহ'লে তুই কি বলিস্ ধীরু-ঠাকুরপোকে বলেকয়ে একবার দেখবো না?

বসুন্ধরা তখনও তার কোলে মুখ গুঁজে পড়েছিল, বললে, না দিদি না।

এই বলে সে মুখ তুলে উঠে বসলো। বললে, আমি যদি একটুখানি চেষ্টা করি দিদি তাহ'লে আমি জানি ও ঠিক পাগলের মত আমার পিছু পিছু ছুটে বেড়াবে। কিন্তু তা আমি কখনও করবো না। তুইও কিছু বলিস না।

সুবচনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, ধীরু-ঠাকুরপো মানুষটা ভাল। বেচারার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

দুধ নিয়ে এলো ঝুলন।

অনেকখানা দুধ দিয়েছে আজ। নিজে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয় না। চা

যাত্রী

মৃত্তিকা প্রেস

CENTRAL LIBRARY

গল্পোত্রী

মানিক চট্টোপাধ্যায়

হলো? নাও, একটু দেরি হয়ে গেল আজ।

চা নিয়ে ধীরে-সুস্থিরে খাবার অবসর আজ আর তার হলো না। দু'এক চুমুক খেয়েই সব চাটুকু ঢেলে দিলে নর্দিতে ওপর।

তাই না দেখে বসুন্ধরা তো হেসেই খুন!

এ আবার কি রকম খাওয়া হচ্ছে মা?

সুবচনী বললে, ওর খাওয়া হলেই হলো!

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে জলা হাতে নিয়ে ঝুনন বেরিয়ে গেল। বসুন্ধরা বললে, আমি যাই দিদি মণীমা বলেছে ওর ছেলেকে ভাত খেলাও খাইয়ে দিতে হবে। ফেরার সময়ে মাছ ধরতে। ভাল চাল আছে কিনা দেখি!

যাওয়ায় বাধা পড়লো।

সুবচনীর বাচ্চা ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে বসেছে বিছানায়। বসুন্ধরা হাত বাড়াতেই ঝাঁপিয়ে সে তার কোলে উঠে পড়লো।

এঁটো চায়ের কাপ-ডিস আর থালা নিয়ে সুবচনী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাসীমার কোলে চড়ে তরুণ অবোধ-ভাবেই কী যে বলছিল কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে তোমার ভাষা আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা যা বলবে স্পষ্ট করে বল।

এই বলে সে তার পেটে নিজের নাকটা ঘসে দিতেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো ছেলেটা বসুন্ধরা তার সেই হাসিমুখে একটা চুমু খেয়ে নিজেও হাসতে হাসতে কর যেন পরের জন্যে দেবার দিকে তাকিয়েই দেখে ধীরু এসে দাঁড়িয়েছে।

রাতের দেখা আর দিনের দেখায় তফাৎ আছে। ভোরের আলোয় নূতন নূতনকেই দেখায়। বসুন্ধরার শাড়ীর আঁচলটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল, চট্ করে একহাত দিয়ে তুলে নিলে।

সিমেন্স এর পূজা উপহার

SIEMENS INDIA

সীমেন্স প্রাণ্ড সুপার ৭৯০ ট্রানজিস্টর রেডিও। ৭ ব্যান্ড, ৫টি লাউড স্পীকার, ৮+১ পুশ বাটন। মূল্য ৯৬০, টাকা (উৎপাদন করসহ) স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

সীমেন্স স্টাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১ ট্রানজিস্টর রেডিও ৬ ব্যান্ড, ৬টি পুশ বাটন। মূল্য ৪০৫, টাকা (উৎপাদন কর সহ) স্থানীয় কর অতিরিক্ত

সীমেন্স কেলকার সুপার ৬৯২ ট্রানজিস্টর রেডিও। ৬ ব্যান্ড, ৬+৩ পুশ বাটন, ৩টি লাউড স্পীকার মূল্য ৫৭৫, টাকা (উৎপাদন কর সহ স্থানীয় কর অতিরিক্ত

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

নান এণ্ড কোং ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা—১

ধীরু জিজ্ঞাসা করলে, বৌদি কোথায়?

চোখ দুটি তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে; ওই তো!

রান্নার জায়গায় উনোনে মাথা হেঁট করে সুবচনী বাসন ধুচ্ছিল, ধীরুকে দেখতে পায়নি। এতক্ষণে মুখ তুলে দেখেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো। —সকাল বেলা, ধীরু-ঠাকুরপো —বোসো।

—না বসবো না। মা বলছে তোমার বোন কি-একটা কথা বলবে আমাকে। সেই কথাটা শুনতে এলুম।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলো সুবচনী। চমকাবার মত কথাই।

সুবচনী বললে, এমন কি কথা রে? যা শোনবার জন্যে ধীরু-ঠাকুরপো ছুটে এসেছে সকালবেলা—

মুচকি একটু হেসে মুখ নামালে বসুন্ধরা। বললে, আমার কথা নয়, মাসীমার কথা। বলবো এরপর।

মাসীমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলো সুবচনী। আশ্বস্ত হলো ধীরুও।

ধীরু বললে, আচ্ছা বৌদি, কাল তুমি আমাকে কি রকম অপ্রস্তুত করলে বল তো! বললে তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম—চুপ করে রইল। আর এক্ষুনি মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললে, বৌ তোর সঙ্গে রসিকতা করেছে।

সুবচনী বললে, ভাগ্য আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেছে ভাই, তাই আমিও মানুষের সঙ্গে রসিকতা করবার সোজ সামলাতে পারি না।

ধীরু বললে, না না ও রকম রসিকতা ভাল নয় বৌদি। তোমার বোনের বিয়ে হবে। নিশ্চয়ই হবে। মা বলছিল—ওর জন্যে একটি ছেলে দেখতে। আমি দেখবো—

এই বলে বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে ধীরু আবার বললে, তাহলে বোলো এক সময় তোমার কথাটা—তোমার যখন অবসর হবে। আমি চলি বৌদি।

ধীরু চলে গেল।

বসুন্ধরা বললে, দিদি, হলো তো! শুনলি?

সুবচনী বললে, শুনলুম।

আশা ভরসা সব একেবারে শেষ করে দিয়ে চলে গেল ধীরু।

মাছ ধরানো হলো পুকুরে। পোলাও রান্না হবে।

পোলাওএর মসলাপাতি, ঘি, মাংস সবই ঠিক করে রেখেছিল আগে থেকে।

বসুন্ধরার রান্না শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। একটি মানুষের জন্যে আয়োজন, কিন্তু মনে হলো যেন বরযাত্রী।

মাসীমা কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে সেই সকাল থেকে।

বলি এতবার যে এ-ঘর ও-ঘর করছিস তবু তোর আর অবসর হলো না বসুন্ধরা?

কিসের অবসর মাসীমা?

কথা না হয় আমরাই ভুলে যাই বয়েস হয়েছে বলে, কিন্তু তোরও কি মতিভ্রম হলো নাকি এই বয়েসে?

মাসীমা কি বলতে চায় বুঝতে সে পেরেছে ঠিকই। শুধু এটা-সেটা কাজ টেনে টেনে রাখছিল যতক্ষণ পারে।

বসুন্ধরা বলেছিল, এত সব রান্না-বান্না করতে করতে এই হলুদ-তেল-ঝোল মাখা কাপড়টা পরে ধীরুদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না আমি।

সত্যিই তো, মেয়েটা সেই সকাল থেকে চরকির মত ঘুরছে, রান্না করছে, আগুনতাতে থেকে থেকে মুখখানা হয়ে উঠেছে লাল টকটকে, ঘেমে একেবারে নেয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

না বাছা তোকে আর বিরক্ত করবো না। যখন তোর ফুরসুৎ হবে তখন বলবি।

রান্নাবান্না শেষ করে ধীরুর সামনে খাবার ধরে দিয়ে বসুন্ধরা বললে, কি চাই না চাই আপনি এবার দিন মাসীমা, আমি চট্‌ করে একবার চান করে আসি।

সাবান মেখে পুকুরে স্নানই করলে সে।

তারপর ফর্সা কাপড় জামা পরে পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা যখন এসে দাঁড়ালো রান্নাঘরে, দেখলে ধীরুর খাওয়া তখন সবে শেষ হয়েছে।

মাসীমা বললে, ধীরু কি বলছে শোন্‌ বসুন্ধরা।

হাসতে হাসতে বসুন্ধরা বললে, কি বলছে?

ধীরু বললে, সত্যি বলছি আমি এমন রান্না খাইনি কোনোদিন।

বলেই সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না। সদ্য স্নান করে এসেছে বসুন্ধরা। মাথার চুল তখনও শুকোয়নি। মুখখানা যেন আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। শাড়ীটা পরেছে সে এক অদ্ভুত ধরণে। বাঙালী মেয়েরা সাধারণত ওরকম করে পরে না।

সুবচনীর বাড়ীতে কিছু পাঠিয়ে দিয়ে, মাসীকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বসুন্ধরা বললে, ছাতে বসে চুলটা শুকিয়ে আসি মাসীমা।

মাসীমা এ'টোকাটা মুক্ত করছিল। বসুন্ধরা চেয়েছিল মুক্ত করতে, কিন্তু মাসীমা দেয়নি। বলেছে, না, কাপড়-চোপড় কেচে এসেছিস তোকে আর আমি এ-সব ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেবো না।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাড়ীতে বাংলা বইটই কিছু আছে মাসীমা?

কি বই? রামায়ণ? কি করবি?

চুল শুকোতে শুকোতে পড়ব।

তা যা না ধীরুর কাছে চেয়ে নিগে একখানা বই। আর অমনি সেই কথাটা—

মাসীমাই তাকে পাঠিয়েছিল ধীরুর ঘরে।

বসুন্ধরা গিয়েছিল একটা বই চাইতে। পায় তো ভালো, না পায় তাতেও ক্ষতি নেই। বই একখানা পেলে সেইটে পড়তে পড়তে চুলগুলো মেলে দিতো পিঠের ওপর। শেষ-বর্ষার আকাশ। তখনই মেঘ, তখনই বৃষ্টি আবার তখনই রোদ্দুর।

কেমন করে মাসীমার কথাটা ধীরুকে জিজ্ঞাসা করবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বসুন্ধরা ধীরুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ধীরু সিগারেট খায় তা সে জানতো না। বিছানার ওপর শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিস রেখে ধীরু সিগারেট টানছিল। বসুন্ধরাকে ঢুকতে দেখেই সিগারেটটা সে নিবিয়ে দিলে।

বসুন্ধরা হেসে ফেললে। —ও-মা, একি করলেন? আমি একা এসেছি। মাসীমা আসেননি। ওটা নিবিয়ে ফেললেন কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো ধীরু।

সেই কথাটা বলতে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ। আরও একটা কাজ ছিল।

কি কাজ বল। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো এইখানে। বলেই ধীরু তার ধপ্‌ধপে সাদা চাদর-বিছানো বিছানাটা দেখিয়ে দিলে। বললে, আমি নেমে যাচ্ছি।

সত্যিই ধীরু নেমে যাচ্ছিল খাট থেকে। বসুন্ধরাই দিলে না নামতে। বললে, না। আপনি উঠবেন না। তাহলে আমিই চলে যাব।

বসুন্ধরা বসলো খাটের পায়ের দিকে। নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ মুখের চেহারা। খোলা চুল পিঠের ওপর

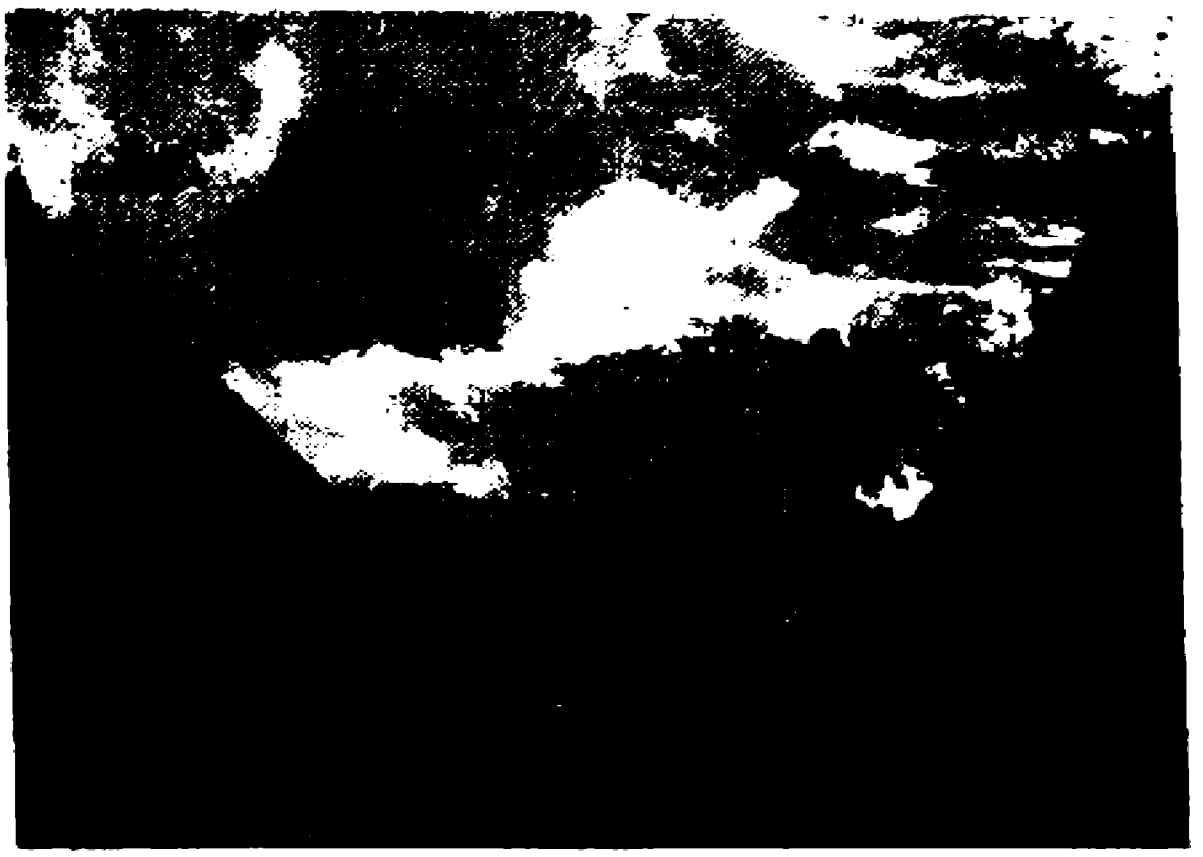

মন্ত্রীর সন্ধানে

শ্রীসুবোধ বিশ্বাস

[illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

স্ত্রী যে, কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। তিনি বলছেন, ও আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমি ওকে আলাদা থাকতে দেবো না। আমার অপমান হবে।

কথায় বাধা পড়লো। চারিদিক অন্ধকার করে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। বসুন্ধরা বললে, এই রে! এখন আমি যাবো কেমন করে?

এই বলে সে উঠতে যাচ্ছিল।

ধীরু বললে, যাবে আবার কোথায়?

এচ্‌বি
ক্লীন
Kleen
অনাবশ্যক
চুল
অতি সহজেই
চট্‌পট্ নির্মূল করে

বহু বৎসর গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত বিশেষভাবে কলপ্রদ বীজাণুনাশক উপাদানে প্রস্তুত ক্লীন পাকিস্থ হোয়ার বিমুক্তি ক্রীম অনাবশ্যক ও বাড়তি চুল অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি নির্মূল করে।

ক্লীন ব্যবহার করুন ...আপনার লাবণ্য উজ্জ্বলতর হোক।

এইচ্ বি এণ্ড কোম্পানী
পৃথিবী-বিখ্যাত হ্যাণ্ড ব্যাগ
হোয়ার ভাই প্রস্তুতকারক
৬/২ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

NAS/HB-435

বাড়ীতেই তো রয়েছ। আলো দেখলে তারপর কি হলো সে দেখা। স্বামী ছাড়তে চান না স্ত্রীকে। বলছেন, ও আমার ছেলের মা।

স্ত্রী বলছেন, ভুল করে আমি এক পশুর ছেলে গর্ভে ধারণ করেছি।

জানোয়ারের ছেলে জানোয়ার হবে। আমি চিনতে পারিনি আমার এই শিক্ষিত স্বামীটিকে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দেওয়া হোক্।

ঘন বর্ষার সেই আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসুন্ধরা মাথা হেঁট করে বসে বসে শুনছিল এই কাহিনী। তেমনি মাথা হেঁট করেই বললে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের মনের মিল হয়নি। মানুষের মিল হয় মনের সঙ্গে। চোখের দেখা দুদিনেই কেটে যায়। মনের লেখা কাটে না।

ধীরু বললে, মনের লেখা তো চট্ করে মেলে না বসুন্ধরা। চোখেরও তো একটা দরকার আছে।

এইবার চোখ তুলে চাইলে বসুন্ধরা। বললে, তাহলে পৃথিবীতে যারা সুন্দর হয়ে জন্মায়নি, তারা কি করবে? আপনি আমার দিদির কথাটা একবার ভাবুন। স্বামী তো দেখতে ভাল নয়। একচোখ কানা। দেখলে একটা কুলি-মজুর বলে মনে হয়। কিন্তু ভাব-ভালবাসা দেখেছেন ওদের?

বাইরে বর্ষণমুখর পৃথিবী আর সেই স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে প্রিয়দর্শন এক যুবক আর পরমাসুন্দরী এক যুবতী। দুজনেই চেয়েছিল জীবনের একাকীত্ব থেকে মুক্তি। দুজনেই চেয়েছিল দুটি আনন্দসুন্দর জীবন। অনাদিকালের চিরন্তন আকর্ষণ ছিল এই দুই বিকসিতযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে, তবু তারা কেন স্পর্দ্ধার এত কাছাকাছি বসেছিল একই শয্যার দুই প্রান্তে? অলক্ষ্যে থেকে পুষ্পধনু অনঙ্গদেব বোধকরি হেসেছিলেন একটুখানি। হেসেওছিলেন আবার সাহায্যও করেছিলেন। হাসিটা বিদ্রূপের হাসি নয়, আনন্দের হাসি। নইলে সাথী নির্বাচনে নিশাহারাই না হয় হয়েছিল ধীরু, তাই বলে তার শিক্ষিত মনের মর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে নাকচোয়া অধ্যাপিকের আড়লটুকু ছেঁকে ফেলবার মত দুর্মনীয় আবেগই-বা সে পেলো কোথায়? আর উন্মাদযৌবনা বসুন্ধরা? সেই-বা তার সহাস্য ছলনায় স্বর্বনিক জল অপসারিত করে দিয়ে ধীরুর সে অযাচিত আমন্ত্রণকে অভ্যর্থনা করলো কেমন করে?

প্রকৃতিও সেদিকের ষড়যন্ত্র করেছিল। অবিরত বর্ষণের ধারামুখরিত সেই শ্যামানন্দপুরের অপরাহ্ণবেলাটি মনে হচ্ছিল যেন একটি আশ্চর্য মধুর স্বপ্ন।

মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, আর দুটি দেহ মন চৈতন্যের নিবিড়তর মিলনের পুলকস্পর্শ—এই দুই পুষ্পিতযৌবন নরনারীকে যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বর্গসুখের অনুভূতির, এক অত্যাশ্চর্য নতুন সত্যের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বসুন্ধরা! বসুন্ধরা!

চমক্ ভাঙলো বসুন্ধরার। মাসীমা ডাকছেন রান্নাঘর থেকে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে। ওদিকের বারান্দায় গিয়ে বললে, এই যে, আমি এখানে।

তুইও আটকে গেলি চুল শুকোতে গিয়ে, আমিও আটকে গেলাম। পোড়া বিষ্টি আর বন্ধ হবে না আজ। ধীরুর ঘরে একটা ছাতি আছে বোধহয়। সেইটে নিয়ে একবার আয় না বাছা। আমি এখনও একটা পান পর্যন্ত মুখে দিইনি।

ছাতি আনতে যেতে হবে ধীরুর ঘরে!

যেই পেছন ফিরেছে, দেখলে ছাতি হাতে নিয়ে ধীরু এসে দাঁড়িয়েছে।

হাত বাড়িয়ে ছাতিটা নিয়ে বসুন্ধরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে রান্নাঘরে চলে গেল।

মাসী বললে, চুল আজ আর তোর শুকোলো না! এমন চুলও তো কোথায় দেখিনি মা। চিরুনি নিয়ে আঁচড়ে এলো-খোঁপা করে বেঁধে ফ্যাল্। মা-কালীর মত একপিঠ চুল এলিয়ে ঘুরে বেড়াসনি। চল্। ছাতিটা খোল্।

ছাতি নিয়ে দুজনেই আবার এলো এই ঘরে।

জিজ্ঞাসা করেছিলি ধীরুকে?

করেছিলাম।

কি বললে?

কিছুই বললে না।

হাঁ না—কিছু না?

না।

ধীরুর ভারি লজ্জা যে। মুখ ফুটে কিছু বলবে না আমি জানি। তিনটের গাড়ীটা পেরিয়েছে? আওয়াজ শুনেছিস?

পূজোর অভিনন্দন গ্রহণ করুন
ইংলিশ টেলার্স এণ্ড ড্রাউটফিটার্স
বেঙ্গল
ফ্যান্সী জোরস্

পৃথিবীর কোনও আওয়াজই এতক্ষণ শোনেনি বসুন্ধরা।

মাসী বললে, আমি একটু গড়িয়ে নিই বাছা। তুইও একটু শুয়ে নে। খুব খেটেছিস আজ।

বসুন্ধরা বললে, আমি একবার দিদির কাছ থেকে ঘুরে আসি।

পান সাজতে সাজতে মাসী বললে, বিষ্টিবাদলায় নাই-বা গেলি!

বৃষ্টি ধরে এসেছে।

বলেই সে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে জামতলা হয়ে কুয়োতলা পেরিয়ে সুবচনীর ঘরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো।

অরুণ বরুণ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। মাসীকে দেখে অরুণ বললে, এই এত বড় বড় মাছ—

কোথায় রে?

ওইখানে। বলে আঙুল বাড়িয়ে ছেলেটা উঠোন দেখিয়ে দিলে। বললে—চল দেখবে চল।

সুবচনী তক্তাপোষের ওপর শুয়েছিল ছোট বাচ্চাটাকে কোলের কাছে নিয়ে। বললে, বৃষ্টিতে ওর ভেজবার মতলব। খবরদার যাসনে।

বসুন্ধরা কোনও কথা না বলে দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সুবচনী তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, ভিজলি বুঝি?

না।

পোলাও খুব ভাল রান্না হয়েছিল।

বসুন্ধরা শুধু বললে, হুঁ।

ধীরু-ঠাকুরপো খেয়ে কিছু বলেনি?

চুপ করে রইলো বসুন্ধরা।

বিয়ের কোনও কথাবার্তা হয়নি? হাঁরে?

এবারও বসুন্ধরা কিছু বললে না। সুবচনী দেখলে সে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

তা ঘুম পেয়েছে তো ঘুমো না!

বসুন্ধরা শুয়েই রইলো। জেগে রইলো না ঘুমোলো কিছুই বুঝা গেল না।

রবিবারের রাতটা কোনোরকমে কাটলো।

রাত্রে ভাত খেয়েছে ধীরু। রান্না করে ভাতের থালাটা মুখের কাছে ধরে দিয়েই সেখান থেকে সরে গেছে বসুন্ধরা। কি নেবে না নেবে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি।

সোম মঙ্গল দুদিন ছুটি। ধীরু বাড়ীতেই থাকবে।

বসুন্ধরা কেমন যেন লুকোচুরি খেলছে। মাসীমার কাজকর্ম করে দিয়ে ঘন-ঘন চলে আসছে সুবচনীর কাছে। মাসীমা ডাকলে যাচ্ছে, নয়ত' যাচ্ছে না।

বসুন্ধরার মুখের দিকে সকাল থেকে বার বার তাকাচ্ছিল সুবচনী।

দুপুরে বললে, তোর মুখখানা কেমন যেন ভার-ভার মনে হচ্ছে বসুন্ধরা। কি ভাবছিস? অসুখবিসুখ করেনি তো? কই দেখি!

কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে সুবচনী। না, কিছু হয়নি।

মুখে তোর হাসি নেই, কথা নেই। কি হয়েছে? বল্ না!

কী আবার হবে?

বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বসুন্ধরা বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

উঁহু, কিছু হয়েছে ঠিক। তোর এত কথা, এত হাসি, কাল থেকে একেবারে চুপ। বল্ বসুন্ধরা, আমার ভাল লাগছে না কিন্তু, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে দেবো।

তারও যে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে! তবু বললে, না দিদি কিছু হয়নি। এই তো কথা বলছি।

সেখান থেকে সরে যাবার জন্যে বসুন্ধরা উসখুস করতে লাগলো। তার কোলে ছিল তরুণ। বললে, চল তোকে শালুক ফুল দেখাই গে।

তীর্থভূমি কালীঘাট ও কালী মন্দিরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত গ্রন্থ

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

অমৃত মন্থন

দাম—চার টাকা

এইরূপ তীর্থভূমিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গবেষণামূলক কল্যাণধর্মী উপন্যাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি—

॥ অমৃত মন্থন ॥ স্বার্থ-লালসা-ত্যাগ-মহত্ত্ব অর্থাৎ সুধা ও গরল মিশিয়া অপরূপ হইয়াছে। (সজনীকান্ত দাস)—শনিবারের চিঠি।

॥ অমৃত মন্থন ॥ কলিতীর্থ কালীঘাটের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বলার গুণে রস সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

- শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেছেন। —প্রেসেন্স মিত্র।
- লেখকের কৃতিত্ব ষড়ো হরফে লেখা আছে উপন্যাসের সর্বত্র। —দেশ
- একাধারে উপন্যাসের সরসতা ও ইতিহাসের তথ্য সম্পদ বৃদ্ধি করেছে এই বইটি। —যুগান্তর।
- কাহিনী বয়নের নৈপুণ্যে, বর্ণনা ভঙ্গীর সরসতায় বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। —আনন্দবাজার।
- ভিন্ন স্বাদের একটি সাহিত্য-পর্ব। —মনোজ বসু।

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

বহু প্রশংসিত আর একখানি গ্রন্থ

পরিচিতা

একটি সত্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই সংসারেরই এক পরিচিতা নারীর জীবনের গোপনতম মর্মান্তিক কাহিনী।

দাম—তিন টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এই বলে তরুণকে শালুক ফুল দেখাবার ছল করে বসুন্ধরা গেল ধীরুদের বাঁধানো ঘাটের দিকে।

ঘাটের একটা সিঁড়ির ধাপে বসলো গিয়ে।

ঘাটে আসতে আসতে শালুক ফুলের কথা ভুলে গিয়েছিল বসুন্ধরা। কিন্তু ছেলেটা ভোলেনি। পুকুরে শালুক ফুল ফুটেছিল অনেকগুলো। সেইদিকে হাত বাড়িয়ে তরুণ বলতে লাগলো, শালুক দাও।

তাকে চুপ করাবার জন্যে বসুন্ধরা বললে, বা-রে শালুক নিতে নেই। জলে বেড়াল আছে। ম্যাও!

বেড়ালকে ভয় করে ছেলেটা। সেও বললে, বেজাল্ আছে। ম্যাও। কামড়ে দেবে।

এই বলে ছেলেটা ঘাটের পৈঠায় ম্যাও! ম্যাও! বলে ছুটে ছুটে খেলা করতে লাগলো। বসুন্ধরা ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো তার মায়ের কথা। একদিন সন্ধেবেলা কুলটিকরির বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে মা তার গালে ঠাস্ করে একটি চড় মেরেছিল। কেঁদে সে তার মায়ের পায়ে ধরে বলেছিল, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, আর আমি কোনোদিন কিছু করব না।

সে প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারলে না।

বসুন্ধরার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। দুহাত দিয়ে নিজের মুখটাকে চেপে বসুন্ধরা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলে খানিকটা।

ছেলেটা জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। বসুন্ধরা উঠে গিয়ে তাকে ধরে আনলে। আকাশে আবার মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। আঁচল দিয়ে ভাল করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে তরুণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বসুন্ধরা ঘরে এসে দেখে তার জামাইবাবু খেতে বসেছে।

বসুন্ধরাকে দেখে কুলদা জিজ্ঞাসা করলে, খাওয়া হয়েছে?

অনেকক্ষণ।

সুবচনীর দিকে তাকিয়ে কুলদা বললে, খবরটা তাহলে ওকে বলি।

বল।

কুলদা বললে, খুব ভাল একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। কোন্নগর-এ লেভের 'পাগ্ মিল্' আছে।

পাগ্ মিল্ কাকে বলে জানতো না বসুন্ধরা। জিজ্ঞাসা করলে, পাগ্ মিল্ কাকে বলে দিদি?

সুবচনী বলল, ইট তৈরি হয় সেখানে।

কুলদা বললে, বেশি বয়স নয়। বছর তিরিশ-বত্রিশ হবে। হ্যাঁ তাও বলে রাখি। বিয়ে একবার করেছিল, বৌ মরে গেছে। ওপক্ষের একটি মেয়ে আছে। তবে মেয়েটি এখানে থাকে না। বললে, মামার বাড়ীতে থাকে। পছন্দ হয় তো বল—কাল তাহলে একবেলা ছুটি নিয়ে যাই কোন্নগর। বেশি দূরে নয়, এই কাছেই।

লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলে বসুন্ধরা, টাকা চাইবে না?

কুলদা বললে, খুব কম। তিন চারশ' টাকাতেই হয়ে যাবে। তোমাকে দেখলে হয়ত কিছুই চাইবে না।

বসুন্ধরা বললে, বিয়ে না করলে হয়ত চাইতো না। হাত পাতলে বরং দু' দশ টাকা পাওয়া যেতো।

সুবচনী ধমক দিলে, ও আবার কি কথা! ছি!

বসুন্ধরা বললে, ছি কেন বলছিস দিদি, সত্যি কথা। খুব সত্যি কথা।

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে তার গলাটা ধরে এলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, তিন চারশো টাকাই-বা তুই পাবি কোথায় দিদি?

সে আমি যেখানেই পাই তোকে তা ভাবতে হবে না। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—আগেকার পক্ষের একটা মেয়ে আছে; এখানে না যাওয়াই ভাল।

বসুন্ধরা বললে, নিশ্চয়ই যাবে। মেয়ে থাকলো তো কি হলো, দাদা তুমি যাও, তুমি যাও—

বলতে বলতে বসুন্ধরা ছুটলো মাসীমার বাড়ীর দিকে।

সেখানে গিয়ে আবার আর-এক বিপদ।

মায়ের দোরটা পেরিয়েই দেখে, মা-বাটার কথা হচ্ছে। মা দাঁড়িয়ে আছে জামগাছের তলায় আর ধীরু বসে আছে কুয়োর বাঁধানো পাড়ের ওপর।

ওদের দেখেই বসুন্ধরা পালিয়ে আসছিল, মাসীমা দিলে না পালাতে। বললে, যাসনে বসুন্ধরা শোন্!

মাথা হেঁট করে বসুন্ধরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

মাসীমা বললে, এই মাসে তো ধীরুর বিয়ে হবার কথা ছিল, বিয়ের সময় আমি তিন হাজার টাকা পেতুম। ধীরুকে কলেজে পড়াবার সময় দু' হাজার টাকার অতি উৎকৃষ্ট সতীঘাটার ধানের জমি আর রামকানাইয়ের বাগানটি আমি বিক্রি করেছি। সেই ধানের জমি আর বাগান হেবো হালদার আমাকে ফিরিয়ে দেবে বলেছে। ধীরুকে তাই বলছি—পরাশরবাবুকে তুই একটা চিঠি লেখ্।—লিখে দে, বিয়ে নাহয় দু'মাস পরেই হবে, কিন্তু টাকাটা তুমি এখন আমাকে দিয়ে যাও। হেবোকে আমি বলে রেখেছি। দু'শ টাকা বেশি পেলেই এখন সে আমাকে জমি বাগান ফিরিয়ে দেবে। কি? আমি অন্যায় বলছি কিছু? তুই কি বলিস বসুন্ধরা?

বসুন্ধরা চুপ করে রইলো। সে আবার কি বলবে?

চিঠিটিকিটি লিখতে পারব না আমি।

বলেই ধীরু সেখান থেকে উঠে পালিয়ে গেল।

মাসীমা বলে, বেশ তাহলে আমিই লিখি।

এই বলে বসুন্ধরার কাছে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে মাসী বললে, আয় আমার সঙ্গে। বেশ করে গুছিয়ে এই কথাগুলি তুইই লিখে দিবি আর।

মাসী ছাড়লে না কিছুতেই। বসুন্ধরাকে যেতে হলো তার সঙ্গে।

যেতেও হলো। লিখতেও হলো।

ছুটির দুটো দিন বাড়ীতেই কাটাতে হলো ধীরুকে।

এই দুটি দিনের মধ্যে অনেকবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ উঠলো, ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, কিন্তু একটি বারের জন্যও বসুন্ধরা এলো না তার ঘরে।

বসুন্ধরার কেমন যেন লুকোলুকো চেহারা, চুল আঁচড়ায় না, ভাল কাপড় পরে না, মুখ নীচু করে ঘরের কাজকর্ম সবই করে, ধীরু কাছে এলেই সরে যায়।

সেদিন শেষ রাত্রি, কাল সকালেই ধীরু চলে যাবে কলকাতায়। ভাতের থালাটা ধরে দিয়েই বসুন্ধরা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, ধীরু তার মায়ের কাছেই ডেকে বসলো, বসুন্ধরা!

বসুন্ধরা ফিরে দাঁড়ালো। মুখখানি বিষণ্ণ ম্লান। একগাছি চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। দুরে লাড়ীর আঁচলটা শুধু কোমরটা দিয়ে কোমরে গোঁজা। তাও যেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

বড় বড় চোখদুটি তুলে একবার ধীরুর দিকে তাকালো সে। চোখে চোখ পড়ে গেল। কালো তারা দুটি যেন থর থর করে কাঁপছে।

ধীরু বললে, বইগুলো নিলে না যে!

বসুন্ধরা শুধু বললে, নেবো।

নেবো বলেই চলে গেল বেরিয়ে।

দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল ধীরুর মা।

ধীরুর মনে হলো সে যেন অপরাধী। বসুন্ধরার কাছে সে যেন মারাত্মক কোনও

অপরাধ করে ফেলেছে। মার দিকে চোখ পড়তেই মনে হলো মাও যেন তার কৈফিয়ৎ চাচ্ছে তার কাছ থেকে। ভাতে তখনও হাত দেয়নি সে। ভাতগুলো খেতে ইচ্ছে করছিল না তার। হঠাৎ বলে বসলো, কি হয়েছে ওর? ভাল করে কথা বলছে না—

মাসীমাও সেটা লক্ষ্য করেছে। বসুন্ধরার কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে। বসুন্ধরাও যেন মাথাটি কাৎ করে দায়-সারা গোছের জবাব দিলে, হ্যাঁ।

মাসীমা বললে, ও।

ধীরুর কাছে এসে বললে, না কিছু হয়নি। এমনি।

বাস, আর কোনও কথা নেই। ওই পর্যন্তই।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিল ধীরু। মার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিল, বসুন্ধরার শোবার জায়গাটা খালি। তারও আগে কখন্ সে উঠে চলে গেছে। পুকুরের ঘাটে গিয়েছিল হাত-মুখ ধুতে। যদি বসুন্ধরার সঙ্গে একটিবার দেখা হয়! কিন্তু না, সেখানেও নেই। সুবচনীর বাড়ীতে যেতে কেমন তার সাহসে কুলোয়নি।

সাতটার ট্রেণ। কলকাতায় যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নীচে নেমে এসেছিল ধীরু। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে মেঝের ওপর বসেছিল চা খাবার জন্যে।

মা বলেছিল, শুধু চা খাবি? চারটি মুড়ি খা।

না।

বৌমা দুধ দিয়ে গেছে। এক বাটি দুধ গরম করে দিক্।

না।

সুমুখে রান্নাঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ধীরু।

ভোরের আকাশে শুকতারার মত চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে বসুন্ধরা। শাড়ী পাল্টেছে। চুলও আঁচড়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই ম্লানমুখী বসুন্ধরা।

ওপরের ঘরের চাবিটা ছিল ধীরুর হাতে। চাবিটা অন্য দিন সে মার হাতে দিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু বসুন্ধরার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ঘরের চাবি রইলো। বই যা দরকার হবে নিও।

চাবিটাও তুলে নেয়নি, কোনও কথাও বলেনি বসুন্ধরা। চায়ের পেয়ালাটি সে তার পায়ের কাছে নামিয়ে নিতে গিয়েছিল, ধীরু হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েছিল পেয়ালাটি।

হাতে ঠেকেছিল হাত, আর চোখে পড়েছিল চোখ।

রোমাঞ্চিত শিহরণ জেগেছিল ধীরুর সর্ব অঙ্গে। আর প্রচণ্ড আঘাত জেগেছিল তার বুকে। বসুন্ধরার দুটি চোখ জলে ভরা। লুকোতে চেয়েছিল বসুন্ধরা। কিন্তু লুকোতে পারেনি। পেছন ফিরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল তার মা। যাবার সময়েও বলেছিল, চিঠিখানা ডাকে দিয়েছি। আজকালের মধ্যেই পাবে।

ধীরুর মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি।

চিঠি পেয়ে টাকাটা যদি বেইমশাই তোর আপিসে গিয়ে তোর হাতেই দিয়ে আসে তো নিবি। বাড়ীতে একবার যদি তোকে নিয়েই যেতে চায় তো যাবি। লজ্জা-টজ্জা করিস নে।

কোনও কথা না বলে ধীরু সাইকেল-রিক্সায় গিয়ে উঠেছিল।

কোথেকে 'পাগ্ মিলের' মালিককে ধরে নিয়ে এসেছে ঝুলন চক্রবর্তী।

লোকটি ভাল। হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পরণে লাল পাড় কোঁচানো ধুতি। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মুখের চামড়া একটু কুঁচকে গেছে।

ঝুলন একেবারে ঘরের দোরে এনে হাজির করলে ভদ্রলোককে।

সুবচনী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে বললে, একটা খবর দিয়ে আসতে পারলে না? জানো তোমার একখানা ঘর—

ঝুলন বললে, সে অবসর আর নিলেন কোথায় বটব্যাল-মশাই! বললেন, মেয়েটিকে একবার দেখেই—

'পাগ্ মিলের' মালিক বটব্যালমশাই তখন নিজেই কথা বললেন। জুতো খুলে তিনি তখন একেবারে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছেন।

সে জন্যে কোনও চিন্তা করবেন না আপনি। মেয়েটি যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই একবার দেখিয়ে দিন আমাকে।

বলতে বলতে তক্তাপোষের ওপর চেপে বসলেন বটব্যালমশাই।

সুবচনী বললে, না না তা কি হয় নাকি? এসেছেন যখন, একটু মিষ্টিমুখ করে যান। ওগো, শুনছো? ওখানে আবার কি খুঁজছো তুমি?

ঝুলন তখন তক্তাপোষের নীচে বসে কি যেন হাতড়াচ্ছিল। সুবচনীর কথা শুনে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সুবচনী বললে, যাও চট্ করে কিছু সন্দেশ নিয়ে এসো।

সন্দেশ যে আমি এনেছি পকেটে করে। ডিস খুঁজছিলুম।

ওই দ্যাখো, গ্লাস ডিস সব আছে রান্নাঘরে। নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে নিজেও খেতে। আমি ততক্ষণ বসুন্ধরাকে বারণ করে দিই—এদিকে আসতে।

ঝুলন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, কেন, বারণ করবে কেন?

সুবচনী কিন্তু সে চুপিচুপি কথার জবাবে বেশ জোরে জোরেই বললে, তুমি নাওগে খেতে। তারপর বলছি। একটা খবর নিয়ে আসবার কথা তবে আর

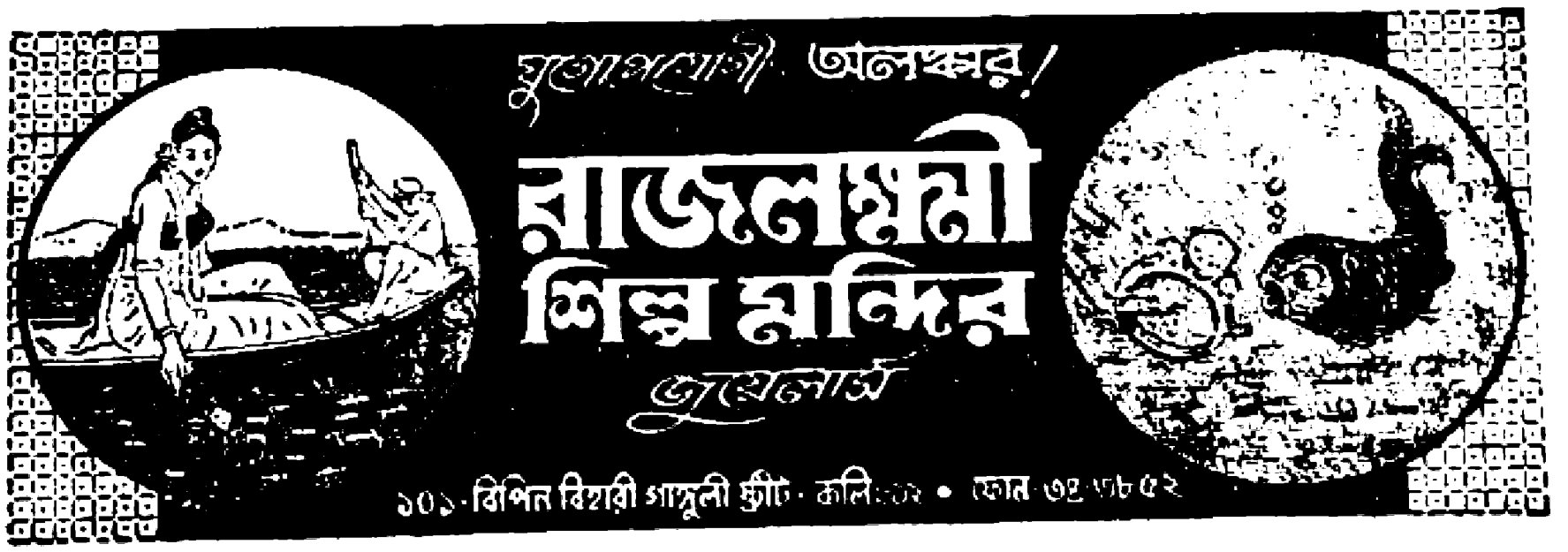

বলছিলুম কেন? আজ বিষ্যুৎবার। মেয়ে অজ আমাদের দেখাতে নেই।

কথাটা শুনতে পেলেন বটব্যাল-মশাই। ভেতর থেকেই জবাব দিলেন, কেন? বৃহস্পতিবার তো ভাল বার।

আজ্ঞে না। আমাদের একটা ইয়ে আছে।

বলেই সুবচনী মাসীর বাড়ীর দিকে চলে গেল। ছেলে তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে বসুন্ধরা বোধ হয় সেইখানেই গেছে। তাড়াতাড়ি বারণ না করলে হয়ত ফট্ করে এসে পড়বে।

সুবচনী যা ভয় করেছিল শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই হলো।

বটব্যালমশাই সন্দেশটি মুখে দিয়েছেন আর ঠিক সেই সময়েই গোয়ালের দিক থেকে ছেলে তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে বসুন্ধরা এসে হাজির।

'দিদি' বলে ডেকে ঘরে ঢুকেই নতুন মানুষ দেখে আবার বেরিয়ে আসছিল, ঝুলন বললে, এই তো বসুন্ধরা। দাঁড়া দাঁড়া যসনি, শোন্!

ঝুলন তার কোল থেকে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে বললে, দেখুন বটব্যাল-দাদাই! এত কষ্ট করে এলেন যখন—হোক্‌গে বৃহস্পতিবার। আমি ও-সব মানিটানি নে।

মাসীর বাড়ী থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো সুবচনী। দূর থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল বসুন্ধরাকে। কাছের কাছে এসে যেন সে রাগে একেবারে ফেটে পড়লো।

তোমার কি এতটুকু আক্কেল-বুদ্ধি নেই? আমি বারণ করে গেলাম—

বটব্যালমশাই জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থামুন মা থামুন। আপনার বারণ উনি শোনেননি, ভালই করেছেন। দেখুন, ইঁটের দালালী করতে করতে পাকা মিলের মালিক হয়েছি আমি। আক্কেল-বুদ্ধি আপনার স্বামীর না থাকলেও আমার একটু আছে। বৃহস্পতিবারে মেয়ে দেখাবেন না, আপনার একটু 'ইয়ে' আছে শুনেই আমি একটুখানি আঁচ করেছিলুম, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার এই বোনটি হলো গিয়ে এক নম্বরের ফার্স্ট ক্লাস ইঁট, বড় বড় ইমারত-অট্টালিকায় দরকার হয়। এ দিয়ে কাদার গাঁথনি হয় না। হলেও বড় বেমানান হয়। এই সোনার প্রতিমাকে আমি কি কখনও বিয়ে করতে পারি মা, না আপনিই আমার হাতে তুলে দিতে পারেন এই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটিকে?

এই বলে বসুন্ধরার মাথায় হাত দিয়ে বটব্যাল-মশাই বললেন, তুমি রাজরাণী হও মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

বটব্যাল-মশাই জুতো পরলেন, লাঠিটি হাতে নিলেন, তারপর আবার দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, আপনার ঠিকানা আমার জানা রইলো চক্কোত্তিমশাই। ভাল ছেলের সন্ধান যদি পাই তো আপনাকে আমি জানাব। আসি। নমস্কার!

ভাল ছেলের সন্ধান কিন্তু বটব্যাল-মশাইকে দিতে হলো না। তার আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল।

একটা দিন পরই শনিবার।

শনিবারের পাঁচটার ট্রেণ।

ধীরু এলো। সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়ালো বাড়ীর দরজায়। মস্ত বড় একটা সুটকেস হাতে নিয়ে ধীরু নামলো রিক্সা থেকে।

আমার ওপরের ঘরের চাবি কোথায় মা?

মা বললে, চাবি যেখানে থাকে সেইখানেই আছে। দ্যাখ্‌গে আমার ঘরের দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো। কেন, চাবির কথা আজ জিজ্ঞাসা করলি যে?

ধীরু বললে, সেদিন যাবার সময় চাবিটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম বসুন্ধরার পায়ের কাছে। বই নেবে বলেছিল না?

কই, বই-টই কিছু নেয়নি। এই নতুন বাক্সটা কিনলি বুঝি? বেইমশাই টাকা দিয়েছে?

না।

ধীরু ওপরে উঠে গেল, সুটকেসটা রাখতে।

সুটকেস রেখে চটি পরে গামছা কাঁধে নিয়ে যেমন নেমে আসে তেমনি নেমে এলো ধীরু। বসুন্ধরা চা করছে। মা দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে।

হাঁরে ধীরু, বেইমশাই তোর আপিসে কোনও খোঁজখবর নেয়নি? আমার চিঠিটার জবাব দিলে না কেন বল্ দেখি? হেবো এসেছিল পরশু সকালে। আমি বললুম—আর কয়েকটা দিন সবুর কর বাবা, জমি কেনার দরুণ যা ব্যবস্থাই আমি পাকাপাকি করে ফেলেছি। এখন নিলে ধানসুদ্ধ পাওয়া যেতো জমিটা—এই আর-কি!

শেষ পর্যন্ত কথাগুলো শুনলে না ধীরু। চলে গেল পুকুরের ঘাটে।

হাঁরে বসুন্ধরা, চিঠির ঠিকানাটা তুই ভাল করে লিখেছিলি তো?

লিখেছিলাম।

কথাগুলি যা যা বলেছিলুম—ঠিক ঠিক লেখা হয়েছিল?

হুঁ।

তাহলে চিঠির জবাব এলো না কেন বল্ দেখি?

তাও বলতে হবে বসুন্ধরাকে? বসুন্ধরা চুপ করে রইলো।

কাপে দুধ চিনি দিয়ে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো খিড়কির দিকে।

ধীরু এলো। এসেই বসে পড়লো রান্নাঘরের সিঁড়ির ধাপে। কাপটা হাতে হাতে বাড়িয়ে দিলে না বসুন্ধরা। চা তৈরি করে একটুখানি ঠেলে দিলে মাত্র ধীরুর দিকে।

মা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারলে না বসুন্ধরার দিকে। কাপটা তুলে নিয়েই সে মুখে দিয়েছে, অমনি মাতৃকণ্ঠ থেকে সুধাবর্ষণ সুরু হলো।

তখন আমার কথাগুলো তুই ভাল করে শুনলি না ধীরু। বেইমশাই-এর টাকার জন্যে আমি ছট্‌ফট্ করছি কেন জানিস? এখন যদি জমিটা কিনে নিতে পারতুম তাহলে ধানসুদ্ধ পাওয়া যেতো। তোর পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে ওইটি আমার গেছে।

হ্যাঁ না কিছু বললে না ধীরু। খুব তাড়াতাড়ি খানিকটা চা খেয়ে নিয়েই কাপটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে ধীরু সোজা চলে গেল সুবচনীর কাছে।

কি করছো, বৌদি?

লেখাপড়া শেখাচ্ছি ছেলেদের।

সব-চেয়ে ছোট ছেলে তরুণ বসে আছে সুবচনীর কোলে, আর অরুণ বরুণকে দু' খানা শ্লেট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে অ আ লিখবার জন্যে।

ধীরু দাওয়ার ওপর চেপে বসলো। বললে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে কত খরচ হলো হিসেব রাখো।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

ওদের বিয়ের সময় সেটা আদায় করতে হবে বৌ-এর বাপের কাছ থেকে।

সুবচনী চট্ করে কথাটা ধরতে পারলে না। একবার তাকালে ধীরুর মুখের দিকে। তারপর বললে, তোমার মুখে হঠাৎ এ-কথা কেন ঠাকুরপো?

কিছু না। এমনিই বললাম।

না না এমনিই কেন বলবে? তুমিও তো ওই দলে! তোমার শ্বশুরকেও তো সেদিন মাসীমা একখানা চিঠি লিখিয়েছেন বসুন্ধরাকে দিয়ে!

কী লিখিয়েছেন?

সুবচনী হেসে বললে, কিছু জানো না যেন! ন্যাকামি কোরো না ঠাকুরপো, ন্যাকামি ভালবাসি না।

সুবচনীর চাঁছাছোলা কথা। সত্যি কথাটা মুখের ওপর না বলতে পারলে তার সুখ হয় না। বললে, আমার যে

রাতের পড়া ফটো : সমর দিপদার

কিছু বলবার উপায় নেই। মুখের কথাটা মুখের ডগায় এসে আটকে থাকে।

কেন?

ভাবছে বুঝি আমার বোনকে তুমি বিয়ে করলে না তাই বলছি। কলকাতায় তো রয়েছ, দাও না দেখে একটি ছেলে!

ধীরু বললে, সেই রকম একটি ছেলের সন্ধান আমি পেয়েছি। সেই কথাই বলতে এলাম তোমাকে।

সত্যি?

সত্যি।

সুবচনী বললে, তাহলে পাঠশালার ছুটি দিয়ে দিই?

তার মানে?

অরুণ বরুণের শ্লেটদুটো সরিয়ে নিয়ে সুবচনী বললে, যা, তোদের আজ ছুটি। খেলা করগে যা।

অরুণ বরুণ ছুটে চলে গেল। কোলের ছেলেটা কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুবচনী বললে, এটা এখনও ইস্কুলে ভর্তি হয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছে। একে শুইয়ে দিয়ে এসে ভাল করে শুনি।

ছেলেটাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে এসে সুবচনী ভাল করে চেপে বসলো। বললে, বল এবার। কি সুখবর নিয়ে এসেছ, শুনি।

ধীরু বললে, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে, তোমার বাপের বাড়ীর দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আজকাল নাকি খুব ভাল হয়ে উঠছে। একটি পয়সা না নিয়ে তোমার বোনকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেছে। বলেছিলে কি না?

হ্যাঁ বলেছিলাম।

অথচ কথাটা তাহা মিথ্যে কথা।

সুবচনী বললে, হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। তোমার ওপর রাগ করে বলেছিলাম। আর যতই লেখাপড়া শিখুক সে রকম দিন কখনও আসবে বলে মনে হয় না।

ধীরু বললে, কেন আসবে না?

সুবচনী বললে, মা বাপের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। ছেলে-মেয়েদের নিজেদের শক্ত হতে হবে। তা কি আর কোনোদিন হবে এই হতভাগা দেশে?

হবে বৌদি হবে। হবে কেন, হয়েছে। সেই খবরটাই দিতে এসেছি তোমাকে। আগামী পরশু মানে সোমবার সন্ধ্যেবেলা তোমার বোন বসুন্ধরার বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি। পাঁজি দেখে দিন স্থির করেছি। তোমার এই ঘরের ভেতর বিয়ে হবে। একটি পয়সা খরচ করতে হবে না। বুলনদা-শিবু ভট্‌চাজকে খবর দেবে। পাড়ার দু-চারজন লোককে যদি খাওয়াতে হয় তো খাইয়ে দিও। খরচ সব আমার।

সুবচনী বিশ্বাস করতে পারলে না কথাটা। বললে, কী পাগলের মত কথা বলছ ঠাকুরপো? ছেলে দেখলাম না কিছু না—

ছেলে দেখতে চাও দাখো।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছেলে?

এই তো তোমার সামনে বসে।

বলে ধীরু তার নিজের বুকে হাত রেখে বললে, আমি—আমি বিয়ে করব বসুন্ধরাকে।

যে রকম জোরের সঙ্গে বললে কথাটা, সুবচনী অবিশ্বাসও করতে পারলে না, আবার পুরোপুরি বিশ্বাসও হলো না। বললে, তুমি আমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছ না তো ঠাকুরপো?

ধীরু বললে, না বৌদি সত্যি বলছি।

কিন্তু তোমার মা?

মা এখনও জানে না।

কখন জানাবে তাকে?

আজ রাত্তিরে।

সুবচনী বললে, আগে দাখো জানিয়ে—কি হয়।

যা হবার তাই হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর জানানো হয়েছিল তাকে। জানিয়েছিল অবশ্য তার একমাত্র সন্তান ধীরু।

প্রথমটা গুম্ হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো বিরজাসুন্দরী, তার পর আরম্ভ হলো তার কটূক্তির ভাষণ!

সব দোষ গিয়ে পড়লো সুবচনীর ওপর।

মাসী বললে, ওই হারামজাদীই আমার এই সর্বনাশটি করেছে। আমি বুঝতে পারছি। সহদেটের ধানের জমি আর রামকানাইয়ের বাগান আমি ফিরে পাব—ও-মাগীর তা' সহ্য হবে কেন? আর তোকেই বা কি বলবো ধীরু, লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত এই বুদ্ধি হলো তোর? তিনটি হাজার টাকা নগদ, কলকাতায় এতখানা বাড়ী, টকাকড়ি গয়নাগাঁটির তো কথাই নেই, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একটি পয়সা না নিয়ে তুই বিয়ে করবি ওই মেয়েটাকে? কেন? কি দুঃখে? তুই লেখাপড়া জানিস না, না রোজগার করতে পারিস না? আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে হতভাগা!

রাত্রে খেয়েদেয়ে সেই যে বসুন্ধরা পালিয়েছিল সুবচনীর কাছে, সে আর এ-পথ মাড়ায়নি।

সকালে দুধ দিতে এলো না সুবচনী। পাঠিয়ে দিলে বসুন্ধরাকে।

বিরজাসুন্দরী বললে, খবরদার বলছি দুধ দিবিনে। টান মেরে ফেলে দেবো আমি।

দুধ নিয়ে ফিরে গেল বসুন্ধরা।

সুবচনী বললে, রেখে দে। বুড়ীকে আর দুধ খেতে হবে না।

জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুবচনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গালাগালি দিতে লাগলো বিরজাসুন্দরী।

পুকুরের ঘাটে ধীরুর সঙ্গে দেখা হলো সুবচনীর। সুবচনী বললে, মা যখন তোমায় এমনি করছে ঠাকুরপো, তখন তুমি এক কাজ করতে পার। বসুন্ধরাকে আমি পাঠিয়ে দিই কুলটিকরিতে। সেখানে আমার বাবা আছে, আমাদের বাড়ী আছে। মার চোখের বাইরে বিয়েটা সেরে নিয়ে এসো, তারপর মা একটু ঠাণ্ডা হলে বৌ নিয়ে আসবে।

রাজী হলো না ধীরু। বললে, না। লুকিয়ে আমি কিছু করব না। যা করব সমারোহ করে করব। তোমার বাড়ীতেই কাল আমাদের বিয়ে হবে।

হলোও তাই।

ঠিক সময়েই বিয়ে তাদের হয়ে গেল।

বিয়ের পর মাকে প্রণাম করতে গেল ধীরু আর বসুন্ধরা।

বসুন্ধরাকে মানিয়েছে চমৎকার। কলকাতা থেকে ধীরু তার জন্যে মনের মত কাপড় জামা কিনেই এনেছিল।

প্রতিমা পুস্তক

১০১ডি/১, আনন্দ পালিত রোড
কলিকাতা—১৪

- স্কুল-কলেজ, পাঠাগার উপহারের
- বাংলা-ইংরাজী ভাষার বাণীবিধ সর্বাধুনিক গ্রন্থের বিচিত্র সম্ভার

আমাদের নিবেদন

॥ ধর্মগ্রন্থ ॥
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে—
হরিসাধন গোস্বামী ৩·০০

॥ জীবনচরিত ॥
ব্রহ্মবান্ধব—সুকুমার সেনগুপ্ত ২·০০

॥ গল্পগ্রন্থ ॥
গল্পসঞ্চয়—বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী ২·০০
প্রেম কাহিনী—সুবোধকুমার চক্রবর্তী ২·৫০

॥ উপন্যাস ॥
ত্রিকোণ—সুকুমার সেনগুপ্ত ২·০০
জিজ্ঞাসা—বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী ৩·০০

॥ ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ॥
ভারতীয় ও ইউরোপীয় ইতিহাসের
সাধারণ সমাধান—অমরেশ
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৩·০০
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :
বিশ্লেষণ ও আলোচনা

স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

কিন্তু প্রণাম করতে গিয়েই বাধলো বিপদ।

ধীরু প্রণাম করলে, মা তখন গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল।

কিন্তু বসুন্ধরা যেই প্রণাম করবার জন্য মাথা হেঁট করেছে, বিরজাসুন্দরী মাগলে তাকে সজোরে এক ধাক্কা। বললে, বেরিয়ে যা তুই আমার চোখের সম্মুখ থেকে। তোকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

'মা' বলে চীৎকার করে বসুন্ধরা উলটে পড়েছে তখন সিঁড়ির ওপর। দুহাতে দিয়ে মাথাটা চেপে ধরেছে সে। কিছুতেই উঠতে পারছে না।

ধীরু ছুটে গেল তার কাছে। দেখলে মাথা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

হাত ধরে তুলে ধীরুই তাকে তার ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। টিনচার আইডিন লাগিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, খুব কি লেগেছে?

বসুন্ধরা হেসে বললে, না।

পরের দিন সকালে ধীরু আর বসুন্ধরা মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ধীরু বললে, আমরা কলকাতায় চললাম মা।

মা ভেবেছিল ছেলে বুঝি একাই চললো।

বসুন্ধরাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, ও-ও চললো বুঝি?

ধীরু বললে, হ্যাঁ। ওকেও নিয়ে যাচ্ছি।

মা বললে, তাই যা। আমার চোখের সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যা তোরা।

মাইকেল বিদ্যা ভেঙে এসেছিল কুলীন চক্রবর্তী।

সুবচনীর এদিক দিয়ে আসবার উপায় নেই। তাই সে তার ছেলে তিনটিকে নিয়ে ওই দিক দিয়ে ঘুরে ধীরুদের দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিদ্যার কাছে।

বসুন্ধরা সুবচনীকে প্রণাম করলে।

সুবচনীর চোখে জল। বললে, তোরা দুজনে সুখেই থাকবি তা জানি। তবু আশীর্বাদ করছি—

আর সে কিছু বলতে পারলে না। কান্নায় গলাটা ধরে এলো।

খানিক পরে বললে, বাবাকে আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো। তুই কলকাতায় গিয়ে আমাকে একটা খবর দিস।

বসুন্ধরা বললে, দেবো।

পরের দিন বিকেলে কলকাতা থেকে এলেন পরাশরবাবু।

দেখা করলেন বিরজাসুন্দরীর সঙ্গে।

আপনার চিঠি আমি পেয়েছিলাম বেয়ানঠাকরুণ!

ছেলেবৌকে বিদায় করে দিয়ে মনের অবস্থা তার ভাল ছিল না। কোনও জবাব দিতে পারলে না ধীরুর মা। চুপ করেই রইল।

পরাশরবাবু আবার বললেন, টাকাটা আমি এখন জোগাড় করতে পারলাম না বেয়ানঠাকরুণ। তবে পুজোর আগেই এক হাজার টাকা আমি দিয়ে যাব। বাকি দুহাজার টাকা দেবো বিয়ের সময়।

এতক্ষণ পরে কথা বললে বিরজাসুন্দরী। বললে, টাকা আর দিতে হবে না আপনাকে। আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে।

কথাটা বোধহয় রাগের কথা।

পরাশরবাবু বললেন, আপনি রাগ করলেন আমার ওপর?

না রাগ করিনি। সত্যি বলছি।

পরাশরবাবু কি যেন ভাবছিলেন।

ধীরুর মা বললে, তবে যে বলেছিলেন আপনি বড়লোক?

পরাশরবাবু বললেন, বিয়ে যখন হয়েই গেছে আপনার ছেলের, তখন আর বলতে দোষ নেই—শুনুন!

মা বললে, কি শুনবো?

পরাশরবাবু বললেন, মেয়েটা আমার দেখতে তেমন ভাল নয়। ভেবেছিলাম, আপনারা গরীব। টাকার লোভ দেখালে আমার মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবে। তাই ও-সব কথা বলেছিলাম।

মা বললে, খুব অন্যায় করেছিলেন আপনি।

পরাশরবাবু বললেন, বাড়ন্ত আই-বুড়ো মেয়ে যাদের বাড়ীতে, তারা এর চেয়েও বড় অন্যায় করে থাকে।

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহ'লে আমি চলি। প্রণাম।

আচ্ছা আসুন।

বিরজাসুন্দরী তাঁকে বিদায় করে দিয়ে কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জামগাছের তলায় গিয়ে ডাকলেন, বৌ! ও বৌ!

বৌ মানে সুবচনী।

সে ভাবতেই পারেনি যে ধীরুর মা তাকে এমন করে ডাকবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাড়া দিলে। বললে, কি বলছো?

ধীরুর মা বললে, ওরা বোধহয় আমাকে খবর-টবর দেবে না। তোর কাছে ওদের চিঠি এলে আমাকে জানাস।

সুবচনী বললে, জানাবো।

বলেই সে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

—শেষ—

আধুনিক কবিতা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

আমি তখন ছাতের ঘরে বসিয়া আধুনিক কবিতার মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি যখন পড়িতে বসি প্রায় রোজই তখন একতলার ছোট মেয়েটি আসিয়া তাহার সব কালীঘাটের হাঁড়ি-কুঁড়ি ছাতে বিছাইয়া রান্নাবান্না খেলিতে বসে। পড়া-শুনার ফাঁকে ফাঁকেই আমাকে তাহার সুপক্ক অভিনব ঘন্ট-বাঞ্জনাদি মাঝে মাঝে খাইয়া লইতে হয় এবং কিছু কিছু রোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে খুশী রাখিতে হয়।

আজ আধুনিক কবিতার হাত দিয়াছি একটা বিশেষ সংকল্প লইয়া; সে সংকল্প হইল এই যে, আজ আর ছেলেমানুষী আধুনিক কবিতা পড়িবার তরল প্রবণতা প্রকাশ করিব না। এ-কথাটা এত-দিনে বুঝিয়া লইয়াছি যে আধুনিক কবিতা পড়িতে হইলে মনকে আগে তাহার উচিত-মূল্য দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উচিত-মূল্য দানের মধ্যে এখানে হৃদয়দানের কথাটা বড় হইয়া আছে; হৃদয়দানের অর্থ এখানে উপযুক্ত মনন-দান। পূর্বাভ্যাসে বহুবার বিড়ম্বিত হইয়াছি; সেই বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতায় এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আধুনিক কবিতার মননের একটি সমবায় নীতি অনুসৃত আছে,—সেই সমবায়ের অংশীদার একদিকে কবি নিজে, অন্য-দিকে সহৃদয় পাঠক। সহৃদয় বলিতে সম-মননশক্তি-সম্পন্নতার উপরে এবং সম-সুচিগ্রহণতার নিকটার উপরেই জোর দিতে হইবে। সমবায়-নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই কারবারের অংশভাগ ঠিক সমান সমান না হইলেও অন্ততঃ দশ-আনা দু'-আনার কাছাকাছি হইতে হইবে; নতুবা লাভের অংক উত্তরদিকেই বক্রগতি পড়িবার সম্ভাবনা। কথাগুলি এখন জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া বিধিপূর্বক পাঠের জন্য নিজেকে সচেতনভাবে প্রস্তুত করিয়া লইবার তাগিদ বোধ করি; আজ নিজেকে যতটা পারি সেইভাবেই প্রস্তুত করিয়া লইয়া কবিতা পাঠে বসিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেও সুফল তেমন কিছু হয় নাই।

আশঙ্কা করিতেছি, এই উপক্রমণিকা পড়িয়া ইতিমধ্যেই সামাজিকগণ আশা করিতেছেন এই যে, আজ শেষ পর্যন্ত বহু-উক্ত বহুশ্রুত এবং বহুচর্চিত একটি রক্ষণশীল-স্লোগানেরই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই, স্লোগানটি হইল, আধুনিক কবিতা' অতিশয় দুর্বোধ্য। এই স্লোগানটি আবার আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়, ইহা সম্পূর্ণ আর একটি অনুসিদ্ধান্ত লইয়া, তাহা হইল এই যে, যাহা দুর্বোধ্য তাহা মূলতঃ কোন সাহিত্যকর্মই নয়।

এই আশঙ্কিত পথে পদচারণা আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। এতদিনে আমরাও জানিয়া ফেলিয়াছি যে, কবিতা লইয়া সাধারণতঃ যে বোঝা-না-বোঝার কথাগুলি বলা হইয়া থাকে তাহা তরল-গুলি অচল কথাকেই প্রথাবশতঃ ঠেলিয়া চালাইবার চেষ্টা মাত্র। কবিতা বোঝা শব্দের অর্থ সরাসরি একটা সরলার্থ বা ভাবার্থ বুঝিয়া লওয়া নয়; একটি কবিতা একজন কবির অত্যন্ত ব্যাপক এবং অত্যন্ত জটিল সমগ্র পূর্বচেতন সত্তারই একটি অনুচ্ছেদের পরিচয়; কবির সত্তা যতটা সম্ভব এক হইয়া গিয়া সেই অনু-চ্ছেদেরই যে গ্রহণ তাহারই তাৎপর্য হইল কবিতা বোঝা। যখন বলিলাম সকল হইল না, তখন বলিলাম, গ্রহণটা সম্পূর্ণভাবে হইল না। কেন সেই কথাটিই বিচার্য। নিজেকে বারবার কবিতার একটি গড়পড়তা সাধারণ পাঠকরূপে ধরিয়া লইয়া সেই 'কেন' প্রশ্নটার উত্তরই খুঁজিয়া ফিরিয়া নানাভাবে নিজের মধ্যে পাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি যখন সেই অন্ধ শিক্ষানবিস এবং তাহাকে সাধারণীকরণের ব্যাপক কবিতা সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক সত্য আবি-ষ্কারের চেষ্টা করিতেছি তখন ছাতের এক কোণ হইতে ছোট মেয়েটি তাহার ছোট্ট ছোট হাতা-খুন্তির টুং-টাং শব্দের দ্বারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত সহজ সুরে আমাকে বলিয়া উঠিল, 'তোমাকে অত ভাবতে হবে না, একটু দেরী কর, এই আমার হয়ে এল।'

আমি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি হয়ে এসেছে? তুমি আজ কি রান্না করছ?'

মেয়েটি বলিল, 'পায়েস রান্না করছি।'

আমি বলিলাম, বাঃ, পায়েস? একটুখানি নিয়ে এস না।'

মেয়েটি বলিল, 'যাও, এখন পর্যন্ত নুনই দিলুম না, নিয়ে আসব কি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'পায়েসে নাকি নুন দেয়? হা-হা-হা—তুমি রান্নাই শেখনি।'

মেয়েটি সহসা একটু অপ্রতিভ হইয়া পরক্ষণেই মুখখানি গুঁচলো করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁ-গো হাঁ, পায়েসেও একটু নুন দিতে হয় গো! এবে আমি অন্য রকমের পায়েস রাঁধছি, বিলিতি পায়েস গো।"

'আমি সামনের বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কথাটা ত মেয়েটি মন্দ বলে নাই, নূতন করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবার মত।

একরকমের পায়েস সম্বন্ধে আমরা বহুদিন যাবৎ অভ্যস্ত, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রায় অনড় একটা সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অভ্যাস এবং সংস্কার দুইই ত একদিন বদলাইয়া যাইতে পারে। অন্য সব খাবারের চেয়ে আমরা এতদিন বেশ স্বাদু এবং উপকারী বলিয়া পায়েস খাই; এই খাবার এবং প্রস্তুতকারকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ তাহাদের অভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যভাবে একটা যোগ আছে। আমাদের অভ্যাস হয়ত আজ এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যখন দুগ্ধ ও শর্করাযোগে প্রস্তুত একজাতীয় একটি বিশেষ লেহ্য পদার্থকেই আমাদের পরম-তৃপ্তিকর এবং বলকারী বলিয়া মনে হইবে না, তখন হয়ত নুন-কাল-টক-মিষ্টির মিশ্রণযুক্ত কোনও ঘন বা পদার্থকেই অধিক তৃপ্তিকর এবং উপকারী মনে হইবে।

আবার আরম্ভ করিতেছি, আমার সম্বন্ধে সুফল উৎপন্ন হইতেছে যে আমি আধুনিক কবিতাকে নূন মিশ্রিত নববিধানের পায়সরূপ বলিয়া সত্তা রসিকতা করিতে উদ্যত হইয়াছি। আধুনিক কবিতা লইয়া সত্তা রসিকতা অনেক হইয়াছে, সেই চর্বিত-চর্বণের কোন অভিপ্রায় আমার নাই। তাহা ছাড়া আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আমি বিদ্বেষ রসিকতাপন্থী নই; আমার অভ্যাস-সংস্কার অনুশীলন-পূর্ববর্তার সহিত যে-জিনিসটি দুরূহ মিলিয়া না যায় তাহার আর ভাল হইবার কোন আশঙ্কার বা সম্ভাবনাই নাই এমনতর কথা আমার নিকটে যুক্তিকোটিস্থিত বলিয়া মনে হয়।

॥ ২ ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার এই কথা মনে হইয়াছে, আমরা যাহারা একদল লোক আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে একটা নঞর্থক অবজ্ঞা বা প্রদর্থক বিদ্বেষ পোষণ

কবির কবিতা সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যাস সংস্কার আদর্শ আধুনিক কবিগণের অভ্যাস সংস্কার আদর্শ হইতে পৃথক। এইখানেই আমরা টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিব, কবিতা ও কবিতা, হাজার বৎসর আগেও কবিতা, পাঁচ শত বৎসর আগেও কবিতা, এখনও কবিতা—অবার পাঁচ শত বৎসর হাজার বৎসর পরেও কবিতা, দুপেগুণে একটু তরতম হইতে পারে মাত্র—একেবারে বদলা-বদলির কথা আসে কি করিয়া? কিন্তু চোখের সম্মুখে দেখিতেছি মানুষের জীবনযাত্রা বদলাইয়া যাইতেছে, মানুষের সমাজ-সংগঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, মানুষের বিশ্বাস—মানুষের জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, শুধু কবিতা সে এক কবিতাই হইয়া থাকিবে—সে আর দুই হইয়া উঠিতে পারিবে না, এ-কথা বলার তাৎপর্য কি হইবে?

মনন ব্যাপারে আমি হয়ত একেবারে নিরেট গোবেট নই: সম্বন্ধকেও হয়ত দৃঢ় করিয়া লইলাম যে প্রচুর পরিমাণে মানসিক প্রক্ষালনের দ্বারা সমবায়-প্রথায় কবির সহিত সহানুভূতিশীল অংশীদার হইয়া তাঁহার কবিতা আস্বাদ করিব: ফলে হয়ত দেখা গেল অনেকখানি প্রক্ষালনের পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার গ্রহণ হয়ত একরূপ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমার সত্তার কোন অংশের নিকটেই হৃদ্য হইয়া ওঠে নাই। এরূপ কেন হয়? এ-ক্ষেত্রে মনে হয়, অভ্যাস-সংস্কারবশতঃ আমি একটি কবিতার নিকট হইতে যে প্রয়োজন-সিদ্ধির আশা করি ঠিক সেই জাতীয় প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদ তাঁহার কবিতা-রচনার পিছনে একজন আধুনিক কবি কোনওদিনই অনুভব করেন নাই। পিকাসোর ছবির কথা-কৌশলটি হয়ত বুঝিয়া লইলাম: বুঝিলাম, একটি নারী-দেহের সব অবয়বই ইহার মধ্যে আছে, সেগুলিকে খুঁজিয়া একত্র করিয়া লইবার সঙ্কেতও কবি এক জায়গাতে রাখিয়া দিয়াছেন: এইবারে আমার মনটিকে একটু নড়াচড়া করাইয়া সব খুঁজিয়া লইলেই নারীটির বিশেষ মূর্তিখানি দেখিয়া ফেলিতে পারিব। আমি সচকিত হইয়া মনকে প্রচুর পরিমাণে নড়াচড়া করাইলাম, হয়ত সব অবয়বগুলি ছবি-খানির মধ্যে আবিষ্কারও করিয়া ফেলিলাম,—তাহার পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, এমন নারীরূপে আমার কাজ নাই। পিকাসো বলিবেন, তুমি যে নারী-রূপ চাও তাহা অঙ্কিত করিবারও আমার কোন দায় নাই, তুমি অনন্ত পথ দেখ। ঠিক তেমনইভাবে একজন আধুনিক কবির একখানি কবিতার বই সাগ্রহে পাঠ করিয়া কেহ হয়ত বলিবেন, 'তোমার কবিতা ত পড়িলাম, সব না বুঝিলেও কিছু কিছু না হয় বুঝিলাম, কিন্তু হায়, কোন একটা কিছুকেই ত বড় করিয়া পাইলাম না, আমার মন যে কোথাও এতটুকু একটু গলিল না!' কবি বলিবেন, 'গোড়াতেই যে ভুল করিয়া বসিয়াছেন মশাই: আমার কবিতা ত কোন একটা কিছুকে বড় করিয়া পাইবার জন্য নয়, কাহারও মন গলাইবার জন্য নয়: আমার কবিতা মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্য, এদিক হইতে ওদিক হইতে সেদিক হইতে আচমকা নাড়া দিয়া দিয়া দিশাহারা ভ্রান্ত করিয়া তুলিবার জন্য, সংশয়ে তর্কে অবিশ্বাসে আপনার মনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিবার জন্য, সব কবিতা জুড়িয়া কিছু একটা বড় করিয়া পাইতে হইলে, 'আঁখি হলোহলো' করিয়া লইতে হইলে, মনকে গলাইতে হইলে রবিঠাকুরের কাছে যান।' এ-সব ক্ষেত্রে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যাঁহারা যাহা করিতে চাহেন নাই তাঁহারা তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের নিরাস যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দা-বিদ্রূপ সহ্যোপযোগী করিবার যৌক্তিকতা আছে কিনা: অপরপক্ষে তাঁহারা যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহা যদি সুষ্ঠু উপায়ে করিতে পারিয়া থাকেন সেখানে তাঁহাদের সাফল্য স্বীকার্য কি না।

এইখানে জলদগম্ভীর স্বরে যেই কথাটি বলা হইবে তাহা এই, 'যাহা করিতে চাহে নাই তাহাই যে করা উচিত ছিল, যাহা করিতে চাহিয়াছে তাহাই যে করিতে না চাওয়া উচিত ছিল।' এই-খানেই চরম বিতর্ক ও মতদ্বৈধ। এই বিতর্কের এবং মতবিরোধের মীমাংসা কে করিবে? কল্যাণের আদর্শকেই এখানে হুব বলিয়া দাঁড় করান হইবে। কিন্তু সেই কল্যাণের আদর্শে মানুষের ঐকমত্য কোথায়? যেখানে ফাটল সেখানেই প্রলেপ লাগাইয়া সহমতালির মলাটন হইবার চেষ্টাতেই মানুষের কল্যাণ, না যেখানে চিড় ধরিয়াছে সেখানে বজ্র-আঘাতে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করিয়া নূতন গঠনের সম্ভাবনাকে সহজ করিয়া দেওয়াতেই মানুষের কল্যাণ? আমার হয়ত সাবধানী পাঠকের পক্ষ হইতে বলা হইবে, কল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টার মধ্যে এই যে দুইটি কোটি রহিয়াছে তাহার দুইটিকেই স্বীকার করিয়া লইলাম, এবং দুইটিকেই শ্রদ্ধা করিতে রাজি আছি: কিন্তু অশ্রদ্ধা করি তাঁহাদের যাঁহারা কিল

শতকের বাঙলা কবিতার উত্তর-তিরিশের যুগে ঘুরিয়া ফিরিয়া নির্বীর্যের মতন কেবলই বলিয়াছেন, আমরা এদিকেও নাই—ওদিকেও নাই—আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত —আমরা 'ত্রিশঙ্কু',—আমরা মানুষকে আমাদের সেই দিগ্‌ভ্রান্তি এবং ত্রিশঙ্কু-ত্বের কথাই নানাভাবে শুনাইতে চাই। উত্তরে তাঁহারা বলিবেন, কালই আমাদের জাতীয় জীবনটাকে একটা কলপরিধিতে ত্রিশঙ্কু করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল; আমরা যদি সেই সঙ্কটের সংকেত অমন করিয়া না দিতাম তবে জীবন-সত্য হইতেই আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়িতাম; আমাদের সংসাহস আমাদের জীবন-পরিচয়ের সততায়, সেই সততাই আমাদের কবিকর্মকে শর্তহীন সমর্থন দান করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

পারসে লবণ দিয়া একটা নব-পারসাম্ল-রচনাবিধির কথা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছি। গল্পচ্ছলে উল্লেখ করিলেও জানি এমন অনেকে আছেন যাঁহারা আধুনিক কবিতার রচনাবিধি সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তটিকে অনেক দূর টানিয়া লইতে উৎসাহিত হইবেন। তাঁহারা বলিবেন, কবিতা রচনা করিতে বসিয়া ছন্দোব্যবহারের এবং পঙক্তিবিন্যাসের যেরূপ খামখেয়াল চলিতেছে, অলঙ্কার-প্রয়োগে যে-সকল উদ্ভটত্বের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, শব্দ-প্রয়োগের যে উৎকট মহিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—ইহার যে-কোনও একটি পারসাম্ল-রচনায় লবণ সংযোগের সহিত অতি সুষ্ঠুভাবে তুলিত হইতে পারে। সব জিনিসকে একসঙ্গে জড়াইয়া লইয়া কথা বলিয়া লাভ নাই, আধুনিকদের ছন্দোব্যবহারকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কথা বলিতেছি। আমি কোন পক্ষে-বিপক্ষের কথা বলিব না, যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহার পিছনকার কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

আধুনিককবিতা-বিরোধী আবা-রসিকদের আধুনিক কবিতার প্রতি বিদ্রূপতার বা বিদ্বেষের বড় একটা কারণ, গদ্যছন্দের অতিমাত্রায় ব্যবহার (যেটাকে তাঁহারা বলিবেন ছন্দোহীনতা), পর্ব-ব্যবহারের একান্ত অনিয়ন্ত্রিততা, পঙক্তি-ও স্তবকব্যবহারের অনর্থক স্বেচ্ছাচারিতা এবং বহুক্ষেত্রেই মিলবর্জন বিষয়ে একটা অহৈতুক উৎসাহ-আধিক্য। আধুনিক কবিকুলের পক্ষ হইতে এ-বিষয়ে কারণ যুক্তি ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির পুনরাবৃত্তির পথে আমি অগ্রসর হইতে চাহি না। সেইসব যুক্তি-প্রতিযুক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া মোটা-

মুটিভাবে আমরা রক্ষা করিতে পারি, তাহারা ছন্দোবিষয়ে আধুনিক কবিতার বিরূপ সমালোচক তাহাদের মনের মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধে এবং কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজন সম্বন্ধে বহুকাল-লালিত এবং অনেকখানি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটা বিশেষ ধারণা আছে। ছন্দ সেখানে সঙ্গীতেরই প্রকারভেদ এবং ছন্দোব্যবহারের মূল প্রয়োজনও হইল কবিতাকে যেখানে যতখানি সম্ভব সঙ্গীতাশ্রয়ী করিয়া তোলা। এই জাতীয় ছন্দোব্যবহারের মূলতত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির ভেতরেই চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। এখনে এই জাতীয় একটি মতকেই গ্রহণ করা হয় যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহৃত যে কাজের ভাষা তাহার লক্ষ্য অর্থের দ্বারা সীমিত: শব্দকে অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আভাসে-ইঙ্গিতে অনন্তসম্ভাবমান করিয়া তুলিবার জন্যই ছন্দের সহিত সঙ্গীতের সংযোগ।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই, ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বপর্যন্ত বাঙলা সর্ববিধ কবিতাই সঙ্গীত, ইহার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মধ্যযুগের চরিতগ্রন্থগুলি; যদিও মধ্যযুগে সেগুলি কিভাবে পঠিত হইত ঠিক জানি না, কিন্তু আধুনিককালে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক চৈতন্যচরিতামৃতও আগাগোড়া গীত হইতে শুনিয়াছি। আমাদের চর্যাপদগুলি মূলতঃ গীত, তাহার নামই ছিল চর্যাগীতি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন এবং সহস্র-সহস্র বৈষ্ণব-কবিতা মূলতঃ গীত হইবার জন্যই লিখিত। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠা হইবার পূর্বপর্যন্ত বা গবেষক পণ্ডিতগণ কর্তৃক চর্চিত হইবার পূর্বপর্যন্ত কখনও গীত না হইয়া শুধুমাত্র পঠিত হইত বলিয়া আমাদের জানা নাই। আসরে গীত না হইয়া যেখানে ঘরে ঘরে পঠিত হইত সেখানে সে পঠন-রীতিও আসলে গীত-রীতিই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে দেশ-গাঁয়ে মঙ্গলকাব্য পঠিত হইতে দেখিবার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বরিশালের বহু অঞ্চলে গোটা শ্রাবণ মাস ধরিয়া বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পঠিত হয়, এই পঠনের অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি সংক্ষিপ্ত নিদ্রার অন্তে বয়স্কা মহিলাগণ মনসামঙ্গলের পুঁথি লইয়া বসিতেন; তাঁহারা পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দকে বহু-রকমের সুরে দিয়া দিয়া পড়িতেন (কখনও কখনও পুরুষেরাও যোগ দিতেন), অমরা একটি প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিতাম বিভিন্ন রকমের ধুয়া উপভোগের জন্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঁড়তে শুনিয়াছি পুরুষগণকে, প্রথম হইতে শেষ অবধি রীতিমতন সুর করিয়া গান। রামায়ণ-মহাভারত অসুরে গীত হইবারই রীতি ছিল। আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা যেখানে রামায়ণ-মহাভারত পঠিত হইতে দেখিয়াছি, সেখানে রীতিমত সুর করিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। পয়ার ও ত্রিপদীকে আমরা তানপ্রধান ছন্দ বলিয়া থাকি। আজ আমরা পয়ার-ত্রিপদীকে ভেঙে করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি তাহার মধ্যে তান-মান কিছুই নাই, যত দিন যাইতেছে ততই তাহা কাটাছাটা একটা টেরে-টক্কার ছন্দে পর্যবসিত হইতেছে। কিন্তু কয়েক-দিন পূর্বেও মনে আছে, আমার ভগ্নী আমার মাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল। সে-যুগে স্পষ্ট উচ্চারণেই পাঁড়তেছিল, কিন্তু আমার মা বারবারই প্রতিবাদ জানাইয়া বলিতেছিলেন, 'কবিতা পড়তে হয় তো কবিতার মতন করে পড়, অমন ছাই-ভস্ম করে পড়ছিস্ কেন?' কবিতার মতন পড়ার অর্থ তাঁহাদের মতে বেশ সুর করিয়া পড়া।

উনিশ শতকের পূর্বপর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই, কবিতা ও সঙ্গীত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দুইটি অস্তিত্বরূপে দেখা দেয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিচ্ছেদ প্রথম স্পষ্ট হইয়া উঠিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। পয়ার-লাচাড়ীর অতিমাত্রায় সঙ্গীতধর্মিতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল মধুসূদন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া আমরা দেখা পেলাম, তিনি পয়ারকে সহস্র সহস্র গান রচনা করিলেও কবিতার মধ্যে যে বিশুদ্ধ নিখুঁত ছন্দ সাধনা করিলেন তাহা কবিতাকে বিচিত্র সূক্ষ্মভাবে সঙ্গীতধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তছন্দও রচনা করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বহু ব্যবহার করিয়াছেন, ভঙ্গির ছন্দকেও প্রবহমান করিয়া চলতি ভঙ্গির রীতিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন, সর্বোপরি তিনি করিয়াছেন সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গদ্যছন্দের ব্যবহার; তথাপি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কথা-কবিতা পড়িয়া ফলশ্রুতিতে মনে এই কথাই জাগিয়া ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ সুরের কবি, তাঁহার হাজার গানের ভিতর দিয়াও—তথা তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই যে ছন্দের সুরধর্মিতা রবীন্দ্রানুসারী সুধীন্দ্রনাথ কবিতার এই নিকটকেই অত্যন্ত করিয়া তুলিলেন। রবিমণ্ডলস্থিত অন্যান্য কবিগণের ভিতরে ছন্দের এই সুরধর্মিতার অনুবর্তন দেখা দিল। কবি কালিদাস রায়ের 'নন্দনপুরে চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতা কিছু দিন পূর্বপর্যন্ত অনেক লোকেরই মুখে মুখে শোনা যাইত।

বিশ শতকের উত্তর-তিরিশের কোঠায় নূতন যে কবিদলকে দেখা গেল তাঁহারা কবিতার এই জাতীয় একটা সমমাত্রিক সমপার্যিক এবং অত্যন্তভাবে সহজগ্রাহ্য সুরধর্মিতার বিরুদ্ধে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া লইয়াই কলম ধরিয়াছিলেন। একদিকে এই কবিগণ যে জীবনের মধ্যে নিজদিগকে প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন তাহার বিপর্যস্ত অসৌষম্য ও সুরহীনতা, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য কবিতার (বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও ফরাসী) সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তৎপ্রসূত অনুগতা-বশতঃ গভীর প্রভাব, তাহার সহিত তৎকালপ্রচলিত কবিতায় স্বল্পাধিক সুর-ধর্মিতার বিরুদ্ধে চিত্তের একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া—এই সব মিলিয়া নবাগতগণের ছন্দোব্যবহার রীতিকে দিন দিন অন্য পথে চালিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া আর একটা কথা উত্তর-তিরিশের আধুনিক কবিগণ সকলেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বা-তিশয়ী প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার একটা আগ্রহ সকলের মধ্যেই দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে হইলে তিনি একটি বিশেষ জাতীয় ভাষা ছন্দ ও মিলের যে মোহজাল বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা হইতে নিজেদের ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা নবাগতগণের সকলকেই করিতে হইয়াছে।

একটা তথ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম দিকে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কিন্তু একেবারে ছন্দোহীন নন; প্রতিক্রিয়াটা প্রথম প্রথম বেশী দেখা দিয়াছে মিলের প্রতি অবজ্ঞায় এবং 'কাব্যিক ভাষা' পরিবর্জনে। পদ্যছন্দের প্রতি কৌকটা কমবেশ রহিয়াছে, হয়ত সেখানে সাহস পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেই। অমিত পর্বের ব্যবহার, পঙক্তি-বিন্যাসের এবং স্তবক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে অমিত স্বাধীনতা—এগুলি অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষণীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করি-য়াছে। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই কবিগণের মধ্যে একটা দৃঢ় মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিল যে, প্রথাবদ্ধ, অভিপরিচয় এবং কিয়দ্ধরানো কাব্যিক ভাষার সঙ্গে সুরেলা ছন্দের যে মিশ্রণ—ওটা নেহাৎ একটা মধ্যযুগীয়তা, বিংশ-শতকীয় জীবনালোড়নে জাত কবিতার সহিত তাহার কোন সঙ্গতি নাই—যোগ নাই। অন্যদিকে যে প্রাত্যহিক কথা ভাষা যথেষ্ট সঙ্গীতময় এবং সংকেতময় নয় বলিয়া কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় রূপে পরিহার্য ছিল নূতন কবিগণ তাহার মধ্যেই ভাষার যথার্থ শক্তির সন্ধান পাইলেন; তাঁহারা বলিলেন, আধুনিক জীবনের মধ্যে যে অস্থিরতা তীব্রতা এবং ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে তাহাকে ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এক-মাত্র কথা ভাষার মধ্যে এবং কথা বচন-রীতির মধ্যেই রহিয়াছে: ইঁহারা তাই কথা ভাষাকে এবং বচনরীতিকেই কবিতার মধ্যে যথা-সম্ভব প্রয়োগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

॥ ৪ ॥

কথা ভাষা এবং কথা বচন-রীতিকেও কবিতায় প্রধান করিয়া স্থান দিবার ফলে সুরের সহিত কবিতার বিচ্ছেদ আরও পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনাদের কিছু কিছু তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার সঙ্গে সুরের বিচ্ছেদ যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং সে বিচ্ছেদকে আধুনিকগণ যেভাবে, শুধু ঐতিহাসিক সত্য রূপে নয়, একান্ত বাঞ্ছনীয় সত্য রূপেই গ্রহণ করিতে সমুৎসুক, ভারত-বর্ষের অন্য কোথাও কিন্তু তেমন নয়। হিন্দী কবিতার মধ্যে একদা আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার এবং আধুনিক বাংলা কবিতার রূপবিবর্তনের অনুরূপ রূপবিবর্তন দেখা দিতেছে, তথাপি বৃহত্তর জনসমাজে—এমন কি শিক্ষিত জনসমাজে স্বীকৃত এবং আদৃত কবিতা রীতিমত সুরাশ্রিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে—প্রগতিশীল ছাত্র-সমাজের মধ্যে আজকার দিনে কোনো কবি-সম্মেলন হইলে কবিতাগুলি সুরসংযোগে প্রায় গানের মতন পরিবেশন করিবারই রীতি। ডঃ বচন আধুনিক হিন্দী কবিগণের মধ্যে একজন জনপ্রিয় কবি; তিনি নেহাৎ গতানুগতিক রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিভূমাত্র নহেন; তিনি ইংরেজি-সাহিত্যের গবেষণা করিয়াই উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন; সুধীসমাজে তাঁহাকে তাঁহার নিজের কবিতা যখন পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন সুরসংযোগে রীতিমতন গান করিয়াই পরিবেশন করিতে দেখি-য়াছি। উর্দুর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আরও অনেক বেশি। উর্দুর কিছু কিছু কবি-সম্মেলনে যোগ দিয়া দেখিয়াছি, সেখানে সুর ব্যতীত কবিতাপাঠের কোন রীতিই নাই। পাঞ্জাবী কবিতাও সুরসংযোগেই পরিবেশিত হয়। কিছু দিন পূর্বে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দক্ষিণ-ভাষাভাষিগণের মধ্যেও প্রচলিত এই রীতি। একজন তামিল-কবি—যিনি সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—তাঁহাকে আমরা তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতে বলাতেই দেখিলাম তিনি দিব্য সুর দিয়া সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহার কবিতাটি আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবিতার ক্ষেত্রে নববিধান-পন্থী তাঁহারা যেখানে আজকারের দিনেও অনন্যতন সুর করিয়া কবিতা-আবৃত্তি দ্বারা কবি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় তাহাদের সম্বন্ধে মুখ বাঁকা করিয়া সদয়ভাব প্রকাশপূর্বক বলিবেন, উহারা এখনও মধ্যযুগে বাস করে, যথার্থ কবিতার রুচি উহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে এখনও আরও পাক্কা দুই শত বৎসর দেরী। কিন্তু প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতা অতি-উচ্চ মান লইয়া একটি অতি উচ্চ এবং পরিশীলিতচিত্ত অতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, দেশের জনসাধারণ ত দূরের কথা, উচ্চকোটির শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের সহিতও ইহার কোন নিবিড় যোগ নাই। বিবিধ উপলক্ষে কবি-সম্মেলনের একটা রেওয়াজ এখন আমাদের মধ্যেও চালু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোনও অনুষ্ঠানেই কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা নাই এমন কথা বলিব না; কিন্তু সে উৎসাহ অধিকাংশ স্থলেই ছাত্র-সম্প্রদায় বা শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিতা সম্বন্ধে এবং দেশের কবি-গণকে একত্রে সম্মিলিত করা বিষয়ে সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, কিন্তু দীর্ঘ-কালের কবিতা-পাঠ শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতরে সত্যকারের একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছে আমি তেমনটা বেশি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। অতি-বৃষ্টিমেয় শ্রোতা বাদেই বাকি বৃহত্তর অংশের এক অংশকে দেখিয়াছি একটা বিদ্রূপ অবজ্ঞা-মনোভাবসম্পন্ন, অপর অংশটিকে দেখি-য়াছি উদাসীন—একটা নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি দ্বারা তাঁহারা শ্রোতার সংখ্যাটিকে বাড়াইয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই করেন না। কবিগণের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে দেখিয়াছি, নিজের কবিতাপাঠেরঅন্তে

কেমন একটা বিরূপতা বা অসহিষ্ণুতা লইয়া সরিয়া পড়িতে। আমার অভিজ্ঞতায় যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বরঞ্চ মনে হইয়াছে, আধুনিক কবিতার এই জাতীয় কবি-সম্মেলন না হইয়া আধুনিক কবিতার যথার্থ প্রবেশ আছে এবং এ-বিষয়ে যথার্থ শ্রদ্ধাশীল কোনও ব্যক্তি যদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আধুনিক কবিগণের কবিতা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া শোনান তবে তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধিক সাড়া জাগাইয়া তোলে।

হিন্দী-উর্দু কবি-সম্মেলনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়; সেখানে বিপুল শ্রোতৃ-সমাবেশ দেখিয়াছি, এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতাপাঠ হইতে দেখিয়াছি। উর্দু 'মুশয়রা'র (কবি-সম্মেলন) মত প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান খুব কম দেখিয়াছি। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের লোক সেখানে সাগ্রহে সমাগত হন, এবং তাঁহারা বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনার ভিতর দিয়া কবিগণের ভাব ভাবনা ভঙ্গি সুর—সমস্ত জিনিসের অংশীদার হইয়া উঠিতে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহারা পরমোল্লাসে কবির পর কবিকে স্বাগত জানান। হৃদয়ের সংবাদ সেখানে আধুনিকগণের ভাষায়ই 'অত্যন্ত-ভাবে সোচ্চার'। ইহা হইতে স্বাভাবিক-ভাবেই কেহ কেহ একটা অভিমত গড়িয়া লইতে পারেন যে, যাঁহারা আজকালের দিনেও কবিতাকে সহজগ্রাহ্য ভাবে ছন্দে সুরে এমনভাবে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন কবিকুলে তাঁহারাই ধন্য, অপরেরা আপন আপন অতিসঙ্কীর্ণ কোটরের মধ্যে ধিক্কৃত।

কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমাদের আধুনিক কবিগণ ঐ সব 'মুশয়রা'-ওয়ালাগণকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের ঐ অনির্বাচিত বিমিশ্র জনসংঘট্ট কবিতার নামে উন্মাদনা-উত্তেজনা আমাদের একটা মানসিক বিবমিষার উদ্রেক করিতেছে; আমাদের কবিতা ঠিক এত স্তরের এত লোকের জন্য নয়, রসাস্বাদনের নামে ঐ-জাতীয় একটা উত্তেজনাময় চিত্ত-স্পন্দনের জন্যও নয়—আমাদের কবিতা সুনির্বাচিত সুসংহত সুসংহত সূক্ষ্মজটিল-আকার-ইঙ্গিতধর্ম বিশেষ শ্রেণীর সামাজিকের জন্য। এ-সব কথা তাঁহারা যদি একান্ত উৎকেন্দ্রিকতাজাত ঔদাসিকতা-সহকারে বলিতেন আমরাও তাহা হইলে ক্ষেপিয়া উঠিবার একটা সহজ সুযোগ পাইতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহারা এ-কথা বলিবেন একটা নবগঠিত মানসধর্ম হইতে, সে মানস-ধর্মের সততায় আমার কোনও অবিশ্বাস নাই। আমার বিশ্বাস এখানে মানসধর্মের বিভিন্নতা কবিতা সম্বন্ধে মৌলিক বাসনাই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। যেখানে আধুনিক কবিতাকে ভাল লাগিতেছে না—গ্রহণ করিতে পারিতেছি না—কেবলমাত্র ও-বিষয়ে একটা আক্ষেপ-হীন সার্বিক বিরূপতার জন্য নহে—সততার সঙ্গে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইতেছি—সেখানে বুঝিয়া লইতে হইবে, কবিতা-বিষয়ে মৌলিক বাসনাতেই হয় আমি কবিগণ হইতে অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, না-হয় আমা হইতে কবিগণ অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন।

॥ ৫ ॥

কবিতার ক্ষেত্রে সুর বর্জন করিয়া কবিতাকে যথাসম্ভব কথা-রীতির কাছা-কাছি টানিয়া লইবার চেষ্টা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে একদিক হইতেও হানিকর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আধুনিক কবিতা এখন আর কেহ মুখস্থ করে না। ভাল কবিতা হইলে তাহাকে মুখস্থ করিয়া রাখিবার একটা রেওয়াজ ছিল; আধুনিক ভাল কবিতাও তেমন কাহারও মুখস্থ আছে বলিয়া জানা নাই, যাঁহারা আধুনিক কবিতার অত্যন্তভাবে অনুরাগী তাঁহাদেরও নয়। আবৃত্তি করিতে হইলে বই ছাড়া কোথাও চলে না, চলিলেও জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' প্রভৃতি খুব অল্প কয়েকটা কবিতা চলে, বেশুলি ঠিক ছন্দ-মিল-বর্জিত নয়।

কিন্তু এ অভিযোগও আধুনিক কবিগণের মনে খুব একটা কিছু আঘাত হইয়া দেখা দিবে বলিয়া মনে হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বর্ণা স্বর্ণা সুন্দরী স্বর্ণা' কবিতাটিকে যে আগ্রহ লইয়া বহু লোকে কণ্ঠস্থ করে এবং আবৃত্তি করে সেই জাতীয় কোনও আগ্রহ লইয়া লোকে তাঁহাদের কবিতা মুখস্থ করুক আবৃত্তি করুক ইহা আধুনিক কবিগণ বোধ করি খুব একটা অভীপ্সিত এবং প্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয় না তাহা আশঙ্কা বহু-মানব বলিয়া তাঁহারা মনে করিবেন কোনও সাগ্রহ প্রয়াসীল মননের জীবন্ত ও সততাকে। এ-সম্বন্ধেও পাঠকের নিকটে কবির প্রত্যাশার পাশ্চাত্যপন্থীদলের সহিত অনেকখানি ভেদ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অবশ্য একটা জিনিস বহুদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আধুনিক কবিগণ পরিপন্থী হইয়াছেন সুরেলা আমেজের সঙ্গে তন্দ্রালুতা এবং স্বপ্না-লুতারও, নিজেদের কাছে এবং পাঠকের কাছে তাঁহারা চাহেন সদা-সচকিত মন। কাব্যালুতা জিনিসটাকে তাঁহারা ঐ তন্দ্রালুতা এবং স্বপ্নালুতারই রকমফের মনে করিয়া তাহাকে সর্বথা পরিবর্জনীয় বলিয়া অভিমত এবং সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্বয়া যুগের কাব্যালুতা উবিয়া যায় নাই, আমার সন্দেহ, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভিতরে তাড়া খাইয়া খাইয়া সেই কাব্যালুতা স্থান করিয়া লইয়াছে একটি বৃহৎ ব্যাপক গোষ্ঠীর মধ্যে 'আধুনিক সঙ্গীতের' পক্ষপুটের আড়ালে। চৈতী সাঁঝে বা রাতে বা নিশীথে 'ঝিরি ঝিরি' হাওয়ার মধ্যে 'ঝিরি ঝিরি' আসিয়া 'হিয়ার' সঙ্গে 'পিয়ার' কোন প্রকারের মিলন একটি এলেকার একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; তাহার সঙ্গে এই জাতীয় মিলনের ফলে জাত কোনও প্রকার 'দুরু দুরু গুরু গুরু উড়ু উড়ু ঘুরু ঘুরু' প্রভৃতি জাতীয় ভাববিকারের উপরে রীতিমত কন্ট্রোলের ব্যবস্থা বিধের বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; কোথাও আল-গোছে 'পেনু' আর সঙ্গে সঙ্গে অচমকা কিন্তু 'পেনু'—এ-জাতীয় সকল সম্ভাবনা অশ্রুধেয় বলিয়া শতধা কীর্তিত। সেই 'আধুনিক কবিতা'র এলেকার পাশাপাশি ভাবিয়া দেখুন 'আধুনিক গানে'র বিস্তৃত এলাকার কথা। কি মনে হইবে? 'আধুনিক গান' কি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে 'আধুনিক কবিতা'র একটা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া? সেখানে যে চাঁদে জ্যোৎস্নায় পিয়ালকুঞ্জে ঝর্ণাধারে চৈতি-রাতের দখিন হাওয়ার ঝিরি ঝিরিতে বা নওল রাতের গুরু গুরুতে এনু পেনু পেনু বেনু এবং হিয়া পিয়া দিয়া নিয়া—সে-কি এক কাণ্ড ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে! অত্যাশ্চর্যের কথা এই, ইহার মধ্যে আবার যে যত বেশি আধুনিক তাহার ভিতরে ঘটিতেছে তত এই সব ঘটনার মাত্রাধিক্য! জানি আধুনিক গানের উৎসস্থল সিনেমা; সেখান হইতে জাত, সেখানে জীবিত,—কিন্তু সেখান হইতে বিজয়গর্বে প্রঘাত হইতেছে বৃহৎ সমাজ-জীবনের মধ্যে—এবং সেখানে গিয়া যে রীতিমত অভিসংবেশ লাভ করিতেছে। মুখ্যতঃ সিনেমার পরিবেশে এবং প্রয়োজনে জাত এবং বিবর্ধিত বলিয়া এগুলি ত অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, বহু-প্রচলিত এবং সংবর্ধিত। মনে থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটা কথা খোঁচাইতে থাকে—ইহা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে কোনও রূপ একটা প্রকৃতির প্রতিশোধ নয় ত?

কিন্তু আধুনিক কবিগণ বলিবেন, প্রকৃতির প্রতিশোধ যদি হয়ই বা তবে করণীয় কি? যেখানে কঠোর সংযম সেইখানেই প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে চায়; কবিতার ক্ষেত্রে কঠোর কলা-সংযম সহজ-প্রকৃতিকে হয়ত অনাদিক দিয়া প্রতি-শোধে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে; সেই প্রতিশোধের ভয়ে সংযমের কঠোরতাকে শিথিল করিয়া দেওয়া শ্রেয়ের কাজ হইবে কি? পাঠক-সমাজ যদি অমৃতের স্বাদে উন্মুখ হইয়া আসিতে না পারে, তাহাদের জন্য অমৃত অতখানি নীচে নামিয়া যাইতে প্রস্তুত নই। এই মত মনস্তত্ত্বের মাপা একদিকে একটা শ্রেয়ের অন্তর্নিষ্ঠা সূচিত হয় এ-কথা যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি প্রতিপক্ষ হইতে অবশ্য দুইটি সত্যের দিকে কবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন: প্রথমতঃ তাঁহারা বলিবেন, সংযমের কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রকৃতি তখনই প্রতিশোধ লইতে চায় যখন সংযম জীবনের অন্যান্য সহজ দিকের সঙ্গে একটা স্বাস্থ্যপূর্ণ সমন্বিতি রক্ষা করিতে না পারে, আধুনিক কবিতা সম্ভবতঃ এই স্বাস্থ্যপূর্ণ সমন্বিতি রক্ষা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথা, সমস্ত-জীবনকে একান্ত অযোগ্য বলিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বা পাশ কাটাইয়া গিয়া সমাজ-জীবন হইতে এক তরফাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার কোনও অধিকারও কোনও কবির নাই, কারণ, কবিতা মূলতঃ একটা সামাজিক কর্ম।

আধুনিক কবিগণের রবীন্দ্রধর্ম অতি-ক্রমের সর্বজনীন চেষ্টার কথা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথ এর সর্ববিধ লেখার মধ্যেই বহুস্থলে একটি বিশেষ প্রবণতা লাভ করিয়াছে—তাহা হইল বিশুদ্ধ প্রণয়রসকে অস্বাদ করিবার চেষ্টা। এই বিশুদ্ধ প্রণয়রসই যেন বিশুদ্ধ ভগবৎ রস। বিশুদ্ধ প্রণয়রস শব্দের অর্থ হইল মনন হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রাণস্পন্দনের নিবিড় অনুভূতি—এ অনুভূতি কোনও চৈতসিক বস্তু নয়—ইহা সত্তার ভিতরে অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি লেখায় বনের গাছগুলিকে অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, "কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টুমি করিয়া ঐ ঘন গাছগুলির মধ্যখানে কেবল একটি ফাঁক ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল নিবিড় জীবন মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল প্রাণ-লীলা যদি স্বল্পপর্যন্ত মনের দ্বারা অক্রান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য প্রাণ-লীলার উপরে চৈতন্যের অনন্ত মহিমার কথা বলিয়াছেন; এখানে যে মনের কথা বলা হইল তাহা সেই অনুভূতিঘন চৈতন্য নয়, এ মন তর্ক-সংশয় ছন্ন বুদ্ধি-প্রক্রিয়ার কর্তা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সুদূরতর পরিণতির মানব-জীবনে সেই জিনিসটিই ঘটিয়া গিয়াছে, কোন দেব-শিশু নয়, ইতিহাসের আবর্তে জাত এক লক্ষ্যহীন-শিশু আসিয়া মানুষের প্রাণ-রসের সরল অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ চিন্তাবিষ মিলাইয়া দিয়াছে; ফলে শুধু অমৃত-আস্বাদনের উপায় নাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বিষ-জারণ মন্ত্রের, সে কাজের দায়িত্ব অগ্রসর হইয়া নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হইয়াছে আধুনিক কবিগণকে। যাহারা আঁৎকাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতেছি, এ কি অঘটন—কবিতার নামে এ কি ভূতের মন্ত্র!—তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আধুনিক কবিগণ বলিবেন, তুমি জীবনকে দেখিয়াছ প্রথা-বদ্ধ সংস্কারের চোখে—আধুনিক জীবনের প্রাণরসের মধ্যে সঞ্চারিত বিষক্রিয়াকে বুঝিবার মত হয় তোমার বোধশক্তি নাই—না হয় তুমি বুঝিয়া শুনিয়াও তাহার মত শক্তি আছে সকল প্রয়োগ করিয়া তোমার চোখ দুইটিকে বুজাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু—

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

॥ ৬ ॥

যে কথা দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই কথা দিয়াই শেষ করিতেছি। আমরা মনন-ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি জিনিস আছে বলিয়া জানি, অনুভূতি চিন্তা ও চেষ্টা; আধুনিক যুগে মনটা এমনভাবে ভেঙে ভেঙে নাড়া খাইয়াছে যে, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অনুভূতি বা ইমোশন বলিয়া কোন জিনিস এখন নাই, এ যুগে ইমোশন চিন্তা-চেষ্টার সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে। আমরা হয়ত কবিতায় এখনও কেবল ইমোশন খুঁজিয়া ফিরিতেছি—ইমোশন যে চিন্তা ও তজ্জনিত হলাহলের দ্বারা জর্জরিত হইয়া একটা জটিল বিমিশ্র রূপ ধারণ করিতেছে আমরা হয় তাহার সন্ধান জানি না—না হয় জিনিসটা এখনও আমাদের ধাতস্থ নয় বলিয়া তাহাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতে চাই না। ব্যক্তিজীবনে এমন অনেক সময় দেখিয়াছি যখন মনটা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তখন আর কিছুই ভাল লাগে না; এই কিছুই ভাল লাগে না অবস্থায় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা লইয়া বসি—বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার শৈশব-স্মৃতির কবিতাগুলি পড়ি, তাঁহার লুসি কবিতাগুলি পড়ি—তপ্ত তিক্ত মন আবার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া ওঠে। এই প্রসঙ্গে অনেক দিন মনে হইয়াছে, কই, আধুনিক কবিতার মধ্যে এমন কোনও কবিতা ত সন্ধান করিতে পারিতেছি না যাহাকে ঐ সব ক্ষণে আমার মন বাছিয়া লইতে পারে। পরে ভাবিয়া মনে হইয়াছে, ইহা আধুনিক কবিতারই ত্রুটি বা অপূর্ণতাজ্ঞাপক না হইতে পারে। যে বাসনা লইয়া আমি কবিতা পড়িতে চাই এবং কবিতা দ্বারা আমি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করাইয়া লইতে চাই সেই বাসনা এবং প্রয়োজন-বোধই অনেকখানি পিছাইয়া-পড়া বাসনা এবং প্রয়োজনবোধ; সেগুলি মেটানো তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দিয়াই চলে। আধুনিক যুগে কবিতাকে লইয়া আরও অনেক নূতন বাসনা অনেক নূতন প্রয়োজনবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথকে দিয়া সে-গুলি মেটানো চলে না—তাই প্রয়োজন হইয়াছিল নূতন আদর্শ ও নূতন শিল্প-রীতি লইয়া নূতন কবিকুলের।

সবারপ্রিয়
রবীন্দ্রের সন্দেশ ও সৃষ্টি
শ্রীরবীন্দ্র নাথ আশ
৫৩, বিবেকানন্দ রোড, ফোন ৩৫-১৭১০

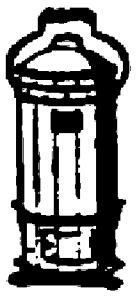

১ ঘণ্টায় স্নান, ডাল, তরকারি ও ১½ ঘণ্টায় রান্না।
রাঁধুনি কুকারেই সম্ভব।
এন, সরকার,
৩৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ।

CENTRAL LIBRARY

পরশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীকান্ত—

একটা যন্ত্রণা, একটা অস্থিরতা, একটা কেমন অস্পষ্ট আতঙ্ক।

সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে কোথা থেকে তীব্র একটা উৎকণ্ঠার ঢেউ-এর পরে ঢেউ।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে যাবার পর তন্দ্রাটা চট্ করে ভেঙে গেল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বলা-ই উচিত।

অন্ধকার ঘরটাই যেন তীব্র ঝনৎকারে আর্তনাদ করছে।

ব্যাপারটা ভয়াবহ কিছু নয় যদিও। ঘোরটা কেটে যেতেই বুঝলাম, ফোন বাজছে।

এত রাতে ফোন বাজা মানেই অবশ্য একটা দুঃসহ উপদ্রব। টেবিলের ওপর রাখা হাত-ঘড়িটায় দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আচমকা ঘুম ভাঙার জড়তা নিয়ে ফোনটা তুলে একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—হ্যালো.....

আর যা বলতে চেয়েছিলাম বলা হ'ল না। আমার কথার মাঝখানেই ওধারের আওয়াজ শোনা গেল,—গলাটা ভার-ভার দেখছি। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?

এমন কথায় হাড়-পিত্তি জ্বলে যায় কি না! রাত্তির একটা বাজতে চলেছে। এমন সময় লোকে ঘুমোয় নাত কি করে' মেজাজটা কোনরকমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আপনি কে জানতে পারি? কাকে চাইছেন?

কাকে চাইছি!—ওধার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল,—চাইছি তোমাকে। শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায়কে। আর আমি হলাম ইশ্বর ভবতোষ হাজরা, ওরফে ভবা। কেমন হ'ল?

না, হল না। কড়া গলাতেই বলতে গেলাম,—প্রথমতঃ আমি.....

নামটা পাল্টেছ! আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওধারে ভবা যা ভবতোষ সেই হ'ন পূরণ করে বললেন,—তেমন অবস্থায় সকলকেই পাল্টাতে হয়। কিন্তু খোল-নলচে যাই বদলাও আমাকে ত ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি যে ইশ্বর ভবতোষ। ঈশ্বর বলেই অবশ্য চিনতে পারছ না। শ্রীযুক্ত যখন ছিলাম তখন ভালোই চিনতে। দুবেলা এই অধীনের বাড়িতে হপ্তা কয়েক করে না কাটালে ভাত হজম হত' না। তার পর সেই মামলাটায় পড়ার পর থেকে অবশ্য ডুব মেরেছ। ডুবে ডুবে রত্নেশ্বর নামটাও ধুয়ে মুছে এসেছ। কিন্তু নাম পাল্টেও সেই আগের কারবারই চালাচ্ছ নিশ্চয়?

ঘুমের দফা'ত রফা হয়েছে। এই বাতুলকে শক্ত দুটো কথা শুনিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মুখের রাশ টানলাম।

হেসে বললাম—না ভাই। এরকম নাম পাল্টালে কারবারও পাল্টাতে হয়। আমদানি রপ্তানি ছেড়ে এখন করখানা খুলেছি। বন্ধুত্বের খাতিরে এ কারবার আর তোমায় ডোবাতে দেব না।

একটু থেমে আবার বললাম—

কিন্তু তুমি কি করছ এখন? চৌধুরীদের যে বাড়িটায় ছিলে স্টেট্ কেনার দায়ে নিলেম কারিয়ে ছেড়েছ সেই কবে' নিজের বুদ্ধির জোরে কি সুবিধেটাই যোগাড় করো তা' পরের ধনে পোদ্দারী করছিলে, তার ওপর কলকাতা শহরে খাওয়া-পরা থাকার ভাবনাটাও ঘুচেছিল। কিন্তু সে সুখ তোমার সইল না। তা এখন আবার কার স্কন্ধে ভর করেছ? চৌধুরীর হাবাগোবা সেই ভাইপোটার? সেই যে ভালমানুষ পেয়ে বন্ধকে যার মাথায় হাত বোলাতে কি নাম যেন গণেশ হাঁ হাঁ গণেশই ত!

ওপারে কয়েক সেকেণ্ড কোন সাড়া-শব্দ নেই।

টেলিফোনটা নামাতে যাচ্ছি এমন সময় কানের পর্দা কাঁপানো একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই যেন শোনা গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের পর তারই সঙ্গে সুর মেলানো হতাশ কণ্ঠ,—গণেশ আর নেই।

গণেশ নেই,—সবিস্ময়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হল,—গেল কোথায়?

মারা গেছে!—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস —যদিও মারাই গেছে বলা উচিত নয়।

সামলাতে আমার একটু সময় গেল। তারপর বললাম,—শেষ পর্যন্ত মারাই গেল! তা যাওয়া আর আশ্চর্য কি! কাঁচা বাঁশে যখন ঘুণ ধরিয়েছিলে তখনই জানি সর্বনাশের বেশী দেরী নেই। কিন্তু তাহলে তোমার বেশ মুস্কিল হয়েছে দেখছি! আস্তানা গাড়বার মত একটা জায়গা পাওয়াও আজকাল সোজা নয়।

ওদিক থেকে এবার হাসির শব্দ এল। শুখনো বিরস হাসিই বলা উচিত। তার-পর তাচ্ছিল্যভরে জবাব,—আমার আস্তানার জন্যে তোমায় কোন ভাবনা নেই। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি এখন ঈশ্বর ভবতোষ ওরফে ভব।

তা ঈশ্বর ভবতোষ, ভবলীলা সাঙ্গ করলে তাহলে!

হ্যাঁ, তাই করতে হ'ল।—ভবতোষের উদাস কণ্ঠ,—খবরের কাগজে দেখেছ নিশ্চয়।

না, আমি আবার আইন-আদালতের পৃষ্ঠাটা পড়ি না।

ও! পড়লেই ভয় হয় আবার বুঝি নিজের নামটা দেখতে পাও! সেই মামলার পর থেকেই অরুচি ধরে গেছে, কেমন? তবে আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় নয় আমার খবরটা.....

থামিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার খবরটা কাগজে না পড়েও জানি।

জানো?—ঈশ্বর ভবতোষ যেন একটু বিচলিত।

হ্যাঁ, তোমায় একবার যখন চিনেছি তখন তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে কি আর কিছু বাকি আছে। তা ফন্দিটা ভালোই এঁটেছ।

তুমি এটাকে ফন্দি বলছ!—ভবতোষ ক্ষুণ্ন কি না ঠিক বোঝা গেল না,—ফন্দিটা কোথায় পাচ্ছ?

ওই ঈশ্বর হওয়াটাই একটা ফন্দি। এক ঢিলে এক-দুই নয়, একেবারে সব পাখি মারা হয়ে গেল। পাওনাদারদেরও ফাঁকি দিলে আবার আণ্ডা-বাচ্চাদেরও একটা গতি হয়ে গেল।

আণ্ডা-বাচ্চা আবার কোথায় হে!—ভবতোষ ক্ষুব্ধ।

ও, তাহলে বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ও-সব গল্প শোনাতে! সেই অজ কোন পাড়াগাঁয়ে বাকে ফেলে এসে কলকাতায় স্ফূর্তি করতে সেই তোমার স্ত্রী লীলা-দেবী বলেও কেউ নেই বলবে বোধহয় এবার?

তাইতে বলতে হচ্ছে। ঈশ্বর হয়ে আর মিথ্যা কথাটা বলি কি করে!

হুঁ, কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেসটা কি অত সহজে ছাড়া যায়। সেই কি যেন নাম, ওই যে তোমার গণেশ চৌধুরীরই মাসতুতো বোন হে, পড়াবার নাম করে যার সঙ্গে প্রেম করতে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ রেবা, সেই রেবার কাছেও ওই মিথ্যেটা কেন চালাতে এখন অবশ্য বুঝছি।

বুঝছ? ঈশ্বর ভবতোষ যেন খুশি —রেবার কথা তাহলে তোমার মনে পড়ছে!

পড়বে না? নিজের দাম বাড়াতে, কত ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ দেখাবার জন্যে আমাকে ধরে বেঁধে ও বাড়িতে কি কমবার নিয়ে গেছ! তা ছাড়া ও রকম একটি.....

ইচ্ছে করেই ওইটুকু বলে থামলাম। ঈশ্বর ভবতোষ কেমন যেন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও রকম একটি কি?

ও রকম একটি—সত্যের খাতিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি— হতকুচ্ছিত চেহারা আমি অন্ততঃ এখনো দেখিনি। ধরি মাছ না ছুঁই পানি কায়দায় নিজের কাজ হাসিল করতে তুমি হতাশ প্রেমিক সাজতে তা কি আর বুঝি না! স্ত্রী থাকতে বিয়ের প্রস্তাবের ভয় নেই অথচ ভালবাসার ভাণ করে যা পাওয়া যায় হাতিয়ে নেওয়ার সুবিধে। তোফা আরামে দিব্যিই ত ছিলে। লোভটা একটু সামলে চললে ও বাড়ি কি নিংলয়ে ওঠে! যাই হোক ঈশ্বর হয়ে একটা সুবিধে ত হয়েছে। ফুটো বৌকে ফেলে যাবার সুযোগ মিলেছে। ওই ট্রেনের 'মাশ্থলি'-টাতেই কাজ হল কেমন?

ট্রে-ট্রেনের মাশ্থলি-তে কা-কাজ হল তুমি বলছ!—ঈশ্বর ভবতোষকে একটু তোৎলা মনে হল।

হ্যাঁ বলছি। আর আমায় বলতে হবে কেন, তুমি জানো না! হুণ্ডি কাটিয়ে কাটিয়ে গণেশকে ত' তখন সেরে এনেছ। তার চুলের টিকিটি পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। তা তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়ে ভালোই করেছিলে। নিরুদ্দেশ হওয়া

নবীন সাহিত্যিকগণ

ছোট/বড়দের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি প্রকাশ করাইবার জন্য যোগাযোগ করুন:—

সম্পাদক : শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী

লেখক মহল

১০৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, (ইণ্ডিয়ান সি আই টি রোডের সংযোগস্থল) কলিকাতা-১৪

খেলাধুলোর সরঞ্জামের পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা

ওরিয়েণ্টাল স্পোর্টস

৮৪।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯

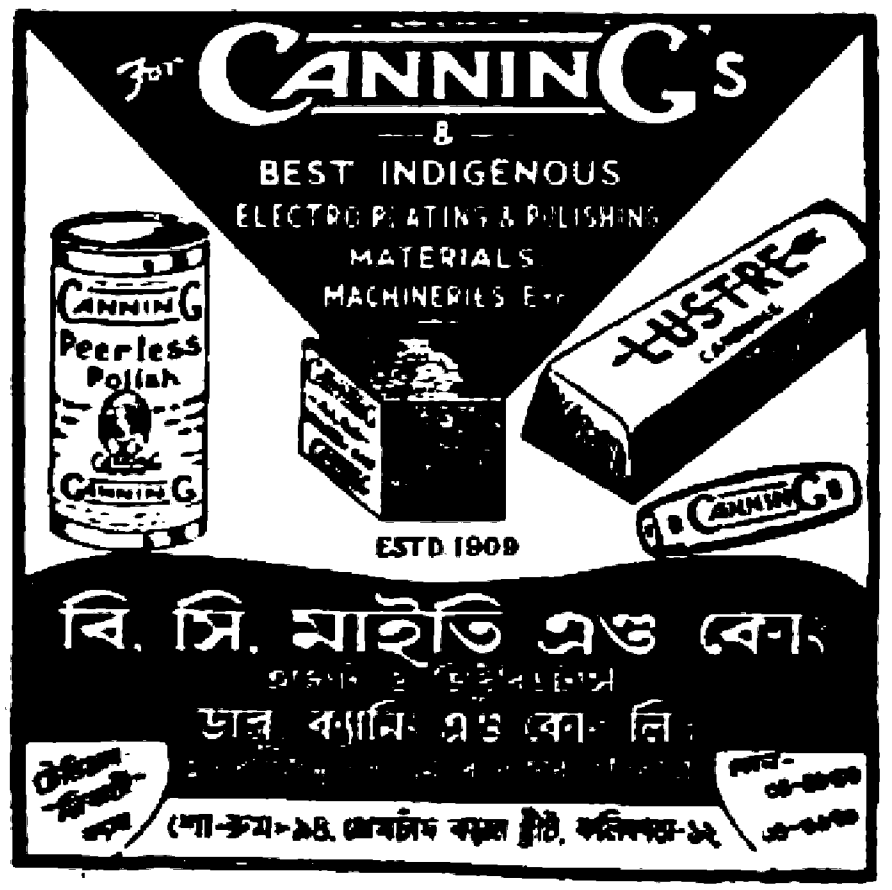

ছাড়া ওর আর কিছু নিজস্ব বিশেষণ হওয়ার কথা নয়। যত শহরের মত এমন সুবিধের কথা আর নেই, তার বড় শহরের মধ্যে সেখানে এর তুলনা হয় না। সেখানে কোন পাড়ায় কি পাওয়া যায় পাড়াতলী পরদেশী কেউ হলে মুখুয্যেদের চেহারা দেখে চেনে কার সাধ্য।

সব কিছুর ভালো একটু থামতে ঈশ্বর ভবতোষের ভাড়া নিলে—বলো থামলে কেন?

ভাড়া ভাড়া নেবার দরকার ছিল না। নিজের উৎসাহেই আমি বলে চললাম,—সেখানেই নাম ভাঁড়িয়ে গণেশ তখন কোন অঞ্চলে পাড়ুয়ার বাপটি মেরে আছে। বুদ্ধি শুদ্ধি গণেশের চিরকালই ভোঁতা। নাম ভাঁড়াতেও তোমার নামটা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে নি। কিংবা তুমিই সে পরামর্শ দিয়েছিলে কেমন?

তাতে আমার লাভ?—ভবতোষ একটু থতমত খেল কি?

যার লাভ না থাকে লোকসান ত নেই। তার শেষ পর্যন্ত এই ঈশ্বর হওয়াই মন্দ কি? গণেশ মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করবার পর তুমি লুকিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির। পরদী বন্ধু সেজেই গেছলে। তবে তার আস্তানায় যাও নি। এখানে সেখানে কখনো চৌপাঠিতে কখনো চটীতলায় দেখা করেছিলে দুটি মনের মিল। তাতেই কিন্তু পৌরহিত্যের পাকে সেই সুঘটন। সকাল বেলা দেখা গেছল কাইতের ধারে একজন মড়ার মুখোস পড়ে আছে। আতঙ্ক ধরে পৌরহিত্য থেকে সেজেই গ্রামের শেষ দুটোর কোনো জমনা থেকে সে সতী পাড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিংবা কেউ ঠেলেও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। বেশী বয়সে সেজেই কিনাই তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো অনেক সময়ে একেবারে খালি থাকে। মড়ার পাশে মরিচ টিকিটে তার নাম পাওয়া যায়। সে নাম তোমার—ভবতোষ হালদার। তুমিই ঠেলে দিয়েছিলে না কি জমনা থেকে? কিন্তু ভবতোষ হওয়া ছাড়া তোমার আর গতি কি।

লাভ আছে, যথেষ্ট আছে। হাঁ, ঠিক বলেছ জমনা থেকে ঠেলেও দিতে পারি।—ভবতোষ উত্তেজিত।

দিতে পারে মনে?—এবার অমর হতভম্ব হবার পালা,—অবশ্য ঠেলে দেবে কি?

আচ্ছা, এইবারই ও দেব। আমি ওর খুন করবার প্ল্যানটাই যে ভাবছিলাম অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা তোমার মাথা প্রপোজ করবে কিনা সন্দেহ। তবে ভাবছি।

আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর? যেন আমাকেও খুন করবার প্ল্যান আছে নাকি? ঠাট্টা হচ্ছে?

আরে না না সবেতেই ভাই। ছাপা হলে আপনাকেই পাঠাবো।

আমাকেই ছাপা হলে পাঠাবেন? কি পাঠাবেন?

কি পাঠাবো? এখন বসুন চটপট করে ঠিকানা। না হয় শুধু ফোন নম্বরটা বলুন।

কিন্তু ফোন নম্বর আমার কেন? নম্বর না জানলে ফোন করবেন কি করে?

আপনাকে কেন? ও সব থেকে অবশ্য হাসি পেলো। নম্বর মেলে তো করেছি নম্বর। আপনার পাড়াতে হই ঘুরেছিলাম। কোনো চায়ের দোকানে পাবো। রোজ বাড়ীই খুন করি আমি।

রোজ খুন? খুনের বাড়ি যাওয়া আসা করেন? আর তাও আমারই মধ্যে রোজ বাড়িয়ে নেওয়া? যার খুনের প্ল্যান তারই সবকার হচ্ছে। আপনার ফোন নম্বর?

ওদের মত পাকা লোকের সামনে কথার কল ... গেল

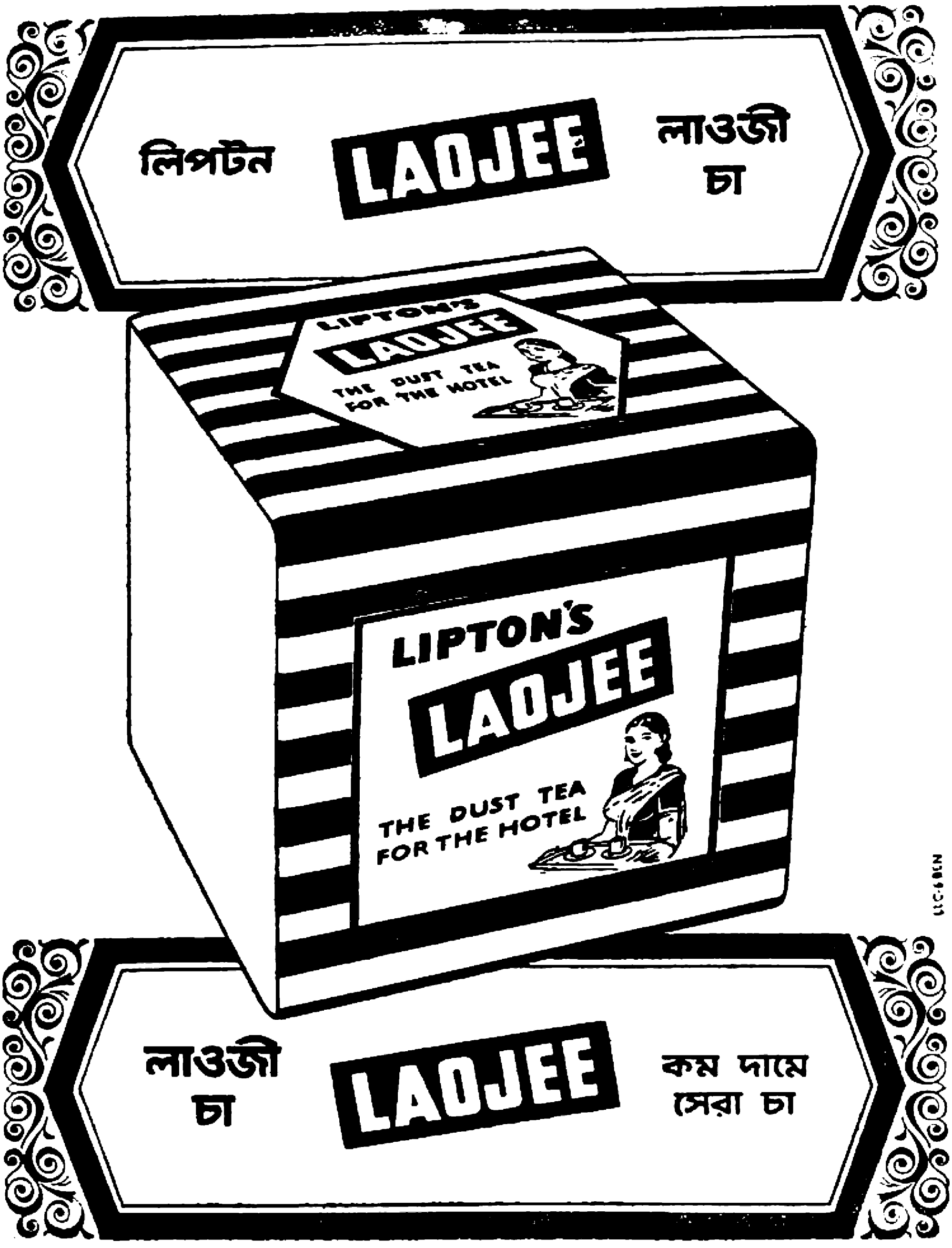
লিপটন LAOJEE লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা

ব্যর্থ তপস্যা

সতীনাথ ভাদুড়ী

সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছলাম ধর্মশালায়। অযোধ্যায় তখন যাত্রীদের বেশ ভিড় চলেছে। ঘর পাওয়া শক্ত। আট আনা বকশিশ পেয়ে ধূর্ত দরোয়ান হুজুরকে যে ঘর দেখিয়ে দিল তাতে একটা মাত্র ছোট গবাক্ষ। মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাল করে দেখলাম ঘরটাকে। এ ঘর আর পাশের ঘরের মধ্যে একটা তালাবন্ধ দরজা। বাতির আলোয় পড়া গেল কপাটের উপর খড়ি দিয়ে লেখা—"এই তালা দেখে যাত্রীরা যেন এ ঘরকে নিরাপদ না মনে করেন। আমি ভুক্ত-ভোগী, আমার সর্বস্ব চুরি গিয়েছে।"

ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখবার জন্য কপাটে ঘট্‌ঘট্‌ করে ধাক্কা দিতেই তালাটা খুলে এল।

"একটু আস্তে ভাইয়া! এখানে একজন লোক অসুস্থ।"

মেয়েমানুষের গলা। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ। ও ঘরের মধ্যে কোন্ আলো ছিল না; আমার যন্ত্রের মোমবাতির আলো খানিকটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিল মাত্র। এই আবছা আলোয় এক নজরে মনে হল—একজন সন্ন্যাসী উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন; আর একজন গেরুয়াপরা স্ত্রীলোক তাঁর কোমরে সেঁক দিয়ে দিচ্ছেন।

"মাপ করবেন সাধুবাবা।"

"হ্যাঁ সাধু তো ঠিকই; কলিকালের সাধু! শাস্ত্রে বলেছে কলিতে তপস্বীরা হয় গ্রামবাসী; আর সন্ন্যাসীরা হয় অর্থ-লোলুপ। সন্ন্যাসিনঃ অতি অর্থ-লোলুপাঃ।"

ঠিক এতটা আশা করিনি। শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ! নিজেকে শোধন করে তুললেন, সে কী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে? আমি যে চোর আসতে পারে ভেবে দরজার তালা পরীক্ষা করছিলাম। উনি যে কথা বললেন আমার দিকে না তাকিয়ে! আধ্যাত্মিক মার্গে অন্তত খানিকটা অগ্রসর না হলে, এ ক্ষমতা লোকের আসে না। আমি সাধুসঙ্গ করবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ যখন এঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখন এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই।

পরের দিন সকালে গেরুয়াপরা মহিলাটির সঙ্গে দেখা হ'ল ধর্মশালার গেটের বাইরের মুদীর দোকানে। কপালে তিলক, পায়ে খড়ম, নাতিপ্রৌঢ়া, স্বাস্থ্যবতী, খাটো গড়ন।

দুইজনেই চাল ডাল কিনতে গিয়েছি। গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম।

"সাধুবাবা আছেন কেমন?"

"ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছেন।"

"ও'র অসুখটা কি?"

"কোমর থেকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঘাড় মাথা পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা। হয় ও'র মাঝে মাঝে। হয় আবার সেরে যায় দুই একদিনের মধ্যে।"

দোকানীকে যখন উনি পয়সা দিলেন তখন দেখলাম মহিলাটির হাতে একটা প্রকাণ্ড উল্কি। অশ্বারূঢ় কোন যাত্তির ছবি। যাশু না, কোন দেবতা; কেননা তাঁর মাথার চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল দেওয়া রয়েছে। দেবতার হাতে খোলা তলোয়ার। ঘোড়ার গায়ে লাল রঙের অগ্নিশিখা আঁকা। ঘোড়া ছুটে চলেছে বায়ুগতিতে।

বহু ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না ইনি কোন দেবতা।

মহিলাটির সঙ্গে আবার দেখা ধর্মশালার রান্নার জায়গায়। আমি ইট সাজাচ্ছি উনানের জন্য; কাঠ, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে তিনি ঢুকলেন। আমার পৈতাটা বোধহয় তাঁর নজরে পড়ল।

"ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ"

"চাল না আটা?"

"চাল"

"চাল"

আমি জল আনবার জন্য কলতলার দিকে যাচ্ছি; হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন তিনি। ছুটে গিয়ে দেখি উনি বাঁদর তাড়াচ্ছেন আমার উনানের কাছ থেকে।

"শ্রীরামচন্দ্রজীর রাজ্যে কখনও বাঁদর জিনিস এমন ভাবে ফেলে রেখে যেতে আছে। আমি আজ মুগীর জন্য খিচুড়ি রাঁধব। খিচুড়ি চলে তো দিন না আপনার চাল ডাল আমার কাছে; এক-সঙ্গেই রেঁধে নিই।"

এর থেকেই সাধুবাবার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেলাম। কী জ্বলজ্বলে চোখ দুটো! বয়স আশী বছর হবে। গৌরবর্ণ; দীর্ঘকায়; সুন্দর চোখ মুখ। গৈরিক বসন; কিন্তু গলায় যজ্ঞোপবীত। এর থেকে মনে হ'ল যে উনি বোধহয় আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। পৌঢ়ত্বে এ দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা।

গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন "জাতভাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ী কোথায়?"

"পুরী"

"পুরী!"

বাড়ী পুরীর শুনে এত আশ্চর্য হলেন কেন বুঝতে পারলাম না।

"বাঙ্গালী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"বাঙ্গালীরা বড় রোগা আর বেঁটে হয়। তুমি তো দেখছি তবু একটু লম্বা আছ।"

"হ্যাঁ"

"মাছ মাংস নিশ্চয়ই খাও।"

"না আমি খাই না।"

"বাঃ!"

আমি হাসলাম।

"তীর্থযাত্রী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশীটা তাই; তবে তার সঙ্গে খানিকটা ঘুরে বেড়াবার শখও আছে।"

"বহু জায়গা দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"নেপালে গিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"সেখানে শুনেছি এখনও গোবধ বারণ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"নেপালের গরু দেখেছ?"

"ঠিক মনে নাই। দেখে থাকব নিশ্চয়।"

"খুব ছোট হয় শুনেছি; ছাগ প্রায়ই ধেনুষ্?"

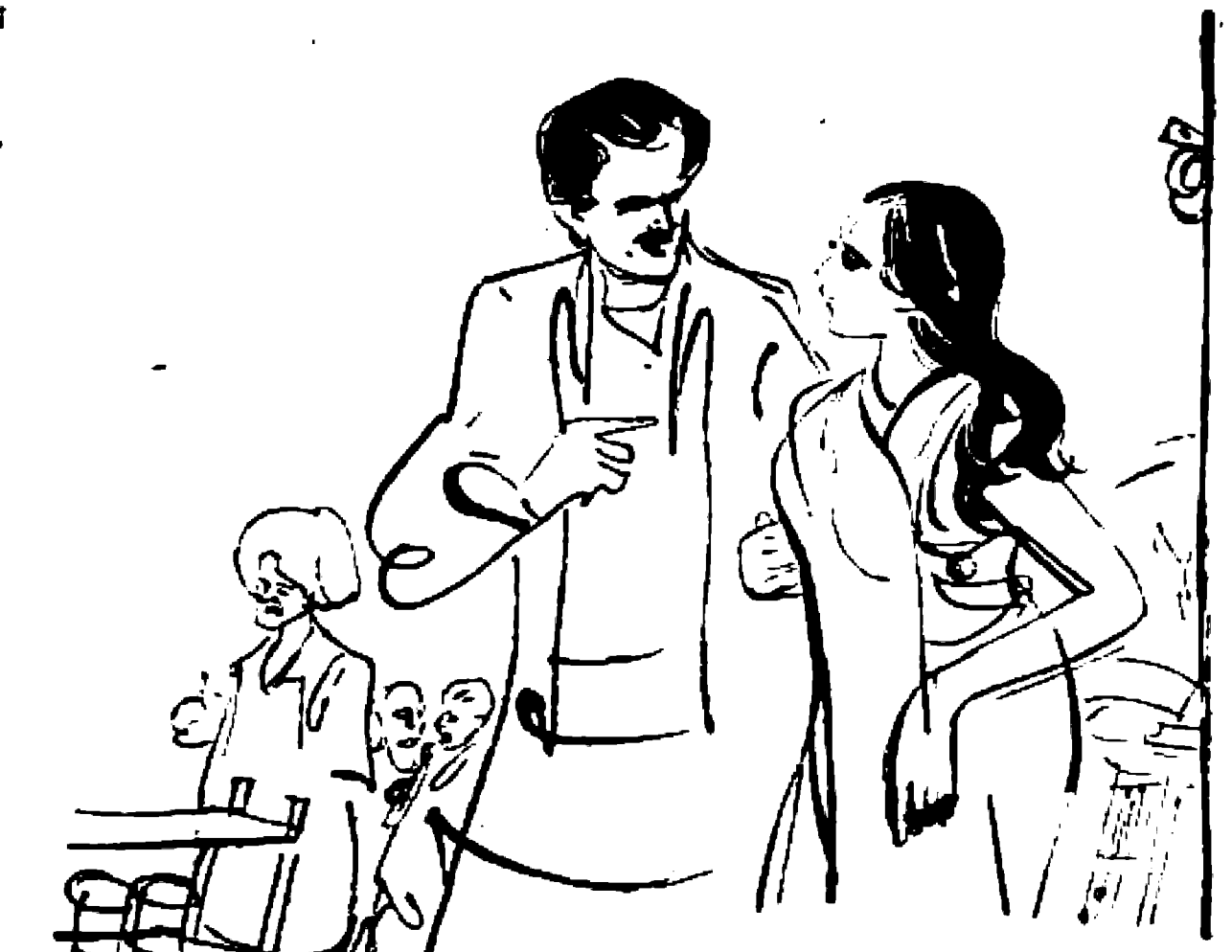

—সাধুবাবা কেমন আছেন?

"ঠিক মনে নেই।"

"কোন নূতন জায়গায় গিয়ে চোখ বুজে থাক নাকি? লোকের Power of observation একটু Keen হওয়া দরকার।"

চটে উঠেছেন বৃদ্ধ। আমার ভক্তি আরও বাড়ল তাঁকে ইংরাজী বলতে শুনে। এই সময় আমার দৃষ্টি গেল তাঁর হাতের দিকে। ও'র হাতেও সেই উল্কি।

প্রচণ্ড ধাবমান অশ্বে আরূঢ় উন্মুক্ত অসিধারী সেই দেবতার ছবি!

সে তো একশবার।"

"পাঞ্জাবের গরুগুলো কিন্তু বেশ বড় বড় হয়।"

"পাঞ্জাবের কোথায় আপনার বাড়ী?"

"বাড়ী ছিল; এখন আর নেই। ১৯৪৭-এর আগে ছিল। গ্রামের নাম ছিল সিন্ডল। মণ্টগোমারি জেলা। ওদিকে গিয়েছ নাকি?"

গেরুয়াপরা মহিলাটি এতক্ষণে কথা বললেন—

"বাবুজী, দেখছেন না মাথার যন্ত্রণায় উনি কি রকম কষ্ট পাচ্ছেন এখন।"

অর্থাৎ আপনি এখন উঠুন। কাজেই উঠতে হ'ল।

"কিন্তু ওষুধ-বিষুধ দরকার হলে....."

"না না, উনি ডাক্তারি ওষুধ খান না।

বৃদ্ধ বললেন "লজ্জাবতী লতার শিকড় কপালে ঘসতে পারলে হত।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি চেষ্টা করে।"

"কাছাকাছি তো আমি খুঁজেছিলাম, পাইনি।"—মহিলাটি বললেন।

অযোধ্যায় তীর্থ করতে এসে দেব-দর্শনের আগে লজ্জাবতী লতার শিকড় খুঁজে বেড়ান যে কতদূর হাস্যাস্পদ আচরণ সেকথা তখন খেয়াল ছিল না। একজন উচ্চস্তরের সাধকভক্তের কাছে ছোঁবার লোভ অন্য সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়।

লজ্জাবতী লতা সরযূর ধার থেকে আরম্ভ করে সীতাদেবীর মন্দির পর্যন্ত সমস্ত জায়গা চষে ফেলেও কোথাও পাওয়া গেল না। শেষকালে ফয়জাবাদের এক আয়ুর্বেদী গাছগাছড়া-বিক্রেতার কাছ থেকে একটা কাঁচকলা শিকড় পাওয়া গেল। যে কোন গাছের শিকড় চাইলেই বোধ হয় এইটাকেই দিত সে দোকানদার। তবু আমি ভাবি গেলাম, একজন যৌগিক বিভূতিসম্পন্ন মহাত্মার সামান্য একটু কাজে আসতে পেরে।

শিকড়টাকে মহিলাটির হাতে দিতেই তিনি বললেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছে কলির ভেষজে গুণাগুণ কমে যায়। এখন দেখা যাক, শেষকেতারের কৃপায় যদি কিছু হয়।" ভগবানের নাম স্মরণ করে তিনি সেটাকে মাথায় ঠেকিয়ে নিলেন।

কপালে শিকড় ঘসবার জন্য বৃদ্ধ মাথার বাঁধন খুলছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল—"ওঁকে এর নাম বলেননি কেন রুক্মিণী? রামাবতারের জন্মস্থানে এসে বিনা দক্ষিণায় ভেষজ নিয়েছ! কলির স্ত্রীলোক কিনা, তাই আক্কেল নেই, লোভ আছে!" রাগে মুখচোখের চেহারা বদলে গিয়েছে বৃদ্ধের।

রুক্মিণী দেখলাম এসব রাগের ঝাপটায় অভ্যস্ত। ধমকানি খেয়ে একটুও বিচলিত হলেন না তিনি। আমি তখন-কার মত সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি। রুক্মি যে বৃদ্ধ একটু ছিটগ্রস্ত ও কোপন স্বভাবের লোক। বুড়ো বয়সে অমন একটু হয়েই থাকে সকলের। বহু বড় বড় সন্ন্যাসীরও এ দুর্বলতা আমি দেখেছি। ওঁরা কী ভেবে কী করেন, কী বলেন, আমরা সাধারণ মানুষরা সেটা ধরতে না পেরে, ওঁদের সম্বন্ধে নানা রকম ভুল ধারণা করে নিই। কেউ না বললেও বৃদ্ধ জানতে পেরেছেন যে রুক্মিণী লজ্জাবতী লতার শিকড়ের দাম দেয়নি। এই কথাটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

রাত্রিতেও রুক্মিণী আমার ডাল রুটি তৈরি করে দিলেন নিজের রান্নার সঙ্গে। জানতে পারলাম যে বৃদ্ধের মাথার যন্ত্রণা কমে গিয়েছে।

"কলিবৃদ্ধের ভেষজেও তাহলে দেখছি রোগ সারে।" ভেবেছিলাম এই কথাটা বলে তাঁকে হাসাতে পারব।

রুক্মিণী গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন—"হয় কখন কখন।"

"আপনার কথা শুনে তো আপনাকে পঞ্জাবের লোক বলে মনে হয় না।"

"আমার বাড়ী মথুরায়। গিয়েছেন নিশ্চয় মথুরায়? স্বাপরের শ্রীকৃষ্ণভক্তদের জন্মস্থান যে। কোন তীর্থকামী কি সেখানে না গিয়ে পারে?"

অমন কৌতূহল ইচ্ছে জানবার শুনে যে বৃদ্ধ তাঁর কে হন। মথুরায় যখন বাড়ী, তখন বৃদ্ধের মেয়ে হতে পারেন না রুক্মিণী। বিবাহের কোন লক্ষণ তাঁর বেশে নেই। তবে?

জিজ্ঞাসা করতে বাধল।

পরের দিন সকালে দেখলাম বৃদ্ধের মেজাজ ভাল রয়েছে। আগের দিনের গল্পের জের টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কপালের কোথায় কোথায় গিয়েছ?"

"কাটমণ্ডু আর পশুপতিনাথ।"

"বল কি! আর কোথাও যাওনি?"

"ওই দুটোই তো নেপালে আসল দেখবার জায়গা।"

"তুমি তো সব কেনে বসে আছ দেখছি!"

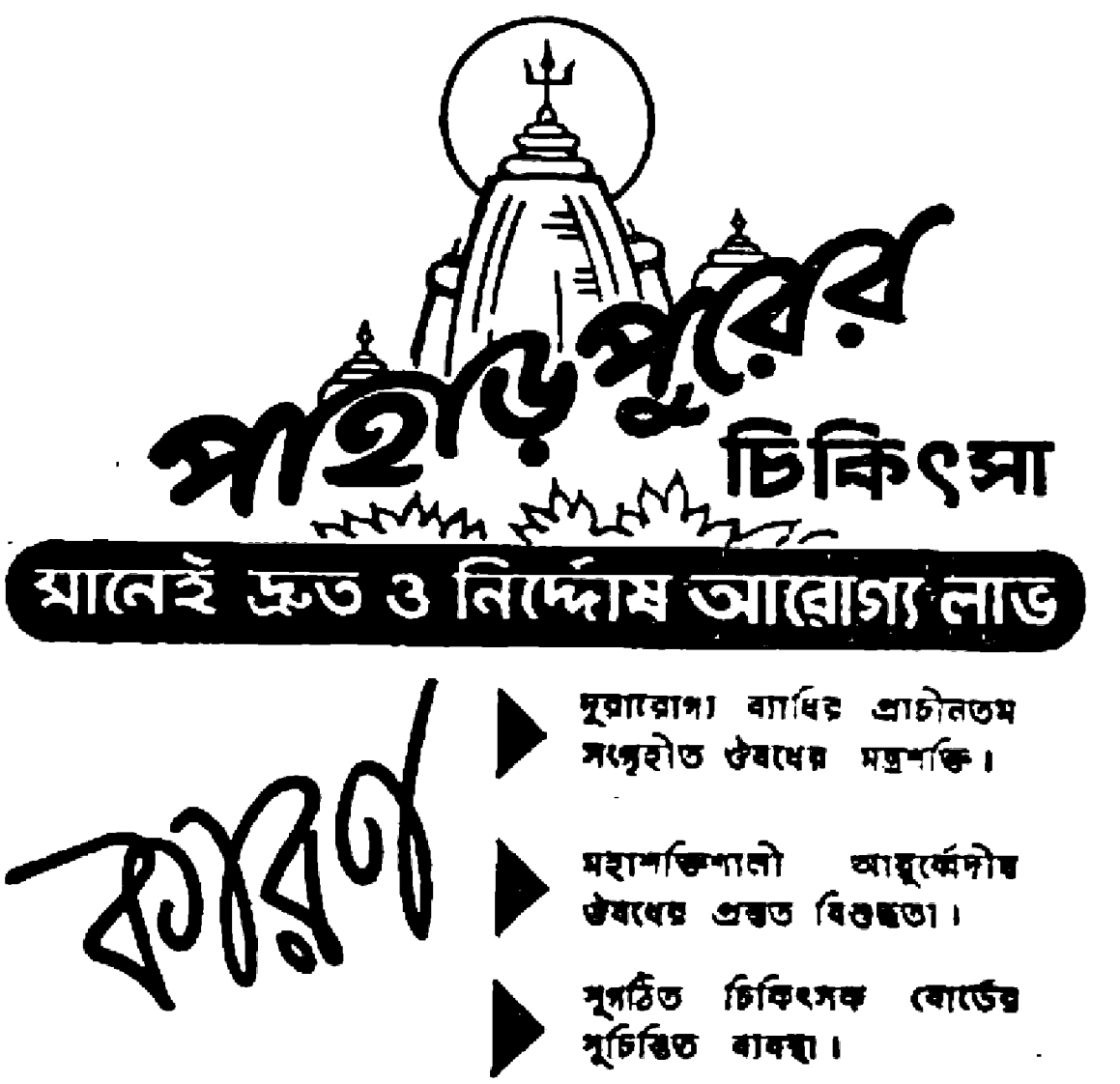

চটে উঠলেন বৃদ্ধ।

"কিছু জানি না বলেই তো আপনার কাছে আসা।"

"আবার বাচালতা! নেপালে গিয়ে একবার কলির প্রথম অবতারের কথা মনে পড়ল না?"

মাথা গুলিয়ে গেল। ঠিক মনে করতে পারলাম না কলির প্রথম অবতার কে; আর কেনই বা নেপালে গিয়ে তাঁর কথা মনে পড়তে বাধ্য।

"ও। তাই বলো। কলির প্রথম অবতার কে জান না বুঝি? পুরাণে আছে, কলিযুগে বাচালতাই পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হবে। তুমি হচ্ছ সেই কলির পণ্ডিত! গায়ে জোর না থাকুক, বুদ্ধিমান বলেই তো জানতাম বাঙ্গালীদের।"

"আজ্ঞে আমি সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট কিনা, তাই এ সব বিষয়ের জ্ঞান খুব কম।"

"সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট তো আমিও। তাই বলে নিজেদের শাস্ত্র পড়ব না? অবতারদের সকলকার নাম জান? শ্রীকৃষ্ণাবতারের দেহাবসানের পর থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। বুদ্ধদেবই কলিযুগের প্রথম অবতার।"

"জানি; মনে পড়ছিল না।"

চোখ বুঁজে প্রণাম করে বৃদ্ধ বললেন—"কলির শেষ অবতারের নাম মনে আছে—না সেটাও মনে নেই? তাঁর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার সময় হয়ে গিয়েছে। কলিযুগ শেষ হবার শাস্ত্রোক্ত সব লক্ষণ চারিদিকে তুমিও দেখছ আমিও দেখছি।"

তাঁর বুদ্ধচোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকমের। গদগদকণ্ঠে শাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার মানে বলে বলে যেতে লাগলেন।

"কলিযুগের শেষে মনুষ্যরা হয় লোভী, কামুক ও দরিদ্র। স্ত্রীলোকরা হয় কটুভাষী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, অতিশয় ভোজী, বহুপুত্রবতী। তপস্বীরা হয় গৃহবাসী ও সন্ন্যাসীরা হয় অর্থলোলুপ। পুরুষরা হয় স্ত্রৈণ; আর তারা চালিত হয় শ্যালক-শ্যালিকার মন্ত্রণা দিয়ে। বহুভাষী ব্যক্তিকেই লোকে পণ্ডিত বলে। বাচালতাকেই লোকে সত্যতার প্রমাণ বলে মনে করে। দেহীদের দেহ হয় ক্ষীণ; ধেনুসকল ছাগতুল্য; ওষধিসকল অল্পগুণ; গৃহসকল হয় লোকশূন্য। রাজারা হয় অসৎ ও প্রতারক। রাজগণ প্রজাপীড়নকারী।..... কলির শেষের আর বাকি কি।.....সব লেখা আছে শাস্ত্রে।....."

বুদ্ধিমণী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। বৃদ্ধের খাওয়ার সময় হয়েছে; আমাকে তাই সেখান থেকে উঠতে বললেন। গলার স্বর বেশ দৃঢ়। বৃদ্ধ চোখ নামিয়ে নিলেন মাটির দিকে। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন।

পরদিন বুদ্ধিমণী মন্দিরে যাবার পর বৃদ্ধ নিজে থেকেই আমাকে ডাকলেন, বন্ধ দরজায় ফাঁক দিয়ে। বাইরে বার হবার মত সুস্থ বোধহয় তখনও হননি। একা একা থাকেন; কথা বলবার জন্য লোকের দরকার তাঁর। আমার ভয় যে আবার সেই কলিযুগ আর অবতারদের কথা না পাড়েন।

"তুমি চাকরিবাকরি কর নাকি?"

"করতাম, এখন আর করি না। স্কুলমাস্টার ছিলাম।"

"ছেলেরা মানুষ হয়েছে?"

"আপনাদের আশীর্বাদে কাজকর্ম করছে; আর সেইজন্যই আমি এই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার ফুরসত পেয়েছি।"

"তোমার আবার তীর্থকরা! নেপালে গিয়ে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু না দেখেই ফিরলে? আর তাঁর মহাপরিনির্বাণের স্থান কুশীনগর? আমি তো ভাবতেই পারি না। অবতারদের জন্মস্থান ও লীলাক্ষেত্রগুলো দেখলে মনে উৎসাহ পাওয়া যায়; নিজেদের কর্তব্যের প্রেরণা পাওয়া যায়; আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপ্রণালীর—খসড়া তৈরি করা যায়। কলির প্রথম অবতারের লীলাক্ষেত্র থেকেই আমরা সবচেয়ে কার্যের নির্দেশ বেশী পেতে পারি; তিনি সবচেয়ে কম পুরনো কিনা,".....

মনের আবেগে তিনি আরও কত কথা বলে যাচ্ছেন একটুও না থেমে। কথাগুলো যেন বিনা চেষ্টায় আপনা থেকে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে, প্রলাপের মত। এমনভাবে প্রাণ ঢেলে দিয়ে বলা, যে এক একবার মনে হচ্ছে যে এগুলোর মধ্যে হয়ত কোন গভীর তত্ত্ব আছে। হয়ত নিছক পাগলের প্রলাপ নয়। চিন্তা তাঁর বিক্ষিপ্ত নয়। অবতার আর কলিযুগ এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি যেন সবাক চিন্তা করে চলেছেন। শ্রোতা উপলক্ষ মাত্র। উঠে গেলে হয়ত দুঃখিত হবেন; তাঁর এই একঘেয়ে কথা চুপ করে বসে শোনা ছাড়া উপায় নেই।

....."জন্মস্থানগুলোর গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। সে যুগের লোকজন না থাকুক, সে সমাজ না থাকুক, সেখানকার হাওয়াবাতাস, জলমাটি, পশুপক্ষী সব তো প্রায় সেই রকমই আছে। চিন্তা করে বার করতে হয় যে, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার জন্য ঠিক ওই রকম জায়গা বেছেছিলেন কেন? সেইটা বুঝতে পারলে আমাদের কাজ হয়ত খানিকটা সহজ হয়ে আসে। কপিলাবস্তু আজ জঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীরামাবতারের জন্মস্থানের উপর আজ বিধর্মীদের প্রার্থনামন্দির খাড়া হয়েছে। এর একমাত্র অর্থ হল যে ওই সব অবতারদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে; নূতন অবতারের আবির্ভাবের সময় হয়েছে। তাঁর আসা দরকার। তাঁকে যেমন করে হোক আনতে হবে! মানুষের মধ্যে দিয়েই ভগবান কাজ করেন; আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তোমার ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে তো? নাতিপুতি কয়টি? যারা ভাত খায় তাদের সন্তান বেশী হয়।"

হঠাৎ তিনি কথার প্রসঙ্গ একেবারে বদলে নিয়েছেন, বুদ্ধিমণীকে আসতে দেখে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। এঁদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না। তবে বুদ্ধের অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ হতে আরম্ভ হয়েছে। তিনি যদি সব জানতে পারেন, তবে আমার নাতি কয়টি, এ খবরটা তাঁর অজানা কেন?

পরের দিন সকালে দরোয়ান এসে জানিয়ে গেল যে এখানে যাত্রীদের এক নাগাড়ে তিনদিনের বেশী থাকবার হুকুম নেই। অর্থাৎ তাকে আবার বকশিশ দিতে হবে। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে বৃদ্ধ বেরিয়ে এসেছেন। ভীষণ ঝাপ্পা দরোয়ানের উপর। বললেন—"চল তোমার মালিকের কাছে। মেরে তোমার হাড় ভাঙ্গাব। আমাকে বাঙ্গালীবাবু পাওনি। যাত্রীদের অনর্থক জ্বালাতন করা বার করছি আমি তোমার!"

দরোয়ান গজগজ করতে করতে চলে গেল। বুঝলাম যে আজ বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। ধর্মশালার উঠনে পায়চারি করতে করতে আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। বুদ্ধিমণী তখন সরযূতে স্নান করতে গিয়েছেন।

বুড়োবয়সে এক এক সময় এক এক প্রসঙ্গের উপর ঝোঁক পড়ে। বৃদ্ধ আজও আবার আমার নাতিদের সম্বন্ধে সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করলেন। গায়ের রঙ, স্বাস্থ্য, মাছমাংসের উপর ঝোঁক আছে কিনা, ভীতু না সাহসী, জিদ আছে নাকি—আরও কত প্রশ্ন। আমার মনে হল আমাকে খুশী করবার জন্য নাতিদের কথা তুলছেন তিনি।

তাঁকে খুশী করবার জন্য আমিও ইচ্ছা করে কলিযুগের প্রসঙ্গ তুললাম:

"দারোয়ানটাকে দেখলেন না। আপনি ঠিকই বলেছেন—কলিযুগের শেষ এটা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলো, সব লক্ষণ একেবারে হুবহু মিলে যায় কিনা। তোমাদের মত নিরপেক্ষ লোকের কাছ থেকে শুনলেও খানিকটা ভরসা পাই।"

"সব মিলে যাচ্ছে। একজন অবতার এসে দুষ্কৃতদের নাশ না করলে আর এখন কোন উপায় নেই।"

অনন্তে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ:

"বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র গয়ার লোক তুমি। তুমি একথা না বুঝলে বুঝবে কে? সব কথা আগে থেকে কুটিয়ে লেখা আছে পুরাণে। তবু কেন এমন হল?"

"কী? কী এমন হল? কিসের কথা বলছেন?"

"না, সে অন্য কথা।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

নূতন একদল যাত্রী বস্তা-পেটরা নিয়ে ধর্মশালার গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য আমি বলি —"যাত্রী আসবার কামাই নেই।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আপনি বলছিলেন না, শাস্ত্রে আছে—কলির শেষে গৃহসকল লোকশূন্য হয়?"

"হ্যাঁ আছেই তো। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লেখা আছে—শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু। সদ্ম মানে জান তো? সদ্ম হচ্ছে গ্রাম।"

"তবে?"

বৃদ্ধের জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দীপ্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

"তবেটা কিসের? কি বলছ স্পষ্ট করে বল না!"

গলার স্বর বেশ রুক্ষ। মুখ এগিয়ে এনেছেন আমার মুখের কাছে। উত্তেজনা ও অধীরতার ছাপ তাঁর চেহারায় সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছে আমার উত্তর তাড়াতাড়ি বার করে নেবার জন্য এখনই বুঝি গলাটা দুহাতে দিয়ে ধরে ঝাঁকি দিয়ে নেবেন।

"আমি তো দেখছি ঘরে ঘরে লোক বাড়ছে। সর্বত্রই এই। একটা বড়ী খালি হলে, পঞ্চাশটা লোক ভাড়া নেবার জন্য তখনই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ বিষয়ে, কলির শেষদশার শাস্ত্রীয় বিবরণের ঠিক উলটো ব্যাপার দেখছি আমরা সারা দেশে।"

ভয় করছিলাম যে রেগে ফেটে পড়বেন বৃদ্ধ অর্বাচীনের এই বাচালতায়; কিন্তু প্রতিক্রিয়া হল একেবারে অন্য রকমের। কপালের রেখাগুলো আরও গভীর হয়ে উঠল। কুঞ্চনরেখাগুলোর ক্ষণদীপকায় ধরা পড়ল একটা অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব।

মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে তিনি বললেন—"কথাটা আমারও মনে হয়; কিন্তু আমি ওটার উপর গুরুত্ব দিতে চাই না। একশটা কথার মধ্যে যদি নিরানব্বইই মেলে, আর একটা না মেলে, তাহলে সেই গরমিলটাকে কি উপেক্ষা করা যায় না?"

"হতে যায়।"

"সেই কথাই আমিও আমার মনকে বোঝাই।"

"আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, বলো! সংশয় দূর করবার জন্যই এই আলোচনা। এতে অবার দ্বিধা কিসের?"

"আপনি বলেছিলেন, শাস্ত্রে আছে, কলিতে স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তানবতী হয়। তাই যদি হয় তবে আবার গৃহ লোক-

কৃষ্ণা গ্লাস

"...করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে দুরূহ কর্তব্যভারে দুঃসহ কঠোর বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন.....।"

কৃষ্ণা সিলিকেট ও গ্লাস ওয়ার্কস্ লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই
১৭, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

শুনা হবে কি করে? এ নিশ্চয়ই শাস্ত্রের একটা অসঙ্গতি।"'

"না না। ও হচ্ছে তোমার বুদ্ধির দৌর্বল্য। লোক বেশী জন্মালে কি হবে; তার চেয়েও বেশী মরতে তো পারে। মহামারী ইত্যাদির কথা ভুলে যাচ্ছ কেন। আমি যখন লাহোর থেকে পাস্ করে সম্ভলের আশ্রমে যাই তখন আমারও এটাকে শাস্ত্রের অসঙ্গতি বলে মনে হত। ও রকম মনে হয় প্রথম প্রথম। ওটা কোন দোষের নয়।"

আমার মানসিক অবস্থার একটা ভুল আন্দাজ করে নিয়ে উনি আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন। সে ভুল ভাঙ্গালে অনর্থক ওঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। তাই তাঁর কথায় সায় দিলাম।

"ঠিক বলেছেন আপনি।"

"সংসারে ভবিষ্যতে কবে কোথায় কি হবে, শাস্ত্রে সব আগে থেকে ছক কেটে লিখে দেওয়া আছে। মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। নইলে ভগবান দশম-অবতারের নাম যে কল্কি হবে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে সম্ভল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, এসব কথা আগে থেকে পুরাণে লেখা হয়ে গেল কেমন করে?"

"'সে তো ঠিকই।"

"তুমি ভাবছ বিজ্ঞান পড়েছ বলে সংশয় বেড়েছে তোমার। ভুল ধারণা। যতই শাস্ত্র পড়, খানিকটা বিজ্ঞান না জানা থাকলে কি চলে? দশম অবতারের হাতের অসিতে থাকবে অগ্নিশিখার দ্যুতি। সবাই বলবে পেট্রল মাখাও। সে আগুন থাকবে কেন। তাহলে ন্যাকড়া জড়াতে হয় তলোয়ারে। আমি তখন ফস্‌ফরাস্ মাখিয়ে ওতে আগুনের দীপ্তি আনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের মন বেশী সংশয়ী তারা তখনও বাধা তুলেছিল। তারা বলে, শাস্ত্রের লেখার সব সময় যুগোপযোগী অর্থ করে নিতে হবে। যখন সে যুগে দুষ্কৃতদের সংহারের জন্য ভাল অস্ত্র বলে গণ্য হত; কিন্তু এ যুগে অচল। তরবারির উপরের অগ্নিশিখার ইঙ্গিত হল আজ-কালকার অগ্নেয়াস্ত্রের দিকে। তারা বলল দশমাবতারের হাতে বন্দুক দাও। বন্দুক ছিলও আমাদের কাছে। আমি হয়ত কিইনি শাস্ত্র-বহির্ভূত জিনিস। ভুল করেছিলাম বোধহয়। কে জানে কী হত! হয়ত কলির শেষ তখনও হয়নি, আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল!"

বৃদ্ধ কী বলছেন ঠিক ধরতে পারছি না। প্রতি কথায় গভীর রহস্যের আভাস পাচ্ছি। তিনি ধরে নিয়েছেন যে আমি সব বুঝেছি। জানবার জন্য কৌতূহল আমার কম নয়; কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না, পাছে আবার তিনি সতর্ক হয়ে যান সেই ভয়ে। বুঝতে পারছি যে, গৃহ লোকশূন্য না হওয়ার কথাটা বলবার পর থেকেই আমার প্রতি তাঁর মনোভাব বদলেছে। বিশ্বাস করে আমার কাছে তাঁদের গোপন কথা বলা যেতে পারে, এরকম একটা ধারণা তাঁর জন্মেছে। সেটা নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই বলতে হ'ল—"ভুল মানুষের হ'তেই পারে।"

স্নান করে মন্দির হয়ে বুদ্ধিমণী ফিরলেন। আজ আর কথা পাল্টাবার প্রয়াস নেই বৃদ্ধের। তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন বলতে—কলিযুগের শেষ সম্বন্ধে বাঙ্গালীবাবুর সংশয়ের কথাটা। চাপা গলায় আরও কিসব যেন কথা হ'ল দুজনের মধ্যে। তারপর হেসে এগিয়ে এলেন বুদ্ধিমণী আমার দিকে।

"আমি আগেই চিনেছি বাঙ্গালী-বাবুকে। শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার লোকের হাবভাবে ফুটে বার হয়। বাবুজি প্রথম থেকে গম্ভীর হয়ে আমাদের কথা শুনেছেন; অন্য লেখাপড়াজানা লোকদের মত আমাদের পাগল ভাবেননি।"

এরপর থেকে বৃদ্ধ আর বুদ্ধিমণী একেবারে অন্য মানুষ। বুদ্ধিমণী আর বৃদ্ধের কথা সামলে নেবার চেষ্টা করেন নি। আমি কোন প্রশ্ন করলে বৃদ্ধও আর বিরক্ত হননি।

সেই রাত্রিতে সব কথা জানতে পারি। খাওয়াদাওয়ার পর সারারাত আমাদের গল্প চলে। এঁদের কাহিনী যেমন চমক-প্রদ, তেমনি কৌতূহলজনক। কিন্তু শোনা-বার সময় এর কৌতূকের দিকটা খেয়াল করবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

এঁরা মথুরার চতুর্বেদী বংশোদ্ভব। এবং কল্কি-সম্প্রদায়-ভুক্ত। এ রকম কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের নাম আগে শুনিনি। এর উত্তরে, বৃদ্ধ বললেন যে, তাঁরা সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়, তা'ও দিন দিন কমে যাচ্ছে। নূতন লোক এপথে আর আসতে চায় না। আগেকার যারা ছিল, সেসব পরিবারের ছেলেপিলেরাও আজ-কাল এপথ মানতে চায় না। সারা ভারত ছড়ান এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের দুইচারজনের পরস্পর দেখাশোনা হয় কুম্ভমেলায়, আর বিষ্ণুর অবতারদের লীলাক্ষেত্রগুলিতে। অনেক দিন থেকে এই সম্প্রদায় মুমূর্ষু অবস্থায় কোন রকমে শুধু টিকে ছিল। প্রায় একশ বছর আগে এতে নূতন জীবনের সঞ্চার করেন বৃদ্ধের পিতা শ্রীকল্কিপদ—এ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সম্মানিত নাম। তিনি এই পথকে সাধন-ভজন ছাড়াও এক ত্রিয়াশীল কর্মপন্থা দেন। তিনি বলেন, কল্কি অবতার আসবেন বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইনি আগের নয়জন অবতারের মত নন। তাঁদের লোকে জেনেছে, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার পর। কিন্তু কল্কি অবতারের বেলায় ভগবান তাঁর নাম-ধাম সবকিছু বহু আগেই প্রকাশ করে দিয়েছেন শাস্ত্র পুরাণে। এর উদ্দেশ্য, দশম অবতারের বেলায় মর্ত্যের লোকদের আগে থেকে এক কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেওয়া। কর্মযোগী কল্কিপদ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথম কাজ দিলেন সারা ভারত ঘুরে ঘুরে সম্ভল গ্রাম খুঁজে বার করবার। পুরাণে আছে:—

"সম্ভল গ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কি প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥"

সম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি অবতীর্ণ হবেন। কাজেই সম্ভল গ্রাম খুঁজে বার করাই হল প্রথম কাজ। বছর কয়েক খোঁজবার পর সম্ভল নামের এক গ্রাম পাওয়া গেল পাঞ্জাবে। সে গ্রামের বেশীর ভাগ লোক ভিন্নধর্মাবলম্বী; ব্রাহ্মণ এক-ঘরও ছিল না। কল্কিপদজী কয়েকঘর ব্রাহ্মণ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা আরম্ভ করলেন। কিছুকাল পরে ঝিলাম নদীর খাল কাটা হলে, তাঁদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা ফিরে যায়। চাষবাস করেই সকলের জীবিকা চলত। কল্কি-পদজী সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যান, ও দেহত্যাগ করবার আগে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে যান। তারপর থেকে এই বৃদ্ধের উপরই দলের মুখ্য দায়িত্ব বর্তায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়ে আসছিল পঞ্চাশ বছর ধরে। বৃদ্ধের প্রথম ছেলের নাম রাখা হল বিষ্ণুযশা। শাস্ত্রে আছে বিষ্ণুযশার স্ত্রীর নাম সুমতি। তাই দলের আর এক ব্রাহ্মণের মেয়ে হলে তার নাম রাখা হ'ল সুমতি। বড় হলে সুমতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল বিষ্ণুযশার। সকলেই জানত এদের প্রথম সন্তান হবে ছেলে। হলও তাই। ছেলের নাম রাখা হ'ল কল্কিদেব।

কল্কিদেবের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধের চোখে জল এল। "কী রূপ! কী কান্তি সে দেহের! নিজের নাতি বলে বলছি না। তাঁর নাতি বলে কোনদিন ভাবিনি। দেবতা জ্ঞানে আমরা সকলে তাকে সমাদর করে এসেছি তার জন্ম মুহূর্ত। এতো শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের প্রশ্ন নয়; সারা পৃথিবীর মানুষের

ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই ভগবান কল্কির উপর! বেদব্যাস যেমন বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন কল্কি-ভগবানের, ঠিক সেইরকম করেই আমরা তাঁকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম। শস্ত্র শাস্ত্র উভয় বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন কল্কি-দেব। অনায়াস দেখলে চোখে তাঁর আগুন জ্বলে উঠত সেই বাল্যকাল থেকেই। সেকথা আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আনন্দ পেতাম। পঞ্চাশ বছর ধরে সম্ভলের স্ত্রীপুরুষ সকলে প্রত্যহ একত্র হতাম কল্কি-আশ্রমে। সেখানে শাস্ত্রালোচনা হ'ত। স্ত্রীপুরুষ সকলের অবশ্যের সম্বন্ধীয় সব শাস্ত্র পড়া ছিল। তাই সকলেই আলোচনায় যোগ দিতে পারতো। পঞ্চাশ বছর ধরে সে সব শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এসেছি আমরা; তবু বিষয়বস্তু কখন পুরনো বা একঘেয়ে মনে হয়নি আমাদের কাছে। আশ্চর্য সমস্যই কেন নতুন পরিপ্রেক্ষিতে উঠেছে, তাকেই নেওয়া হত। পঞ্চাশ বছর ধরে লেখা এইসব টীকা-টিপ্পনীগুলো একখানা বিরাট গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল। সে বই সকলের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। কলিযুগ শেষ হবার পৌঁছেছে কিনা সেই কথার আলোচনাই হ'ত সবচেয়ে বেশী; কেননা পৃথিবীর আশাভরসা সবকিছু নির্ভর করছে, ওই কথাটার সঠিক বিচার আর নির্ণয়ের উপর। শাস্ত্রে বলা আছে ঠিকই; কিন্তু ভগবান আর মুনিঋষিরা কী ভেবে কী বলেছেন সেকথা বোঝা অত সহজ নয়। গ্রন্থের সব চেয়ে বেশী পাতা জুড়ে ছিল আপনার ভোলা প্রশ্নটা—স্ত্রীলোকরা বহু সন্তানবতী হলে, গৃহ সকল লোকশূন্য হয় কেমন করে? এই দুটি পরস্পরবিরোধী উক্তির সমঞ্জসাসাধনের চেষ্টা করে গিয়েছিলেন স্বয়ং কল্কিপত্নী—। তবু তার পঞ্চাশ বছর পরও ওই সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি হাজার দিনের আলোচনা সত্ত্বেও।"

এতক্ষণে আমি বুঝি কেন আমার প্রশ্ন, বৃদ্ধ আর রুক্মিণীর মন পলাতে পেরেছিল। তাঁদের শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাসকূটের সন্ধান একজন সম্পূর্ণ বাইরের লোককে অনায়াসে পেতে দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়েছিলেন।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—"সমস্যা কি শুধু একটা? পুরাণে লেখা আছে—কল্কি ভগবান দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাক্ষসচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যুকে খড়্গ দ্বারা সংহার করিবেন। এখানে দেবদত্ত কথাটার মানে পরিষ্কার। কল্কির বাহন সাদা ঘোড়াটিকে ভগবান নিজেই জুটিয়ে দেবেন। একথা জানা সত্ত্বেও একটা করে সাদা ঘোড়া আমরা সব সময় আশ্রমের আস্তাবলে রেখে দিতাম। সে ঘোড়ার নাম রাখা হত দেবদত্ত। নিরর্থক ও অনাবশ্যক জেনেও আমরা দেবদত্ত নামের ঘোড়া পুষতাম, শুধু দলের কয়েকজন সংশয়ীর মনের তৃপ্তির জন্য। কেউ বলত পোষা ঘোড়ায় চলবে না; কারও বা মত ছিল যে সব প্রাণীই যখন দেবতার দেওয়া, তখন আশ্রমের পোষা ঘোড়াতেই বা কল্কি-দেবের চলবে না কেন? মোটকথা, শাস্ত্রের কথা যাতে কোনরকমে নিষ্ফলা না যায়, সেজন্য আমরা আটঘাট বেঁধে কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। এসব সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি একমত ছিলাম যে কলির শেষ-দশা উপস্থিত হয়েছে। শুধু কবে কখন কল্কিদেব তাঁর কাজ আরম্ভ করবেন, সেই খবরটা ছিল আমাদের অজানা। উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির হতে দেয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মজীবনের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত ছিল এক স্থিরলক্ষ্যের দিকে। অভ্যাসে চিন্তাধারা হয়েছে এক-

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
চিত্রতারকা
অনুরাধা গুহ বলেন…
"বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের মধুর গন্ধটি আমার খুব ভালো লাগে—তাই প্রত্যহই আমি স্নানের আগে ইহা ব্যবহার করি।"
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

দুখী। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও তপস্যা সত্ত্বেও কল্কিদেব তাঁর কাজ আরম্ভ করতে দেরী করছেন দেখে আমরা অধীর হয়ে পড়েছিলাম।

"তারপর হঠাৎ যখন সেইদিন এল, তখন আর ভাববার সময় পাওয়া গেল না। যখন ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগি হল তখনকার কথা বলছি। সম্ভল পড়ল পাকিস্তানে। সবাই যে যার মত পালাচ্ছে; আমরা ভয় পাইনি। বরঞ্চ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করছি, শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী গৃহ-সকল লোকশূন্য হচ্ছে। তবে কি সেই প্রতীক্ষিত দিন এসে গেল! সকলে মিলে দিনরাত আলোচনা আর প্রার্থনা করি। কল্কিদেবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি যে কোন প্রকার নিকট-ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেখান থেকে পাওয়া যায় কিনা। চতুর্দিক থেকে নানারকম খবর এসে পৌঁছচ্ছে গ্রামে। আমরা নির্বিকার। সম্ভল থেকে দেড় মাইল দূরে ঝিলাম থানের একটা সরকারী অফিস ছিল। সেখানকার ওভারসিয়র আত্মারামের খুব আলাপ ছিল আমাদের সঙ্গে। একরাত্রিতে দেখি থানা অফিসের দিককার আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আগুন লেগেছে সেখানে। লোকজনের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে এতদূর থেকেও। এসব জিনিস তখন চতুর্দিকে অষ্টপ্রহর ঘটছে। আমরা কল্কিদেবকে ঘিরে বসে আছি তাঁর ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়। এতগুলি লোকের মনে সেই এক চিন্তা। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। শব্দটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে! সওয়ারহীন সাদা ঘোড়াটা এসে ডাকল। ওভারসিয়র আত্মা-রামের ঘোড়া ভয় পেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে পালিয়ে এসেছে আমাদের আস্তাবলের তার চেনা বন্ধুর কাছে।

নিজের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কারও মনে আর কোন সংশয় নেই। দেবদত্ত অশ্ব! সময় এসে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছরের জল্পনা-কল্পনার নিরসন হয়েছে। আর কি এখন বসে থাকলে চলে! শাস্ত্রের বিবরণ অনুযায়ী কল্কিদেবকে সাজান হল।

দুর্বৃত্তদের দল আসছে! মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। জিগিরের ধ্বনি কানে আসছে। আমরাও প্রস্তুত। ওরা সংখ্যায় আমাদের দশগুণ; তাতে কি হয়েছে!! জয় ভগবান কল্কি অবতারের জয়! ওদের আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে থাকব কেন? তিন মাসের শিশু কোলে নিয়ে এক মা চলেছেন এগিয়ে। কিশোরীর দল নিঃশঙ্ক। আট বছরের ছেলেটা পর্যন্ত হাতে একটা লাঠি নিয়েছে। ভয় কিসের; কল্কিদেব রয়েছেন সঙ্গে! কল্কিদেব চলেছেন আগে আগে; দলের সকলে রয়েছে তাঁর পিছনে। সকলের শঙ্কাহীন মুখমণ্ডলে স্থির-বিশ্বাসের দ্যুতি। বহুঈপ্সিত চরম মুহূর্ত এসে গিয়েছে। জয় কল্কিদেবের জয়!

হাতে জ্বলন্ত উল্মুক অসি; দেবদত্ত ঘোড়া ছুটিয়ে বায়ুগতিতে এগিয়ে গেলেন কল্কিদেব। অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ হ'ল একসঙ্গে। বিকট উল্লাসের গগনভেদী চীৎকার শোনা গেল। বলবার আর কিছু নেই। কল্কিদেবকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছি। সব কিছু ভুলে সকলে মিলে ছুটেছি তাঁর দিকে। কিন্তু পৌঁছতে পারলুম কই তাঁর কাছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।"

বৃদ্ধ কাঁদছেন। বুকিণীও কাঁদছেন। কাঁদছেন এক বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায়।

বৃদ্ধের উরুতে গুলি লেগেছিল। জ্ঞান হবার পর নিজেকে দেখেছিলাম এক সরকারী ক্যাম্পে। তারপর কেমন করে এদেশে ফিরলেন সেসব কথা এখানে অবান্তর। তবে সম্ভলের মেয়েপুরুষ কেউ বেঁচেছিল কিনা সে খবর তিনি আজ পর্যন্ত পাননি।

শুনতে শুনতে, নিজের অজ্ঞাতে এই ধর্মান্ধ বৃদ্ধের একমুখী চিন্তার আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমিও। লোকটি নিজের সন্তানসন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্ব কারও মৃত্যুর জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি। তাঁর দুঃখ তাঁদের নিরলস তপস্যায় গ্লানিকর নিষ্ফলতায়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হতে পারে না। তবে কেন এমন হল? তিনি জানেন এ ব্যর্থতা সাময়িক। মহাজনদের আরব্ধ কাজ মধ্য-পথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। যে মহান কর্মের গুরুদায়িত্ব একদিন তাঁর উপর পড়েছিল সে কাজ যতদিন বাঁচবেন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। নূতন করে গড়ে তোলবার শক্তি এখনও তাঁর আছে। তবু তাঁর মনে সংশয় জেগেছে। কেন এমন হ'ল?

পাগলামি সংক্রামক ব্যাধি কিনা জানি না। একরাত্রির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসে আমারও মনে হতে আরম্ভ হয়েছে, কলির শেষ এসেছে কিনা নির্ণয়ে হয়ত এঁদের ভুল হয়েছিল। তাই হয়ত তাঁদের চেষ্টা এখনকার মত ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধকে বলি—"ওদিককার ধেনুরা ছাগতুল্য নয় কিনা—হয়ত সেইজন্য....."

উর্মি আমার হাত চেপে ধরছেন কৃতজ্ঞতায়। মিথ্যা স্তোকবাক্যের চেয়ে বেশী কিছুর সন্ধান পেয়েছেন আমার গলার স্বরে। কথাটা নিশ্চয়ই তাঁরও মনে হয়েছে বহুবার।

পরের দিন সকালের ট্রেনেই অযোধ্যা ছেড়েছি। পালিয়ে বেঁচেছি। ভেবে রেখেছি কয়েক বছর পর একবার কপিলাবস্তু দেখতে যাব। আমার ধারণা, বৃদ্ধ সেখানে সম্ভল নামের এক নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করবেন। কল্কিদেবকে যে এ পৃথিবীতে আনতেই হবে। যাদের মাথায় এই গুরুদায়িত্ব তারা কি কখন নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে!

প্রবাদ-রত্নাকর

বাংলা প্রবাদ রচনাদির সুবৃহৎ অভিধান

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম-এ, বি-এল

বোর্ড বাঁধাই, ডিমাই, পৃঃ সংখ্যা ১২৮

মূল্য ১৫·০০ টাকা

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স লিঃ

১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

কলিকাতা—১৩

আগুন ও চোর ডাকাতের হাত থেকে

মূল্যবান সম্পদ বাঁচাতে হলে···

ল'জ

ষ্টীল ফার্ণিচার

সেফ • আলমারী • ফাইলিং ক্যাবিনেট

• টেবিল • চেয়ার •

ল'জ ষ্টীল ফার্নিচার

২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬

মহারাণী

বিমল মিত্র

মহারাণী কলকাতায় আসছেন। মহারাণী মানে নাহরগড় স্টেটের খাস মহারাণী। নাহরগড়ের যুবরাজ বিন্ধ্য প্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি সেখানেই চলে গিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে আজ প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। আসলে মহারাণী সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। নেহাৎ পাঁচ-পাঁচী। ডাক নাম ছিল গৌরী। গৌরী দেবী নামটাই ছাপানো হচ্ছে কার্ডে।

মহারাণী এত দিন পরে কলকাতায় আসছেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় মহারাণীর একটা ছিল জানতাম। মার্লিন প্লেস না কোথায় একটা পালেস ছিল। সারা বছর ফাঁকাই পড়ে থাকতো। বিরাট বাড়ি শুনেছি সেটা। বাড়ি, বাগান, চাকর, মালী সবই ছিল, শুধু মালিক ছিল না। মালিক থাকতো ছোটনাগপুরে, নিজের রাজ্যে।

টেলিফোন পেয়ে তাই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনি কি মিস্টার মিত্র?

বললাম—হ্যাঁ, কথা বলছি—

বোধ হয় ভদ্রলোক মহারাণীরই নায়েব-গোমস্তা-সেক্রেটারি কেউ হবেন। সম্পত্তিদেখা শোনা করেন।

Shyamal Sen

বললেন—মহারাণী বুধবার সন্ধ্যা-বেলা কলকাতায় আসছেন, চার ঘণ্টার জন্যে, রাত্রেই আবার চলে যাবেন সুইজারল্যাণ্ডে—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এত বছর পরে গৌরী দেবীর সঙ্গে যোগ-সূত্রটা ঠিক তাড়াতাড়িতে ধরতে পারিনি।

—আপনি বিকেল পাঁচটার সময় এলেই চলবে, পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা আপনাকে টাইম দিয়েছেন—

আমি রাজি হলাম। রাজি না হবারও কারণ ছিল না। রাজি না-হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ গৌরী দেবীকে আমি ভাল করেই চিনে নিয়েছিলাম।

তখনকার দিনে গৌরী দেবীর বেশ নাম ছিল। এখনকার লোকে সে-নাম ভুলে গেছে। সে যুগেই দু'একটা ছবিতে ভাল অভিনয় করে নাম করেছিলেন গৌরী দেবী। 'ঋষির প্রেম' কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিম্বা 'পুরাণ-ভকত'এ ভাল পার্ট করেছিলেন। সবে তখন টকী সুরু হয়েছে। এক-একটা ছবি আসে আর আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। টিকিট-ঘরের জানালা-দরজা ভাঙা-ভাঙি হয়। রাণী-বালা, জোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশ-গুপ্তার যুগ তখন। সেই যুগেই অবশ্য কয়েকটা ছবি করলেই গৌরী দেবী একেবারে ফিল্ম-স্টার হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ গৌরী দেবী একদিন ফিল্ম লাইন থেকেই একেবারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এ-গল্পের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই।

বলতে গেলে গৌরী দেবীর সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ। আমি তখন সেই বাচ্চা বয়সে একটা নাটক লিখে ফেলেছিলাম। একেবারে আস্ত তিন অঙ্কে সমাপ্ত সম্পূর্ণ একখানা নাটক। কাঁচা বয়সের লেখা হোক আর যাই হোক, নাটকখানা পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের ভাল লেগেছিল। সামাজিক বিষয়-বস্তু। নাম দিয়েছিলাম 'ত্রিভুজ'। ক্লাবে আমি ছিলাম সব চেয়ে কম বয়সের ছেলে। বড়োরাই পান্তা। নিজের মাস্টারমশাই আসতেন সন্ধেবেলা, তাই রিহার্শলে কোনও দিন যেতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় ছিল না। শুধু অতুলদার কাছে শুনেছিলাম বিখ্যাত অভিনেত্রী গৌরী দেবী হিরোইনের পার্ট করতে রাজি হয়েছেন। অতুলদাই ছিল ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি। অতুলদা অমলা-মার্কা লোক। অতুলদাই চেষ্টা করে বড় বড় লোককে ক্লাবে আনতো। তখনকার দিনে মেয়র-শেরিফ-লাটসাহেব কাউকেই স্টেজের কাংশনে আনতে বাকি রাখেনি অতুলদা। সেই অতুলদা যে আমার নাটকে গৌরী দেবীকে হিরোইনের পার্ট করতে রাজি করাতে পেরেছে, তা শুনে আমি খুব বেশি অবাক হয়নি। শুনে আনন্দ হয়েছিল খুবই নিশ্চয়। ভেবেছিলাম ডি-এল-রায়ের মত কি গিরীশ ঘোষের মত না-হোক, একটা ছোটখাটো নাটকার আমি বড় হয়ে হবোই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতুলদা এল বাড়িতে।

বললে—ওরে, একটা প্রব্লেম হয়েছে—।

আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়ে-ছিলাম। তাহলে কি আমার নাটক হবে না?

—না তা নয়, গৌরী দেবী বলছেন ওই লাভ-সীন্‌টা ঠিক লেখা হয়নি। ডায়ালগ্‌গুলো পছন্দ হচ্ছে না ওঁর—

—তাহলে কী হবে? শেল করবেন না উনি?

অতুলদা বললে—কিছু বুঝতে পারছি না।

জিজ্ঞেস করলাম—উনি কী বললেন?

—জিজ্ঞেস করলেন ড্রামাটিস্ট্‌ কে? আমি তোর নাম করলুম। তখন উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—ড্রামাটিস্টের বয়েস কতো? আমি তোর বয়েসটাও বললাম। বললাম—সেকেণ্ড ইয়ার স্টুডেণ্ট্‌—

—শুনে কী বললেন?

—শুনে গৌরী দেবী বললেন—হাউ সম্বন্ধে এর কোনও আইডিয়াই নেই—

—কেন?

অতুলদা বললে—তা কিছু বললেন না। আমি তো অতো বড় আর্টিস্ট্‌কে মুখের ওপর কিছু বলতে পারি না। তখন আমি বললাম—এখন কী করা যায় বলুন? শুনে গৌরী দেবী বললেন—ড্রামাটিস্ট্‌কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি তার সঙ্গে একটু ডিস্‌কাস্‌ করবো—

খানিক থেমে অতুলদা বললে—তুই এক কাজ কর, তুই একবার গিয়ে দেখা কর গৌরী দেবীর সঙ্গে— গিয়ে ডিস্‌কাস্‌ করে দ্যাখ্‌ না কী বলেন!

বললাম—আমি একলা যাবো?

—হ্যাঁ, তুই একলাই যা—আমার যাওয়া ঠিক হবে না। যা-যা বলেন তাই-তাই-ই করা যাবে, অতো বড় আর্টিস্ট্‌ যখন পাওয়া গেছে তখন ওর টেস্ট্‌ মত নাটক বদলালে ক্ষতি কী?

—বাড়ির ঠিকানা কী?

অতুলদাই ঠিকানা বলে দিয়ে-ছিল। অতুলদাই বলতে গেলে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। দিন-ক্ষণ ঠিক করে আমি একদিন গিয়ে হাজির হলাম গৌরী দেবীর বাড়ি। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডের ওপর বাড়ি। তখন আনোয়ার শা রোড আরো জঙ্গল-ভর্তি ছিল। সামনে নিউ থিয়েটার্সের দু নম্বর স্টুডিও। আমি সেই স্টুডিও বাঁয়ে রেখে আরো কিছু দূর গিয়ে ডানহাতি একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরের বাগানে ঢুকে পড়লুম।

গৌরী দেবীকে সশরীরে কখনও দেখিনি। সিনেমায় দেখা ছিল। চাকর দরজা খুলে দিতেই আমি আমার নাম বললাম। চাকরটা আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়িংরুমে বসালো। বেশ সাজানো ঘর। চারদিকে পারিপাটি আসবাব। দেয়ালে গৌরী দেবীরই কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো।

একটা সোফার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলাম। চাকরটা পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

ভাবছিলাম জীবনে কখনো কোনও এ্যাক্ট্রেসের বাড়ি ঢুকিনি। এরা কী-রকমভাবে কথা বলবে আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে তারও অভিজ্ঞতা ছিল না। তা ছাড়া, বহুদিন বহুরাত পরিশ্রম করে নাটকটা লিখেছি। এর অভিনয় না হলে সব পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। আর গৌরী দেবী অভিনয় না করলে শেষ পর্যন্ত এ-নাটকের অভিনয় হবে না। পাড়ার ক্লাবের লোকেদের নাটকটা আকর্ষণ নয়, আকর্ষণ হলো গৌরী দেবী। নাটকের তো অভাব নেই বাঙলা ভাষায়। শেষ পর্যন্ত আমার নাটক না নিয়ে হয়ত অন্য কোনও নাটক পছন্দ করে বসবে। গৌরী দেবীরই কোনও পছন্দসই ড্রামাটিস্টের নাটক! সেই গৌরী দেবীই অভিনয় করবেন, ক্লাবও থিয়েটার করবে, মাঝখান থেকে আমিই শুধু বাদ পড়ে যাবো।

হঠাৎ যেন নাকে এসে সেন্টের গন্ধ লাগলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা ওড়াতে ওড়াতে ঘরের ভেতরে এসে হাজির হলেন গৌরী দেবী।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করলাম।

গৌরী সামনের সোফাটায় বসলেন—বললেন—বোস তুমি—

চেয়ে দেখলাম সেজেগুজেই এসেছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত।

বললাম—আমাকে অতুলদা পাঠিয়ে-ছেন আপনার কাছে, আমার একটা

তুমি, ওঁদের চোখে দেখা করছে, আপনি বলেছিলেন একটা সীন্ নিয়ে একটু ডিসকাস করবেন আমার সঙ্গে—

গৌরী দেবী বললেন—একটা সীন্ নয় পারো তুমি এই আমার আপত্তি—

আমি ভয় পেয়ে গেলাম কিছু বলে আমার মুখ দিয়ে বেরোল না।

গৌরী দেবী আবার বললেন—হাঁ, ওদের আঁকা বর্ণনা, কিন্তু তুমিটাই আমার ভালো লাগেনি—ওটা তুমি হয়নি—

বললাম—কেন? ও-কথা বলছেন কেন? ওরা তো সবাই ভাল বলছেন—

—ওঁরা বলুন গে, ওঁরা তোমার মুখ-রক্ষা কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমি তো আর্টিস্ট, আমি তো বুঝি কীসে তুমা হয় আর কীসে তুমা হয় না—

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম গৌরী দেবীর মুখের দিকে। আমি এখানে আসবার সময় আশাই করিনি এমন হতাশ করবেন আমাকে গৌরী দেবী

বললাম—কোন্ জায়গাটায় ডিফেক্ট আছে আপনি যদি বলে দেন তো আমি সেটা সংশোধন করতে পারি,—

গৌরী দেবী বললেন—সংশোধন করলেও হবে না—প্রথমেই ভুল—

এর পর আর আমার কোনও কথা বলবার রইল না।

গৌরী দেবী বললেন—প্রকাশ তোমার নাড়ু সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই ওভাবে প্রেম হয় না— বিশেষ করে নায়কের—

'অভিজ্ঞতা করলাম—কিন্তু.....

গৌরী দেবী বাধা দিয়ে বললেন—যে ভিনিস সম্বন্ধে তোমার একদম পিরিয়েন্স নেই তা নিয়ে ঘোরা কেন তোমরা? আর তুমি একলা নও অনেক অনেকের চোখাতেই এটা দেখেছি—কেউ লিখতে জানে না—

বললাম—কোনটা সম্বন্ধে বলছেন?

—ওই নাড়ু সম্বন্ধে! প্রেম সম্বন্ধে! তোমার বয়েস কতো?

বললাম—উনিশ!

—উনিশ বছর বয়েসে কতটুকু জানা সম্ভব! তাও মেয়ের সঙ্গে মিশেছো? এক মা-বোন ছাড়া সংসারে কার সঙ্গে মেলবার সুযোগ হয় তোমাদের?

আমি স্বীকার করলাম যে, সে-সৌভাগ্য আমার হয়নি। মা ছাড়া আমি আর কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি। তা ছাড়া আমার নিজের বোনও নেই। সোজা কথা বলতে কী, আমাদের দেশে মেয়েদের সঙ্গে মেলবার সুযোগই ছিল না এতকাল অবধি।

—তবেনে? তোমার 'বিচ্ছু' নাটকে হিরোইনকে কারোর অপরূপ রূপসী, আর হিরোকে কারোর আগুনে হাঁদা-ভোঁদা হতে। সে হিরোকে হিরোইন কী করে ভালবাসতে? রূপ নাকচ করে দিলে তাহলে নায়িকা তাকে ভালবাসতে পারে?

—কিন্তু রূপোত্তীর্ণ কি কিছু হয় না? স্রষ্টা কি কোনও সৃষ্টিকে ভালবাসে না? আর ওয়ার্ডসওর্থ কবে তো পড়েছি কোন্ ভিক্ষুক ভিখিরি নাকি তাঁকে ভালোবাসতে!

গৌরী দেবী কেন চটে গেলেন।

বললেন—দেখ, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক তোলো না। ভগবানের দৃষ্টি আর ফটোগ্রাফারের দৃষ্টি কি এক? নষ্টকে কি ভগবান ক্ষমা করেন?

আমি আর কিছু বলিনি গৌরী দেবীকে। কিন্তু মনে মনে এর জবাব তো জানতাম না। এখানেও কোনও জবাব

মায়েদের চির আদরের
বীরেন ও গৌরী
মার্কা কড়াই ব্যবহার করুন
ডি,এন,সিংহ এ্যাণ্ড কোং
১৬১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-৬৮২৬
প্লাম্বিং এবং স্যানিটারী বিভাগ ও শো-রুম-
৩৮, ৩৯/১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৪-৪৭৫৭
১৪৪ কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন ৪৬-৪৬৫৩
- হেড অফিস -
৬৪, সীতানাথ বসু লেন, সালকীয়া, হাওড়া। ফোন: ৬৬-২৩৪৮ 3 ৬৬-৩৫৭৭

আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আর তখন আমি এত ছেবে-চিন্তে লিখিনি। নাটক লিখবো বলেই নাটক লিখেছি। বেশ জমাটি হলেই হলো, শেষ পর্যন্ত সাস্‌পেন্স থাকলেই হলো, তার বেশি আর কিছু জানতাম না।

বললাম—তাহলে কী করবো?

নাটকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ও তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে মনে করো!

বললাম—আর কি আমার উৎসাহ হবে? খুব ইন্‌স্পিরেশন্ নিয়ে লিখেছিলাম, আর ওঁরাও বললেন শো করবেন, তাই দু'মাস রাত জেগে লিখে ফেলেছিলাম—

গৌরী দেবী বললেন—কিন্তু আমি তার কী করবো! আমি তো বলছি শো করতে পারি আমি যদি হিরোকে খুব বিউটিফুল দেখতে করে দাও! ও হয় না, কোনও ইয়ং মেয়ে ও-রকম খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারে না! ও রকম চেহারা দেখলে আমার মুখ দিয়ে প্রেমের কথা বেরোবে না!

বললাম—কিন্তু শো করলে আপনি দেখতেন খুব হাততালি পেতেন, ভলকানের সিম্‌পাথি পেতেন—

—না না না, আমি তো বলেছি, জীবনে যা আর্টে অসুন্দর জিনিসের ঠাঁই নেই! খোঁড়া লোক দেখলে আমার গুলী করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে—খোঁড়া লোককে কি কুঁজো লোককে আমি দেখতে পারি না—

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—রাস্তায় খোঁড়া ভিখিরি দেখলেও আপনার মায়া হয় না?

গৌরী দেবী বললেন—রাস্তার ভিখিরিকে কি আমি ভালবাসি? তার সঙ্গে কি আমার ভালবাসার সম্পর্ক? তার দিকে তো একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেই হলো! কিন্তু স্বামী? খোঁড়া স্বামীকে আমি কী করে ভালবাসবো? তার দিকে চেয়ে দেখতেই যে আমার ঘেন্না হবে! তুমি তো শেষ দৃশ্যে তাদের বিয়ে হলো দেখিয়েছ—অ্যাবসার্ড! একেবারে অ্যাবসার্ড! আর্টের এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট বলে তোমার নেই—! তুমি অন্য নাটক লেখো কিংবা হিরোকে সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর করে দাও, আমি প্ল্যাড্‌লি শো করবো!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর অত কথা থাক্, এই যে তুমি, তুমি তো সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে খোঁড়া ছেলেটার চূড়ান্ত প্রেম দেখিয়েছো, তুমি নিজে কোনও খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারবে? খোঁড়া মেয়েকে দেখলে তোমার প্রেম জাগবে? বলো, উত্তর দাও—

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—অরে নাটক লেখা যদি অত সোজা হতো তো বাঙলা দেশে কেউ আর বাদ থাকতো না, সবাই প্লেমাটিস্ট্ হয়ে যেতো—

আমার আর কোনও কথা বলবার রইল না। আমি চুপ করে রইলাম। গৌরী দেবীর শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল, আর বার বার তিনি সেটাকে তুলে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম আবহাওয়া, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দুজন, সেই কম বয়েসের চোখ দিয়ে গৌরী দেবীকে যে-রকম সুন্দরী দেখেছিলাম, পরে আর কখনও কোনও মেয়েকে আমার চোখে অত সুন্দর মনে হয়নি। পায়ের আঙুলের নখগুলো রং করা, হাতের নখগুলোও রঙিন। গাল ঠোঁট শাড়ি ব্লাউজ সবই রঙিন। সেদিন গৌরী দেবী আমার জন্যে অনেকখানি সময় নষ্ট করেছিলেন। সে-জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু গৌরী দেবীর মতের সঙ্গে আমি মতে মিলতে পারিনি! সৌন্দর্য কি শুধু বাইরের জিনিস? ভালবাসা কি সত্যিই দেহ-নির্ভর? তাহলে মন নিয়ে কেন এত মারামারি? আমার সেই অল্প অপরিণত বয়েসেই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, গৌরী দেবীর কথা সত্য নয়। গৌরী দেবী বড় আর্টিস্ট্ হতে পারেন, কিন্তু নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতটাই শেষ মত নয়!

গৌরী দেবী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন—আমার আবার এখুনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—

আমিও দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। বললাম—তাহলে অতুলদাকে গিয়ে কী বলবো?

—বোল, ও নাটকে আমি শো করবো না।

—কিছু কারণ বলবো?

গৌরী দেবী বললেন—হ্যাঁ তাও বলতে পারো, বোল খোঁড়ার সঙ্গে প্রেম হয় না, খোঁড়াকে ভালবাসা যায় না,—

এর পরে আমি আর দাঁড়াইনি। আমি তাঁকে নমস্কার করেই চলে এসেছিলাম সেদিন গৌরী দেবীর বাড়ি থেকে। আমার জীবনে নাটক লেখার সেই প্রয়াসের সেখানেই ইতি হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আসতেই অতুলদা বললেন—কী রে, কী হলো?

সব বললাম। নাটক হয়নি। নাটক লেখাতেই গোলমাল আছে। যা-যা গৌরী দেবী বলেছিলেন সব খুলে পরিষ্কার করে বললাম।

সব শুনে অতুলদা বললেন—বড় ভাবিয়ে তুললে, এতদূর প্রগ্রেস করে এখন পৌঁছিয়ে যাওয়া, বড় মুস্‌কিলে ফেললে দেখছি।

বললাম—আপনারা অন্য শো ধরুন না—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই-ই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা চলতি নাটক ধরে শো করা হয়েছিল। গৌরী দেবী তাতে শো-ও করেছিলেন। হাততালি পেয়েছিলেন খুব, ভালিফ পেয়েছিলেন খুব। অত বড় আর্টিস্ট্, তিনি যে দয়া করে একটা অ্যামেচার ক্লাবের শো'তে নেমেছিলেন তাতেই সমস্ত লোক ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। শুধু আমি সে-শো দেখতে যাইনি। দেখতে যাইনি অভিমানে নয়, ক্ষোভে। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হলো বলে নয়, আমার শিল্প-প্রচেষ্টার কদর্থ হলো বলে। সবাই জানলো এবং বিশ্বাস করলো আমার নাটক নাটকই হয়নি। সবাই বুঝলো আমি নাটক লিখতে পারি না। নাটকের এ-বি-সি-ডিও আমি জানি না। ক্লাবের রিহার্শালে এসেই গৌরী দেবী সকলকে সে-কথা বলে গিয়েছেন শুনলাম। আমি ক্লাবের সকলের চোখে সেদিন থেকে ছোট হয়ে গেলাম। বলতে গেলে সেদিন থেকে আমি ক্লাবের সঙ্গে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

এরপর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে-ক্লাবও উঠে গেছে। গৌরী দেবীও সিনেমা-থিয়েটার লাইন থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশগুপ্তার মত গৌরী দেবীও অভিনেত্রী-জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু বড় হঠাৎ। ঠিক উঠতির সময়ে। পরে শুনেছিলাম নাহারগড় স্টেটের যুবরাজ বিশ্বপ্রসাদ সিং-কে বিয়ে করে ফেলে তিনি নাহারগড় স্টেটের রাণী হয়ে গেছেন। ছোটনাগপুরের বিরাট স্টেট্ নাহারগড়। কোটি টাকার রেভিনিউ স্টেটের। নানা রকম কথা ছড়ালো। একজন বললে গৌরী দেবী দল-বল নিয়ে থিয়েটার করতে যান নাহারগড়ে, সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। যুবরাজ বিশ্বপ্রসাদের নজরে পড়ে যান গৌরী দেবী। মহারাজার আপত্তি সত্ত্বেও গৌরী দেবীকে তিনি বিয়ে করে বিলেতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এ-সব অনেক বছর আগেকার কথা।

এর পর স্টেট্ মহারাজার হাতছাড়া

নিশাদ বাগ

অরুণ ঘোষ

হয়ে গেছে। মহারাজাও মারা গেছেন। কিন্তু স্টেটের যা প্রপার্টি তার সবটুকু ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট নিতে পারেনি। বহু সোনা, বহু জুয়েলারী সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বাপ মারা যাবার পর বিন্ধ্যপ্রসাদ মহারাজ হয়েছেন। গৌরী দেবীও মহারাণী হয়েছেন। নাহারগড়েই নিয়ে প্যালেস তৈরি করেছেন। এয়ার-কণ্ডিশনড্ প্যালেস। তারপর এইবার,—এই গেলবারে জেনারেল ইলেকশনের সময়—মহারাজা নাহারগড় থেকে পার্লামেণ্টের ক্যাণ্ডিডেট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে এম-পি হয়েছেন। এ-সব খবর সে-সময় খুব শুনেছিলাম। শুনেছিলাম গৌরী দেবী নাকি প্রজাদের প্রত্যেকের বাড়িতে পায়ে হেঁটে গিয়ে গিয়ে ভোট চেয়ে চেয়ে বেড়িয়েছেন। যে-মহারাণীকে প্রজারা জীবনে চোখে দেখেনি, সেই তাঁকেই কষ্ট করে ভোট চাইতে দেখে প্রজারা কেঁদে ভাসিয়েছিল। প্রজারা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল ধন্য হয়ে গিয়েছিল মহারাণীমার কষ্ট দেখে। সেই সব ছবি কিছু কিছু বোম্বাই-এর ইংরিজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল।

তা এতদিন পরে সেই মহারাণী কলকাতায় আসছেন। সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পথে। আর আমাকে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন, এতে আমার কৃতার্থ হবারই কথা। কিন্তু তবু আমি মনে মনে কৃতার্থ হতে পারিনি। আমার নাটক লেখা হয়নি বলে নয়। জীবন সম্বন্ধে আমার বোধই বদলে গিয়েছিল এই ক'বছরে। বাঙলা দেশে এখন লোকে আমাকে গল্প-উপন্যাস লেখক বলে জানে। কিন্তু সেদিন সেই গৌরী দেবীর দেওয়া আঘাত আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। নাট্যকার হতে পারিনি বলে তবে কি আমার মনে ক্ষোভ আছে? এখনও কি আমি নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারিনি?

দেখা হলে মহারাণী আর কী-ইবা বলবেন আমাকে? কীই বা বলতে পারেন?

বড়জোর সবাই যেমন মাতব্বরি করে সেই রকম দু'চারটে মাতব্বরির কথা বলবেন। আমার লেখার কী দোষ-ত্রুটি তাই-ই খুঁটে খুঁটে বলবেন। কোন্ লেখককে এ-দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি তা তো জানি না। একমাত্র হোমার আর বাল্মিকী ছাড়া পৃথিবীর সব লেখককেই সমালোচকের দুঃসহ-কটূক্তি শুনতে হয়েছে। যে লেখক সমালোচককে ভয় করে তার লেখাই উচিত নয় এই সিদ্ধান্তই জীবনে পাকা করে নিয়েছি।

তাই গৌরী দেবীর নিমন্ত্রণ পেয়ে তৈরি হয়েই গেলাম।

বৃদ্ধবার। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। ঠিকানা মিলিয়ে মার্লিন গেটে গিয়ে পৌঁছালাম। গেটে দরোয়ানের কাছে নাম ধাম কুলুজী দিলাম।

দরোয়ান সে আমাকে ভেতরের পার্লারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর ভেতরে গিয়ে খবর দিল। আমি চুপ করে বসে বসে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। বাগানের তেমন শ্রী নেই। মহারাজ বা মহারাণী কেউই কলকাতায় কখনও আসেন না। বছরের অর্ধেকটাই কাটে বাইরে। এবারই মহারাজা এম-পি হওয়াতে দিল্লীতে আছেন। চাকর-বাকর-মালী কেউই তাই মন দিয়ে কিছু কাজ করে না।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ মতন লোক সশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—আপনি এসেছেন? এই আধঘণ্টা হলো মহারাণী এসেছেন, এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—

হঠাৎ বাইরের বাগানের দিকে একটা লক্ষ হতেই চেয়ে দেখি নতুন উর্দি-পরা চাকর একটা ছোট ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বছর চারেক বয়েস হবে। ফুটফুটে ফর্সা চেহারা। চমৎকার দামী সাজ-পোষাক।

জিজ্ঞেস করলাম—ও কে? কার ছেলে?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের মহারাজকুমার, মহারাণীর এই প্রথম ছেলে, একটিই হয়েছে—

কী রকম যেন ভূত দেখতে লাগলাম চোখের সামনে।

ভদ্রলোক বললেন—মহারাজকুমারকে নিয়েই মহারাণী সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছেন, অপারেশন করতে—

অপারেশন করতে! দেখি ছেলেটা খোঁড়াচ্ছে। একটা পা সোজা কিন্তু আর একটা পা ত্রিভঙ্গ হয়ে বেঁকে গেছে। সেই খোঁড়া পায়ে বেড়াতে গিয়ে বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করতে হচ্ছে ছেলেটিকে। বড় করুণ, বড় কষ্টকর সে দৃশ্য।

ভদ্রলোক বললেন—আমি খবর দিচ্ছি মহারাণীকে—

বলে ভদ্রলোক আবার ভেতরে চলে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো আমার নাট্যকার হওয়া হয়নি, তা না হোক। কিন্তু আমার সেদিনের সেই আঘাতের প্রতিশোধ ঈশ্বর এমন করে নিলেন কেন? আমি তো এ চাইনি! তাই তো এ কল্পনাও করতে পারতুম না। গৌরী দেবী কি এই খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারবেন? নিজের পেটের সন্তানকে তিনি ঘৃণা করে যাবেন? তবে কেন সুইজারল্যাণ্ড নিয়ে যাচ্ছেন অপারেশন করবার জন্যে? তাকে সুস্থ-সুন্দর করে তোলবার জন্যে? সুইজের ডুখ আর ডিটারেচারের ডুখ কি সত্যই ভালো? ডিটারেচার কি সত্যই সুইজের কার্ল-মার্ক্স নয় তাহলে?

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে নামলাম। তারপর গেট্ পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। রাস্তায় নেমে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। মহারাণীর পরাজয় যেন আমারও পরাজয়। গৌরী দেবীর এ-লজ্জা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতুম না। আমি রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিরাপদ হয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি পেলাম।

NAVY BOY
CONDENSED MILK
বাজারের সেরা

প্রস্তুতকারক :
নিও প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া)
১৮বি, সুকিয়াস লেন, কলিঃ—১
ফোন : ২২-৭১৭৪

একমাত্র পরিবেশক :
লর্ড এজেন্সী হাউস
১১নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১
ফোন : ২২-৬১০৪
২২-১১২১

অনাদি আর বিশু প্ল্যানশেটে বসবে এই রকম মতলব করছিল।

অনাদি বলছিল, প্ল্যানশেটে আত্মা আনা কি সোজা কথা? রীতিমতো সাধনা দরকার। এ সব কাজ চঞ্চলমতি বালকের জন্য নয়। মনস্থির ক'রে বসতে হবে, মনটাকে চারদিক থেকে টেনে ছিঁড়ে এনে, চেপে, একটি ছোট্ট বিন্দু বানাতে হবে, তবে তো তার আত্মিক আকর্ষণ বাড়বে? আজ দু বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রে পারিনি। অন্তত দু'জনের একাগ্রতা দরকার।

বিশু বলছিল, ঐ খানেই তো ভাই মুশকিল, মনটাকে কোনো মতে কোনো একটা আত্মার চিন্তার মধ্যে আটক রাখতে পারছি না।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সব সময় একটা উড়ুউড়ু ভাব। কোনো একটা দেহের মধ্যে মনটাকে আটকাবার ফন্দিতে আছ।

কি যে বল অনাদি!

ঠিকই বলি। প্রেমে পড়েছ। দেহের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছ, আত্মার কি দাম এখন? সেও আবার কোনো এক মৃত আত্মীয় বা বন্ধুর আত্মা। কি বল? ভাস্তর স্মৃতির মধ্যে ভাস্তর সাঁতার কাটা, তার দাম কত বেশি! কি বলছে ভবনাথ?

পরিমল গোস্বামী

ভবনাথ, অর্থাৎ আমি, একটু দূরে বসে একখানা বিদেশী সাপ্তাহিক পত্র পড়ছিলাম। পড়া হ'ল না। উঠে এলাম আসন থেকে। বললাম, প্রেমের কথা কি বলছিলে? দু'গজ দূরে প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে কি পড়ায় মন যায়?

অনাদি বলল, প্ল্যানশেটে বসতে চাই, কিন্তু এই হতভাগা বিশুটার সঙ্গে বসলে কোনো ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। বর্তমানে ওর মতিস্থির নেই। প্রেমে পড়ে গোল্লায় গেছে।

এই কথা? কিন্তু তাতে অসুবিধাটা কোথায়? মহাশূন্যবাসী আত্মারা

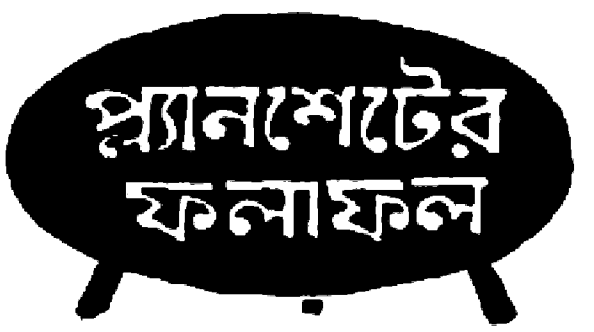

প্রেমিককে খাতির করে, প্রেমকে তুচ্ছ মনে করে না। ওকে নিয়ে বসে দেখ, ভাষা ঠিক নেমে আসবে।

না, তুমি ঠাট্টা করছ, ভবনাথ। ওকে নিয়ে বসলে কিছুই হবে না। তুমি বসতে রাজি আছ কি না বল।

আমি? না ভাই, আমি ওতে রাজি নই। ভূতের রাজত্বে বাস করছি, ভূত তাড়াতে পারলে বাঁচি, এর উপর আবার প্ল্যানচেটে বসে পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে ভূত নামাতে হবে, আমি ওর মধ্যে নেই। ভূতের কি কোনো মর্যাদা আছে যে তাকে খোশামোদ করতে হবে?

না, ঠিক সে রকম নয়। ধর তোমার কোনো বন্ধুর আত্মাকে যদি আনা যায়, এবং তার বাণী শুনতে পাও, তা হ'লে কি তোমার ভাল লাগবে না? না বলতে পারবে না। সন্ধ্যার পর এসো, তিনজনেই বসা যাবে।

পৃথিবীতে সন্ধ্যা নেমেছে। মহাশূন্যে দিন নেই, রাত নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই। মহাশূন্যের এমনি আলো-অন্ধকারহীন কোনো জায়গায় কয়েকটি বালক বসে আলাপ করছিল। তাদের আলাপের বিষয় পৃথিবী থেকে উড়ে-আসা রকেট। তাদের কাছে খুব মজার মনে হচ্ছিল এই সব শূন্যচারীদের আবির্ভাব। এমন সময় একটি বালকের দেহ একদিকে হঠাৎ খানিকটা প্রসারিত হয়ে আবার যথাপূর্ব হয়ে গেল। আমিবা নামক এক-কোষ জেলিজাতীয় প্রাণীদেহের এক একটা অংশ যেমন হঠাৎ একদিকে হাত বাড়ানোর আকারে লম্বা হয়ে আবার ফিরে আসে, এবং জেলিদেহের সঙ্গে মিশে যায়, এও তেমনি। বালকটির দেহে বার বার এই রকম হতে লাগল।

সবাই ওরা বুঝতে পারল পৃথিবী থেকে কেউ তাকে ডাকছে। বার বার দেহে টান পড়ছিল এবং শেষ বারে জোয়ারের জলের মতো উঁচু হয়ে উঠল এবং সমস্ত দেহটাই ছুটে চলল পৃথিবীর দিকে। শুধু কোনো দেশ, তা হ'লে আসি ভাই?

ঠিক এর কয়েক মিনিট আগে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো এক স্থানে নিম্ন-লিখিতরূপ ঘটনা ঘটছিল।

অর্থাৎ আমরা তিনজন সন্ধ্যার পর ড্রয়িংরুমে বসেছিলাম।

সবাই আলাদা, বই পড়ে পণ্ডিত হবার চেষ্টা আর কি। কিন্তু ফলে যা হয়েছিল ভাবলে আজও কাঁপতে থাকি। জীবনে কখনও আর এ কাজ করব না। খুব শিক্ষা হয়েছে। সত্যিই শিক্ষা হয়েছে। সুখে আছি এখন।

একটা হরতনের আকারের বোর্ডে তিনজন বসেছিলাম। একটিমাত্র পেনসিল, আমার এক হাত তাতে লাগানো।

তিনজনেই একাগ্র মনে কোনো এক মৃত বন্ধুর কথা ভাবব। ঠিক হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা যাক। তিনি আমাদের সবারই বন্ধু ছিলেন, এবং ডাকলেই আসবেন কথা দিয়েছিলেন। এমন কি না ডাকলেও আসবেন এমন ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় বারো বছর তাঁর কোনো খবর নেই।

আমার হাতে পেনসিল দেওয়ার কারণ সবার মতে আমিই নাকি মীডিয়াম হবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত, কারণ আমার মন খুব দুর্বল, এবং আমি একজন ইনফ্রেভার্ট, স্মৃতিমন্থন করে সময় কাটাই, ইত্যাদি। ওদের এই বিচার শুদ্ধ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে মেনে নিলাম।

কাজ আরম্ভ হল যথাসময়ে। ঘরের আলো নেবানো, বাইরের আলো যাতে প্রবেশ করতে না পারে জানলা বন্ধ করে সে ব্যবস্থাও করা হল। মোট কথা মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন কিছু সে ঘরে রাখা হল না, এবং বাইরে থেকে কেউ ডাকাডাকি করতে না পারে সেজন্য পাহারা বসানো হল।

বিভূতিবাবুর চেহারা চিন্তা করতে লাগলাম একাগ্র মনে। কিন্তু মনের বিচিত্র ব্যবহার। পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি তাঁর চেহারা মনের সামনে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলাম না। ভাবতে ভাবতে চিন্তা কোন্ পথে যে চলতে লাগল, তাকে ঠেকানো গেল না। অন্ধকারে চোখ বুজে ভাবছিলাম। কিন্তু যখনই একটু ভাবতে যাই, তখনই দেখি আর একটা ভাবনা। বিভূতিবাবুর কথায় মনে এলো পথের পাঁচালির কথা। তারপর অপুর কথা। তারপর আমার নিজের বালক-কালের কথা। চারদিক নিস্তব্ধ। কাছে বা দূরের কোনো শব্দ কানে আসছে না। বসেছি প্রদক্ষীপ আত্মা নামাতে। পরি-বেশ, উদ্দেশ্য, সব মিলে কেমন যেন একটা ভয়ঙ্কর ভাব, গা ছমছম করছে। কল্পনাতেই ভূত দেখতে পাচ্ছিলাম। ভয় প্রায় জমাট হয়ে আসছে তেমন। শেষে প্রাণপণে মনটাকে আত্মা-চিন্তা থেকে অন্য-চিন্তাতেই আবদ্ধ রাখতে লাগলাম।

মনের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল ভিতরে ভিতরে। আমার চেতনা বলছিল শুধু উদ্দিষ্টকে ডাকতে থাক, কোনো ভয় নেই, তিনি তোমার বন্ধু, কিন্তু অবচেতন মন আমার নিজের বয়সকালের কথা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করল, এবং আমিও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দশ মিনিটও লাগেনি। এমন সময় যা ভয় করেছিলাম তাই যেন হতে আরম্ভ করল। আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠল, সমস্ত গায়ে কাঁটা দাঁড়িয়ে গেল, শেষে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তারপর সমস্ত গা কাঁপতে লাগল। হাতের পেনসিল কাঁপতে লাগল।

আমার অবস্থা অনুমান করে সহ-যোগী বন্ধু দুজনও কাঁপতে লাগল। যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে আমার দেহে, আমাকে যারা ছুঁয়ে আছে, তাদের দেহেও তা সঞ্চারিত হচ্ছে। তবু আমাদের মধ্যে একটু বেশি ঠাণ্ডামাথা, সে জিজ্ঞাসা করল কে এসেছেন বলুন।

এমন একটি প্রশ্নে আমার সমস্ত গা ঠিম হয়ে গেল। আমারই মধ্যে বাইরে থেকে একটা আত্মা এসে ঢুকে পড়েছে, এ ব্যাপারটা খুব সুখপ্রদ নয়।

কিন্তু তবু আমার হাতের পেনসিল লাফাতে লাগল। যন্ত্রের নিচে কাগজ পাতা ছিল, লিখন চলল তার উপর।

লেখা থেমে গেল হঠাৎ। অনাদি টর্চ জেলে নাম পড়ে বলল, অসম্ভব! মিথ্যা কথা!

আমি নাম পড়ে স্তম্ভিত। দেখি আমারই নাম। এ কেমন কথা? আমি কি আধা-চেতন অবস্থায় এই নাম লিখেছি? বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে লাগল আমাকে। বলল চালাকি করেছ। এও তোমার এক ধরনের ভূতকল্প। তা-ছাড়া তেমন ভূত আসবে কোত্থেকে, তুমি তো বেঁচে আছ। তোমার হাতের লেখার সঙ্গেও এ লেখার মিল দেখছি না।

আমি বললাম, কি জানি। মিল নেই বলেই তো আরও সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন এ আমারই লেখা। বহুকাল আগে এই ভাবেই হাত লিখতাম, কিন্তু এখন অনেক চেষ্টা করলেও এ রকম লিখতে পারি না।

তারপর এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল।

পেনসিল ফেলে আমি হাসতে লাগলাম ছেলেদের মতো। তারপর লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ঘাড়ের উপর একটা ভয়ঙ্কর বোঝার চাপে কটীদেশে বড় চোট লাগল। কি একটা পিণ্ড যেন ঘাড়ের উপর চেপে বসেছে, দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ তার চাপ স্পষ্ট

অনুভব করলাম। এ এক নতুন বিভীষিকা। আমার চোখমুখের চেহারা দেখে বন্ধুরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের সন্দেহ রইল না আমাকে ভূতে ধরেছে।

কিন্তু হঠাৎ ঘাড়ের বোঝা অসহ্য করে আমি লাফাতে লাগলাম।

অনাদি বলল, এ কি ব্যাপার?

বিনু বলল, তোমার পায়ে বাত।

আমি বললাম, জানি, কিন্তু তাই লাফতে বাধা হচ্ছি। স্ফূর্তিতে লাফাচ্ছি। ঠেকানো যাচ্ছে না। আনন্দ ধরছে না।

কেন আনন্দ ধরছে না?—প্রশ্ন করল বিনু।

বোধ হয় ভূতে ধরেছে।—বলল অনাদি। বেশ চেঁচিয়ে বলল।

সবাই ছুটে এলো মজা দেখতে। অনাদিদের বাড়িতে প্ল্যানচেট বসানো হয়েছিল, দু বছর ধরে হচ্ছে, কিন্তু ভূত এলো এত দিন পরে এই প্রথম। খবর শুনে বাড়ির মেয়েরা এসে পড়ল। আমি কেমন যেন বিভ্রান্তভাবে হাসতে হাসতে বাইরে পালিয়ে গেলাম।

বন্ধুরা ছুটল আমার পিছনে। তারপর আমাকে ধরে নিয়ে এলো আমাদের বাড়িতে। তারপর ডাক্তার এলো, ওঝা এলো, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে ভূতের বোঝা নামাতে পারল না তারা কেউ। ভোরবেলা পালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

.....শেষে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

তারপর দিশাহারা হয়ে ঘুরছি। পা আর চলে না, তবু না চলে পারি না। ছোট ছেলেরা আমার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে, আমিও তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালাই। তারপর আমার খোঁজে আমার বাড়ির লোকেরা এলো আমাকে ধরতে।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বুঝতে পারছি সব, অথচ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কত বড় মুক্তির স্বাদ পাই, অথচ সর্বাঙ্গে বাধা। মনে হয় যেন নদীর ধারে ধারে চিরদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াই। বড়দের সংস্রব ভাল লাগে না। মনে হয় স্বাধীনভাবে লাফাই, গাছে উঠি, নদীতে সাঁতার কাটি, মাছ ধরি, অথচ দেহটা বয়স্ক লোকের, সেটাও বুঝতে পারি।

আমি দুটি ব্যক্তিত্বে ভাগ হয়ে গেলাম। আসলে এদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিটিই হল প্রধান। অথচ অনুতাপ নেই সেজন্য। মাঝে মাঝে সব মনে পড়ে, কিন্তু তখনই চিৎকার ক'রে গান গেয়ে উঠি, আবার সব ভুলে যাই। আবার সব মনে পড়ে।—শেষকালে কি আমারই ভূত আমাকে ধরল? কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। এই তো আমি বেঁচে আছি। তার প্রমাণ, আমি যে অনুভব করছি আমি বেঁচে আছি। তবে?

তবে এ কার ভূত? যদি অন্যের ভূত হয় তবে আমার ছদ্মনামে আমার ঘাড়ে চাপবে কেন? নিজের নামেই তো আসতে পারত। তা-ছাড়া আমার ভূত আমার ঘাড়ে চাপবে একথা পরস্পরবিরোধী।

হঠাৎ আমার কানের কাছে চাপা সুরে ভূত বলে উঠল, সন্দেহের কারণ নেই, আমি তোমারই ভূত।

এর পর থেকে সে চুপ। আর একটি কথা বলেনি। আমিও চুপ।

আমার বাড়িতে বহু লোক আসতে লাগল আমাকে দেখতে। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল অগ্নুনের মতো। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসে পড়ল। বলল, অদ্ভুত কাণ্ড। তারা যতদূর সম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ ক'রে এ খবর কাগজে ছেপে দিল।

ভূত ইতিমধ্যে আমাকে কেমন যেন নিরুৎসাহ ক'রে ফেলেছে। আমি নেশা-খোরের মতো ঝিমিয়ে পড়েছি। অতএব আপাতত ছুটে বেড়াবার উৎসাহ আর নেই। পায়ে বাতের ব্যথা খুব বেড়ে গেছে।

লোকের ভিড় ক্রমে বেশি হচ্ছে। সেই ভিড় ঠেলে ইম্প্রেজারিও অগেন রায় এসে হাজির। সব শুনে সে বলল, এর একটা বিরাট সম্ভাবনা। আমি একটা উৎসবের ব্যবস্থা করছি। আমি তিনটি লোককে বিখ্যাত করব। অনাদিবাবুকে, বিনু-বাবুকে আর ভবনাথবাবুকে। টাকাও পাবেন তাঁরা বিস্তর। সোজা ব্যবসায়িক প্রস্তাব, আমাকে শুধু ফ্রী হ্যান্ড দিতে হবে। একটি শুধু প্রশ্ন—আমি ভবনাথ-বাবুকেই জিজ্ঞাসা করছি।—ভূত কি

এখনও আপনাকে ধ'রে আছে? আই মীন, ঘাড়ে চেপে আছে?

আমি বললাম কি জানি, আচ্ছা দেখি, ব'লে অতি কষ্টে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম, এখনও চেপে আছে।

খগেন রায় বলল, ঠিক আছে। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। জীবিত লোকের ভূত স্বাধীন ভারতে এই প্রথম।

একজন রিপোর্টার নোট নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল স্বাধীনতার আগে এমন হয়েছে কি কোথাও?

ভগবান জানেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে প্রথম' বললে এর মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। 'স্বাধীন ভারতে নিজের ভূত নিজের ঘাড়ে'— দেখুন তো কেমন রোমাঞ্চকর শোনায়! ভূতের এই নতুন মনোভাব স্পিরিচুয়ালিস্টদের কাছেও নতুন বোধ হবে। ভূতের এ একটা নতুন অ্যাপ্রোচ—একেবারে অভিনব।

দেশময় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। দলে দলে লোক হানা দিতে লাগল আমাদের বাড়িতে। খগেন রায় আমাকে গোপনে সরিয়ে ফেলল খুব মজবুত নিরাপদ আশ্রয়ে। বলল আর মাত্র সাত দিন। টাকা যা হবে আপনারা তিনজনেই পাবেন, আমার শুধু টেন পারসেন্ট— শতকরা দশ। অবশ্য সব খরচের পর যা লাভ থাকবে তার।

খগেন রায় আরও একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ভূত যে আপনারই ভূত এটা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন কি?

বুঝতে পেরেছি।

ভূত কথা বলে?

মাত্র একবার বলেছিল।

আরও বলবে এমন সম্ভাবনা আছে কি?

তোয়াজ করলে বলতে পারে। কিন্তু তার কথা আমি ভিন্ন আর কেউ শুনতে পায় না যে। নীরবে কানের ভিতর চালান করে, কি কৌশলে সেই জানে।

তা হোক, কি বলে শুনে রাখুন। একটা পুরো রাত দিচ্ছি আপনাকে।

অনেক সাধ্যসাধনার পর ভূত রাত্রে গোপনে আমাকে বলল, আমারই ভালর জন্য সে আমার ঘাড়ে চেপেছে এবং সে কার ভূত তাও আমার অনুরোধে রাত্রে বলেছে।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এমন যে হতে পারে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরদিন খগেন রায়কে সব বললাম।

খগেন রায় সব শুনে স্তম্ভিত হ'ল, কিন্তু কি ক'রে এ সব কথা পঞ্চাশ টাকা, পঁচিশ টাকা, আর দশ টাকায় টিকিটে বিক্রি করা যায় সে হ'ল সমস্যা। অবশেষে একটা উপায় সে বা'র করল।

বিরাট ভিড়। টিকিট বিক্রি বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে স্থানাভাবে। লাখখানেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। টিকিট ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছে কত! যারা ভিতরে ঢুকতে পারেনি তাদের জন্য বাইরে লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—ভবনাথবাবুর ঘাড়ে তাঁর নিজেরই যে ভূত চেপে বসেছেন, সেই ভূত আজ বিদায়ের আগে অভূতপূর্ব সব স্বীকারোক্তি করবেন। ভূতের নিজ কণ্ঠেই সব শোনা যাবে। ভূতকে দেখা যাবে না, শুধু কথা শোনা যাবে। তাঁর কথা শেষ হলেই তিনি বিদায় হয়ে যাবেন। তিনি ভবনাথবাবুকে একটি বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ঘাড়ে এসে চেপেছিলেন, সে কথা তিনি নিজের ভাষায় নিজকণ্ঠে বলবেন, এমন আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড যেমন স্বাধীন ভারতে এই প্রথম, নিজের ভূত নিজের ঘাড়ে চাপাও স্বাধীন ভারতে এই প্রথম। এখন এদেশে স্বপ্নবিলাসী আর্থিং-গোরুদের স্থান নেই, সেই শিক্ষা আপনারা পাবেন ভূতের বাণীতে। অনুষ্ঠানে এ ভিন্ন নাচ-গানের ব্যবস্থাও আছে।

কিছু শিক্ষা পাওয়া যাবে শুনে বাইরের ভিড় থেকে অনেক লোক ফিরে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু সে দশ লাখের মধ্যে কয়েক হাজার মাত্র। কয়েকজন ছোকরাকেও বলতে শোনা গিয়েছিল— সিখ্‌খার ভয়ে ম্লা ইস্‌কুল ছেড়েছি, এখানেও মাইরি সেই সিখ্‌খা?

অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। প্রথমে নাচ গান। তাণ্ডব, রারবেশে, প্রভৃতি নাচ। তারপর খগেন রায়ের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

কনটেম্পোরারীর নতুন বই

একটি ফুলকে ঘিরে

প্রখ্যাত কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি অনবদ্য গল্পের সংকলন।
দাম ২·৫০

The Swami Vivekananda—A Study
By Monomohan Ganguly
স্বামীজীর সাহচর্যধন্য লেখকের নির্ভীক আলোচনা গ্রন্থ। দাম ৩·০০

মন দেউলে দীপালোক

প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর নবতম গল্প গ্রন্থ।
দাম ৩·৫০

পূজার আগেই বাহির হইবে :

উড়িষ্যার দেব দেউল

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত
গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখের অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী।

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৫ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা—৩
সিটি অফিস—১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি—১

আমাকে রাখা হয়েছিল পর্দার আড়ালে। পর্দা তুলে ফেলা হল। আমার দুদিকে দুই স্থানশেট বন্ধু অনাদি আর বিশু। তৃতীয় আরও এক পরিচিত যুবক। সে জাদুকর অতুলচন্দ্র সরকার।

আমাকে আগেই এ সব পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, তাই ও সব জানত।

পর্দার আবরণ তোলা হলে মামুলি হর্ষধ্বনি হল, সে সব কথা বলব না। যে নাচ-গান আর উদ্বোধনী বক্তৃতা হল সেও মামুলি।

এইবার ভূতের বক্তৃতা।

ভূত কিছু বলার আগেই করকে সেকেণ্ড খুনো গাঁটার বেজে উঠল। এটি প্রোগ্রামে ছিল না। কেন বন্ধ মনে মনে কারণটা বুঝতে পারল।

ভূতের একেবারে ছেলেমানুষের গলা। মনে হল একটি বালক কথা বলছে। কথাটা আসছে আমার মাথার কিছু উপর থেকে—শূন্য হতে।

চারদিকে হৈ হৈ কিসফিস।

ভূত বলতে লাগল—"ভবনাথ ও আমি যে একই বাড়ি সে কথা বিশ্বাস করুন। তবু আপাতত আমাকে পুরুষ বোধেই কথা বলছি, নইলে বুঝতে পারবেন না।

"আপনারা জানেন ভবনাথ প্লানচেটে বসেছিল। কথা ছিল সে একান্ত মনে তার এক বন্ধুর মূর্তি চিন্তা করবে। কিন্তু সে একাগ্রচিত্ত নয়। সে তার বন্ধুর সঙ্গে এক বালকের কথা ভাবতে লাগল, তারপর তার নিজের বালক-কালের কথা। সে কালকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন। অথচ সে সব সময় সেই ফেলে-আসা দিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে। সে জানে না যে তার বালককাল অনেক দিন মরে গেছে। আজ আমি ভবনাথকে ছেড়ে যাবার আগে সেই কথাটা তাকে এবং আপনাদের সবাইকে জানিয়ে যাই যে আমিই তার সেই মৃত বালককালের ভূত।"

এ কথায় সমস্ত দর্শক চমকে উঠল এবং আমিও আরও একবার চমকালাম যদিও ভূত এ কথা আমাকে বার বার বলেছে

তারপর ভূত বলতে লাগল, "এই ভবনাথ এখন বোধ হয় বুঝতে পারছে তারই ভূত তারই ঘাড়ে কি করে চাপে। নিজের বালককে ভাল না বেসে শুধু অতীতকে নিয়ে মেতে থাকা সুস্থ মনের পরিচয় নয়। ভবনাথের এটি একটি মানসিক ব্যাধি। ভবনাথ, বল দেখি এ ব্যাধির নাম কি?"

আমি বললাম, নস্‌টালজিয়া।

"ঠিক। আমি তার এই ব্যাধি সারাবার জন্যই তার পায়ে বাত থাকা সত্ত্বেও তাকে দৌড়ঝাঁপ করিয়েছি ছেলেবেলার মতো। ছেলেবেলার ভূতের শাস্তি এটি। এখন আমাকে সে ছাড়তে পারলে বাঁচে। আমা করি আমি ছেড়ে গেলে ও সুস্থ মানুষ হবে, কাজের মানুষ হবে। তা হলে এবার আসি? নমস্কার।"

আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম।

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকেরা বিদায় হল। আয়োজন কত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কত অলৌকিক। দর্শকদের বিদায় হতেই ঘণ্টাখানেক লাগল। মেয়েরা যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ভূতের কণ্ঠ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তাদের জন্য অ্যাম্বুলান্সের জোগাড় করতে হল অনেকগুলি। দর্শকদের মুখে শুধু—অদ্ভুত, অদ্ভুতপূর্ব, কল্পনার অতীত। দুচারজন অবিশ্বাসী যারা ছিল তাদের গুটিয়ে বার করে দেওয়া হল।

ভূত রাত্রে ঐ সব কথাই আমাকে বলেছিল। যখন রাত্র সব আমার কাছ থেকে টুকে নিয়েছিল। তার বাকিটা অতি পাকা। সে জানত ভূতের কণ্ঠ আর কেউ শুনতে পাবে না, তাই সে জাদুকরকে এনে বসিয়েছিল আমার পাশে। সে ভেন্‌ট্রিলোকুইজম-বিদ্যার সাহায্যে ভূতের কথাগুলো মুখস্থ করে বলে গেল। সবাই ভাবল কথাগুলো আমার মাথার উপর থেকে ভূত বলছে। তার আগে সে নিজের কিছু কৃতিত্ব প্রোগ্রামে যোগ করে ঐ বিদ্যার সাহায্যেই কয়েক সেকেণ্ড গাঁটার বাজিয়েছিল।

হাজার হাজার লোকের টিকিট কেনা সার্থক হল, তারা অদ্ভুত অলৌকিক জিনিস দেখে গেল নিজের চোখে। ভীষণ উত্তেজনার ব্যাপার।

কলা বাহুল্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য জাদুকরকেও একটা মোটা টাকার অংশ দেওয়া হয়েছিল।

আর আমার যা ছিল না তা হয়েছে। টাকা হয়েছে এবং বিয়ে হয়েছে। ভূতটা আর ডাকলেও আসে না।

CENTRAL LIBRARY

পারত্রিক

আশাপূর্ণা দেবী

বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প লিখলাম জীবনে। শুনে হাততে হাততে, মানুষ রোগাড় করলাম, তাদের গল্পে ইচ্ছেমত রং চড়ালাম, ইচ্ছেমত তাদের মারলাম কাটলাম বাঁচালাম। আবার জলজ্যান্ত সত্যি মানুষ নিয়েও কম গল্প লিখিনি।

তাদের ওপর যথেচ্ছাচার চলেনি, তারা যে যেমন রঙের সেই রঙটি সমেত পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছি, যেমন পেরেছি না পেরেছি। গল্পের নায়ক-নায়িকার উপাদান থাকে অনেকের মধ্যে, তারা যেন সাধারণ হয়েও অসাধারণ, তারা আমাদেরই মত হাসে কাঁদে খায় ঘুমোয়, কিন্তু সেই হাসিকান্নার মধ্যে থেকেই গল্প উঁকি মারে। মনে হয়, 'একে নিয়ে তো গল্প লেখা যায়।'

যেমন অমলেন্দু তরফদার, যেমন উষা-দেবী, যেমন নলিনাক্ষ, কি যেমন অমূল্যমামা। এদের নিয়ে ভেবেছি, এদের নিয়ে লিখেছি।

এমন কি বটুভাস্কর আর বিধু-ভবেরেজকে নিয়েও গল্প লিখেছি। কিন্তু কৃতান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে গল্প লিখবো, একথা কোনদিন ভাবিনি। সেদিনও যদি কেউ এসে আমায় বলতো, 'কৃতান্তকে নিয়ে লেখনা—', আমি তাকে পাগলা-গারদে যাবার পরামর্শ দিতাম, কিন্তু আজ আমিই বসেছি কাগজ-কলম নিয়ে।

বসতেই হল।

না না তা নয়। ভট্টচায আমাকে কাকুতি-মিনতি করেনি। যেমন করেছিল অমর। কৃতান্ত ভট্টাচায ওদের মত নয়, বরং ঠিক উল্টো। আমি ওকে নিয়ে গল্প লিখবো জানতে পারলে খুশি হতো না। যারা বানিয়ে বানিয়ে কতক-গুলো মিথ্যে কাহিনী লেখে তাদের মুখচক্ষে দেখতে পারে না কৃতান্ত।

আমাকেও পারে না।

দেখলেই বলে, 'এতদিন কাগজের ওপর কলম ঘসে ঘসে কী সর্বনাশ হয়? যা যা, তার চেয়ে বরং গরুর খড় কুচোগে যা। তবু বুঝবো বিশ্ব-সংসারের কিছু কাজ করছিস।'

যেন কৃতান্ত ভট্টাযের বোঝা না বোঝা নিয়েই বিশ্ব-সংসার চলছে, চলবে। তা' সে কথা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না, বরং এমন অপরাধী ভাবই দেখতে হয় যাতে মনে হয়

আমিও জানি গরুর খড় কুচোনোর চাইতে উঁচুদরের কিছু করছি না আমি।

আমার এই অপরাধীতরে অবশ্য কৃতান্ত প্রীত হয়। বলে একটা মাত্তর মিথ্যের বলে রাজা যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন ঘটেছিল। আর তোরা—এই গল্প-লিখিয়েরা, রাতদিন মিথ্যের চাষ করছিস! ছিঃ! যে জগৎ নেই, সেই জগতের ওপর ফুল কাটছিস। বলি সত্যি জগতের ওপর একটা কলমের আঁচড় কাটবার ক্ষমতা আছে? তা তো নেই? তবে আর কেন মিথ্যে...।'

কৃতান্ত ভটচাযের মুখে 'সত্যি-মিথ্যে' 'স্বর্গ-নরক' শুনলে কৌতুক অনুভব না করে পারি না। কারণ ব্রাহ্মণের ঘরের 'চন্ডাল' এই কৃতান্তর আর যাই হোক 'সত্যের স্বর্গে' ঠাঁই পাবার কোন আশা আছে, এমন মনে হয় না।

পুরুত বামুনের ছেলে কৃতান্ত 'ঘোষার পাটে' বসে চা খায়, বাগদী-বাড়ী ভাত খায়। আর গাঁজাটা খায় শ্মশানে বসে পদা ডোমের সঙ্গে। কৃতান্তর বন্ধুবৃন্দ ওই সব 'উচ্চকুলের' রত্ন এক একখানি।

তবু কৃতান্ত পাড়ার পুরুত।

সকালবেলা ঘোষাপুকুরে একটা ডুব দিয়ে লোহারদা একটা পেতলের সাজি হাতে করে ফুল তুলে বেড়ায় কৃতান্ত, তারপর সেই না বলে চেয়ে নেওয়া ফুলগুলি নিয়ে বংশগত সম্পত্তি 'নমোদয়ের' পুজোপাঠ সেরে যজমানিতে বেরোয়—।

ঘরোয়ানেসে পুজো আছে কিছু কিছু। কার বাপঠাকুর্দা কোথায় শিব-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, কি কোন দেবী-প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছে, নাতিপুতি কৃতান্ত ভটচাযকে মাস মাস কিছু দিয়ে নিতাপুজোর ঠাট বজায় রেখে পিতৃ-পিতামহের সেই অক্ষিম্বোকারিতার মান শোহাচ্ছে।

তাছাড়া—'নৈমিত্তিক' পুজোও আছে, থাকে প্রায়ই। নমো নমো করে লক্ষ্মী-পুজো আছে, সত্যনারায়ণ আছে, শ্রাদ্ধ-পিন্ডি, 'বহুর্কি' একোদ্দিষ্ট এগুলোও আছে। প্রথা না থাক, প্রথার কঙ্কালটা তো টিঁকে রয়েছে এখনো গেরস্থঘরে? মেয়ে-বৌগুলো হাসপাতাল থেকে আঁতুড়ের ঝামেলা মিটিয়ে এলেও, আর 'বেঠেরা, 'আটকৌড়ে' উঠে গেলেও তাদের শুদ্ধ করিয়ে নিতে একুসো ঝক্কিটা করছে এখনো অনেকে। অন্ততঃ কৃতান্ত ভটচাযের গ্রামে এখনো আছে এসব। শুনতে কলকাতা থেকে মাত্র তেরো মাইল, কিন্তু আসলে অনেক দূরে আছে এরা।

অতএব ষোলা পার্সেন্টে কালো যজ্ঞি, কষ্টভাষী অনাচারি কৃতান্ত ভটচায, যজমানিতেই চালিয়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া বাপপিতামোর আছেও কিছু। অবিশ্যি সংসারই বা কি? 'আপনি যে উনি তিনি' তো কেউ নেই?

কৃতান্ত অকৃতদার।

লোকে বলে, 'দেখতে অত খারাপ ছিল না কৃতান্ত। একহারা শ্যামবর্ণ, দুঃশ্রী মন্দ নয়, মোটামুটি এই ছিল ওর আকৃতি। কিন্তু কথায় বলে, রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রকৃতির দোষে আকৃতি নষ্ট। গাঁজা খেয়ে খেয়ে পরে নাকি ওই কদর্য চেহারা হয়েছে ওর। চেহারার দোষে বিয়ে জোটেনি ওর, এটা ভুল। কানা-খোঁড়ারও বিয়ে হয়, তা' কালো কুৎসিত!

আসলে বিয়ে হয়নি ওর নামের দোষে। যার যত কেলনা মেয়েই হোক, 'কৃতান্ত'র হাতে কে মেয়ে তুলে দিতে চায়?

চায়নি।

তাই বিয়েও জোটেনি কৃতান্তর।

ওর মৎবৎসা মা নামের ফাঁদে স্বয়ং কৃতান্তকে ধোঁকা দিয়ে এই একটা ছেলেকে কোনরকমে পৃথিবীর আলো-বাতাসের দাবীদার করে রেখে যেতে পেরেছে বটে, কিন্তু কৃতান্তর সে গুড়ে বালি। কৃতান্ত জগতে কাউকে রেখে যেতে পারবে না।

অবিশ্যি তার জন্যে কৃতান্ত মনঃক্ষুণ্ন নয় মোটেই। ও বেলা বারোটা অবধি ওই বাড়ী বাড়ী ফুল ফেলে বেড়ায়, তারপর বাড়ী এসে দুটো ভাত সেদ্ধ করে খায়, এবং খাওয়া-রূপ পাপ-কর্মটা চুকিয়ে নিয়েই হৃষ্টচিত্তে হয় হাতা বগলে কলকাতায় ছোটে কোর্টে হাজরে দিতে, আর নয়তো মামলার কাগজপত্র বগলে করে ছোটে পদ্মা কিচেলের বাড়ী।

না, 'কিচেল' অবিশ্যি কোনও আইন-সম্মত পদবী নয়, কিন্তু পাড়াসুদ্ধ সবাই পদ্মাকে পদ্মা 'কিচেলই' বলে। বলতে বলতে, ওটা যেন পদ্মার পদবীতেই দাঁড়িয়ে গেছে।

এই পদ্মা কৃতান্তর প্রাণের গুরু।

বহু কূটকচালে বুদ্ধি মামলাইয়ের রাজা। আর সে বুদ্ধি মামলাই না করলে চলবে কেন? পদ্মা আছে বলেই না কৃতান্ত একটা উত্তেজনাময় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতে পেরেছে এত-দিন?

তেরো বছর ধরে একটা মামলা লড়ছে কৃতান্ত। তা'ও মিথ্যে মামলা। যে জিনিস ওর নয়, ধর্মেধর্মে জানে বোঝে, সেই জিনিস নিয়ে এই লড়া-লড়ি।

আর প্রতিবাদিনী কে?

না একটা অসহায় বিধবা।

যে বিধবাটা নাবালক ছেলে নিয়ে একলা যুঝছে পৃথিবীর সঙ্গে। কৃতান্ত তাকে তপ্ত শাল দিচ্ছে। সবাই জানে সুশীলা যে বাড়ীতে বাস করে, সেটা আর তার আনুষঙ্গিক যে বাগান-পুকুর, ধানজমি আছে, সবই সুশীলার মামার। যে মামার ছেলেপুলে ছিল না, আর যেখানে সুশীলা আজন্ম মানুষ হয়েছে।

আজন্ম, আজ অবধি।

নড়েনি কোনদিন কোথাও।

বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাও নয়। মামাদের অবস্থা ভাল, তারা সংসারে কেউ নেই বলে ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিল।

তা' জামাইয়ের বোধহয় আয়েস সইল না, মরেই গেল। ছেলেটা তখন সুশীলার মাত্র মাস আষ্টেকের।

সুশীলার জীবনটা দুঃখের সাগর।

যা পায় তা ভোগ হয় না। মামামামী আদর করে বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই পুষল, নাতি হবার আশায় গয়না গড়িয়ে দোলনা কিনে আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে দিন গুনতে লাগল, পোড়া ভাগ্যে সেই মামামামী থাকতে আর তাদের নাতি দেখাতে পারল না সুশীলা।

বিয়ের পর পাঁচ-সাত বছর কাটল। ঠাকুর দেবতার পৌর ধরতে ধরতে মামী হতাশ হয়ে উঠল, শেষ অবধি মরাও গেল। দুদিনের আড়াআড়িতে দুজনে। কলেরার সেবার অনেক লোক মরেছিল গ্রামের।

দুঃখে-শোকে প্রথমটা হাতের মাদুলী গলার কবচ সব খুলে ফেলে-ছিল সুশীলা, আবার হাহাকরা শূন্য প্রাণের দায়ে নিজেই নতুন করে জোগাড় করতে সুরু করল।

আর অবশেষে একদিন ফিরল দেবতার বর। তিন মাইল দূরে পায়ে হেঁটে একলা গিয়ে কোন ফুলন্ত ডালিম গাছে 'মানসিক' বেঁধে এসে জ্বরে পড়ল সুশীলা, কিন্তু সে জ্বর থেকেই জন্ম জয়ন্তর।

ছেলে হল রূপের কান্তি।

শ্যামবর্ণ রঙ্ হলে কি হবে, নাদুস-নুদুস যেন যশোদার গোপালটি! স্বামী-স্ত্রী দুজনে গিয়ে মানসিক ছাড়িয়ে এল,

সুশীলার যাওনার অন্নপ্রাশনে ঘটা ও হল বেশ, কিন্তু নিভল রোশনাই রাতি।

স্বামী মারা গেল সুশীলার।

ছেলে নিয়ে একা সুশীলা।

তবে পয়সার অভাব নেই এই যা। কিন্তু মানুষের অভাবও তো কম অভাব নয়? যা আছে তা রাখে কে? কে দেখে, কে শোনে? সেই দুঃখেই এবাড়ী ওবাড়ী হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুশীলা, এমন দুর্দিনে কৃতান্ত ভটচায দিল এক নালিশ ঠুকে।

কী?

না, সুশীলা যা কিছু ভোগ করছে, সবই না কি কৃতান্তের। কি বার্তা? কি করে? কেন পড়েই আছে শশা কথা। যে বাড়ি সুশীলার মামা, সেই বাড়িই কি কৃতান্তের পিসেমশাই নয়? সুশীলার মামী কৃতান্তের আপন পিসি ছিল না?

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়।

সুশীলার মামীর নিজের ভাইপো ওই গোজেল লক্ষ্মীছাড়া কৃতান্ত। কিন্তু তাতে কি? ধনশ্যাম চক্রবর্তী কি তাঁর বিষয়সম্পত্তি নিজের মানুষ-করা সোনার প্রতিমা ভাগ্নীকে না দিয়ে, পরিবারের অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপোটাকে দিয়ে যাবেন?

কৃতান্ত বলে, তাই গেছেন তিনি।

কৃতান্তকেই দিয়ে গেছেন যথা-সর্বস্ব। আর সেই ধনশ্যামের দলিল কোর্টে দাখিলও করেছে কৃতান্ত ভটচায।

লোকে বলে জাল দলিল।

পঞ্চা ফিচেল কোর্টে কাজ করে। এ গ্রামের যার যা লেখবার ওই লেখে। দলিল লেখার কায়দাও জানে। তার সেই জাল করার কায়দাও নাকি তার কাছে জলের মত।

এদিকে সুশীলা বেচারীর হাতে প্রমাণপত্র বলে তেমন কিছু নেই। এমন কি মামা তার কাগজপত্তর কোথায় কি রাখত, যা রেখে গেছে, তাই জানে না ভাগ্নেবউ। এবাড়ীতে থাকতে হলে যে আবার তাকে দাবীদারের প্রমাণ দেখাতে হবে, তা' ঘোরুরি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। যেদিন শুনল কৃতান্ত দলিল দেখিয়েছে, সে দিন মামা-মামীর বিশ্বাস-ঘাতকতার 'কাঠ' হয়ে গেল।

কিন্তু ঝিউড়ি মেয়ে সুশীলা, তা বলে 'কুসুম সুকুমারী' নয়। মোটামুটি দজ্জালই বরং। তাই সেই কাঠ ভাব কাটতেই ছুটলো কৃতান্তর বাড়ী, আর পাড়ার লোক জড় করে যাচ্ছেতাই গালা-গাল দিয়ে এল তাকে। গালাগালের বহর আর ভাষা শুনলে কে বলবে পঁচিশ ছাব্বিশের যুবতী মেয়ে।

যেন সংসারের কানু, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়! মামীর্ঝিনী সেতুর সুবাদে একলা যে কৃতান্তের সঙ্গে কত খেলেছে, কত হাসি গল্প করেছে, কৃতান্তের ওই ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বজ্জাতমনে বামুন হয়ে যাওয়া নেখে ঠাট্টা করেছে, সে সব ভুলে গেল সুশীলা।

কিন্তু ভুলবে নাই বা কেন?

কৃতান্ত ভোলেনি?

কৃতান্ত যদি ওই চেনা-জানা, 'আত্মীয়' বললেও হয়, মেয়েটাকে অসহায় পেয়ে ঠকাতে আসে, সুশীলা আবার মধু-ভাষিণী হতে যাবে কিসের দায়ে?

সেই জেগে গেল ঘটাঘটি।

আর জেগেই আছে এযাবৎ।

তেরো বছর ধরে চলছে।

দু' বছরের ছেলেটা সুশীলার পনেরো বছরের হলো, সুশীলার সেই সোনার অঙ্গ কালিমূর্তি হলো চুলের বস্তা কেটে 'ওয়ার' করলো নিজে হাতে করে, কিন্তু মামলা চলছেই।

যেমন দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন এবং শীতের পর বসন্ত, আর

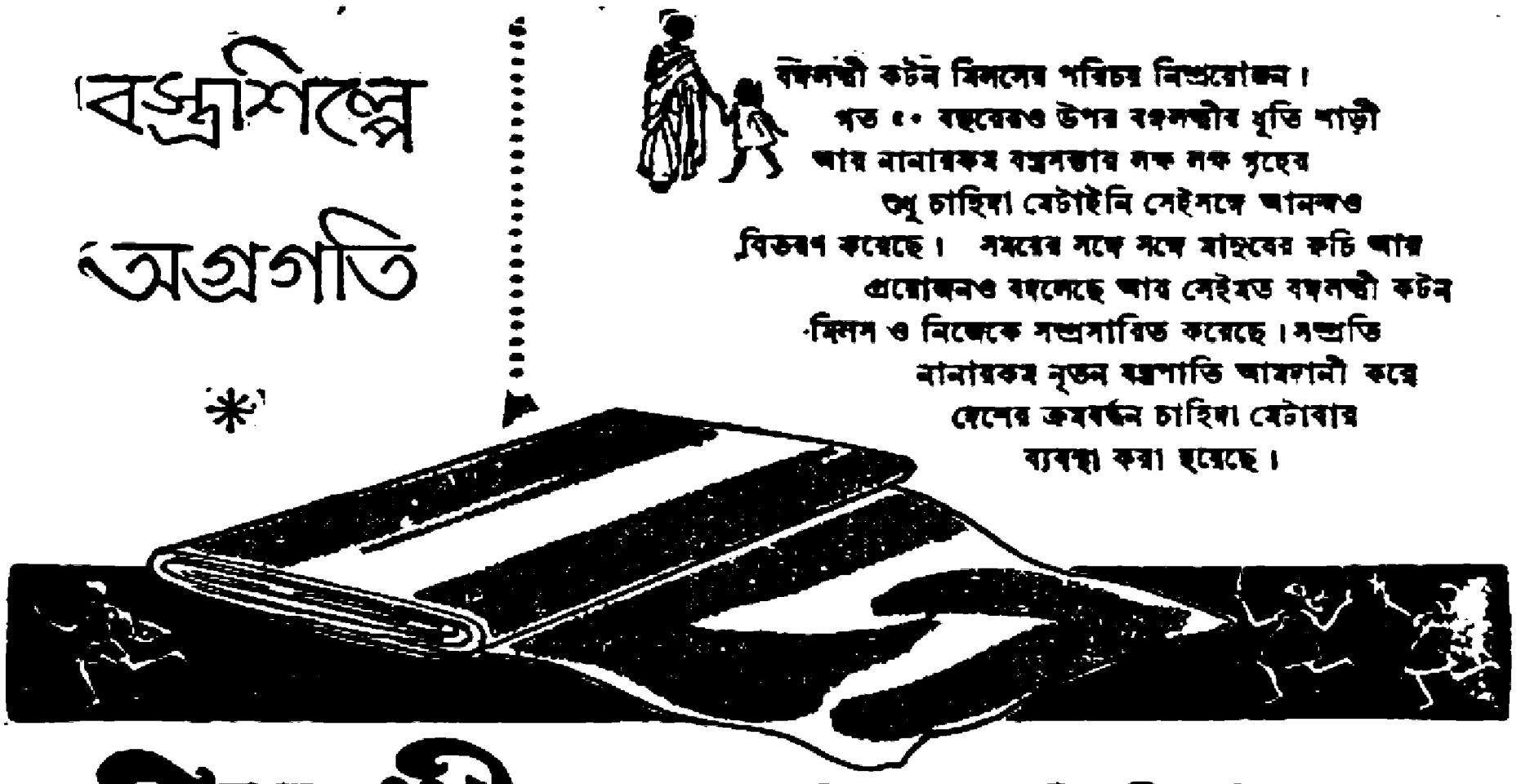

বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসাটা একটা অনিবার্য নিয়ম, তেমনি অনিবার্য নিয়মে আদালতে দিনের পর আবার 'দিন' আসে।

অবিশ্যি অসহায় মেয়ে বলে মামলা চালার কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না সুশীলার। এ ব্যাপারে হিতৈষী জুটেই যায়। মামলা মকদ্দমায় জগতের সেরা রস পায়, এমন ব্যক্তির অভাব নেই জগতে।

সুশীলা একদিকে চালায় মামলা, আর একদিকে চালায় গলা। গালাগালি, খুলো-খুলি, লাশমুদ্দিন্য, এ সবের স্টক ফুরোয় না সুশীলার। দিনভোর ঘুরে বেড়ানো কৃতান্তকে যে কোন জায়গায় একবার ধরতে পারা কিছু শক্ত নয়, দুবার চারবারও হয়ে যায় কতদিন।

সুশীলা সুরু করে গালাগালের ছড়া।

'মাড়িংপোড়া মুখপোড়া, বাদুনের ঘরের চাঁড়াল...মুচি...মুক্তফরাস' কোন কিছু বাদ রাখে না সুশীলা।

তবে ধন্য একটা অসুবিধে এই, স্ত্রী-পুত্র নেই কৃতান্তর।

কাজেই অভিশাপের সেরা অভিশাপ 'নির্বংশে হ'-টা বলা চলে না। যেটা বুকে বাজে, প্রাণে লাগে।

সুশীলার আক্রোশবাণীটা তাই যেন বাতাসে মাথা কোটে। আর কৃতান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

হ্যাঁ দাঁড়িয়েই থাকে, চলে যায় না।

কাঠি কাঠি হাত দুখানা বুকের ওপর আড় করে রেখে দিব্যি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশ্য ওর ওই পেশী-সর্বস্ব মাংসহীন মুখটা যতটা হাসি হাসি হওয়া সম্ভব। বাপ হাসির ধারালো ছুরি আর কি।

অনেকক্ষণ বলে সুশীলা যদি একটু হাঁফ জিরোয়, প্যাচা মুখে বাংলা বিকৃত করে কৃতান্ত বলে, 'একদিন তাড়ায় ফুরিয়ে গেল? সে কি। তাহলে আজ আর কিসে হবে না তোর?'

বলা বাহুল্য নিত্যঘটনা হলেও, সুশীলার কণ্ঠস্বরে দু পাঁচজনকে নিকটে টেনে আনেই। তাদের মুখে চোখে ওই বাঙ্গোক্তির প্রতিক্রিয়া দেখে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে সুশীলা, সাপের মত সরু চকচকে হাত দুখানা প্রায় ওর মুখের কাছে নেড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এখন কিসে বাড়িয়ে কি করবো? কিসে বাড়াবো তোমার ছেরাদ্দর দিন। পেট ঘুরে কল থাকবো। কবে ওলাউঠা ধরবে তোমার, তবে তোমার তেরাত্তির পোহাবে না, তাবই দিন গুনছি আমি।'

নির্বিকল্প নির্বিকার কৃতান্ত বলে, 'শুধু ওলাওঠো? বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর সবাইকে ডাক। যে পরে। যে তোর প্রতি সবয় হয়। কিন্তু ছেরাদ্দর লুচিটা খাবি কার কাছে? সেটা আবার করবে কে? এক তুই যদি নিজেই যেওয়ারিশ বামনা বলে—'

সুশীলা আঙুলগুলো মটকে মটকে বলে, 'মর মর, একদিন মর তুমি! যে চুলোয় বসে গাঁজা গেলো, সেই চুলোয় গিয়ে পড়গে। 'পাকুড়তলার' ডোম তোমায় মুখে আগুন দিক।'

কৃতান্ত বলে, 'বালাই ষাট্, তোম কি বল? তোরই পাঁচজনে দিয়ে দিবি? কি বল হে? তোমাদের পুরুত আমি, তোমে পোড়াবে আমায় এটা কি নেখা কথা হলো? যাইহোক, তুই তবু একটা আপনার লোক।'

সুশীলা অতঃপর যেই যেই করে ওঠে। তিনশো তেঁতিশবার মরণ টাকে কৃতান্তর, তবে নিজের কাজে যায়।

কৃতান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বলে, 'মদ গাঁজার মত, এও একটা নেশা জন্মে গেছে ওর।' বলে, 'ওই বড় বুষ্টি—বন্ধুরটা পেটের মধ্যে ভয়ে রাখলে কিধে হবেই বা কি করে?'

কেন সুশীলার কিধে হওয়াটা ভারী একটা দরকারি কথা। তার জন্যে গ্রাম-সুদ্ধু লোকের পুরুতকে 'ঘরের দক্ষিণ দোরে যাও, তিনদিনের বাসি মড়া হয়ে থাকো'—বলা চলে।

মরার বাড়া গাল নেই, তাই ঘুরে-ফিরে ওই কথাটাই বলে সুশীলা, নানা ছন্দে, নানা সুরে।

কৃতান্ত ওটচাব সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছিস তোরা? বুদ্ধি দেখেছিস আমাদের সুশীলাবালার? বলি আমি আবার কার ঘেরে যাবো? নিজেই যম।'

তা এ তো ছিল নিত্যকার ঘটনা।

চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মত একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই ব্যাপারটা ভয়াবহ দাঁড়াচ্ছে। কারণ কলিকালের রীতি অনুসারে অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় সূচিত হচ্ছে।

কৃতান্ত জিতছে।

'তিন কোটের' মামলা।

দু কোটে নাকি সুশীলা জিতেছিল, কিন্তু এই শেষ কোটে সুশীলা পথে বসলো।

আদালতে নাকি প্রমাণিত হয়েছে, দলিল জাল নয় খাঁটি। এবং সেটাই স্বাভাবিক। নিঃসন্তান স্বামীর নিজের বোনের মেয়ের চাইতে, স্বামীর ভাইয়ের ছেলেকে প্রাধান্য দেবে, এটাই ন্যায়সঙ্গত। কারণ বিষয় কৃতান্ত পেলে সেটা স্বামীর স্বশুরের বংশে রয়ে গেল, কিন্তু ভাগ্নী সুশীলা পেলে?

কিছু না।

সুশীলার বর অথবা ছেলে, তারা কি আরো নিকট হলো? পেতে তো তারাই পাবে?

পাকাপাকি রায় বেরোবার আগেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। আর সুশীলা মরমে মরে গিয়ে বিছানা নিল। সত্যি যে এমনটা হতে পারে, তা তার ধারণা ছিল না।

পাড়ার লোক, যারা ওই নিত্য গালা-গালির শ্রোতা ছিল, একটা 'চরম' কিছুর আশা করেছিল, তারা একটু হতাশ হলো, বাড়ী বয়ে দেখতেও গেল সুশীলার অসুখটা কতদূর।

তা' মনের অসুখও অসুখ বৈকি।

তা'তেও মানুষকে দুর্বল করে, শীর্ণ করে, কালিবর্ণ করে।

সুশীলার ছেলে সূর্য জ্ঞানাবধি এই মামলা দেখছে। মামলার কথা দিয়েই তার নাড়ি কাটা। কৃতান্ত যে তাদের পরম শত্রু এ তার হাড়ে গিয়ে ঢুকেছে। ছেলেবেলা থেকেই ভাবতো ওর যদি একটা অনিষ্ট হয় তো সে দু'হাত তুলে নাচে।

কিন্তু কৃতান্তর আর অনিষ্ট কি? আজ মরলে কাল টেনে ফেলে দেবে লোকে, ফুরিয়ে যাবে সব।

ও যে এই তেরো বছর মামলা লড়েছে, এই এক রহস্য।

লোকে তো বলতো, 'গাঁজার-নেশার মত, এ ওর একটা নেশা। সর্বস্বান্ত হয়ে ছেরে মরবে।'

তা' সেই ছেরে মরার দিনটার আশায় আশায় ছিল সূর্য। কিন্তু এ কী।

পনেরো বছরের প্রায় জোয়ান হয়ে ওঠা রক্ত আগুন হয়ে উঠল।

অবিশ্যি একথা আমার শোনা কথা। ওদের বাড়ীর কি রাশ্ই করে বেড়িয়েছিল, সূর্য না কি ওর মার অনুমতি চেয়েছিল, ওই পাজী ওটচাবটার দফা গয়া করে

দেবার। সুশীলা বিরক্ত ভাবে বলেছিল, 'থাম্ থাম্ ঢের মুরোদ দেখিয়েছিস!'

কিন্তু রায় বেরোলোর ঠিক পরের-দিনই ঘটে গেল ব্যাপারটা। ভোরবেলা যখন কৃতান্ত ধোবার পুকুরে ডুবটা দিয়ে, তার সেই লিকলিকে দেহটা গামছা দিয়ে রগড়াচ্ছিল কোথা থেকে একখানা ইঁট এসে তার মাথায় লাগল। আস্ত খান ইঁট।

রক্তারক্তি পুকুরের জল লাল হলো। আশপাশের ধোবাকুলের যাই ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল, তাই লোকটা হাস-পাতালে যেতে পেল, একটু, ওষুধ ব্যান্ডেজও পড়ল।

সন্দেহ রইল না কারুর, এ কাজ কৃতান্তর শত্রুপক্ষের, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখেনি কেউ।

সূর্য তো আজ তিনদিন গ্রামছাড়া। কলকাতায় পিসির বাড়ী গিয়ে বসে আছে। আর সুশীলা খবর পেয়ে এমন পাথর হয়ে গেল যে, সেটা 'অভিনয়' ভাবা কঠিন।

কিন্তু করলই বা কে?

আকাশ থেকে বাজ পড়তে পারে, খান ইঁট পড়ে না।

তা, ওর আর হদিস হলো না।

ঘরে ঘরে আলোচনাই চলল। তা'ও যদি সঙ্গে সঙ্গে মরতো, তাহলে খুনের চাঞ্চল্য নিয়ে হয়তো একটা তোলপাড়ি খোল কাণ্ড হতো। কিন্তু তক্ষুণি মরল না কৃতান্ত ভটচায। বেড় মাস ধরে কাৎরে কাৎরে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী এসে মারা গেল।

শ্মশানঘাটে মৃত্যুর কারণ লেখা হল 'ক্ষত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু'।

ওর গাঁজার সঙ্গী 'পদা' ডোমই না কি শেষ ছাড়পত্র দিল ওকে। পদা না কি দেখে মুখ বিকৃত করে বলেছিল, 'শুয়ার শালা, মরলি মরলি, 'পিণ্ডি'র হাতে মরলি!'

যারা সঙ্গে ফিরেছিল তারা কথাটার মানে বুঝতে পারল না, সে'জেল ডোমটার কথায় কানও দিল না।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটা ঘটলো একটা অভাবনীয় নাটকের মূর্তিতে। পদা-ফিচেলই ফাঁস করলো খবরটা। মরবার আগে কৃতান্ত ওই তেরো বছরের মামলায় পাওয়া যাবতীয় বিষয়, মায় নিজের পৈতৃক যা যেটুকু ছিল সব, লেখাপড়া করে দিয়ে গেছে সূর্যর নামে!

কৃতান্তর মামলা-জেতা, এবং কৃতান্তর ইঁট খাওয়ার চাইতে আরো অনেক বেশী চমকপ্রদ ছিল খবরটা।

গ্রামসুদ্ধ, লোক ঝেঁটিয়ে এসে কাঁপিয়ে পড়ল সুশীলার বাড়ী।

কী ব্যাপার, কী ব্যাপার।

সুশীলা পাথর মুখে বলল, 'ব্যাপার আর বুঝতে পারছ না? মরণকালে জ্বরঘোরে ভুল বকছেন। অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরেছে। বুঝেছে এই মহাপাতক নিয়ে মরলে অপদেবতা হয়ে ঘুরতে হবে, গতি হবে না। তা' দিয়ে তো আবার ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে, নাও এখন ব্যবস্থা করে নাও তোমরা। শর্ত না পালনে যখন বিষয় পাচ্ছে না সুখে—'

হ্যাঁ শর্ত একটা রেখেছে কৃতান্ত।

বেশ কড়া একখানি শর্ত।

কৃতান্তর শ্রাদ্ধ করতে হবে সূর্যকে। পুরোদস্তুর ষোড়শ দান করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে! আর 'সম্মোদন'টার ভার নিতে হবে।

শ্রাদ্ধ হয়ে গেল আজ।

ব্রাহ্মণরা আকণ্ঠ খেয়ে মন্থরগতিতে ফিরছে কৃতান্তর বাড়ী থেকে। সূর্য সবাইকে দক্ষিণা দিয়েছে খলকস্ত হয়ে।

এই বাড়ীতেই হল।

নিজের বাড়ীতে করতে দেননি সুশীলা। তা' কৃতান্ত ভটচাযের ভিটেটাও তো এখন সূর্যর! সেই প্রাপ্তির আহ্লাদে সূর্যর মুখ চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কৃতান্ত ভটচাযকে নিয়ে গল্প লিখবো একথা কোনদিন ভাবিনি, কিন্তু আজ লিখছি। কৃতান্তর ক্ষীণ হয়ে আসা কণ্ঠের কথাগুলো কানে বাজছে.....'কেন জানি না কাউকে বলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। পাপের স্বীকার না করলে শুনেছি গতি হয় না।' দম নিয়েছিল কৃতান্ত, তারপর বলেছিল, 'অনেক খোসামোদ করেছিলাম পিসিকে, পিসি বলল, 'ঘরে ঘরে বিয়ে! ছিঃ!'

কোথা থেকে একটা লক্ষ্মীছাড়া কাঁপাবাশকে ধরে এনে লক্ষ্মী-প্রতিমাটাকে তুলে দিল তার হাতে। রূপ ছিল পাত্রীটার, কিন্তু আকাল যদি। মেয়েটা বোকা ছিল, অতশত বুঝত না, 'ছেলে ছেলে করে উন্মাদ। নিজেকেই নিষ্ফলা ভেবে দশ বিশ সের মাদুলি কবচ চাপাচ্ছে।.....একদিন জনমানবশূন্য এক জঙ্গলের পথে আসছি পাখী মেরে, দেখি একা পরিবর্ত হয়ে কোথায় চলেছে। কি না ছিল মাইল পথ ভেঙে কোন দুরোয় কাছে মানসিক করতে।' মুখটা বিকৃত করল কৃতান্ত, 'দেখে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। বলে দিলাম, ওসব ছাইপাঁশ করে হবেটা কি? মাদুলি কবচের বাবারও সাধ্য নেই। তোর ওই কাঁপাবাশটা দিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশা ছাড়।

'বোকা মেয়েটা চমকে গেল, হাঁ হয়ে গেল, তারপর খুনো জানোয়ারের মত ক্ষেপে উঠল। ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'বেশ যাব না মানসিকে।—প্রমাণ দেখাতে পারো তোমার কথার—'

বাধা দিয়েছিলাম কৃতান্তকে।

বলেছিলাম, 'থাক, তোমার মাথার চাঁড় পড়বে।'

কৃতান্ত হেসে বলেছিল, 'চাঁড় আর কোথাও পড়ে না রে। গাঁজার দমে সব আলগা করে দিয়েছি।'

শুনতে পাচ্ছিলাম অবশ্য খারাপের দিকে যাচ্ছে। তারপর যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম— সেদিন বলেছিল, 'বলছিস —এত 'ইয়ে' ছিস তো মামলা বাধিয়ে উৎখাত করলাম কেন? ভেবেছিলাম 'শত্রুর ঘর' করে নেবে লোকচক্ষে ধুলো দেবে। এতবড় শত্রুকে নিয়ে সন্দেহটা উঠবে না কখনো।.....আর কি জানিস? ভয় তো একটা যোগসূত্র। কাজেপক্ষের আইনে-আদালতে ওর আর আমার নামটা তো একসঙ্গে ঘুরছে। গাজনতলা বাড়িয়েও তো দুবেলা দেখা হচ্ছে। এই একটা আন্দাজ আর কি। কে জানতো এতখানি মিথ্যে নিয়ে মামলায় নামতে হবে। হাস্যরসের চোটে পদাই এটি করল। ডোবাল আমায়।'

এর দুদিন পরই মারা গিয়েছিল কৃতান্ত।

আজ শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

বিষয়ের লোভে সুশীলা ছেলেকে দিয়ে ওই চিরশত্রুটার শ্রাদ্ধ করালো বলে সুশীলাকে ধিক্কার দিচ্ছে অনেকে। আবার সুশীলার মহত্বকে সাধুবাদও দিচ্ছে কেউ কেউ। সুশীলা নাকি বলেছে, 'উইলে শর্ত না থাকলেও জলপিণ্ডি একটু দেওয়াতামই সূর্যকে দিয়ে। যতই হোক মামীর বাপের বংশ। মামী আমার মায়ের মত ছিলেন।'

—

না, আমি সুশীলার কথা ভাবছি না।

আমি ভাবছি সূর্য কোন মন্ত্রে পিণ্ডদান করলো?

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ কোন

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কথা :

আজ রবিবার, সকাল আটটা বাজল। বাইরের ঘরে বসেছি খবরের কাগজটা নিয়ে। এবং, মনটা আশঙ্কায় কাতর হয়ে ভাবছে, একটু পরেই মল্লিক আসবে। তাকে কোনোমতেই ঠেকানো যাবে না, করুণ কাকুতি ভাষায় সে মৃত্যুর চাইতেও দুর্বার।

আর মল্লিক যেদিন আসবে, সেদিন আকাশ ভাঙা বৃষ্টি নেমে আমাদের এই গলিটাকে আগে থেকেই ডুবিয়ে দেবে না। বরং সে-রকম যদি একটা প্রচণ্ড গোছের বৃষ্টি-বাদল হয়ই, তা হলে সেটা শুরু হবে ও আমার বাড়ীতে পৌঁছোবার পর। অর্থাৎ যাতে আরো ঘন্টা দুই নিশ্চিন্তে বসে যেতে পারে। এই যে আধমাইলটাক ও হেঁটে আসে, তাতে কোনোদিন ওকে ঘাড়ে গুঁতিয়ে দেয় না, কিংবা ওদার গোদার পা পিছলে আছড়েও পড়ে না (অবশ্য এই চাইতে কোনো বড়ো অপঘাত ওর আমি কামনা করি না)। হাড়ি কামানোর পর যেমন তার অলক্ষিত পুনরুদ্গম অনিবার্য, তেমনি সপ্তাহের ছুটি দিন মল্লিকের আবির্ভাব একেবারে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত। মল্লিক জানে, বুধবার রাত্রে আমার ক্লান্ত থাকে না আর রবিবার আমার স্বাভাবিক ছুটি।

বিকেলে দেশবন্ধু পার্কে একদিন বেড়াতে গিয়ে মল্লিককে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত খুব সুখে ছিলুম আমরা, আমি আর আমার জার্নালিস্ট বন্ধু জীবেশ। জীবেশ কবি, আধুনিক সাহিত্য তার নখদর্পণে। যদিও দুজনে একসঙ্গে আমরা বি-এস্‌সি পাশ করেছিলুম, কিন্তু জীবেশের মন পড়ে ছিল সাহিত্যের দিকে। কাজেই ও তখুনি খবরের কাগজে নিউজ-এডিটার হয়ে ঢুকে পড়ল আর কবি হিসেবে নামও করে ফেলল দারুণ। আমি

এম-এস্‌সি পেরিয়ে কলেজের মাস্টারীতে ঢুকলুম, আপাতত সেই গোরাক্ষেই আমার জাবর-কর্তন চলছে।

তবু, জীবেশ আমাকে ভোলেনি, সময় পেলে আজ দিতে আসে, বলতে কি, কবিতা পড়ার নেশাও একটু ধরিয়েছে। লিখি না, কারণ, 'ইথাইল-মিথাইলের চাহিদা মিটিয়ে ওটা আর সম্ভব হয় না। তবু বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ মাঝখানে মল্লিকের আবির্ভাব।

সেদিন দেশবন্ধু পার্কে দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল, বিশাল পার্কে প্রচুর লোকজন থাকলেও কারো গায়ে গায়ে ঠেকছিল না, আকাশে ভালো একটা চাঁদ ছিল আর সামনের পুকুরটার জলে আলো ছায়া দুলছিল। তখন অবশ্য জীবেশ কবিতা আওড়াচ্ছিল না, ঘাসের ওপর বসে—পা ছড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে, আমরা দুজনে ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম এবং রোহন কানহাই আর ওরেলের খেলা নিয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলুম।

মল্লিক বোধ হয় পাশ দিয়ে যেতে যেতে, আমাদের আলোচনা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—আমরা লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ শুনলুম, 'দাদা, আপনাদের ডিস্‌কাশনে জয়েন করতে পারি কি?'

আমরা তাকিয়ে দেখলুম, লোকটি দু-এক বছরের বড়োই হবে আমাদের চাইতে। একটা ইলেক্‌ট্রিক পোস্ট্‌ কাছাকাছিই ছিল, তাতে দেখলুম, তার রঙ টকটকে ফর্সা, গোলগাল চেহারা, আহ্লাদে-আহ্লাদে মুখ। গায়ে গিলেকরা আদ্দি কিংবা মলমলের পাঞ্জাবি, তার বোতামগুলো কাঁধের ওপর; পরণে বনেদী ধাঁচের কালো ফিতেপাড় ধুতি, পায়ে সাদা নাগরা। হাতে বোধ হয় গোটা আষ্টেক আংটি—নবগ্রহের প্রায় সব ক'টিকেই তাদের সাহায্যে বশীভূত করা হয়েছে।

'দাদা, কিছু যদি মাইণ্ড না করেন—'

মাইণ্ড করলেও ভদ্রতা রাখতে হয়। আমরা বললুম, 'না-না, আসুন, বসুন এখানে।'

দেখলুম, লোকটি জীবনে কখনো ক্রিকেট্‌ খেলেনি, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেটের স্কোর-বোর্ড তার কণ্ঠস্থ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নাড়ী-নক্ষত্র এমন করে জানা যে, মনে হল ভবল্‌-জি গ্রেসের সঙ্গেও বসে বোধ হয় ডিনার খেয়ে এসেছে। যাই হোক, ভালোই লাগল।

পরে আলাপ জমল। কাছাকাছিই থাকে। প্রকাণ্ড সাবেকী ধাঁচের বাড়ী, সে-আমলের মার্বেল বাঁধানো মেজে, ঘরজোড়া আয়না, এদিকে ওদিকে দু-চারটে ইটালীয়ান মূর্তি—দেওয়ালে মাস্টার আর্টিস্টদের ইমিটেশন ছবি। এখন চার সরিকে ভাগ হয়ে গেছে—তবু বিরাট ব্যবসা। মল্লিক গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু চাকরি করে না—ব্যবসাতেই প্রচুর টাকা আসে। বনেদী ধরণের সাজপোশাক ছাড়া আর কোনো রকম বড়োমানুষী চাল নেই—ট্রামে বাসে আসে যায়, আমাদের মতো মধ্যবিত্তের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে। আমরা ওর বাড়ীতে গোকুল পিঠে, চন্দ্রপুলী আর জয়দা পোলাও খেয়েছি অনেক দিন। ওর টাকায় ভালো সীটে বসে থিয়েটারও দেখেছি অনেকবার। কিন্তু—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মল্লিক পাগল করে তুলেছে।

ক্রিকেট ওর একটা 'হবি' বটে কিন্তু নেশা নয়। নেশাটি হচ্ছে ওর স্ত্রী।

নিজের স্ত্রীকে সকলেরই ভালো লাগে—অন্তত লাগা উচিত। আর সময় সুযোগ ঘটলে স্ত্রীর গুণপনা আমরা সকলেই সাধ্যমতো জাহির করবার জন্যে সচেষ্ট থাকি। কিন্তু মল্লিক—ওঃ!

এমন দুরন্ত আধুনিক কালেও ওদের পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা খুব কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। রূপ এবং টাকাই তাদের বোঝাপড়ার মানদণ্ড। মেয়ের ফর্সা রঙ পাকা কিনা যাচাই করবার জন্যে এখনো রুমাল দিয়ে ঘষে দেখার ব্যবস্থা আছে; এই বিয়ে করে ছেলে কখানা বাড়ী পাবে এইটিই হল প্রথম জিজ্ঞাসা।

এর মাঝখানে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়েছে মল্লিক। তার বাড়ীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সমারোহের মধ্যে সে কালো রঙের একটি মেয়ে বিয়ে করেছে। এবং আরো ভয়ঙ্কর কথা, মেয়েটি রূপ আর রূপোর পুঁটলি নিয়ে হ্যারিসন রোডের বিলিতী ব্যাণ্ড পার্টির আওয়াজে চারদিক মুখরিত করে এসে বাড়ীতে ঢোকেনি। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের—বাংলা দেশের কোন এক মফঃস্বল শহরে তার বাড়ী। কলকাতার মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করত, ব্যবসার সূত্রে সেখানে প্রায়ই যেতে হত মল্লিককে। কী করে আলাপ হল, সে আলাপ গাঢ় হল, শেষ পর্যন্ত দুজনে চলে গেল রেজিস্ট্রারের কাছে।

বরবধূ যখন বাড়ীতে এল সে দৃশ্য অনুমান করা যায়। মল্লিকের বড়দা—যিনি সেই মুহূর্তেই স্নান এক রায়-চৌধুরীদের সঙ্গে পঞ্চাশ ভরি সোনা আর মোটরগাড়ী নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন আর পরদিনই আলাদা হওয়ার প্রস্তাব আনলেন। অন্য আত্মীয়েরা প্রায় বছরখানেক মল্লিকের মুখদর্শন করলেন না। সে যা হওয়ার হোক, আপাতত আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমার আর জীবেশের। সেই সাধারণ কালো মেয়েটির গুণ-ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে আমরা প্রায় পাগল হয়ে গেলুম।

আমার রবিবার আর বুধবারের সকাল দুটো ওর স্ত্রীর মহিমা-কীর্তনে অসহ্য করে তোলে। অন্য কাউকে কথা বলতে পর্যন্ত দেবে না—একটানা বকর-বকর: 'আমার স্ত্রী—তিনি দেবী, তিনি মহীয়সী—'

মল্লিক যা বলে:

ভাই, মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল কি সাধে? একটু গোড়া থেকেই শোনো তাহলে।

অর্ডারটা বের করতে পারলে চটপট একটা জরুরি কাজ হয়ে যায়, শুধু ঘোরাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছেই। মানে কিছু খাবার মতলব আর কী! সেটা মুখ ফুটে বললেই মিটে যায়—তা নয় হাজারো ধানাই-পানাই!

ক্ষেপে একদিন ওঁকে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি একটু কষ্ট করে চন্দ্রনাথ-বাবুকে বলে অর্ডারটা বের করে দেন—আমি তো জেরবার হয়ে গেলুম। বরং আপনার পরিশ্রমের জন্য আমি কিছু—' শুনেই দেখলুম, ভুরু কুঁচকে উঠল, চমৎকার হল মুখ। বললেন, 'ঘুষের কথা বলছেন? আচ্ছা, এটা আমি ওপরে রিপোর্ট করব।'

সর্বনাশ, সাপের গায়ে পা দিয়েছি—অর্ডারটা ক্যান্‌সেল্‌ হয়ে না যায়। হাত জোড় করে বললুম, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এ-রকম কথা আর জীবনে উচ্চারণ করব না। তবে অনেক জায়গায় কিছু কিছু দিতে হয় বলে—'

উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে।'

'থাকে বইকি। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি। এমন ভুল আর করব না। এখন যদি দয়া করে—'

'আচ্ছা, দেখছি'—উনি হেসে চলে গেলেন আর পরের দিনই অর্ডারটা বেরিয়ে এল।

আরে ভাই, চারদিকে ঘুষের রাজত্ব—যেদিকে চাও, হাত পাতাই করছে। কখনো কখনো এত বিশ্রী লাগে যে হাত-গুলোতে ভাঁকড়া কিক্ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে চমক লাগল।

গরীবের মেয়ে—মার্চেন্ট্‌ অফিসে কী-ই বা মাইনে পায়? তবু লোভ নেই দেখে ভীষণ ভালো লাগল। আকৃষ্ট হলুম একটু একটু করে। একদিন বিকেলে

ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি ধরেছি. দেখি উনি ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জানতুম, শ্যামবাজারের দিকে থাকেন, ডেকে বললুম, 'আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি, আসুন—লিফট দিই আপনাকে।'

বললেন, 'ধন্যবাদ, দরকার নেই।'

বললুম, 'আমি সামনে বসব, আপনি বরং পেছনের সীটে—'

উনি বললেন, 'না, ধন্যবাদ।'

আমি কিন্তু ভাই, মনে মনে খুশিই হলুম। এই তো চাই। আজকাল যা হচ্ছে—রেস্তোরাঁর পার্কে যেখানে-সেখানে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মিলে যে হুল্লোড় দেখতে পাই, তাতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভাবি দেশটা চলেছে কোন্‌দিকে—সমাজ-টমাজ বলে কিছু তো আর রইল না! তার মাঝখানে এ তো এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম—বাবে বলে বরাল একসেপ্‌শন!

কত আর বলব—সে তো নস্তুর মতো মহাচারত হয়ে যায়। কি হে জীবেশ, উঠলে যে? কী বলছ—কাজ আছে? আচ্ছা ভাই তুমি যাও, আমি সুকুমারের সঙ্গেই গল্প করি।

জানলে সুকুমার, ও'কে বিয়ে করে বাড়ীতে এনে খুব ঝক্কি-ঝামেলা যে পোয়াতে হয়েছিল তা মানি। এমন কি, ছেলেটার অন্নপ্রাশনে যে এত আয়োজন করলুম এমন বাড়ী বাড়ী বলে এলুম—তবু আত্মীয়-স্বজন কেউ একটা না বলতে গেলে। ভাগ্যিস জ্ঞাত-গোত্তর, আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দু-চারজন বেশ বাইরে লোক ছিল, নইলে বিস্তর জিনিস নষ্ট হত। সে যাই হোক—এখন সবাই বলছে, ছোট বৌটা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। শুধু রংটা একটু ফর্সা হলে—

ওইটে ভাই আমাদের ফ্যামিলির সব চাইতে উইকনেস। আমাদের বাড়ীতে তাই কালো কেউ নেই, আছেন সোনার গৌরাঙ্গ। বাবা বলতেন ভালো লোক দেখলে নাকি তাঁর মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু কালোয় যে কত ভালো সে তো আমি রোজই দেখতে পাচ্ছি। আমার বোনদের কিংবা বৌদিদের তোমরা দ্যাখোনি—সায়েবদের টেক্কা দেয় তাদের রূপ-লাবণ্যের বহর। ছেলেবেলা থেকেই ওই রঙের ভেতর যতো চলতি আমি—রূপ বলতেই আর মন খুশি হত না। আমি দেখা আমি তাই সন্ধ্যা নামি কী আষাঢ়ের, মেজো বৌদি কী আর্দ্রতা আর বোন দুটো কী নাকডোলা! গরমা আর সিনেমা, রঙে রসে পল চিবিয়ে খাটি হয়ে যাওয়া—গুণের তো সব ঢেঁকি।

কী বলছ, আমাদের ঘরের কথা শুনতে চাও না? আচ্ছা, থাক তা হলে। আমার বৌয়ের কথাই বলি। কলেজে পড়েছে, বাইরে চাকরি-বাকরিও তো করেছে, কিন্তু নিজেরাও তো দেখেছ—কখনো ঘরের বাইরে বেরিয়েছে বলে মনে হয়? সংসারের মধ্যে ডুবেই গেছে একদম। আমিই কখনো-সখনো জোরজার করে টেনে নিয়ে যাই সিনেমায় কি গঙ্গার ধারে কিংবা বোটানিক্‌সে—নইলে তো বেরুতেই চায় না। এ রকম সতী-সাধ্বী মেয়ে যে একালে থাকতে পারে—নিজের জীবনে না দেখলে আমি তো বিশ্বাস করতে পারতুম না। আমার বোন কিংবা বৌদিরাও এদিক থেকে ভালোই—কিন্তু ওরা তো কখনো বাইরের জগৎ দেখল না, ওদের পরীক্ষাই হল না কোনো রকম। কিন্তু জোৎস্নাকে দ্যাখো। একা চলা-ফেরা করেছে, কলেজে পড়েছে, চাকরি করেছে পুরুষদের সঙ্গে। রংটা ময়লা হলেও দেখতে খারাপ, কোনো শত্রুতেও বলবে না এ-কথা। অমন সুশ্রী চেহারাটি নিয়ে, এই দিনকালে—এতগুলো পুরুষের সঙ্গে মিশে—রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রোজ সকালে উঠে প্রথমেই প্রণাম করে আমাকে।

হাসছ? কী বললে, তোমার পিসিমার গল্পটা? সেই যে শীতের ভোরে উঠে স্বামীর পাদোদক খাবার জন্যে ভদ্রলোকের পা লেপের তলা থেকে বের করে এক ঘটি বাসি ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন আর 'বাপরে বাপরে' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি? জানি, জানি—সে আমি শুনেছি। কিন্তু সুকুমার, এ ঠাট্টার কথা নয়। আই অ্যাম সীরিয়াস, ভেরি সীরিয়াস।

একটা এগ্‌জাম্পল দিই—তবেই ও'র ক্যারাক্টারের দিকটা বুঝতে পারবে।

অল্পবয়েসী একটি ঝি ছিল ভাই আমাদের বাড়ীতে। খুব চটপটে, খুব কাজের, মুখে হাসি লেগেই আছে, আমার ছেলেটাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করত। জোৎস্নাও খুব পছন্দ করত ওকে।

গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ভাঁড়ার থেকে কী আনতে গিয়ে জোৎস্নাই দেখতে পেলে। ভাঁড়ারের পাশে, একটু নিরিবিলি জায়গাতে বাড়ীর ঠাকুর ঝিকে মাথে জোর করে কী লুচ্চামিটি প্যাঁচ দিচ্ছে, আর খিলখিল করে হাসছে মেয়েটা। ওকে দেখেই দুজনে পালিয়ে গেল।

পরদিনই ডেকে বললে, বিদেয় করে দাও ওকে।

কিন্তু ওকে তো, কিন্তু ঠাকুর পুরোনো, প্রায় বিশ বছর কাজ করছে। তোমার মায়াই পড়ে গিয়েছিল। পা ধরে যখন কাঁদতে লাগল, তখন আমি বলেছিলুম, 'এত করে যখন মাপ চাইছে, তখন নয়—'

জোৎস্না বললে, 'না, তা হয় না। জগদ্ধাত্রী পুজো, গেরস্থর একটা শুভ-দিন, বাড়ীতে দেবতার কাজ—সে-দিনেও এমন বেলেল্লাপনা! ওদের রাখলে বাড়ীতে পাপ ঢুকবে। বিদেয় করো।'

করলুম বিদেয়। কিন্তু জোৎস্নার মতো একবার ভাখো। যাওয়ার সময় ঠাকুরের পুরো মাইনে মিটিয়ে তো দিলেই সেই সঙ্গে আরো একশো টাকা দিয়ে বললে, 'তোমার ছেলেপুলেদের জন্যে দিলুম। কিন্তু ঠাকুর, যেখানেই থাকো, ভালো করে খেকো এরপর থেকে। মনে রেখো, তোমার বুয়েস হয়েছে—তোমার ঘর-সংসার আছে।'

এমনিতে এত নরম-সরম, অথচ একটু বেচাল দেখলেই লোহার মত শক্ত, কিছুতে নোয়ানো যায় না—আরো বিশেষ করে মরাল-ক্যারাক্টারের কোশ্চেন যেখানে। আর তার পরিচয় তো প্রথম দিনেই পেয়েছিলুম আমি—যখন অর্ডারটা বের করবার জন্যে মুখের কথা বলতে গিয়ে গালে চড় খেয়ে ফিরেছিলুম দস্তুরমতো।

এই পরথটুই হচ্ছে কি—

কি হে, অত বড়ো একটা হাই তুললে যে? কী বলছ, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি, একটু বিশ্রাম করতে চাও? আচ্ছা বেশ-বেশ। তা হলে আজ আমি উঠি।

আরে, আসল কথাই যে ভুলে গেছি। জীবেশটা চট করে উঠে গেল তোমাকে বলে যাই, তুমি ভাই একটু দয়া করে জানিয়ে দিয়ো ওকে। কাল রাতে তোমরা দুজন যাবে আমার ওখানে। উপলক্ষ? না-না, সে এমন কিছু নয়। মিসেস মল্লিক কী যেন একটা নতুন রান্না করবেন—খুব খুশি হবেন তোমরা খেলে। যাই বলো ভাই, রান্নাটা কিন্তু ওর খাসা। মাকরের রান্নায় কি আর গিন্নীর মনের ছোঁয়াটি লাগে?

আসছ তো নিশ্চয়? ভুল হয় না যেন। আমিই বরং জীবেশের অফিসে টেলিফোন করে বলে দেব ওকে। চলি ভাই তা হলে—

আমার কথা:

চলুক সাক নতুন রান্না, আর তো পারা যায় না।

মল্লিকের স্ত্রী ভালো, বেশ ভালো, খুব ভালো—এমন কি সারা বাংলাদেশের ভেতরে নম্বর ওয়ান—এগুলো সব মানতে রাজী আছি আমরা। কিন্তু দিনের পর দিন এক কথা শুনতে ভালো লাগে কারো? মল্লিক এমনিতে চমৎকার লোক—সৎ, ভদ্র, বন্ধুবৎসল—লোককে খাওয়াতে ভালোবাসে, তাদের জন্যে খরচ করে সুখী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে সবাই ওকে এড়িয়ে চলে, কেন যে ও শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়ে এসেই চড়াও হয়েছে, সে কথা বুঝতে আমার আর বাকী নেই।

আমার স্ত্রীর গুণপনাও কি আমি কিছু কিছু বলতে পারি না? তিনিও যে অসাধারণ সুগৃহিণী, তিনি যে একদা বেতিওতে ক্লাসিকাল্ গান গাইতেন—স্বয়ং ওস্তাদজী যে একবার তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন তা-ও কি লোককে শোনবার মতো নয়? আর জীবেশ? তাঁর স্ত্রীতো পরমা সুন্দরী, ইংরেজির এম-এ, একটা মেয়েদের কলেজে জুইস-প্রিন্সিপাল, দুবার ইন্টার-কলেজিয়েটে ডিবেটে মেডেল পেয়েছেন—তাও তো বুক ঠুকে বলবার মতো। কিন্তু আমরা বলি না, বলতে প্রবৃত্তিই হয় না। আবার বলবার সুযোগই বা দিচ্ছে কোথায় মল্লিক? একটু যদি মুখ খুলেছি, আর দেখতে হল না। সপো সপোই :

'যাই বলো ভাই, আমার মতো স্ত্রী-ভাগ্য'—

জীবেশ না হয় 'কাজ আছে' বলে পালিয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু নিজের ঘরদোর ফেলে আমি যাই কোথায়? মরীয়া হয়ে যখন ভাবছি, এবার মল্লিক এসে বসতে না বসতে তারস্বরে আমার স্ত্রীর স্তুতি আরম্ভ করব আর নেপথ্য থেকে গৃহিণীর কানে যদি তার কিছু কিছু পৌঁছোয় তা হলে আখেরে আমার কিছু ভরসা আছে—এমন সময় জীবেশের একটা চিঠি এল।

ওর বড়ো ভগ্নীপতি পার্টিশনের পর পশ্চিমবাংলার এক মফস্বল শহরে এসে বছর দশেক আগে ওকালতি আরম্ভ করেন। এতদিনে বেশ পশার হয়েছে, নতুন বাড়ী করেছেন—দেশের পুজোটাও আরম্ভ করবেন আবার। জীবেশকে অনেকবার যেতে লিখেছিলেন, ওর আর সময়ই হয়নি। এবার ভগ্নীপতি বাড়ীতে দুর্গাপুজো করবেন জেনে সস্ত্রীক তিন সপ্তাহের জন্যে বেড়াতে গেছে সেখানে।

আমারও কলেজ ছুটি। মহালয়া পৌঁছিয়ে গেছে, নীল আকাশে টুকরো টুকরো শাদা মেঘ পাশুল রৌদ্র প্রায় শেষ, চারদিকে লাল শালুর জয়ধ্বজা, মোহনের ভিতে জল-কাদার চেহারা আর পা ফেলবার জায়গা নেই। কলকাতা থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নানা কারণেই অমন আর হয়ে ওঠবার পথ বন্ধ। শুধু নিরুপদ্রবভাবে এরা বসে বসে মল্লিকের পত্নী-বন্দনা শুনতে চাচ্ছে। জীবেশও নেই, যে এই দুঃখের একটুখানি ভাগ নিতে পারে।

বাইরের ঘরে বসে সুবের একটা লাল শালুর ওপর লেখছি : 'সার্বজনীন দুর্গোৎসব।' বানানটা একটু সুধরে নিলে কী ক্ষতি হয় এই তত্ত্বচিন্তা করছি, এমন সময় পিয়ন একটা এনভেলপ দিয়ে গেল। বৌধ, জীবেশের চিঠি। ইংরিজিতে, এয়ার-লেটারের পাতলা কাগজে চারপাতা ধরে লেখা।

জীবেশের সেই মারাত্মক চিঠি :

মাই ডিয়ার সুকুমার,

দিস্ ইজ দে সেটার দ্যন ইউ—বট এ বম্ রাদার আন অটমিক বম্। ডোন্ট বী আফ্রেড্ ওপ্ত্ দ্য—ইট্ ইজ নট্ দ্য ইউ।

(যাক, বাঁচা গেল। তবে কার জন্যে? মনে মনে অনুবাদ করে আমি পড়ে গেলুম।)

বেচারী মল্লিক—আমাদের সেই পত্নী-বাতিকগ্রস্ত বন্ধুটি—জানে না, কী নির্বোধের স্বর্গে বাস করছে সে! জানে না সেই প্রচণ্ড প্রলয়টি : যা কিছু সবুজ রাঙে, তা-ই সোনা নয়।

হ্যাঁ, আমি তার স্ত্রী জ্যোৎস্না মল্লিকের কথা বলছি, 'যাঁর কুমারী জীবনে ছিলেন জ্যোৎস্না রায়'। তাঁর সম্পর্কে এই চিঠিতে তোমাকে কিছু আলোকপাত করতে চাইছি। সেই সেতার শিল্পী, বিদুষী গ্রীসেলডা, কিংবা শৌনি-গোপী, অথবা সীতা-সাবিত্রী—কী বলব তাঁকে? এখন সেই মল্লিকের 'সীজার পত্নী' (না-না, মল্লিকপত্নী) সম্পর্কে তোমাকে কয়েকটি তথ্য পাঠাচ্ছি, তাঁর কুমারী জীবনের কাহিনী। তিনি এই শহরেরই মেয়ে।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মতো এটাও একটা আকস্মিক ঘটনা। একটা শেকড়ে কতগুলো পুরোনো পর্দাকে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আট বছর আগেকার একখানা রঙীন ম্যাগাজিন বেরিয়ে এল। চোখ পড়ল রেডীও ডিপার্টমেণ্টের ইউনিফর্মের একটি সুন্দর ফোটো। তাতে আমার ভাগ্নীর ছবি আছে, সে ইউ-নিয়নের সেক্রেটারী ছিল। আর মেয়েদের মধ্যে রয়েছে একটি মেয়ে : জ্যোৎস্না রায়। সেকেণ্ড ইয়ার।

মুখটি একটু রুক্ষ, মধ্যবিত্ত বিনুনী, কিন্তু তা হলেও চিনতে কষ্ট হয় না। নীচে জ্যোৎস্না রায় নাম লেখা

দেখে সন্দেহের আর লেশমাত্রও রইল না। আমার ভাগনী মীরা পুজো উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, তাকে বললুম, 'এই যে বটিকে চিনিস?'

সে চমকে বললে, 'ছোট মামা, বেছে বেছে ঠিক লোককেই বের করেছ তো! কী সাংঘাতিক মেয়ে, আর ওকে নিয়ে কত কাণ্ড তখন। চেনো নাকি ওকে?'

আমি চমকালুম ওর চাইতেও বেশি। বললুম, 'না, চেহারা দেখে বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। সাংঘাতিক বলছিস কেন?'

তখন মীরা যে কাহিনীটি শোনালো—সেটি সংক্ষেপে এই।

চেহারা দেখে যেমনই মনে হোক, মেয়েটি আসলে ভয়ঙ্কর। এই শহরে তখন এক ছোকরা থাকত, তার নাম জয়ানন্দ ঘোষ—সংক্ষেপে জুনু ঘোষ। স্কুলের গণ্ডী, পেরুতে পারেনি, বখাটে করে বেড়াত, জুনু ঘোষের উৎপাতে স্কুল-কলেজের পথে তটস্থ থাকত মেয়েরা। শুধু একটি গুণ ছিল তার। নামকরা ফুটবল-খেলোয়াড়, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে অনেকগুলো কাপ-মেডেল পেত। বাপের একটা সামানা দোকান ছিল—তাতেই কোনমতে সংসার চলত তাদের।

জুনু ঘোষের মতো স্কাউণ্ড্রেলকে কোনো মেয়ে পছন্দ করতে পারে—এ ধারণারও বাইরে। তবু একদিন কলেজে চিঠি এল একখানা—জ্যোৎস্নার নামে। তাতে জুনু ঘোষের সই। সে-চিঠি প্রেমপত্র।

প্রিন্সিপাল জ্যোৎস্নাকে ডাকলেন : 'এর মানে কী?'

জ্যোৎস্না মাথা নীচু করে রইল।

প্রিন্সিপাল বললেন, 'এর সঙ্গে তোমার কোনো যোগ আছে?'

জ্যোৎস্না স্বীকারও করল না, অস্বীকারও নয়। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

প্রিন্সিপাল বললেন, 'সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা এখন বড়ো হচ্ছ, ভালো-মন্দ বোঝবার বয়েস তোমাদের হয়েছে। এই জুনু ঘোষ অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের ছেলে। এর সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমার কোনো যোগাযোগের সংবাদ যদি পাই, তা হলে এই কলেজে তোমার আর জায়গা হবে না।'

কিন্তু মহিলারা কি সত্যিই বর্বরকে ভালোবাসে?

তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। প্রিন্সিপালকে কিছুই করতে হল না, জ্যোৎস্নাই নিজের পথ বেছে নিলে। একদিন সুপ্রভাতে জ্যোৎস্নাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না—জুনু ঘোষকেও না।

ধরা পড়ল পরের দিন। যোগাযোগই না কোথায়। দিল্লীর টিকেট ছিল সঙ্গে।

জ্যোৎস্নার বাবা-মা লজ্জার ভয়ে পুলিশ কেস ধামাচাপা দিলেন, জুনু ঘোষ শহর ছেড়ে কোথায় উধাও হল, কলেজ থেকে জ্যোৎস্নাকে ট্রান্সফার করিয়ে পাঠানো হল কলকাতার মামার বাড়ীতে। তারপর জ্যোৎস্না আর কখনো এখানে ফেরেনি। ফিরবেই বা কোন্ মুখে? বাপ-মা পর্যন্ত ওর নাম উচ্চারণ করেন না।

আমার প্রিয় বন্ধু—সুকুমার, এই হল মল্লিক-গৃহিণীর আদি জীবনের কাহিনী। মল্লিকের কাছে যে সীতা-সাবিত্রী কালপুর্শিয়ার মতো সতী, পেনিলোপীর চাইতেও মহীয়সী!

আমাকে ভুল বুঝো না। একটি মেয়ে তার প্রথম জীবনে কাউকে ভালোবেসে যদি কোনো ভুল (আপেক্ষিক) করেই থাকে, তা হলে তার জন্যে আমার বিবেক তাকে এক কথায় বাতিল করে দেবে না। কিন্তু মল্লিক সম্পর্কে কী বলো তুমি? অজ্ঞতার আশীর্বাদে সে সুখে আছে, স্ত্রীর গুণ-গান গেয়ে চলেছে চারণদের মতো, এক-দিন যদি সব সে জানতে পারে, যদি সত্যের বোমাটি ফাটে, তা হলে সে দাঁড়াবে কোথায়?

প্রসঙ্গত মনে পড়ল, ইবসেনের 'বুনো হাঁস' নাটকটি তোমার পড়া আছে কি?

আমার কথা :

এরপরে কিছু কিছু নিজের খবর দিয়েছে জীবেশ, একদিন পাখি শিকার করতে নদীর চরে গিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছে, কটি স্নাইপ 'থলেজাত' হয়েছিল তা-ও লিখেছে। কিন্তু সেগুলো গৌণ। চিঠির প্রথম অংশটা পড়বার পর থেকেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। মল্লিকের পত্নী-বন্দনা থামিয়ে দিতে পারি এই চিঠিতেই এই ব্রহ্মাস্ত্রে তার জিহ্বা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু ব্যাপার তো সেইখানেই শেষ হবে না। এই চিঠি দেখে যে আগুন জ্বলবে তাতে ওর সংসার ধ্বসে পড়তে পারে, হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে ওর তাসের ঘর। বিশ্বাস যেখানে এমন অন্ধ, সেখানে বিশ্বাসভঙ্গের ট্র্যাজেডী যে কী বিধ্বংসী রূপ নিতে পারে, তা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব নয়।

কিন্তু এরও পরে মল্লিকের স্ত্রীর সতীত্বের মহিমা দিনের পর দিন কান পেতে শুনতে হবে, সত্যটা গলার কাছে উঠে এলেও তাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, আসল প্রহসনটা সেখানেই। আগে ইচ্ছা করলে কখনো কখনো ওকে ঠাট্টা করা যেত, এখন তা-ও চলবে না। সব সময় সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, কখন সতাটা দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে!

মল্লিককে থামিয়ে দেবার অস্ত্র হাতে পেয়েছি। কিন্তু সে অস্ত্র তো সঙ্গে সঙ্গে তাকেও হত্যা করবে। রোগ সারাতে গিয়ে রোগীকে শেষ করা—সে অন্তত আমার কাজ নয়—জীবেশকে যতদূর জানি, তারও নয়।

এখন আর মল্লিকের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

জীবেশের চিঠিটা দুয়ারে রেখে উঠে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, আজ সন্ধ্যা-বেলাতেই মল্লিকের ওখানে আমার চায়ের নেমন্তন্ন। গোকুল পিঠে আর জর্দা-পোলাও খেতে হবে ওখানে।

কিন্তু এর পরেও আমি যেতে পারব? শুনতে পারব মল্লিকের বক্তৃতা? ওর স্ত্রীর হাতের মিষ্টির স্বাদ কেমন লাগবে আমার? একটা বঞ্চনার তিক্ততায় সমস্ত জিনিসটা অসহ্য কি হয়ে উঠবে না? আমি বসে থাকতে পারব সেখানে? আর প্রতি মুহূর্তেই কি মনে হবে, আমার সঙ্গে একটা গোখরো সাপের কাঁপ আমি বয়ে চলেছি—এক বিন্দু অসতর্কতায়, এক পলকের ভুলে তার ঢাকনাটা খুলে যেতে পারে?

এতগুলো জিজ্ঞাসার জবাব মনের ভেতরে কোথাও খুঁজে পেলুম না আমি।

একটা অন্ধ ক্রোধে মনে হতে লাগল, এ চিঠি জীবেশ আমাকে না লিখলেও পারত। মল্লিকের বক্তৃতার চাইতে সত্যের যন্ত্রণা অনেক বেশি দুঃসহ—কেন জীবেশ সেই যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিলে আমাকে?

তবু যেতে হল। না-যাওয়ার মতো কোনো কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

মল্লিক সাদরে অভ্যর্থনা করল : 'এসো প্রোফেসার, এসো—'

সহজভাবে ওর দিকে চাইতে পারছি না বলে আমিই অনর্গলভাবে কথা আরম্ভ করলুম। অকারণে একটা হাসির গল্প বললুম, পুজোর সময় কলকাতার মাইকের উপদ্রবে ভদ্রলোক টিঁকতে পারে না সে কথা বললুম, গতবার পুজোয় নাইনিতালে বেড়াতে গিয়ে কী কী প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে-

ছিলুম বিস্তারিত বিবরণ শোনালুম তার।

নিজের বড়ুনিতে নিজেরই যখন মাথা ধরে গেল, তখন বাধ্য হয়ে থামতে হল আমাকে। আর মল্লিক ফুরসৎ পেয়েই মুখ খুলল : 'আজ তোমাকে চা খেতে ডেকেছি কেন জানো? আমার স্ত্রীর আজকে জন্মদিন।'

সুখ সুখ আমার মনের ওপর একটা চাবুক পড়ল। মুখের রঙ বদলালো কিনা জানি না, সামলে নিয়ে বললুম, 'ছি—ছি, আগে বললে না কেন? তা হলে একটা কিছু—'

'প্রেজেন্টেশন আনতে, না? কিন্তু আমার স্ত্রীই বারণ করলেন। বললেন, ওসব ভালো নয়, এক পেয়ালা চা খেতে ডেকে মিছিমিছি লোকের খরচান্ত করা। শুভেচ্ছাটাই হল আসল। সত্যি বলতে কি, এমন কনসিডারেট মেয়ে—'

আমার কান দুটো জ্বালা করতে লাগল। আর সেই সময় ঘরে ঢুকল একটি লোক। বেঁটে খাটো, ভেঙেন চেহারা, পরণে আধময়লা জামা-কাপড়। ডাকল : 'বাবু!'

'কিহে জয়ানন্দ?'

'টেলিফোন এসেছে।'

'যাচ্ছি'—মল্লিক উঠে গেল, বলে গেল : 'এক মিনিট। আসছি এখুনি।'

জয়ানন্দ। আমার মাথার ভেতরে যেন বজ্র পড়ল। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমিই ডাকলুম ওকে।

'শুনুন?'

লোকটা হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে আমাকে তুমিই বলবেন। আমি বাবুর সামান্য কর্মচারী।'

'তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি।'

'আমি ও'দের বর্ধমানের অফিসে কাজ করি। কাল কলকাতায় এসেছি। বাবু আমার খুবই অনুগ্রহ করেন, বলতে গেলে ডেকেই চাকরি দিয়েছেন—নইলে খেতে পেতুম না।'

আমি বললুম, 'তোমারই ডাক নাম জুনু ঘোষ?'

লোকটা বললে, 'বাবু বলেছেন বুঝি আমার কথা?' হঠাৎ ওর মুখের ওপর একটা আতঙ্কের ছায়া নামল। বললে, 'আজ্ঞে আমি একটু ওদিক পানে যাই—কাজ আছে।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এই জুনু—জয়ানন্দ ঘোষ! না জেনে ওকে চাকরি দিয়েছে নাকি মল্লিক? জ্যোৎস্নার অনুরোধেই কি সাপ এনে পুষেছে ঘরে? আমি যা ভাবতে পেরেছিলুম, তার চাইতেও অনেক বড়ো সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মল্লিক, আরো ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তহাইতভার ছুঁড়ে দিতে চলেছি ওর কানে। শান দেওয়া হচ্ছে ওর জানো?

মল্লিক ফিরে এল। বলল, বলার ওকে সব কথা? আমার শরীরে আগুন জ্বলতে লাগল।

শরতের আকাশ থেকে খেয়ালী বৃষ্টি এল একপশলা। আমার জুতো জোড়া দরজার বাইরে ছিল, মল্লিক ডাকল :

'জুনু—'

'আজ্ঞে'—পোষা কুকুরের মতো ছুটে এল সে।

'বাবুর জুতোটা তুলে আনো ঘরে।'

'আনছি'—আমি ওঠবার আগেই সে নক্ষত্রবেগে আদেশ পালন করল। তারপর বললে, 'আজ্ঞে এবার ওপরে চলুন—মা খাবার দিয়েছেন।'

মা!

মল্লিক হাসছিল। বললে, 'চলো হে প্রোফেসার—'

কিন্তু ওর হাসির দিকে তাকিয়ে মন সুস্থ হয়ে গেল।

কিছুই জানে না—না আমার চাইতে স্ত্রীর কথা, জুনু ঘোষের কথা অনেক বেশি করে জানে মল্লিক? জুনু যে আজ জ্যোৎস্নাকে 'মা' বলে ডাকে, মুখের কথা পড়তে না পড়তে জুতো তুলে আনে—এটি ওর নিষ্ঠুর কুটিল প্রতিহিংসারই দিক? এবং জন্মের পর দিন স্ত্রীর পরিচয়ে সম্বন্ধে এই দীর্ঘ বক্তৃতা—এই প্রশংসার বন্যা—এটি তিক্ত তিক্ত বিষের সূচীমুখে স্ত্রীকে বন্ধ করে ফেলা—হাত-পা বেঁধে সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু আসিড ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারা? ওর উজ্জ্বল প্রসন্ন হাসির কি সেই বীভৎসতম ঘৃণ্যতার ছদ্মবেশ? মল্লিক কি দেবতা? মল্লিক কি শয়তান?

একমাত্র সে বলতে পারে, সে জ্যোৎস্না মল্লিক।

আর জ্যোৎস্না মল্লিক তা কোনোদিন বলবে না।

ইম্পিরিয়াল চা

দেশ-বিদেশের সকলের কাছে সমান প্রশংসিত

ইম্পিরিয়াল শ্রেষ্ঠ ওরিয়েন্টাল চা ইউকো প্রাঃ লিঃ

৪নং রসা উডসুট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন - ২২-৪১৩৩ তার নাম - "ADNIVAG"

সাজীদা কবিরাজের

মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

ইহাই একমাত্র কেশ তৈল

আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সুপ্রাপ্তে ঠিক রাখিয়া প্রথাত বৈজ্ঞানিক কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

কর্তৃক পরীক্ষিত ও সংযোজিত।

P-2-62

আর্য্য ঔষধালয় (চাকা) কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

ছায়া

লীলা মজুমদার

তাসজোড়া বাক্সে পুরতে পুরতে ডাক্তারবাবু বললেন, তা বললে তো আর হবে না, গোপেনবাবু, সব জিনিষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যানা করা যায় না। এত লোকে দেখেছে, সবাই কি আর মিথ্যে কথা বলে?

গোপেনবাবু নরম গলায় বললেন,

না, ঠিক তা বলছি নে, তবে কি জানেন, আত্মার যদি অসীম স্বভাব হয় তবে তার একটি সীমাবদ্ধ রূপ কি করে দেখা যাবে?

চৌধুরীমশাই বলেলেন,

সীমাবদ্ধ রূপ আবার কি? আত্মার বিস্তার যেমন অসীম, তার ক্ষমতাও তেমনি অসীম; একটা সীমাবদ্ধ রূপ নেওয়া তার পক্ষে কিছু শক্ত কাজ নয়।

দানু বললে,

আর রূপও নিচ্ছে না এক্ষেত্রে, শুধু একটু ছায়া নিচ্ছে, ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না, ভেতর দিয়ে গপ্পার ওপারের গাছ দেখা যায়, চাই কি ওর মধ্যে দিয়ে হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

চৌধুরীমশাই শিউরে উঠে, গায়ের চাদরটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

আসলে কি জানেন গোপেনবাবু, বিয়ে থা তো আর করেন না, তাই সব জিনিষ যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান। পৃথিবীতে যে এমন বহু জিনিষ আছে যার সামনে যুক্তি তর্ক খাটে না, এ অভিজ্ঞতা আপনার হবে কোত্থেকে?

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চলি, গোপেনবাবু, আমার বাড়িতেও কেউ রাত করার যুক্তি মানতে চায় না। কিন্তু আপনার ঐ অসীমের কথাটার মধ্যে যে কিছু নেই, তাই বা বলি কি করে। তবে কি জানেন, ছ ফুট লম্বা মানুষটার ফটোও সেটা একটা চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি কাগজে ধরে যায়। অবিশ্যি সে ছবিটা কিছু আর আসল মানুষটা নয়, তার হুবহু ছায়াটুকু ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি কালের পটেও হয়তো বিশেষ অবস্থায় ঘটনার আর পাত্র-পাত্রীর ছাপ পড়ে যায়, আবার সেই বিশেষ অবস্থা ঘটলে ফটোর মতো সেগুলো দেখা যায়। বলা যায় না কিছুই। চল, দানু।

দানু গলার কম্ফর্টার জড়াচ্ছিল, পাড়ায় ভালো গাইয়ে বলে তার সুনাম, পুজোর সময় সখের থিয়েটারে তাকে গাইতে হবে, কাজেই সাবধানের মার নেই। তাছাড়া এদের যা কথাবার্তা এমনিতেই কেমন গাটা শির-শির করতে আরম্ভ করেছে। জোর করে হেসে দানু বললে,—

ভূত নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলুন গোপেনবাবু? তার চেয়ে স্মাগলারদের সম্বন্ধে সাবধান হোন, দেখেছেন তো কাগজে কি লিখেছে, মেয়ে লাগছেনা নাকি আর এই সব জায়গাতেই কোথাও স্মাগলারদের আড়ত। মাঝ-গপ্পায় জাহাজ নোঙর করে সোনাদানা-গুলোকে জলে ডুবিয়ে দিলেই হোল! গভীর রাতে সাঙ্গপাঙরা নৌকা করে গিয়ে জল থেকে সেগুলো উঠিয়ে এনে পাচার করে দেয়। ব্যস আর কি চাই!

চৌধুরীমশাইও খুব হাসতে লাগলেন।

আরে, জলেও ফেলে না; এই তো শীতের হাওয়া দিতে সুরু হোল বলে, ওরা এখন জলে ডুব দিল আর কি, তুমিও যেমন! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, বয়ার তলায় শেকলের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়। গিট খুলে নিয়ে গেলেই হোল। তবে পুলিসও এর্তাদনে শুঁকে শুঁকে সব বের করেছে; তারাও এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে আছে, হাতে-নাতে এক ব্যাটাকে ধরতে পারলেই হোল, জেরা করে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিতে পারবে।

ডাক্তারবাবু বললেন,

এদের যেমন কথা! কিন্তু বাস্তবিকই একটু সাবধানে থাকবেন গোপেনবাবু, দুষ্টু লোকের কিছুই বলা যায় না। বে-আইনি কাজ করে করে শেষটা ওদের মনটা এমন হোয়ে যায় যে দুটো-একটা খুন-খারাবিতে কিছুই বাধে না। তার ওপর একেবারে এক থাকেন তো। আপনার কি মশাই, এক-আধটা পুরোনো চাকরও থাকতে নেই? এখানকার লোক যে মরে গেলেও এ বাড়িতে রাত কাটাবে না সেটা মানি।

গোপেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, পুরনো চাকর তো সঙ্গেই এনে-ছিলাম, তা সে কিছুতেই গপ্পার এতটা কাছে থাকতে রাজি হোল না। গপ্পার

গন্ধে নাকি তার হাঁপানি বাড়ে। একটা রাত মোটে ছিল।

চৌধুরীমশাই বললেন,

গঙ্গার গন্ধ-ফন্ধ কোনো কাজের কথা নয় আসলে আপনার ঐ মালী মজুররা সেক তাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে জাগিয়েছে। বুদ্ধির কাজই করেছে। আপনি তো আর ভালো কথা শুনবেন না। পই-পই করে বলছি, আমার ছোট বাড়িটাতে উঠে আসুন, ঐ রাঁধুনেই রাঁধবে, গঙ্গার ঐ সাঁৎসেঁতে হাওয়া থেকেও রেহাই পাবেন, চাই কি পুরোনো চাকরটাও ফিরে আসতে পারে। মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া। তা ভালো কথা কে শোনে?

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে পর, ছোট ফটকে তালা দিয়ে, মোটা আমেরিকান তারের জালে ঘেরা বারান্দায় তালা দিয়ে, গোপেনবাবু গঙ্গার ধারের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। আসলে ঐ একই বারান্দা, গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, আগাগোড়া তারের জালে মোড়া। আগে নাকি জোয়ারের সময় দু-একবার মানুষ-খেকো কুমীরকে একেবারে বাড়ির সীঁড়ানো পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যেত, তাই এই ব্যবস্থা। গোপেনবাবু কেনবার আগে ত্রিশ-চল্লিশ বছর নাকি বাড়িতে বড় একটা কেউ বাস করে নি। বড় জোর একটা রাত কি দুটো রাত।

বারান্দার বাইরেই রং-বেরঙের ভাঙ্গা চীনেমাটির বাসনের টুকরো বসানো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চাতাল। এক কালে এখানে ফোয়ারা থেকে জল বেরুত, ফোয়ারার চারধার বাঁধানো, গোটা দুই পাথরের বেঞ্চিও রয়েছে।

বারান্দা থেকে গোপেনবাবুর মনে হতে লাগল ফিকে তারার আলোয় একটা বেঞ্চির কোণায় কে বসে রয়েছে। সারা গায়ে সবুজ কাপড় জড়িয়ে, পাৎলা ছিপ-ছিপে একটি মেয়ে যেন গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

গোপেনবাবুর ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে এই প্রথম তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল। মনে হচ্ছে যেন এক ঢাল ভিজে চুল মাথার ওপর জড়ো করে রেখেছে, কানে গলায় গয়না চিকচিক করছে, গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ। তারার আলোতে সত্যি কতখানি দেখছেন আর কতখানি কল্পনা করে নিচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির পাশে বেঞ্চির ওপরে রাখা আর ঠাহর লম্বা একটা কালো বাক্সও চোখে পড়ল।

এতক্ষণে গোপেনবাবুর চৈতন্য হল। তাইতো চোরাকারবারিরা তো এই রকম সব সুন্দর মেয়েদেরই কাজে লাগায়। কথাটা তো তাঁর অজানা নয়; সত্যিই তো এ মেয়েকে কখনো কেউ সন্দেহ করতে পারে না, একটা কোমল শ্যামল লতার মতো বেঞ্চির ওপর হাল্কা শরীরটা কেমন এলিয়ে রয়েছে। এতখানি দূর থেকে তার মাধুরী টের পাচ্ছেন গোপেন-বাবু, কিসের একটা মৃদু সুগন্ধও যেন নাকে আসছে।

হাতে একটা বন্দুক নেই, লাঠি নেই, অমনি বারান্দার জালে বসানো ছোট দরজাটির ছিটকিনি খুলে গোপেনবাবু বাইরে এলেন। মোটাসোটা কর্সা মানুষটি, মাথার চুল পাৎলা হয়ে এসেছে, নাকের ওপর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা বসানো, চোখটা দিন-দিন যেন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কে জানে কাছে গিয়ে হয়তো দেখবেন সব ভুল, কি দেখছেন আর পাঁচ রকম গল্প শুনে কি মনে করে বসে আছেন। ওখানে সত্যি কারো থাকার সম্ভাবনা কম, পথ তো শুধু গঙ্গা, নয়তো দু ফুট উঁচু পাঁচিল টপ-কানো। তাছাড়া এ এলাকার কেউ রাত এগারোটার সময় যে এ বাড়িতে আসবে না সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ এলাকাতে যারা থাকে তারা হল সব আটপৌরে মানুষ। অমন মেয়ে এখানকার হবে কেন?

বারান্দা থেকে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে, চাতালে বসানো এক মানুষ উঁচু লাল গোলাপের গাছের সারি পার হয়ে, শুকনো ফোয়ারার ধারে এসে দেখেন, যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই, বেঞ্চিতে কেউ বসে নেই।

কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে এল। তবে কি গোপেনবাবু মনে মনে চেয়েছিলেন যে, ঐখানে ঐ রকম একটি মেয়ে সত্যি থাকুক? ওরকম মেয়ে হয় কখনো? ও তো চল্লিশ বছর ধরে দেশী বিদেশী কাব্যে পড়া যত সুন্দরী তাদের রূপরস দিয়ে মনগড়া একটা ছবি, একটা ছায়া, কি যেন বলছিল দাদু, ওর মধ্যে দিয়ে চাই কি হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু কি একটা অনভ্যস্ত সুগন্ধে বাতাসটা তবে কেন ভারি হয়ে আছে? গোপেনবাবু চারদিক চেয়ে দেখলেন গন্ধরাজের ঝোপের পাশ সবুজ ছায়া থেকে খানিকটা ফিকে সবুজ যেন আলগা হয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ তাকে এতটা কাছে দেখে গোপেনবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

মেয়েটি ম্লান একটু হেসে বললে,

বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন। এটা লুকিয়ে রাখুন। বলে বুকে আঁকড়ে ধরা কালো বাক্সটি পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে গোপেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে। গোপেনবাবুর কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না, অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় বললেন,

কি—কি আছে ওতে?

সে খিল-খিল করে হেসে উঠল, সে হাসি গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে গঙ্গার বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই, সে জানে পুলিশরা কোথায় ওর সন্ধানে ঝাপটি মেরে বসে রয়েছে। চোরাকারবারি গোপেনবাবু আগে কখনো চোখে দেখেন নি, তাই ভালো করে তাকে দেখলেন। ইস্, এরা এত রূপসীও হয়! চোখে ধাঁধা লেগে যায়। কপাল ছিরে বেঁটে বেঁটে ছিপে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছি, দুকানে সাঁটা সবুজ পাথর, তারার আলোয় ঝিকমিক করছে, পাৎলা পাখির ডানার মতো ভুরু, কি যে সুক্ষ্ম কি যে মসৃণ, জোরে কথা বলতে ভয় করে। অথচ ওরই ঐ আধাহাতে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কোথাও একটা মুখ-কাটা ভোঁতা বন্দুক লুকিয়ে আছে। অব্যর্থ টিপও নাকি চোরাকারবারি মেয়েদের, দাদু কোন ভাগ্যে পড়েছে। এর হাতের আঙ্গুলগুলো সত্যি সত্যি চাঁপার কলির মতো, একটা আঙ্গুলে এই বড় একটা সবুজ পাথর বসানো আংটি পর্যন্ত।

হাসি হয়ে কেন লোকে পাপ করে, কিসের জন্যে নরকে যাওয়া সার্থক মনে হয়, সে সহসা হঠাৎ গোপেনবাবু বুঝে ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বাক্সটি ধরলেন। এত ভারি যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। মেয়েটি খুব কাছে এসে হেসে বললে,

খুব ভারি, না? খুলেই দেখুন না এত ভারি কেন।

বলে বাক্সের ডালা নিজেই তুলে দিল। বাক্সভরা সোনার মোহর। সে বললে,

একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখুন, কেমন?

বলে এক মুহূর্তের জন্য গোপেন-বাবুর হাতের কব্জির ওপর নরম কচি পাঁচটি আঙ্গুল রাখলে।

গোপেনবাবুর কান ঝিমঝিম করতে লাগল, ভাবলেন একেই বোধহয় সুখমৃত্যু

বলে। পর মুহূর্তেই মেয়েটি অনেকখানি ঝুঁকে সরে গেল। বলল,

ওগুলো আমার নয়। পরে গোলমাল চুকে গেলে, বনানী দেবী, বনহুগলি এই নামে পাঠিয়ে দেবেন কেমন? কিন্তু বলতে পারলেন না গোপেনবাবু। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলেন। সে একটু একটু করে সরে যেতে লাগল, দেখতে দেখতে এতটা তফাতে চলে গেল যে, এই তার সবুজ সাড়ি গাছের সারির সঙ্গে মিশে যায়, আবার এই যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তারপর গলার ধারের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়ির সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল, আর তাকে আলাদা করে দেখা গেল না।

গোপেনবাবু বাক্স নিয়ে ঘরে এলেন। মাথার ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার, কোথায় লুকোতে হবে তাও বলে দিতে হল না। চাতালের সিঁড়ির পাশেই পাতা-বাহারের চাঁনেমাটির টব সরিয়ে, ছোট খুরপি দিয়ে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বাক্স পুঁতে, ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে, টবটি আবার যথাস্থানে রেখে, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে শুয়ে পুলিসের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এল তারা ঠিকই, ঘণ্টা দুই পরেই, সঙ্গে তাদের চৌধুরীমশাই, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাণ্ডা তিনি, এসব ব্যাপারে বড় পড়েন না। বড় ফটকের ঘণ্টা দিয়ে একটু লজ্জিতভাবে এসে ঘুটো একটা গ্রাম্যতা প্রশ্ন করল শুধু।

জিগ্যেস করে হয় বলে করছি, স্যার, নইলে এদিকে যে কালো নদীর জিন ছেড়ে আসা সম্ভব নয়, সেটা আমরা খুব জানি। নদীতেও আমাদের লোক আছে যে। ওরা মেয়েছেলেরা করতে পারে না এমন কাজ নেই, তাই একবার খোঁজ করতে আসা। আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুন গে। জানলেন দরজার তালা দেন আশা করি? এ গাঁয়েরই কারো কারো সঙ্গে ওদের সড় আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনভাবে সোনাদানা চলান হয় যে, যে-আইনি বলে ধরে কার সাধ্যি! চলি স্যার।

তারা গেলে পর দরজার তালা দিয়ে গোপেনবাবু লম্বা দেবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগে থাকল।

পরদিন সকালে রাধেশ্যাম এসে চা স্টোভ নিয়ে গোপেনবাবুকে ডেকে তুলল। তার কাছে খিড়কি দোরের চাবি থাকে। চোখের কোলে তার কালি।

কি হোল রাধেশ্যাম?

সে বলল,

কাল রাতে গাঁয়ে কেউ ঘুমোয় নি, বাবু, সারারাত খানাতল্লাসি চলেছে। আমিনদের বাড়িতে মেয়েছেলেটি ধরা পড়ে গেছে। তক্তাপোষের নিচে সোনা। তাই দেখতে গেলাম, কি সোন্দর, মাইরি। কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

গোপেনবাবুর হাতখানি কাঁপছিল, অনেক করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, সোনা হরতো আর কেউ এনেছে? ও মেয়ে আনবে কেন?

সে তো তাই বলছে। নাকি কিছুটি জানে না। এমনি বেড়াতে এসেছিল, আমিনের ঠাকুমা ওর মাইমা ছিল, হেনা-তেনা কত কি। খুব কাঁদছিল মেয়েটা। ঐ দেখুন গাড়ি এল, ওকে থানায় নিয়ে যাবে। কি হোল গো, বাবু?

গোপেনবাবু পেয়ালা ফেলে আধখালি পাথালি ছুটে চললেন। কাঁদছে মেয়েটা? এতক্ষণে ভাবছে গোপেনবাবুই খোঁজ দিয়েছেন। কেমন অসহ্য লাগল ভাবনাটা। নীচে কাছে পেঁপে দেখেন লাল নীল কাপড় পরা, এক গা সোনার গয়না পরে, ঠোঁটে গালে রং মেখে লম্বা চওড়া এ কোন মেয়েকে তোলা হচ্ছে? আঃ, বাঁচা গেল।

রুমাল দিয়ে হাসি চেপে গোপেনবাবু ঘরে ফিরে রাধেশ্যামকে নতুন করে চা করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দানুকে নিয়ে চৌধুরীমশাইও এসে উপস্থিত, চুল সব উস্কোখুস্কো, উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। দানু বসে পড়েই বললে,

শেষটা গেলি তো বাছা ফটকে? মেয়েছেলে হয়ে এসবে ঢোকা কেন! চা খাওয়ান গোপেনদা। চৌধুরীমশাই পা-দুখানি মেলে দিয়ে বসলেন। দানু বললে,

যাক, আপনার একটা বিপদ ঘুচল। চোরাকারবারি মেয়ে ধরা পড়ল। এবার ভূত হইতে সাবধান।

চৌধুরী মশাই বললেন,

না, ঠাট্টা নয়, রটে এমনিতেই গা ছমছম করে, তাই কল আর কিছু বলিনি, কিন্তু এ বাড়ির দুর্নাম কি একেবারে মিছিমিছি হোয়েছে ভেবেছেন? এটা জগু বোসের বাগানবাড়ি ছিল তা জানেন? মেউলে হোয়ে জগু বোসও গেল, তার সুন্দরী বাইজি বাঈতলা মোহর নিয়ে নিখোঁজ হোল, সেও প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর হোতে চলল। জগু বোসের বৌ বনানী দেবী এখনো বেঁচে। নাকি বন-হুগলিতে বুড়ো বয়সে একরকম না খেয়ে দিন গুনছে।

শিরায় মধ্যে রক্ত চলাচল যেন থেমে যায়। নাকি ছবি, নাকি ছায়া, ওদের মধ্যে দিয়ে নাকি হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

নিরুম দুপুরে নির্জন চাতালের ধার থেকে টব সরিয়ে বাক্স তুলে, তুলো দিয়ে এঁটে প্যাক করে, চটে সেলাই করে, গোপেনবাবু কলকাতায় এসে বড় পোস্টাপিস থেকে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বনহুগলিতে রেজিস্টার্ড পার্সেল পাঠালেন। ফিরবার সময় ভিনটে বেজায় উড়নচণ্ডে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কাজকর্ম না শিখলে চলে কখনো?

তাছাড়া সে যে আর কখনো আসবে না তা কি তিনি জানেন না?

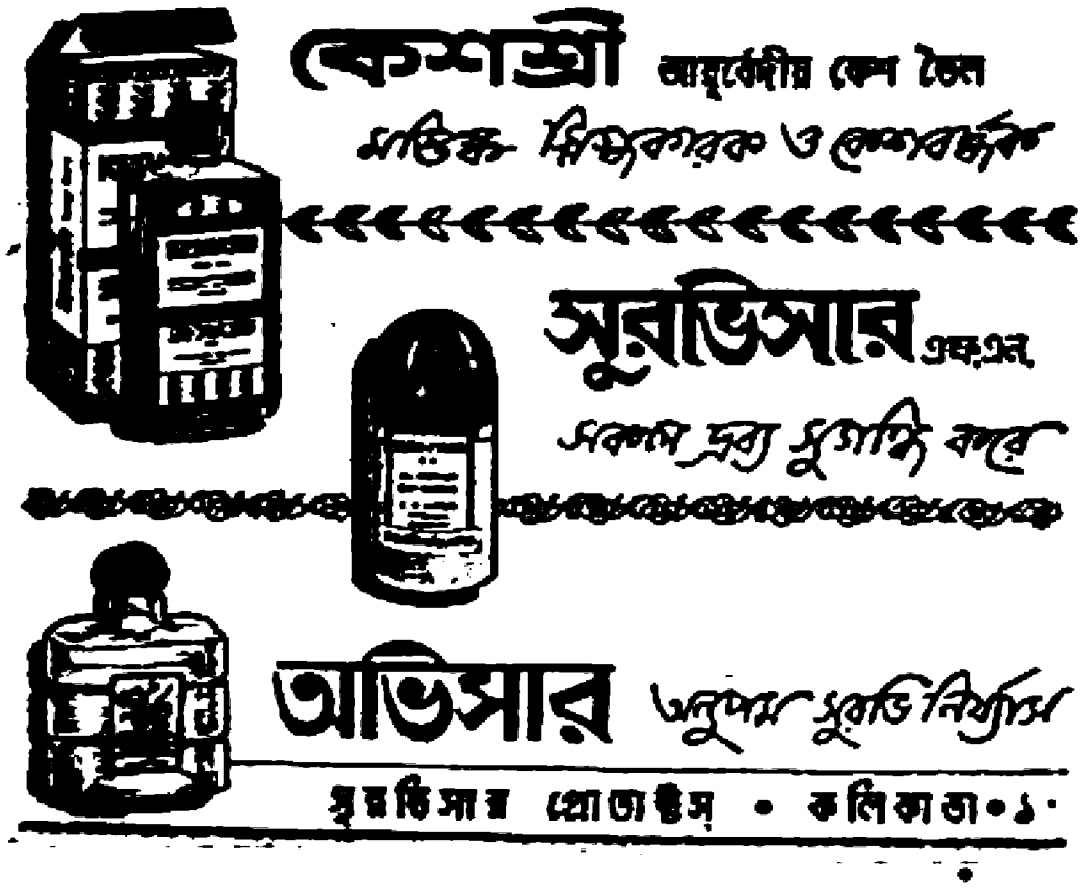

CENTRAL LIBRARY

খবরটা ভালো করে শোনার আগেই আমার ঘরের রমণীটির মুখখানা যা হল তা দেখলে কোনো ভদ্রলোকের আর খবর দেবার উৎসাহ বোধ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ভালো খবর শোনাতে গেলেও যদি এই মুখ হয়। কিন্তু ঘরে তখন তার বড় জাটিও ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সহৃদয়া। ছোট জায়ের নিষ্পৃহ অবহেলা তুচ্ছ করেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন, থামলে কেন, কি হল বলো না শুনি?

আমি প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক নই। অর্থাৎ, ঘরনীর মুখের প্রায়-অপমানকর অভিব্যক্তি-সহ 'হুঃ!' বচনের ঘায়ে শুয়ে-বসার আহত হবার মত ভদ্রলোক নই। তা ছাড়া খবরটাও ফেলনা নয় যখন, প্রাতৃজায়ার আগ্রহটুকু অবলম্বন করেই উৎসাহের আঁচটা আর একবার উঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার আগে তাঁর উদ্দেশে স্ত্রীটি ছোট-খাট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শুনবে আবার কি, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এবারে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে যত্নো গ। শুনতে হয় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসে শোনোগে, রাত জেগে আমাকে এখন এক গাদা খাতা শেষ করতে হবে—

বিরাগের যথার্থ হেতু আছে। তার ইস্কুলের বাণ্মাসিক পরীক্ষার শ-চারেক খাতার নম্বর বসাতে হবে। আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ছুটি শেষ। ইস্কুল খুললেই মেয়েরা নম্বর নম্বর করে মাথা খাবে। সংসারের ঝামেলায় গোটা ছুটিতে পঞ্চাশটা খাতাও দেখা হয়নি। কোনদিন হয়ও না। এ-ব্যাপারটায় বরাবরই সে আমার সাহায্যপ্রত্যাশী। এবারেও যথা-রীতি কথা দিয়েছিলাম দেখে দেব। কিন্তু দেব দেব করে এ পর্যন্ত একটা খাতা ওলটানোরও ফুরসত হয়নি। ফলে ভালো খবর শোনারও ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা গেছে। বিছানায় খাতার গাদা ছড়িয়ে বসেছে।

কথা না বাড়িয়ে আমি পকেট থেকে লম্বা খামটা বার করলাম। তার ভিতরের বস্তুটি বার করতে গিয়ে খামের একটা ধার ছিঁড়ে গেল। একটান দিয়ে বাকি-টুকুও ছিঁড়ে ফেললাম। খামের ভিতর থেকে যা বেরুল, আচমকা দুজনেই তারা মন্ত্রমুগ্ধ। করকরে নোট্ একতাড়া, সব একশ টাকার। কড়া কলপ-দেওয়া ইস্তিরিকরা নতুন জামাকাপড়ের মত খড়খড়ে নতুন।

বউদিরই বাক্‌স্ফূর্তি হল প্রথম, ও-মা, সত্যিই তো রে! কত টাকা?

আড়াই হাজার। পরে আরো আড়াই হাজার পাব।

আর খবর শোনার ধৈর্য থাকল না। এক-গাল হেসে খবরটা দাদাকে অবিলম্বে শোনাবার জন্যে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অতঃপর স্ত্রীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি। কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোর একেবারে কাটেনি। নোটের তাড়া হাতে তুলে নিল। দেখল। নিজের আগোচরে নাকেও ঠেকালো একবার।

টাকার গন্ধই তো?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল।—বেশ যাও! ছড়ানো খাতাগুলো এক-হাতে কোঁটিয়ে সরিয়ে দিল। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বসতেও পারি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বইটা নিলে?

বই না, ছোটগল্প। বাড়িয়ে দিতে হবে—

কোন্ গল্পটা?

হেসে বললাম, তোমার সেইটাই।

খুশি হবে জানতাম। শীলা ভারী খুশি। নাম শীলা বটে, কিন্তু আজকাল নামটা খুব মানায় না ওকে। সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। আমার ওপর হামেশা তার রাগ-বিরাগের কাপটটা খুব নিড়াতের ঝাপর নয় এখন। তবু এই নামে এখন আর যে ওকে মানায় না

এ-কথা এক আমার ছাড়া আর বোধহয় কারো মনে হয়নি। 'সেই গল্পটা' বলার পিছনে আর তার খুশির পিছনে একটা মানসিক যোগ আছে।

গোড়ার গোড়ায় আমার সব লেখার প্রতি তার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। কি লিখছি, কি লিখব, কি লেখা উচিত, সে-সম্বন্ধে আলোচনা হত। কোন্ গল্পের পরিণতি কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে আগে থাকতে মতামত ব্যক্ত করে বসে অনেক সময় বিভ্রান্তও করত। উল্টো রাস্তায় গিয়ে অনেকবার মন কষাকষিও হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক স্রোতের ধারায় পড়ে লেখার ওজন টাকার ওজনে মাপতে মাপতে স্বাভাবিক আগ্রহটুকু এখন স্বাভাবিক নিস্পৃহতায় এসে ঠেকেছে। কিছু লিখতে বসলে বড় জোর জিজ্ঞাসা করে, কার জন্য লিখছ বা কত টাকা দেবে? উপন্যাস লিখতে বসেছি দেখলে শুধু একটু খুশি হয়। এর পিছনে কিছুটা স্ফীত অঙ্কের আশ্বাস আছে। সংসার নির্বাহের প্রয়োজনে এই আশ্বাসও না থাকলে সবই অন্ধকার, তা আমিও জানি। শুধু কোনো আশ্বাসের কথা না ভেবেই আগে এক-একটা উপন্যাসের জট ছাড়িয়ে লক্ষ্যের মোহনায় পৌঁছানোর চেষ্টায় দুজনের অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে। সেই সব স্মৃতি কেন জানি আমার ভিতর থেকে মুছে যায়নি একেবারে।

কিন্তু আমি ওর দোষ দিই না একবারও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পরে সাহিত্যপ্রীতির দ্বিতীয়কোটাও আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। যত রাত বাড়ে ততো মেজাজ চড়ে। মেয়েটা তেমন দোষ না করেও কাঁদালো কথা শোনে, সময়ে না ঘুমুলে অবুঝ ছেলেটার পিঠেও দুচার ঘা পড়ে। তারপর নিজে গজগজ করতে করতে শোয়। কিন্তু রাতের গজগজানি বেশিক্ষণ শুনতে হয় না, অভিযোগের তালিকার মাঝামাঝি পৌঁছনোর আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তার সব থেকে বেশি রাগ ইস্কুলটার ওপর। আমার লেখার অনিয়মিত রোজগারের সঙ্গে ওর স্কুলের নিয়মিত বেতন টাকা যুক্ত না করলে দুহাতে কচুরি-পানা ঠেলেও সংসারতরীটি মাসের শেষের ঘাটায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া শক্ত। আজ তিন বছর ধরে চাকরি ছাড়ার জন্যে এক পায়ে প্রস্তুত সে। ওর বেতন টাকার জায়গায় আমার রোজগার আর একশটা টাকা বাড়লেই চাকরির মুখে কাঁটা মেরে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার রোজগার বাড়বে সে প্রত্যাশা আর বোধ-হয় করে না। অথচ আমার রোজগার আসলে সত্যিই কিছু বেড়েছে। সংসারের খরচ সেই তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে বলে বাড়তিটুকু তার চোখেই পড়ে না। সে-কথা বলতে গেলে চোখে খোঁচা পড়বে। তাই এ-ব্যাপারে আমি প্রায় মৌনী।

তার অভিযোগ, ইস্কুলের হেড মিসট্রেস, অ্যাসিসটান্ট হেড মিসট্রেস, সিনিয়র টীচার, সেক্রেটারী সকলেই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। চাকরি করছে বলে মাথা কিনেছে ভাবে। একধার থেকে ওর ঘাড়ে ক্লাস চাপায় আর খাতা চাপায় আর উপদেশের ছলে কড়া কথা বলে। অভিযোগগুলো সত্যি কিনা আমি কখনো যাচাই করে দেখিনি। হতেও পারে সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, চাকরিটা চক্ষুশূল বলেই অভিযোগগুলো চার-গুণ সত্যি হয়ে সর্বদা ওর মাথায় ঘোরে। তাছাড়া ওপরওয়ালা বরদাস্ত করা যাত নয় যার, ওপরওয়ালার সহজ কথাও সে বাঁকা শুনে থাকে। কিন্তু এইসব বিশ্লেষণ আমার একান্ত নিভৃতের।

এবারে 'সেই গল্পটা'র ইতিবৃত্ত বলি। লম্বা ছুটি-ছাটা এলে ঘরনীর মেজাজ সর্বদাই অন্তত সপ্তমে চড়ে থাকে না। তখন ইচ্ছেমত সংসার আর ছেলেমেয়েরের দেখাশুনা করেও আমার সদ্য কোনো লেখা নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামানোর অবকাশ পায়। সমাপিকা গল্পটা ওর গত ছুটিতে লেখা। গল্পটা লেখার সময়ে একটা ডেডলাইনের যোগ হয়েছিল। অর্থাৎ শীলার অবকাশ ছিল, আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, আর সম্পাদকের গল্পটা অবিলম্বে হাতে পাওয়ার তাড়া ছিল। আমি লিখে উঠতে পারছিলাম না, শীলা আমার হয়ে কলম ধরেছে। আমি বলেছি, ও লিখেছে। ফলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মতান্তর ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত ওর মনমতই গল্পটা খাড়া করে তুলেছিলাম। শেষ হতে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলেছিল, সত্যিই গল্পটা ভালো হয়েছে।

আমি যেমনই লিখে থাকি, গল্পটা ওর ভালো লেগেছিল। আমার নির্বাচিত সঙ্কলনে ও-গল্পটার স্থান নির্ঘাত দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলেছে, ওকে জব্দ করার জন্যেই সঙ্কলনে এটা বাতিল করা হল।

কিন্তু গল্পটা সত্যিই এমন কিছু অভিনব নয়। লেখকের বা লেখক-সাধনীর বয়সটুকু ছেঁকে তফাত করে দিলে এমন কিছুই নয়। তবে বয়সের ওজনটাও একেবারে ফেলনা নয় বটে। গল্পের বিষয়বস্তু দুকথায় বলে নেওয়া দরকার। একটি সাধারণ ঘরের ছেলে একটি সাধারণ ঘরের রূপসী মেয়েকে ভালবাসত। দুজনারই সংগ্রামী জীবন। ছেলেটি মরীচিকার আশায় ক্রমশ বাঁকা পথে তলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ যুগেও একটি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ের অনেক শক্তি। সে সোজা রাস্তা ধরেই দৃপ্ত চরণে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুজনের মানসিক ব্যবধান বাড়ছে, বস্তুতন্ত্রীয় ফারাক বাড়ছে। উপসংহারে চূড়ান্ত স্খলনের এক বেদনা-করুণ মুহূর্তে মেয়েটি অনেক প্রলোভন তুচ্ছ করে ছেলেটিকে আবার সুস্থ জীবনের পথে টেনে তুলছে।

গল্পটা কেন শীলার এত পছন্দ হয়েছিল সেটা এবারে সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, তার অতটা আগ্রহে যোনা বলেই হয়ত আমারও নিতান্ত মন্দ লাগেনি। আরো দুচারজন যখন প্রশংসা করেছিল গল্প-টার, তখন এমনও মনে হয়েছিল নির্বাচিত সঙ্কলনে ওটা থাকলেই হত। পরের সংস্করণে ওটা জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আছে।

এই সমাপিকা গল্পটাই এক নামকরা চিত্র-প্রযোজকের মনে ধরেছে। তারই ফলে আমার নগদ আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্তি, আর, ওটা ঠিকঠাক করে দিলে আরো আড়াই হাজারের প্রতিশ্রুতি।

একটা দিনের মধ্যে বাড়ির হাওয়া বদলে গেল। গল্পটা ভালো করে বাড়িয়ে দেবার জন্যে শীলা উঠতে-বসতে তাড়া দিতে লাগল। সংসার আর ইস্কুলের খাটুনির পরেও রাত জেগে শেষে কতটা কি করলাম। তর্ক করে, পরামর্শ দেয়, কোথায় অদল-বদল করা দরকার নির্ভয়ে আর নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করে। নিজের

দিক থেকে এবারে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি, আর পরিশ্রম সার্থক হল বলেও ভাবছি।

লীলার খেদ, অনেক আগেই চিত্র-জগতের দিকে চোখ রেখে লেখা উচিত ছিল। তার আশা, এ ছবিটা ভালো হলে বছরে একটা করে অন্তত ছবির ফরমাইশ হবেই। আর তা হলেই সে অনায়াসে ইস্কুলের চাকরি ছাড়তে পারবে। এই লেখাটা শেষ হলে আর একটা ছবির প্লট ভাবার তাগিদ দিয়ে রেখেছে সে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপিকা লেখার কাজ শেষ হল। প্রযোজক শুনলেন। শুনে গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর ছবির সুনিশ্চিত আর্থিক লাভের দিকে চোখ রেখে ছোট-খাট একটা বক্তৃতা করে ফেললেন। ছবির গল্পে কোন্ ধরনের আবেগের প্রাধান্য থাকা দরকার, প্রথম প্রণয়-পর্বটি কতটা ঊন-ঘন হওয়া অনিবার্য, নায়ক-নায়িকার আবেগ-মধুর সান্নিধ্যের উপ-যোগী কিছু সিচুয়েশনের অবতারণা, ইত্যাদি। তাঁর নির্দেশ, গল্পের এই ত্রুটিগুলো বেশ ভেবেচিন্তে সেরে দিতে হবে।

স্টুডিওতে প্রযোজকের ঘরে বসেই আবার দিনকতক ধরে মেরামত আর নতুন সংযোজনের কাজটি সম্পন্ন করতে হল। শুনে প্রযোজক বললেন, মোটামুটি হয়েছে, এখন এঁরা কি বলেন দেখি।

এঁরা অর্থাৎ, পরিচালক, আলোক-শিল্পী, এডিটার প্রভৃতি। সকলকে নিয়ে প্রযোজকের ঘরে আবার একদিন শোনার আসর বসল। শোনার পরে সকলেই ঠিক প্রযোজকের মতই নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি দুরু দুরু বক্ষে তাঁদের মতামতের অপেক্ষায় বসে আছি।

পরিচালক নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, গল্প ভালোই তবে অনেক জোড়াতাপ্পি লাগবে এখনো। তাঁর মতে গল্পে কিন্তরসসৃষ্টির দিকে আমি আদৌ চোখ দিইনি। যা ঘটতে পারে তাই শুধু ঘটছে, অপ্রস্তুত দর্শককে হকচকিয়ে দেবার মত ঘটনা-সংযোজন দরকার। এছাড়া মাঝে মাঝে কমিক রিলিফ না থাকলে গল্প দর্শকের বুকে চেপে বসবে। সেদিকে চোখ রেখে দুই একটা চরিত্র আমদানি করতে হবে। এছাড়া আড়াসে-ইঁদিগতে যা-কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করে সাধারণ দর্শকের বোধগম্য করে দিতে হবে—পয়সা তো তারাই দেয়।

প্রযোজক এবং আর সকলে একবাক্যে সমর্থন করলেন তাঁকে। এরপর আলোক-শিল্পী তাঁর ক্যামেরা স্কোপ প্রসঙ্গে কিছু পরামর্শ দিলেন, আর এডিটার ছবির স্পীড প্রসঙ্গে। মাথাটা কি এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণে ভরাট হয়ে উঠছিল। বাকি পাওনা আড়াই হাজার টাকার অঙ্কটাও কেমন ঘোলা-মোছা লাগছে। যাই হোক, প্রযোজকের অফিস-ঘরে বসে আবার পনের বিশ দিনের একাগ্র পরি-শ্রমের পর অদল-বদল সংযোজন-বিয়োজনের ব্যাপারটা সম্পন্ন হল। কিন্তু কি যে দাঁড়াল আমি সঠিক বলতে পারব না। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কর্মকর্তারা শুনে মন্তব্য করলেন, চলতে পারে—।

আমার বুক থেকে যেন পাহাড় নামল। কিন্তু সা সামাই উচিত ছিল। এর দিন দুয়েক পরে বাকি টাকাটা পাওয়ার আশাতে প্রযোজকের কাছে এসেছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, এসেছেন খুব ভালো হয়েছে, আপনাকে খবর দেবার জন্যে এক্ষুনি লোক পাঠাব ভাবছিলাম। চলুন একবার ঘুরে আসি—

কোথায়?

আসুন না—

প্রযোজকের গাড়িতে চেপে যে বাড়ির গেটের সামনে এসে থামলাম, সেই বাড়িটা আমি চিনি না। কিন্তু গাড়িতে বসে শুনেছি কার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে চলেছি। শোনার পর থেকে মনে মনে আমি বিলক্ষণ বিচলিত। বহু নাম শোনা আর বহু ছবিতে দেখা যশস্বিনী চিত্র-তারকার আবাসে এসেছি আমরা। সদ্য বর্তমানের ছবিটির ইনিই নায়িকা। উনি নিজেই নাকি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন। প্রযোজককে বলেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আছে।

খবর পেয়ে মহিলা এলেন। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। প্রযোজক হেসে বললেন, অসামী হাজির, আপনি বোঝা-পড়া করে নিন।

আসামীর মুখ দেখে মহিলাটির হয়ত করুণা হল। বললেন, আগে একটু চা হোক, কেমন?

আমি কৃতার্থ হয়ে বেকার মত মাথা নেড়ে বসলাম, অর্থাৎ, চায়ের তৃষ্ণা আপাতত নেই জানালাম। মহিলা সরাসরি কাজের কথায় এলেন। বললেন, আপনার গল্প ভালো, কিন্তু আপনার নায়িকার প্রতি আপনি সুবিচার করেননি। আগুনের ফুলকির মত মেয়ে—তার কাজ আর সংলাপও তেমনি হওয়া দরকার। নায়কের প্রতিটি চাল-চলন তার চোখের ওপর থাকবে, নায়ককে সে লাগামের মুখে রাখবে, সংঘাত আরো জোরালো হবে—অথচ ভিতরে ভিতরে সে কাঁদবে। এ-ধরনের কিছু সিচুয়েশন ভাবুন, নইলে মেয়েটির আদর্শ তেমন উঁচু হয়ে উঠছে না।

প্রযোজকের সপ্রশংস অভিব্যক্তি। ফেরার পথে গাড়িতে বসে বললেন, আপনার গল্প পছন্দ হয়েছে বলেই এতটা ইনটারেস্ট নিচ্ছে—ভালই তো হল, ও'কে যত বেশি ছবিতে দেখানো যায়। যা বললেন ভেবেচিন্তে করে দিন।

করে দিলাম।

এরপর টাকার জন্য আবার দিন দুয়েক প্রযোজকের স্টুডিও-অফিসে হানা দিয়েছি। কিন্তু ছবির প্রাথমিক কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে আগমনের উদ্দেশ্যটা আমি বলে উঠতে পারছিলাম না। সর্বদাই পাত্র-মিত্র পরিবৃত হয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু অদৃষ্টে তখনো কিছু বাকি ছিল জানতুম না।

সে-দিন এসে দেখি ঘরে গুরু-গম্ভীর মুখে ছবির নায়ক বসে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক তাঁর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন একটু। তারপর আমাকেই বললেন, ইনি তো আপনার এই গল্পে কাজ করতে চাইছেন না।

আমি হতভম্ব। এই নায়কটিও যশস্বী শিল্পী, হেলাফেলার লোক নয়।

কম্পিতবক্ষে আমি তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসলাম। কিন্তু নায়কটি আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন।

আমি অপরাধীর মত প্রযোজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল.....

নায়ক আমার দিকে ফিরলেন এবার। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্ত মুখে বললেন, লেখকদের গল্প বেশিরভাগই নায়িকাপ্রধান হয়, কিন্তু এতটাই যদি হবে, নায়ক চরিত্রের দরকার কি? শুধু নায়িকা নিয়েই গল্প হয় না?

আমি নির্বিরোধী মানুষ, তবু একটা রুক্ষ জবাবই মুখে এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এক-ঘর উৎসুক লোকের চোখের সামনে জবাব মুখেই থেকে গেল।

নায়ক ধীরেসুস্থে বললেন, আপনার নায়িকার পাশে নায়কটি ডলপুতুলের মত হয়ে গেছে—তার স্কোপ বলতে কিছু নেই। সে অধঃপাতে যাক বা যেখানেই যাক, তার মধ্যে জ্বালা থাকবে, যাতনা থাকবে, পুরুষকার থাকবে। প্রতিষ্ঠা পেল না বলে একটা মেয়ের হাতের খেলনা হয়েও যে থাকতে রাজি নয় সে—এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে আমার এতে এসে লাভ কি!

প্রযোজক তাড়াতাড়ি বললেন, সব হবে সব হবে, আপনি ভাবছেন কেন! আপনার রোল ছোট হলে তো আমার ছবি মার খাবে। আমার দিকে তাকালেন, এঁর দিকটা সত্যিই ভালো করে ভাবা হয়নি, সব শুনলেন তো, চরিত্রটা একারে বেশ করে ফুটিয়ে তুলুন।

তাও তুলেছি। সব মিলিয়ে কি করেছি আমার ভাবার শক্তি নেই। বাকি আড়াই হাজার টাকাও পেয়েছি। টাকাটা শীলার হাতে তুলে দিতে সে খুশিতে আটখানা। শিগগীরই ইস্কুলের চাকরিটা ছাড়া অসম্ভব হবে না ভাবছে সে। এরপর অন্য লেখা নিয়ে বসতে দেখলেও ভুরু কুঁচকেছে, বলেছে, ছবির আর একটা গল্পটল্প ভেবে রাখলে হত না!

ছবির কাজ যত শেষ হয়ে আসছে আমার ততো মুখ শুকোচ্ছে। এদিকে আমার আপনজনেরা ছবির মালিকের প্রচারের ছটায় মন্ত্রমুগ্ধ। তাই আমার শুকনো মুখ কারো চোখে পড়েছে মনে হয় না। সারাক্ষণই কি এক অস্বস্তিকর যাতনা। অবশ্য সে-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করেছি।

যাক্তার সরগরম করে একদিন ছবির মুক্তি ঘোষণা করা হল। বাড়িতে একটা আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। হলের সামনে কত লম্বা লাইন হয়েছে আর কত মাথা গিসগিস করছে তার প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা যেতে লাগল। ছবির প্রশংসাও কানে আসতে লাগল। আমি যে চুপি চুপি ছবিটা একদিন দেখে এসেছি সে-কথা আর কাউকে বলা গেল না। শীলা আমার নিস্পৃহতা দেখে রীতিমত বিস্মিত। সেদিন দশ বছরের মেয়ে ইস্কুল থেকে ফিরে বলল, বাবা, আমাদের ক্লাসের মেয়েরা তোমার ছবি দেখতে চাইছে।

হঠাৎ একটা ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল সে। তার মা ঘরে থাকলে বিলক্ষণ অবাক হত। আদরের মেয়েকে কখনো বকি না বলেই তার রাগ। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে-ও হাসিমুখে বলল, কয়েকজন টীচার ধরেছে ছবি দেখাতে হবে—দুই একজন দেখেও এসেছে, খুব ভালো বলছিল। এরা পাশ-টাশ দেবে তো না কি?

আমি একটা দরকারী চিঠি লিখছিলাম, জবাব দেবার ফুরসত হয়নি।

আটদিনের দিন খবরের কাগজের সমালোচনা বেরুল। বাড়িতে আর এক-প্রস্থ খুশির তরঙ্গ বয়ে গেল। কাগজ-ওয়ালারা মোটামুটি প্রশংসাই করেছে ছবিটার, বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, সবল নারী সত্তার শক্তি-মাধুর্য, পুরুষের আক্রমণ পুরুষকার, ইত্যাদি অনেক গাল-ভরা শব্দও চোখে পড়েছে। সমস্যাসঙ্কুল ছবিটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর হাসির খোরাক আছে পড়ে শীলা অবাক।—এ গল্পে আবার হাসি কোথা থেকে এলো?

তার দিকে চেয়ে সেই প্রথম আমার হাসি পেয়েছিল।

সেই সকালেই স্বয়ং প্রযোজক বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর ধারণা ছবি 'হীট্' করবে। অবিলম্বে আর একটা গল্প লেখার জন্য উৎসাহিত করে গেলেন তিনি। শুনে শীলা মুখ বাঁকালো।—গরীবের কথা বাসি হলে ফলে, আমি যে কখন থেকে তাগিদ দিচ্ছি কানেই যায় না!

ওর ধারণা, ও বলেছে বলেই কানে যাচ্ছে না, নইলে কানে যেত।

শীলা আর বউদি দলবলসহ ছবিটা দেখে এলো আরো এক সপ্তাহ বাদে। বাড়ির কর্তা সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যেমন নিজে আহারে বসে, এই ছবিটা দেখার ব্যাপারেও তার তেমনি মনোভাব। সকলে দেখেশুনে তৃপ্ত হোক, তারপর নিজে দেখবে।

তারা ছবি দেখে ফেরার একটু আগে শীলার বোন আর ভগ্নিপতি এসে উপস্থিত। তারা দিনকতক আগেই ছবি দেখেছে। এরা ফিরতে সোৎসাহে ছবির আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বউদি বললেন, বেশ ছবি হয়েছে, আমার বাপু ভালই লেগেছে। ভালো কোথায় কার লেগেছে সেই বিশ্লেষণ চলতে লাগল। শীলা হাসিমুখে শুনছে, আর এক-এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

রাত। ঘরের আলো নিবিয়ে আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। শীলা ওপাশে শয্যা নিল টের পেলাম। মাঝে ছেলে ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণের একটানা নীরবতার পরে অন্ধকারে ছেলের গা ডিঙিয়ে এক-খানা হাত আমার বাহুতে ঠেকল।

ঘুমুলে?

না।

কি ভাবচ?

একটু থেমে বললাম, ছবির প্লট।

শীলার হাতটা আমার বাহুর ওপর থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। একটু বাদে গালের নিচে হাত রেখে আধ-শোয়া হয়ে ছেলের গায়ের ওপর দিয়েই এদিকে ঝুঁকল। আমার মুখ দেখতে চেষ্টা করছে হয়ত। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, আমাদের যে-ভাবে চলছে চলে যাবে, টাকার জন্যে আর তোমাকে ও-সব লিখতে হবে না, বুঝলে?

আবছা অন্ধকারে এবারে আমি তার মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। একবার ইচ্ছে হল আলোটা জেলে দেখি। তা করিনি। অন্ধকারেই কতক্ষণ চেয়েছিলাম বলতে পারব না। হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলে কতক্ষণ বাদে দুচোখ নিমীলিত করেছি, তাও না।

না। শীলাকে আমি সত্যি কথা বলিনি। আমি ছবির প্লট ভাবছিলাম না। কিছুই ভাবছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, আমার নিজস্ব গতিশূন্য পথে আমি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী।

এখন মনে হল, তা নয়। সঙ্গিনী আছে।

চলচ্চিত্রের শিল্প-অনুভূতি

নির্মল কুমার ঘোষ (এন, কে, ঘ)

গত অর্ধ শতকের চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং চলচ্চিত্র-দর্শন বাংলার চিত্তামোদীদের যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে থাকে তবে তার মূল্য হলো এই যে, বাংলার দর্শক আজ বাহ্য চাকচিক্য উপেক্ষা করে সারবস্তুর মর্যাদা দিতে শিখেছে। কিছুদিন আগেও ছবির বিজ্ঞাপন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামাবলী মুড়ে তা দিয়ে, দর্শক আকৃষ্ট করাই মনে হতো ঘোষকদের একমাত্র কাম্য; অন্ততঃ সেই নামকীর্তনই ছিল ঘোষণার মুখ্য চিন্তা। নেহাৎই ভদ্রতার দায়ে উল্লেখ করা হ'ত কলাকুশলী, সংলাপকার, কাহিনীকার অথবা রূপ-সজ্জাকরের নাম। আজ কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ও চৈতন্য বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছে, আপনাপন ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মীকেই তার যোগ্য মর্যাদা দিতে শিখেছে। তাই আজ ছবির প্রচার-বিদ্ সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ছবিতে শুধু জনপ্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীই নেই, বহুসমাদৃত কোনো কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে, সে কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রথিতযশা কোন ব্যক্তি, সুরের স্বপ্ন নয়।

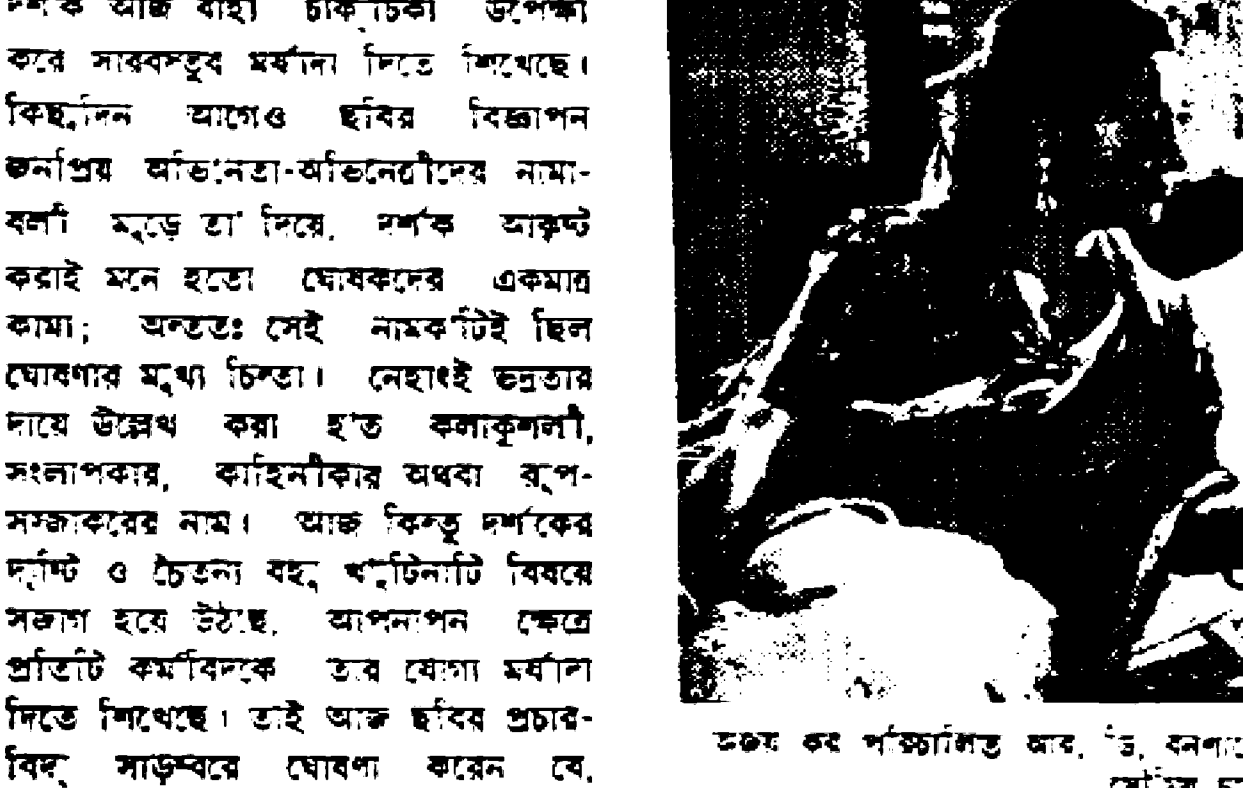

বেনু বর্ধন পরিচালিত আর, ডি, বনশালের এক টুকরো আগুন চিত্রে বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্ধন।

তথাপি, কোথা থেকে এক অদৃশ্য হস্তের প্রবল বাধা বাংলা চলচ্চিত্রের পথরোধ করছে। ভারত সরকার চলচ্চিত্রকে সাহায্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় নিরত, দেশের জনসাধারণ অধুনা চলচ্চিত্রকে মার্জিত আনন্দরসের প্রাপ্য সম্মান দিতে অভ্যস্ত, চলচ্চিত্র কলা-কুশলীদের প্রযোগনৈপুণ্য উন্নতির পথে, বিজ্ঞানের সংস্পর্শে চিত্রকলা সমৃদ্ধ—তবুও সে কোন্ দুস্তর বাধা যা বর্তমান চলচ্চিত্রের শিল্পমান আরো অনেক উন্নত করতে দিচ্ছে না? হলিউড পরিদর্শন-কালে বুদ্ধদেব বসু-বর্ণিত সেই গাইডটির কথা মনে পড়ে, গভীর

ডলফ কর পরিচালিত আর, ডি, বনশালের সাত পাকে বাঁধা চিত্রে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পীর উপর ন্যস্ত করা হয়। পূর্ণ মর্যাদায় চলচ্চিত্রের অভিষেক আজ আর হতাশা ও বিভ্রান্তিতে যে বলেছিল— "সব দেশ থেকে দর্শক আসে এখানে, দেখে বলে 'এ রকম তো কিছুই নেই আমাদের'—কিন্তু তারা যে কেমন করে আমাদের চেয়ে ভাল ছবি তৈরী করে তা ভেবে পাই না।" অন্যান্য দেশের যে অর্থবল বা জ্ঞানবল রয়েছে আমাদের তা নেই। তাই গাইডটির এ কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। তবু আমাদের চলচ্চিত্র নিয়েও তো চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না, আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না কেন?

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি দর্শককে: দর্শকের মাঝে দুটি ভাগ—কৃষ্টিগতভাবে একটি ভাগ সচেতন, একটি অচেতন। সচেতন শ্রেণীর দর্শক চলচ্চিত্রের উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় না; নাচে-গানে-হাসিতে-স্ফূর্তিতে উন্মত্ত দুটি-তিনটি ঘণ্টা

কাটাতে পারলেই তাদের ব্যয়িত অর্থের সার্থকতা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত। যে আনন্দ তারা সংগ্রহ করলো তা যে স্থূল এবং অপরিশীলিত তা নিয়ে মাথাব্যথা তাদের নেই। সচেতন শ্রেণীর দর্শক অবসর-মুহূর্তে চায়ের কাপ মুখে ধরে বাংলা চিত্রশিল্প সম্পর্কে যেটুকু বলে বা ভাবে তার অধিকাংশই সহানুভূতিশূন্য উন্নাসিক সমালোচনা। রসোত্তীর্ণ চিত্রের মর্যাদা দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু অনুত্তীর্ণ চিত্রগুলো সম্পর্কে সহানুভূতি-পূর্ণ আলোচনায় অযথা কালক্ষেপ করতে তারা নারাজ। অতএব বাংলা চিত্রকে উন্নত করার গরজ যাদের সেই চিত্রনির্মাতা ও প্রযোজকদের কাছেই সেই একই নালিশ শুনে ফিরতে হয়—ভালো গল্পের বড় অভাব। কিন্তু সেটাই কি ঠিক? বাংলা সাহিত্যের অফুরন্ত প্রাণচঞ্চলতা, বহুমুখী সমৃদ্ধি যখন বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তখন কি বলবো বাংলা চিত্রজগৎ উপযুক্ত গল্পের অভাবে বিপর্যস্ত? তা যদি হবে তবে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনীসকল এখন সশব্দ এবং সমস্ত-বিশ্বের হাসাকান্না চিত্ররূপ নিয়ে আমাদের সামনে যে উপস্থিত হয় তাও কি ভালো গল্পের অভাবে? আর তর্কের খাতিরে যদি এ প্রশ্ন তুলতেই হয়—তবে বলি সাধারণ দৃষ্টিতে কতটুকু চিত্র-গ্রহণোপযোগী গল্প আছে রুদ্ধশ্বাস পাষাণে, কার্বুলিওয়ালাতে, পোস্ট-মাস্টারে?

আমার মতে গলদ গল্পের অভাবে নয়, উপযুক্ত চিত্রনাট্য-রচয়িতার দুর্লভতায়। ভালো বক্তা যেমন শূন্যের ওপরে কোনো সারগর্ভ মনোরম বাণী রচনা করতে সক্ষম ভালো নাট্যরচয়িতাও তেমনি সামান্যতম বিষয়বস্তু নিয়েই মনোগ্রাহী একটি নাটক রচনা করতে পারেন। তা যদি না হয় তবে 'শাপমোচন', 'কানামাছি' বা 'সবার উপরে' প্রভৃতির মতন অন্তঃসারশূন্য, অবাস্তব কাহিনীর মনোজ্ঞ চিত্রপরিবেশন কিভাবে সম্ভব? অন্যদিকে, অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের চিত্ররূপে এমন করুণভাবে অতি-সাধারণ রূপ নেয় যে, মনে হয় তারও একটি প্রধান কারণ সাহিত্যিকের সক্ষম হাতে বলিষ্ঠ নাট্য-রচনার অভাব। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পুরো-পুরি গল্প-সাহিত্যিকের চেয়ে নাট্য-রচয়িতার অভ্রান্ত হস্ত দক্ষতর হবে। তবে যিনিই হ'ন তাঁর চিত্রজগতের চেয়ে সাহিত্যজগতের সঙ্গে সংস্পর্শ থাকাই অধিক কাম্য।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে (অবশ্য সম্মানিত ব্যতিক্রম স্বীকার করে) মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তাঁরা এ মহৎ দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্রনাট্যের ভার যাঁদের ওপরে অর্পিত তাঁরা সাহিত্য-রচনার চেয়ে চিত্রনাট্য-রচনাকেই পেশা-গতভাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা কেউ বাংলার যৌবনাচ্ছিন্ন 'New age'-এর প্রতিনিধি নন।

অঞ্জন বিশ্বাসের প্রাক্তনত্ব পরিচালিত 'আগামীকাল' চিত্রে বিনয় ও সন্ধ্যা রায়।

তাঁদের নাট্যরচনার চিন্তা, ভাবধারা বা ভাষাশৈলী যুগ যুগ আগেকার বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে আজকের বাংলাদেশ যে সাহিত্যিকদের লেখায় সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁদের সাহিত্যের কোনটিও তাঁদের চিত্রনাট্য-রচনায় নামতে দেয় না। বাধ্য হয়ে নবচেতনাসম্পৃক্ত পরিচালকগণ আজ নিজেরাই চিত্রনাট্য-রচনায় হাত দিয়েছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে চিত্রের কাহিনীও তাঁদের স্বরচিত। এতে তাঁদের পরিচালকের কর্তব্য কিছু পরিমাণে বাহত হচ্ছে বলাই বাহুল্য। আর এও ঠিক যে এ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে কার্যকরী হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে কোনোমতেই কাম্য নয়। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয় আর চলচ্চিত্র যদি জীবন-দর্শনের মাধ্যম হয় তবে সাহিত্যের অত্যাধুনিক গতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলার পরিবর্তে সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ে হাত মেলালে উভয়েরই লাভ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের উৎপত্তি বিভিন্ন, অতএব গতিও বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্য যতই মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক হবার দিকে ঝুঁকছে বাংলা চলচ্চিত্র ততই 'নিও-রিয়ালিজম্' ত্যাগ করে 'নিও-রোমান্টিসিজমের' দিকে মোড় নিচ্ছে। অতএব বাস্তব মনচর্চায় নিরত সাহিত্য থেকে বস্তুসংগ্রহ 'নিও-রোমান্টিক' চলচ্চিত্রের পক্ষে সুসাধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু নবযুগের সাহিত্যের তার নবধারায় পুরাতন সাহিত্যের যে নব-রূপায়ন সাধন করেছে চলচ্চিত্রজগতে তা এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে আশা করা অন্যায় হবে না। চিত্ররসিকের মনশ্চক্ষে সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনটি ভাসছে যেদিন চিত্র-পরিচালক নবযুগের সাহিত্যিকের সহযোগিতায় বঙ্গচলচ্চিত্রজগতে এক যুগান্তরের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন।

শিল্প কখনও থেমে থাকে না, কারণ শিল্পীর কখনও পূর্ণ প্রশান্তি আসে না। শিল্পীর শিল্প-প্রেরণাই তার মধ্যে সৃষ্টি করে এক অপরূপ অতৃপ্তি যা শিল্পকে দেয় নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। সাহিত্যে যে শিল্প আছে তার সংস্পর্শ-চ্যুতিই বঙ্গচলচ্চিত্রের এ স্থিতিশীলতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিশ্বভারতীর শিল্পনিকেতনসমূহে কুটীর শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ যে হাতী-ঘোড়া-মানুষ-পুতুল চোখে পড়ে তা নয়নমুগ্ধকর সে কথা সন্দেহাতীত, তবু হস্তশিল্পের

জীবন-ধর্মী প্রেমের
ছন্দিত-সুষমায় চিত্তাকর্ষক
শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের

আগতপ্রায়
নিবেদন—

চিত্র-নাট্য : : বিনয় চ্যাটার্জী

মূলোদ্ধার অভিজ্ঞান হিসাবে কখনও তা আমাদের ঘরে শোভা পায় না—তখন খোঁজ পড়ে Curio-shop-এ প্রাপনীয় শিল্পবস্তুর। চলচ্চিত্র যদি শিল্পকৃতি হয় তাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাক্ষর থাকা দরকার। কিন্তু অধুনা চলচ্চিত্রও গণ-উৎপাদনের আবর্তে নিষ্ক্রিপ্ত হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গণ-উৎপাদন উৎকর্ষ-লাভের পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু কলাশিল্পে বহু-সৃষ্টি বিনাশেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আজকের চলচ্চিত্রশিল্প ঠিক সেই পথেই এগোচ্ছে। সব ছবিতেই একই ধরণের শিল্পস্বাক্ষর। কোনো বিশেষ ছবি না দেখলেও দুঃখের কিছু নেই, ঠিক সেই ধরণের ছবি আপনি আরও নিশ্চয় দেখেছেন অথবা দেখবেন।

এ কথার গৌরবময় ব্যতিক্রমস্বরূপ যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং চলচ্চিত্রজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে তাঁরা আজও অক্ষম। বঙ্গচলচ্চিত্রের শৈশবাবস্থায় দেখা যেতো বহু যাবহৃত গৃহকোণসম্বলিত কাহিনীর অবিরাম চিত্ররূপ। সাধারণ সংসারের আরও সাধারণ প্রবৃত্তি এবং দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ অবলম্বন করে মামুলী কাহিনী রচনা করা হত—সেই কুচক্রীর মন্ত্রণায় সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাওয়া, শেষ মুহূর্তে ভুল-বোঝাবুঝির পালা শেষ করে মিলনান্তক পারিবারিক দৃশ্য—গণ-উৎপাদনের সেই শুরু। এর পরে একই বিশেষ ধরণের শিল্পব্যঞ্জনায় শিল্পী-মনের পৌনঃপুনিকতা প্রতিটি ছবিতে ছবিতে দেখতে দেখতে বোঝা গেলো শিল্পও আজকাল জনগণের জন্য মাত্র বৃহত্তর শ্রমশিল্পের পরিমাপে নির্মিত হচ্ছে—স্টুডিও নামধারী কারখানাসমূহ হতে জনগণের একঘেয়ে আনন্দে যোগানদার Standardized চিত্রসমষ্টি। চিত্রপরিচালক আজ শিল্পী ততটা নয় যতটা ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায়-নীতিটুকুই শুধু সময়ের সঙ্গে রূপবদল করে; যেমন পুরোনো সমাজের ভগ্নদশায় বাস্তবতাবোধ ছিল তাঁদের নীতি। এবং বাস্তবতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে অতিবাস্তবতার ভঙ্গিমা অবলম্বন করেছেন তাঁরা বর্তমানে। ব্যবসায়ীর মতন তাঁরা অনুকরণ করেন, শিল্পীর মতন অনুধাবন করতে চান না। বিহঙ্গ ডানায় ভর করে অনন্ত আকাশের পানে উড়ে চলে কিন্তু তখন ডানাদুটো মুখ্য থাকে না, উদার আকাশের অসীম নীলের নৈস্তব্ধ্য উপলব্ধিই তখন তার সবটুকু সত্তা জুড়ে থাকে। উপকরণ যেন তার বাহুল্যে উদ্দেশ্যকে গৌণ না করে দেয় সেদিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যন্ত্র আমাদের শিল্প-উপলব্ধির উপায়মাত্র, তার ডানায় ভর করে অযান্ত্রিক শিল্প-সৃষ্টি কেন সম্ভব হবে না?

অতএব চিত্র-সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকের সম্মুখে এখন দুটি কর্তব্য—চলচ্চিত্রে প্রকৃত শিল্পের অনুসরণ করা এবং আমাদের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের কথা স্মরণ রেখে তদুদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োজিত সাহিত্যিকের সাহায্য গ্রহণ। চমকপ্রদ সফলতার সঙ্গেই যন্ত্র আজ বর্তমান মানবের দৈনন্দিন জীবন আক্রমণ করেছে। কিন্তু তার আনন্দের উৎসটুকুতে অন্ততঃ যেন প্রকৃতি ও শিল্পের একাধিপত্য বিরাজ করে—ব্যবসায় বুদ্ধির কাছে শিল্পীমানসের এইটুকুই প্রার্থনা।

"পথিকৃৎ" খ্যাত পরিচালক শ্রীজয়দ্রথ'র আর একখানি অনবদ্য চিত্র-নিবেদন—

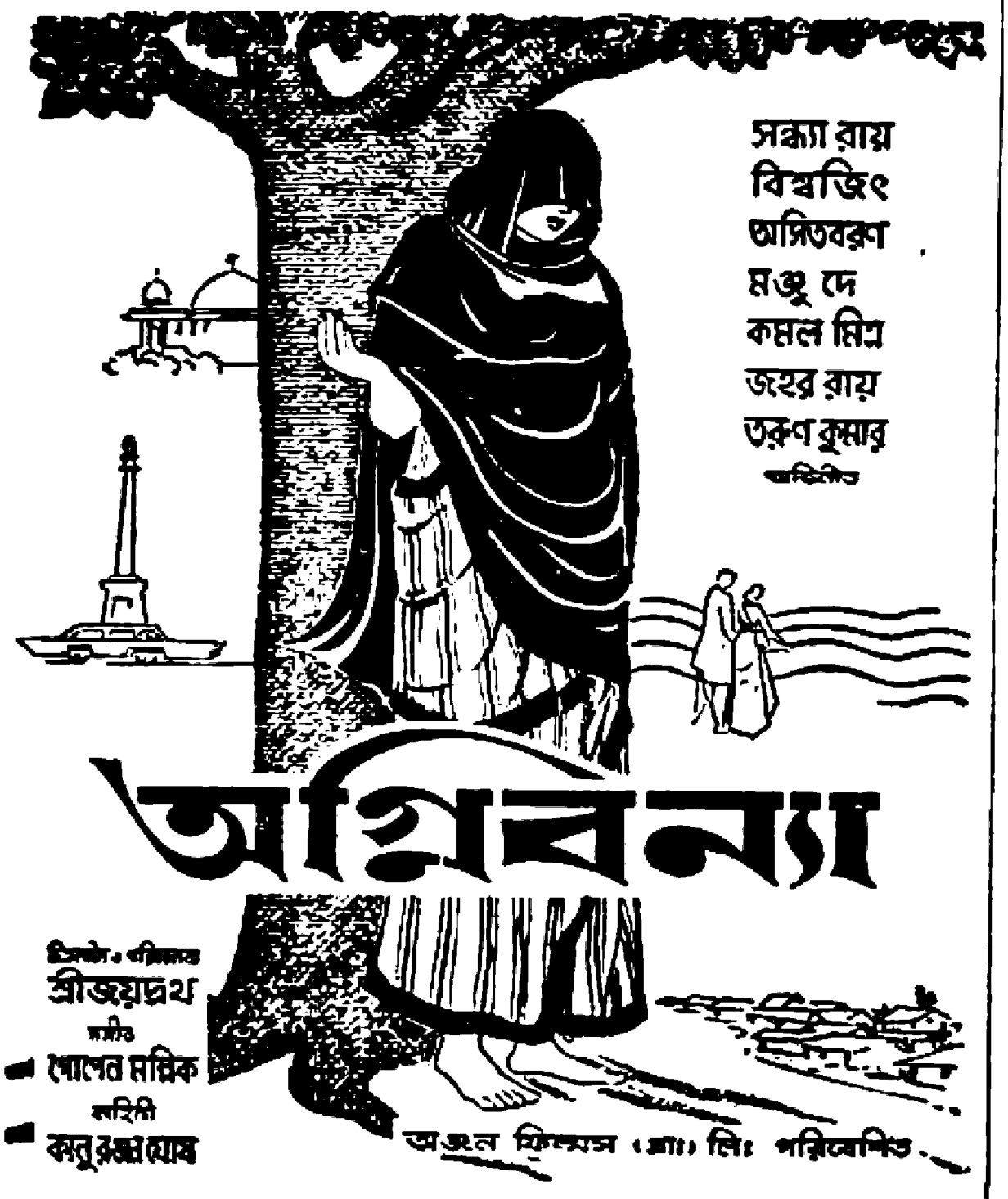

অন্যান্য ভূমিকায় : ভারতী দেবী - পদ্মা দেবী - অমর মল্লিক - অবনীশ শিশির বটব্যাল - তপতী ঘোষ - কল্পনা ব্যানার্জী

আসন্ন মুক্তিপথে

রূপবাণী ঃ ভরতী ঃ অরুণা

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

CENTRAL LIBRARY

আলোচনা চক্র

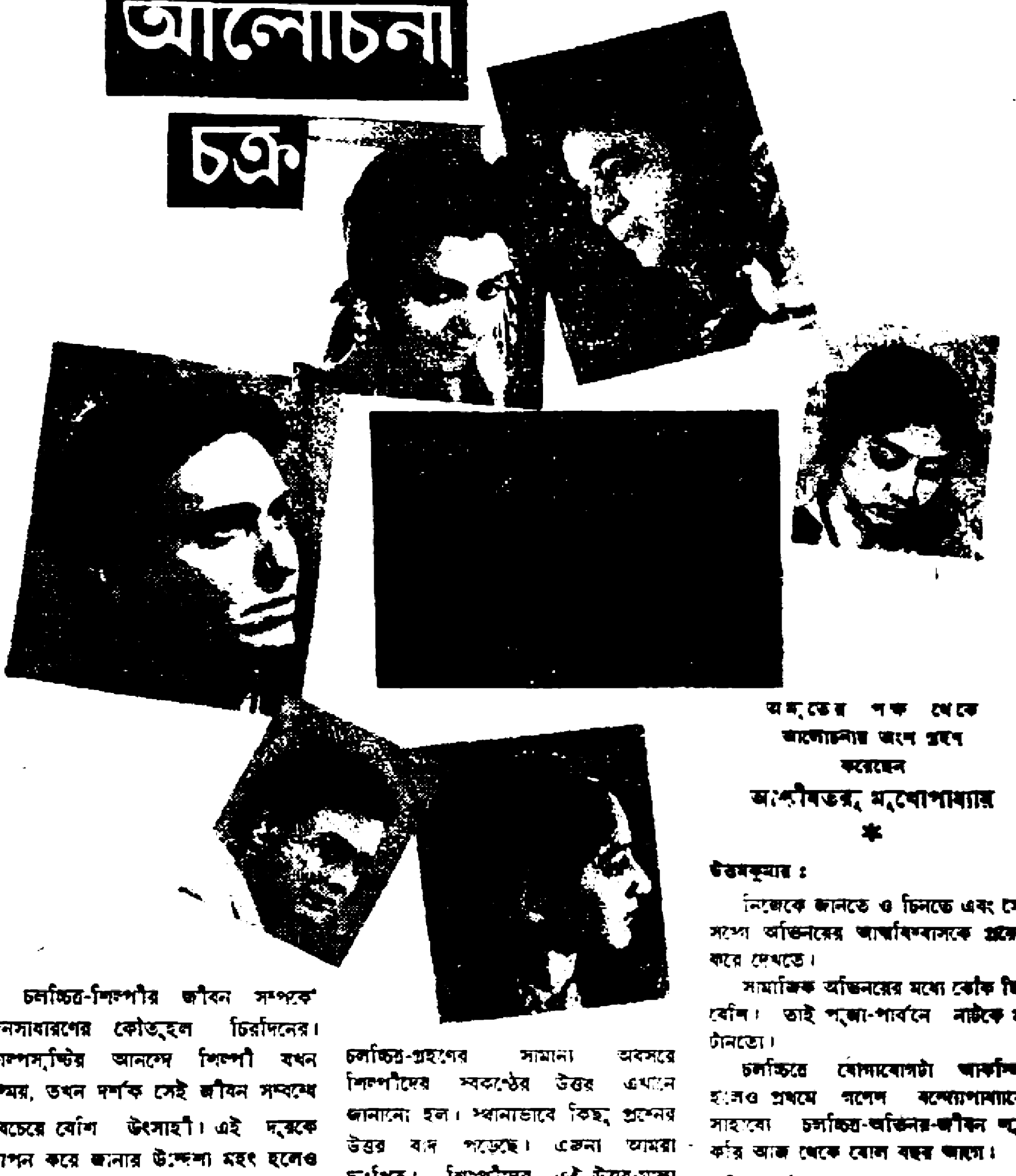

চলচ্চিত্র-শিল্পীর জীবন সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল চিরদিনের। শিল্পসৃষ্টির আনন্দে শিল্পী যখন তন্ময়, তখন দর্শক সেই জীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। এই দূরকে আপন করে জানার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন তার একান্তই নিজস্ব। একমাত্র অভিনীত চরিত্রসৃষ্টির মধ্য-দিয়েই হবে তার অভিনয়-জীবনের সব-চেয়ে বড় স্বীকৃতি। সেখানে ব্যক্তিগত পরিচয় বড় নয়। তাই শুধু শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতা ও আজকের চলচ্চিত্রে কি ভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে আমরা কিছু প্রশ্নের আলোচনা করবো।

চলচ্চিত্র-গ্রহণের সামান্য অবসরে শিল্পীদের স্বকণ্ঠের উত্তর এখানে জানানো হল। স্থানাভাবে কিছু প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। শিল্পীদের এই উত্তর-মালা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথিত এবং মতামতও তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত। আলোচিত শিল্পীরা হলেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রে কেন এলেন ?

(১) অভিনয়ে কোন বিশেষ ঝোঁক।

(২) আকস্মিক যোগাযোগ।

অনুষ্ঠের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

*

উত্তমকুমার :

নিজেকে জানতে ও চিনতে এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ের আত্মবিশ্বাসকে প্রয়োগ করে দেখতে।

সামাজিক অভিনয়ের মধ্যে ঝোঁক ছিল বেশি। তাই পূজা-পার্বণে নাটকে মন টানতো।

চলচ্চিত্রে যোগাযোগটা আকস্মিক হলেও প্রথমে গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে চলচ্চিত্র-অভিনয়-জীবন শুরু করি আজ থেকে ষোল বছর আগে।

অনিল চট্টোপাধ্যায়

ঝোঁক ছিল বলার থেকে ছিল না বলাটাই বোধহয় ঠিক বলা হবে। তবে ছাত্রাবস্থায় কলেজে নাটক করেছি অনেক-বার, কিন্তু তখন একবারও মনে হয়নি যে, অভিনয় জীবনে পেশা হলে মন্দ হয় না।

চলচ্চিত্রে আসাটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ বলাটাই বোধহয় ঠিক কথা। সহকারী পরিচালক হিসেবে আমি প্রোডাকসন্সের 'যোগবিয়োগ' ছবিতে

প্রথম বলাকুলকা হয়ে আসি। তারপর এই কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ পাবার পরই আমার অভিনয়-জীবনের সুরু।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

অভিনয়ে বিশেষ ঝোঁক যে বয়সে চলচ্চিত্র যা মনে আকর্ষণ করে, আমি ঠিক সেই বয়সে চলচ্চিত্রে যোগ দিইনি। ছোটবেলাতেই চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার কারণ আমাদের অভাবগ্রস্ত সংসারে সাহায্য করা। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়, নাচ-গান আমার ভাল লাগতো, কিন্তু এই শিল্পচর্চা যে আমার জীবনযাত্রার পথের হবে তা কোনদিন ভাবিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

চলচ্চিত্রে আসাটা আমার পূর্বোদ্যোগ আকস্মিক নয়। কারণ ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় করার নেশা ছিল। কলেজ-জীবনের শেষে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম অভিনয়কেই পেশা হিসেবে নেব। তবে তখন প্রধানতঃ লক্ষ্য ছিল মঞ্চ। পরে চলচ্চিত্রে আসাটা যোগাযোগ হলেও আকস্মিক নয়।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

ছোটবেলা থেকে অভিনয় করার দারুণ ইচ্ছে ছিল মনে। ভবিষ্যতে যেদিন প্রথম অভিনয়ের সুযোগ আসে সেদিন এত বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম যা আজও ভুলতে পারি না।

আজ থেকে বারো বছর আগে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রথম চলচ্চিত্রে যোগদান করবার সুযোগ দেন।

প্রশ্ন : অভিনয়-শৈলীর কোন ?

১ আত্মবিশ্বাসের সুযোগ কতখানি।

২ পরিবেশ কতখানি ?

৩ কতখানি পরিচালকের প্রয়োজন ?

উত্তমকুমার :

অভিনয়ের শৈলী একটাই থাকবে। প্রত্যেক চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে এ শৈলী সার্থক হবে।

আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে নিশ্চয়ই, তবে ছবির ভাল-মন্দ সবটুকুর সম্বন্ধে দর্শকের দ্বারা সমালোচনা না হলে শিল্পীর পক্ষে সে সুযোগ কখনো সুখের হয় না। দর্শকদের অভিমতের ওপর এ প্রশ্নের নির্ভর করে।

পরিবেশ বলতে কোন প্রতিবেশের কথা মনে পড়ছে না। সমাজের সব পরিবেশের মতই সুস্থ এবং কোন বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হয় না।

চলচ্চিত্রে প্রথম পরিচালকের প্রয়োজন ভাল পরিচালক। তারপর নিশ্চয়ই। তা না হলে শুধু অভিনয়ে এমন কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে মনে করি না।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

'কাজই একমাত্র মুক্তির পথ' এ মতবাদে যাঁর বিশ্বাসী তাঁদের সব কাজই ভাল লাগে, এই প্রসঙ্গে বিশ্বাস। যে পথে মানুষ সহজ বিকাশ সেখানে বিকশিত মনের পরিচয়টিই সেখানে পরিস্ফুটিত আছে। যে কোন শিল্প-সৃষ্টি বা শিল্পানুভূতির মধ্যে এ সুযোগ রয়েছে। অভিনয়-কৌশল তার ব্যতিক্রম নয়।

আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তির বা ব্যক্তিবাতন্ত্র্যের মূল ভিত্তি। অভিনয়ে এই

আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন চরিত্র-সৃষ্টিতে ও অভিব্যক্তিতে।

পরিবেশ বলতেই সাধারণতঃ মনে আসে স্টুডিওর কথা। কিন্তু স্টুডিও ছাড়াও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকাংশে এ জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। তাছাড়া স্টুডিওগুলো সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা ও মতামত বেশির ভাগ ভুল জনশ্রুতি ও কল্পনার ওপর নির্ভর করে আছে। ইঁটের পর ইঁট গাঁথা মানসিকের ছোট্ট খুপরী, কল-কারখানার ধোঁয়ায় ঠাসা মানুষের জীবন থেকে খোলা আকাশের নীচে এ কাজের সময়টুকু জীবনে কম আনন্দ ও স্বাস্থ্য এনে দেয় না। অধ্যাত কুশলী থেকে বিখ্যাত পরিচালকের স্নেহ, সাহচর্য ও সহযোগিতার মাঝে আমাদের কাজের পরিবেশ সহজ ও সুন্দর মনে হয়।

পরিবর্তন ও উন্নতির অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। পুরোনোর বদলে নতুন যন্ত্রপাতি ও স্টুডিওগুলো অবও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে ভাল হয়।

অনিল চট্টোপাধ্যায় :

অভিনয়-জীবন ভাল লাগে তবে দুঃখ সেখানেই যে মনের মত চরিত্র পাওয়া যায় না। চলচ্চিত্রের বেশির ভাগ চরিত্র স্বাভাবিক বলে মনে হয় না, তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু তা সংখ্যায় খুব নগণ্য। অনেক সময় কোন শিল্পীকে প্রযোজক ও পরিচালকেরা একটা 'টাইপ' করে দেবার চেষ্টা করেন যেটা শিল্পীর পক্ষে ক্ষতিকর। নতুন ধরনের চরিত্র করার বিশ্বাসী তাই আজ মনের মত হলে খুব ছোট 'রোল' বা 'একস্ট্রা'র কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না।

আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোন শিল্পী বাঁচতে পারেন না। গোড়ার দিকে সকলের মুখেই শুনেছি যে আমার দ্বারা কিছু হবে না তাই প্রচুর ছোট ভূমিকায় নামতে হয়েছে। আজকের আমি-র আত্মবিশ্বাসটাই কিন্তু সেদিনের আমার একমাত্র সম্বল ছিল।

পরিবেশ-রচনার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। পরিবেশ ভালো এবং উপযোগী। আরও ভাল হবার সুযোগ রয়েছে এবং উন্নতি তো হচ্ছেই।

ভালোর জন্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন তো সব সময়ই আছে। অনেক সময় আমাদের দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয় (আট ঘণ্টার বেশি) যেটা ক্ষতিকর। তাছাড়া ছবি মুক্তি পাবার পরও প্রাপ্য টাকা অনেক সময় পাওয়া যায় না—এ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

মানুষের জীবনটাই একটা বড় রঙ্গমঞ্চ। অভিনেত্রীর জীবন কোন দিনই খারাপ লাগেনি। এর মধ্যে সত্যিকারের থ্রিল আছে—বিশেষ করে নিজের অভিনীত ছবি যখন মুক্তি পায়।

আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনের কোন পথেই তো চলাফেরা চলে না।

পরিবেশ মোটেই অস্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া পরিবেশকে সুন্দর করে নেওয়া তো নিজের ওপর নির্ভর করে। কল্যাণকর পরিবর্তন তো সব সময়ই বাঞ্ছনীয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

অভিনয়ের জীবনই বলুন আর অন্য যে কোন জীবনেই বলুন, আত্মবিশ্বাসের

মুক্তি-প্রতীক্ষায়!

চলচ্চিত্রে অনাস্বাদিত এক নতুন রসের অবতারণা করবে...

সম্পাদনা : অরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় • গান ও প্রাত্যহিক সংলাপ : গৌরীপ্রসন্ন
কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক :
আলোকচিত্রম প্রাইভেট লিমিটেড
৬।২, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

মূলে আছে কাজ করার সফলতা আর সার্থকতা। অভিনয়-জীবনের উৎকর্ষের এবং 'জনপ্রিয়তা'-র সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাস বাড়তে থাকে সাধারণত। তবে এমন লোকও সংসারে থাকে যাদের ভেতরে আত্মবিশ্বাসটা গোড়া থেকেই কাজ করে। তাদের উন্নতি হলে আত্মবিশ্বাস হয় না। আত্মবিশ্বাস থাকে বলেই তাদের উন্নতি হয়। সে বিশ্বাসটা তাদের ভেতরকার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস।

ভালো-মন্দ মিশিয়ে। যেমন অন্য সমস্ত জায়গাতেই। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে জানাতে ইচ্ছে করে। আমার চোখে চলচ্চিত্রের এই 'জগত'টা জগতের বাইরের কিছু বলে কোনদিনই মনে হয় না। আমাদের সমাজে যে ধরনের পরিবেশ যে ধরনের ভালোমন্দ সবই চোখে পড়ে এখানেও সেই একই কথা। পরিবর্তনের অনেক কিছু আছে। কিন্তু যতদিন না সেই পরিবর্তনগুলো সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মিলবে ততদিন তার খুব একটা মূল্য হবে বলে মনে হয় না।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

অভিনয়-জীবন ভাল। শিল্পী-জীবনের মাঝে সবকিছু ভুলে অভিনয় করতে ভাল লাগে। অভিনয়-জীবন যতদিন থাকে ততদিনই ভাল লাগে।

কর্ম-জীবনের সব জায়গার মত এখানেও সে আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে।

পরিবেশ বলতে অভিনয়ের সময়-টুকুতে সামনা কলাকুশলী থেকে আরম্ভ করে সকলের মধ্যে কিছু না কিছু ভালোর সন্ধান মেলে। এখানে অনেক আশা বলেই এ পরিবেশ ভাল লাগে।

পরিবর্তনশীল যখন সবকিছুই তখন এখানেও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে এখানকার কলাকুশলীদের অভাব সবচেয়ে বেশি। অনেক কষ্টের জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজন। অভিনয় সম্পর্কে এ কথাই বলবো যে পুরনো থেকে নতুনের জন্ম। পরিবেশ-অনুযায়ী অভিনয়েরও পরিবর্তন চলেছে।

প্রশ্ন : বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন?

(১) অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের কি করণীয়।

উত্তমকুমার :

ছবির জন্য ছবি করার দিন গেছে। দর্শকদের কাছে যে ছবি ভাল লাগবে সে ছবি নির্মাণের কথা আগে ভাবতে হবে। ছবিতে পয়সা না পেলে এই চলচ্চিত্র-শিল্প বিশেষ করে বাংলা দেশে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা বলে পরীক্ষামূলক ছবি হবে না এ কথা বলছি না। ছবির বাজার বাড়াতে হবে।

ভবিষ্যৎ তোলা আছে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের ওপর। ভাল ছবি করতে হলে ভাল গল্পের প্রয়োজন। অভিনয় ছাড়া শিল্পীদের আর কোন ক্ষমতা নেই।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

চিত্র-প্রস্তুতির ভাবে ও ব্যঞ্জনায় বাংলা ছবি অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। অল্প কয়েকজন এর অগ্রণী হলেও, এঁদের প্রভাব প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমস্ত চিত্র-শিল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। বহু পুরনো স্টুডিওর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কেবল-মাত্র চিন্তাধারা ও বুদ্ধি সম্বল করে যদি এতটা অগ্রগতি—তবে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক কে তুলবে?

অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ে শিক্ষা ও প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন একথা নিশ্চিত। কোন শিক্ষাকেন্দ্রে বা সরকারী সাহায্যে এ সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, হয়তো যায়ও। তবে মনে হয় ব্যক্তি-গত প্রতিভার ওপরই এ শিল্প নির্ভর করে। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষায়তনের সুযোগ ও মঞ্চাভিনয়ের প্রয়োজন আছে। আমাদের পারিবারিক পরিবেশ, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য কর্ম-

শিকারে আনন্দ পেতে হলে আমাদের চার মশলা,
ছিপ, হুইল, সুতা ব্যবহার করুন।

সেন ব্রাদার্স

(মৎস্য শিকার ও খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রেতা)

১৫৫।২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিঃ-১২

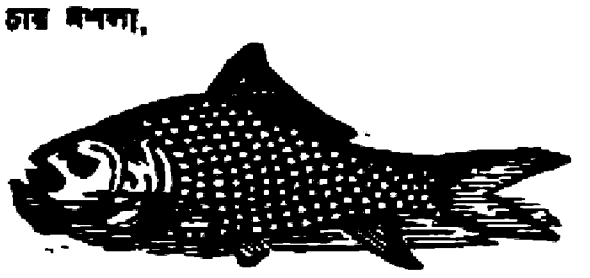

পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরপুর করে তুলুন
আপনাদের উপস্থিতি কামনা করে

কারকো

নানাবিধ আইসক্রীম এবং রসনা তৃপ্তিকর দেশী ও বিদেশী খাদ্যের বহুবিধ আয়োজন। আপনার পরিজনবর্গ, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে চলে আসুন। মনোরম পরিবেশ—পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সুন্দর পরিবেশনই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের জনপ্রিয়তা উপরের ছবিই তার প্রমাণ। প্রতি সন্ধ্যায় আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তরুণ শিল্পীদের কণ্ঠ এবং যন্ত্র-সঙ্গীতের বিপুল আয়োজন। বাহিরের খাদ্য পরিবেশনের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

কারকো

অভিজাত এবং জনপ্রিয় হোটেল রেস্তোরাঁ

হগ্ মার্কেট — কলিকাতা ফোন : ২৪—১১৮৮

CENTRAL LIBRARY

ওঁ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কি না!

[illegible], রায়চৌধুরী

তুমি কে?

—রেখা ঘোষ

শাড়ী

—[illegible]

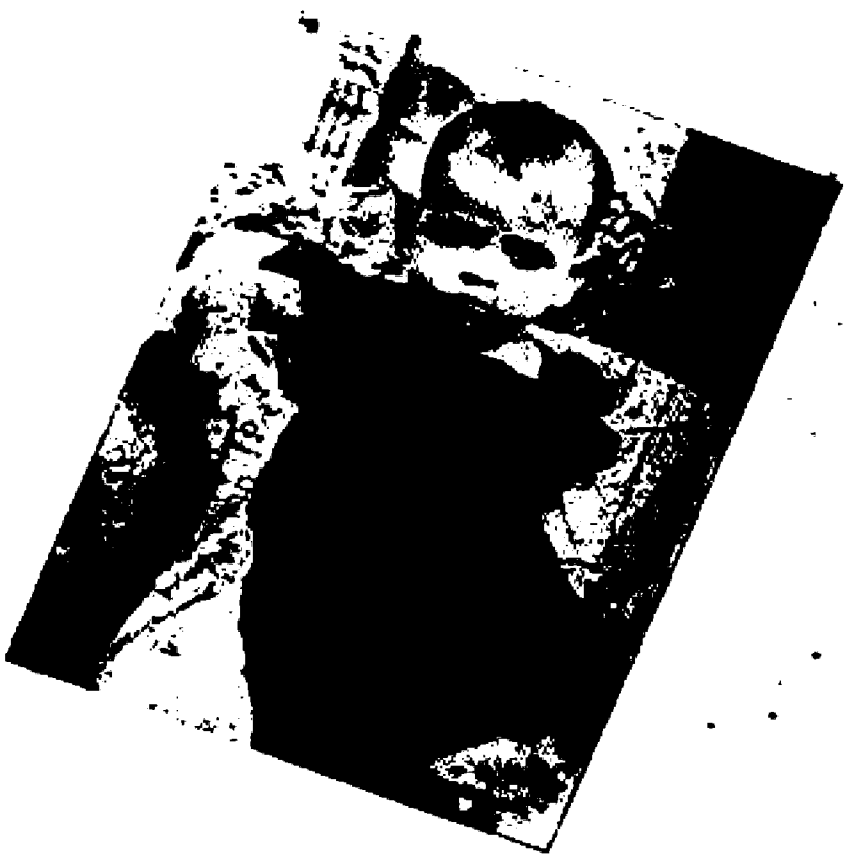

উপরে : বামে—পেজাপতি —শিবাণী দত্ত, দক্ষিণে—যামোই না —শম্ভু বোস, মধ্যে : হেরর্ হি হি —পি, ঘোষ
নিচে : বামে—ঠিক বলছো : —উৎপলকুমার বিশ্বাস, দক্ষিণে—দুলালী —ডি, সিংহ

জীবনের ধারা নিয়ে অভিনয়-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

অনিল চট্টোপাধ্যায় :

আমার মনে হয় ভাল ছবি অর্থাৎ রুচিবান ছবি করাই হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতির ইঙ্গিত। দর্শকদের রুচি পাল্টানোর সময় এসেছে।

অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের মনও উচ্চ হওয়া দরকার এবং যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজনীয়। পরিবেশের ওপর চরিত্র-সৃষ্টি নির্ভর করে। অভিনয়-শিল্পীদের অবশ্য বহু অংশে নির্ভর করতে হয় পরিচালক এবং দর্শকদের ওপর। উভয়ের রুচি ভালো হলেই অভিনয়-শিল্পীরাও সার্থক কাজ করতে পারবেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

বাংলা ছবির বাজার অত্যন্ত ছোট—কিন্তু ছবি যাঁরা তৈরী করেন তাঁদের সৃজনশক্তি অপ্রতুল নয়। বাংলা ছবির বাজারকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায় তাহলে ছবি-নির্মাতারা যে আরও ভাল ছবি তৈরী করতে পারবেন—আমি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের করণীয় বহু কিছুই আছে। সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা চলে না। সময়মতো বিশেষ আলোচনার সুযোগ পেলে জানাবো।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা এলেও সেই সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি পুরোনো কথাগুলিই আবার উঁকি দিতে থাকে। সেখানে শুধু অভিনেতা কেন চলচ্চিত্র-কর্মীরাই এমনকি বাংলা দেশের সমস্ত দর্শকসমাজেরই যৌথ দায়িত্ব আছে। এত বড় দায়িত্বের প্রস্তুতি কি কি ভাবে হতে পারে তা এত ছোট্ট জায়গার মধ্যে ভেবে দেখা কঠিন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

জার্মানি গেলের দিন শেষ হয়েছে। বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপরন্তু চলচ্চিত্র-কাহিনীর প্রস্তুতির সঙ্গে ভাল ছবি তৈরীর উৎসাহ বাড়াতে হবে। অভিনয় তার পরের কথা। বাংলা দেশে অভিনয় এর প্রস্তুতি কোন দিন হয়নি। স্টুডিওতেই শিক্ষানবিশের সময় অভিনয়ের প্রথম হাতেখড়ি হয়।

চলচ্চিত্র-মানের উন্নতিসাধন করতে হলে সকলের উৎসাহ ও সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন থাকা দরকার। অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষায়তনের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : বাংলার শিল্পীদের ভবিষ্যৎ কি ?

(১) খাঁটিছাড়া একদম খাঁটমান শিল্পীর নিরাপত্তা।

উত্তমকুমার :

নিরাপত্তা বলতে কোন কিছুই নেই। সমস্তটাই একটা ভাগ্য বলে মনে হয়। অভিনয়ে যতদিন সুনাম ততদিন অর্থ। তারপর খাঁটিছাড়া একদম খাঁটমান শিল্পীকে সহায়তা করতে কেউ এগিয়ে

অলকার সৌন্দর্য্য রূপায়নে
প্রবীন সোপান—
খাঁটি গিণি সোনা----
নিখুঁত কারুকার্য্য
গিণি ম্যানসন
জুয়েলার্স এণ্ড ব্যাঙ্কার্স
২২৬।১বিহারী এভেনিউ, বালিগঞ্জ • কলিকাতা-১৯
গ্রাম
গিণিম্যান
ফোন
৪৬-১৪৭২

শারদীয় সম্ভাষণ

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু, ভারতের সকল লোকনাট্য সংস্থা এবং লক্ষ লক্ষ শুভানুধ্যায়ীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সকল শুভ প্রচেষ্টার পথ আলোকিত হউক। আপনাদেরই আশীর্বাদপুষ্ট ভারতের শ্রেষ্ঠ লোকনাট্য সংস্থা, বাংলার বাণী জগতের শ্রেষ্ঠ পেশাদার শিল্পী-সমন্বয়ে বিভিন্ন রঙ্গপটে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্যাভিনয়ের সর্বজনপ্রিয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের এই প্রার্থনা।

বিনীত—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ।

রঙ্গ রেজি নং ... নিউ ফোন অফিস ৫৫-১১১০

গণেশ অপেরা

স্বত্বাধিকারী
শ্রীগোষ্ঠ বিহারী ঘোষ
৩৫৬/১ কর্ণওয়ালিস রোড, কলি-৬

শারদীয় অঞ্জলী :—
নাটকাকার বিনায়ক ভট্টাচার্য্যের

আগুন

নাট্যে অভিনব-প্রসার কালের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার
নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রস্তুতির পথে :—
নট ও নাট্যকার
নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর

অভিনয়

রূপ দিচ্ছেন
নাট্যকার নট-গোপাল চট্টোপাধ্যায়
রঙ্গ নায়কী-ছবিরাণী
মোহিত বিশ্বাস ★ অভয় হালদার
অমলেন্দু চক্রবর্তী ★ নমিতা দেবী
গুরুদাস ধাড়া ★ কালী মাল্লা
সহায় বসু, কনক, পুষ্প, ইন্দ্রাণী বিশ্বাস
নৃত্যশিল্প - রাধা রমণ পাল
সুদর্শন নট - সত্যসাচী ব্যানার্জী
— মৃত্যু নীতে —
কোলিয়ারীর বিশেষ আকর্ষণ
কিশোরকণ্ঠী অনিলা দেবী (মধুবালা)

পরিচালনা : গোপাল চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : তুষার কুমার মিত্র
রূপ সজ্জায় : অভয় হালদার

ম্যানেজার : জে, এন, সরকার (মিলনী, আসানসোল)
জি, টি, রোড, আসানসোল
ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি বরুণ রায়

আসবে না। নিজের কাছে শিল্পীর সব নিরাপত্তা। সকল অবস্থায় সপ্রতিভ হওয়া ছাড়া ভবিষ্যতের আর ভিন্ন কোন অবলম্বন নেই এই চলচ্চিত্র-অভিনয়ের জগতে।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

শিল্পীর ভবিষ্যৎ—ভাল মন্দ তার সবকিছুই শিল্পের জন্য। খ্যাতি, অখ্যাতি সবই শিল্পের মাধ্যমে। তর্ক, বিতর্ক, সংগঠন আর পরিকল্পনা শিল্পীকে বোধ-হয় বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। কলের যে অমোঘ চিরন্তন নিয়ম শিল্প ও শিল্পীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে এসেছে, বাংলা ছবির শিল্পীদের ক্ষেত্রেও সে নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

অনিল চট্টোপাধ্যায় :

শিল্পীদের ভবিষ্যৎ বলতে আমি তো কোন নির্দিষ্ট আভাস খুঁজে পাই না। অভিনেতা হিসেবে সংপ্রতিষ্ঠিত যতদিন থাকা যায় ততদিনই অর্থ, নাম, যশ—সবকিছুই। তবে আমার মনে হয় খ্যাতি-চ্যুত শিল্পীদের আবার অভিনয়ের সুযোগ মিলে আবার খ্যাতিমান হবার সম্ভাবনা থাকে। তা নাহলে নিরাপত্তার কোন খোলা রাস্তা নেই।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

বাংলার শিল্পীদের ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ নয় একথা খুবই সত্য। খ্যাতিচ্যুত একদা খ্যাতিমান শিল্পীদের কেউ কেউ আজ খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এই দুঃস্থ শিল্পী-দের জন্য বেনিফিট নাইট অভিনয় হয় বটে কিন্তু বিপুলসংখ্যক শিল্পীদের সে সাহায্য অতি নগণ্য।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

অভিনেতার আর্থিক নিরাপত্তার কোন সুরাহা অভিনেতাদের সংগঠন থেকে পুরোপুরি করা যায় কিনা জানি না। হয়ত কিছু অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হতে হতে পারে, কিন্তু সমস্যার মূলটা রয়েই যায়। যে সম্পূর্ণ পেশার স্থির কোন নির্দিষ্ট কোন রোজগার নেই—'স্বাধীন ব্যবসা' যারাই করে তাদেরই জীবন আমাদের মত ওঠা-পড়ার সংকটের মধ্যে দিয়ে যায়। সেই 'স্বাধীন রোজকারে'-র থেকেও আমাদের পরাধীনতা একটু কম। কেননা আমাদের ওঠা-পড়াটা আরও অনিশ্চিত। যদি আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পের লাভ, লোকসান, মালিকানা, মূলধন ইত্যাদি কোন মূলগত এবং সামগ্রিক পরিবর্তন না হয় তাহলে নিরাপত্তার অন্য কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না বলে আমার মনে হয়। এখন সে পরিবর্তন কি হবে না হবে তা খুঁটিয়ে বলতে পারেন বিশেষজ্ঞরা।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

আজকের দিনে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প যেভাবে চলছে—তার বহুমুখী পরিবর্তন না হলে বাংলা শিল্পীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় একথা বলা চলে।

শিল্পীদের যদি নিরাপত্তাই থাকতো তাহলে একদা খ্যাতিমান বহু শিল্পী এই চলচ্চিত্র-অভিনয় থেকে দূরে চলে যাবেন কেন?

সমাজ সেবার জন্তর গঠনে সহযোগিতা করুন !

"ধর্মনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতি, প্রমোদনীতি এবং সমাজনীতির আবশ্যকতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রকে যদি সুবিধাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কলুষিত করে ফেলা হয় তাহলে পরিণাম অশুভই হয়। এই সহজ ও সরল সত্যকে উপেক্ষা বা তিরস্কার করার অবদানরূপে আমরা সবাই নিজ অজ্ঞাতসারেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনের মান নিম্নাভিমুখী দেখবো। আপনিও আজ সমাজের নৈতিক ও আর্থিক কাঠামোর কথা ভাবুন এবং এই দুঃস্থ ও দেবতার আরাধনার দিনে বিবেকানন্দের স্বপ্নের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাণচঞ্চল সাম্যবাদী সমাজের গঠনমূলক পুনর্বিন্যাসের শুভ কর্মযজ্ঞে সক্রিয় অংশভাক্ হোন্!"

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ
বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদ
পোষ্ট বক্স—২১২২, কলিকাতা—১
টেলিফোন : ৬৭-৪০৭৫

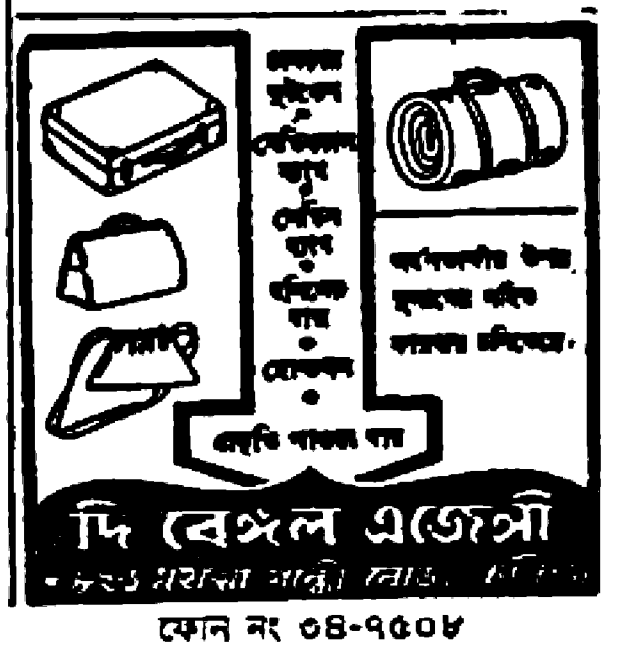

ফোন নং ৩৪-৭৫০৮

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গে

আনন্দকুমার সেন

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মন্ত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বলাবাহুল্য।" সেই প্রেমাবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘর আলো করে শচীমাতার কোলে। নিম গাছের নীচে জন্ম হয়েছিল এই মানবদেহধারী দিব্যবিভূতির, তাই শচীমাতা নাম দিলেন নিমাই। পিতা দিলেন নাম বিশ্বম্ভর।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জগতে শিশু নিমাই এলেন মানব জীবনের আনন্দঘন রহস্যবিভূতি নিয়ে। নবদ্বীপবাসী ধন্য হয়ে ওঠে তাঁর অত্যাশ্চর্য আর দুর্লভ সহচারে। এই অপরূপ নবশশিকে, তাকে কালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠতেন। ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য যেকোনও বিদ্যা নির্বিশেষে স্বীকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বহুজনবাঞ্ছিত লাভ করেন। কিন্তু চিরকালের চাপল্য আর রহস্যপ্রিয়তা হারিয়ে গেল না পণ্ডিতের দার্শনিকতার অন্তরালে। সেকালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর পাণ্ডিত্য এবং পরিহাসের তীব্র বিদ্যুচ্চমকে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে এসে দেখেন পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর ইহজগতে নেই। প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগবেদনা তাঁকে সংসার-বিমুখ করে তুলল। কিন্তু মাতৃ আজ্ঞাকে তৃপ্তমনসে শিরোধার্য করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। গয়াধামে নিমাইয়ের চরিত্রে এক এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনা।

মধুরী মুখোপাধ্যায়

ধারা এক অনন্ত সুরভিত মুহূর্তে ভাঙিয়ে পড়ল মৃত্তিকালেভী পথিক কৈশোরের মানুষের মাঝে। মহুয়ার পথে হয়ে পড়লেন প্রেমাবেশে। ঈশ্বরের পদমূলে নিমজ্জিত হল উন্মত্ত নদিয়ার মানবকেরা। উন্মাত্ত হলেন মহামানবপ্রেমী চিরকালের আবেগে মুখর। বহুজনমোহন মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন মহামানব। জাতির বুদ্ধিপ্রদীপ্ত ঐতিহ্যের কালে লুকিয়ে ছিল যে কল্যাণের আলোক-চেতনা নিমাই তাকেই প্রেমিকের পাকে টেনেছিল। কিন্তু ফিরে এসেছে হল বহুজনের বাধাবন্ধের ফাঁক। কিন্তু নিমাইকে ঘরে রাখা গেল না। চব্বিশ বৎসর বয়সে এক অমৃত লগ্নে কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিলেন।

মহৎ সাধকদের এই চরমানন্দের আবির্ভাবলগ্নের জন্য অসীম সাধনা করিয়েছে ঐতিহ্যকে। বহুকাল ধরে ধরে অনাগত প্রাণ কোটারের যে নেপথ্যলোক ছিল কুটিলিত। তারপর লালসার ছিন্নভিন্ন জীবনের সার্বিক সুস্থতাকে গ্রাস করছিল যে নীরন্ধ্র জীবনবোধে জীবনের আভ্যন্তরিক ছন্দের তাল কেটে চলে এবং সবকালের পথ এগিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরই এই নিত্য যুগান্তিপ্রভাস সর্ববিধ অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে বহুজনী মহাজীবনে নতুন উষা। প্রেমধর্মের আলোয় বিপথচ্যুত সমাজ-জীবনের ছড়াবে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোজ বসু

সুচরিতা

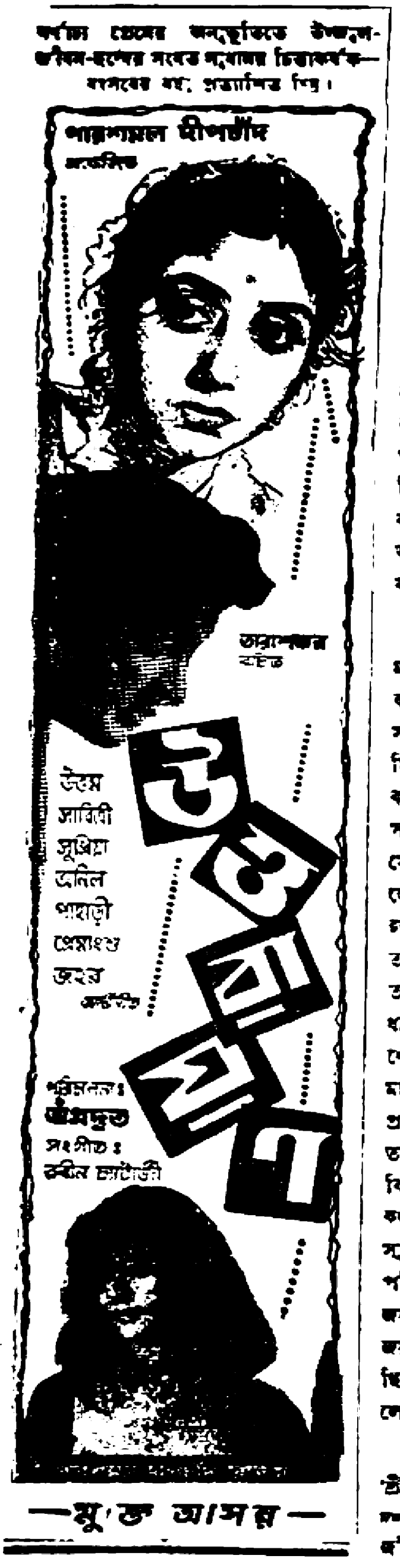

পাষাণভার বিলীন হল। গৌর-কান্তি গৌরকিশোর ভাবোন্মেলচিত্তে বাঙলার মানুষের মন জয় করে নিলেন। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তাঁর প্রেমাশ্রুতে স্নাত হয়ে নব-জীবন লাভ করল; মহামানবের কর-স্পর্শে সুপ্ত নিজীব বীর্যহীন জাতি শক্তির উদ্বোধনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। নামসংকীর্তন-বিভোর আত্মহারা হরি-নামোন্মাদ দেবশিশু প্রেমবিতরণে, দেবতার আলিঙ্গনমানসে দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড়ে পরিভ্রমণ করলেন। নীলাচলে কাশীমিশ্রের আলয়ে আঠারো বৎসর অতিবাহিত করবার পর ১৫০০ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু ঐ স্থানে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অনন্ত নীলিমায় লীন হয়ে যান।

সাহিত্যশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শিশিরকুমার মহাপ্রভু নিমাইয়ের এই জীবন অবলম্বন করে রচনা করেছেন অমর-নাটক 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'এই চারিশত বৎসর হইল কাঞ্চননগরে (কাটোয়া) শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাসের দিন সেই স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। সেই সময় কারুণ্য রসের এরূপ তরঙ্গ উঠে যে, বহুতর লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে। তখন যে ক্রন্দনের রোল উঠে তাহার প্রতি-ধ্বনি এখনও শুনা যায়।'—সীতা এখনও শোনা যায়। ভক্তহৃদয়ের আকুল কামনায় মহাপ্রভু জীবন্ত হয়ে উঠেছেন নাটকের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে। চারশ বছরের প্রাচীন-তার অন্তরাল হতে সে প্রেমের, সে বিনয়ের, সে ভক্তির বাণী ভক্তের কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে দিব্য বিভূতির ন্যায় প্রতিনিয়ত সুরোদ্ভিত। দুঃখক্লেশ গ্লানির পঙ্কিলতার মাঝখানে মহামানবের যে জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে, ষোড়শ শতকে যার জয়ধ্বনি বাঙলার মরাগাঙে জোয়ার এনে-ছিল ভক্তশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের অমর লেখনীতে তা শাশ্বত বিভায় বিভূষিত।

বাঙলা জীবনী-নাটক পর্যায়ে 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'এর আবেদন অসামান্য। শ্রবণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর মহাপ্রভুর জীবনভাষ্য যে যাদুময় রূপ লাভ করে তা একমাত্র সম্ভব হয়ে উঠেছে ভক্ত-হৃদয়ের অসীম আকুতি ও প্রগাঢ় শিল্পানুভূতির জন্য। বহু জীবনেই শুধু নয় শিল্পীর সূক্ষ্মরস-বিশ্লেষণের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতারও অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কোনক্রমেই সর্বজনরসগ্রাহ্য-রূপে শিল্পাভিব্যক্তি দান সম্ভব নয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনব্যাপী যে লীলাখেলা মানবজীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল মহাত্মা শিশিরকুমার তাকেই শিল্পরূপে দান করেছেন। অম্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই তার বালসুলভ চাপল্যে এবং সহপাঠীদের প্রতি একান্ত হৃদয়মাধুর্য অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই প্রিয়জন। বাইরের জীবনে তাঁর রঙ্গপ্রিয়তা সকলের কাছে আদরণীয়। তাঁর অধ্যাপক জীবন, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ, জন্মভূমি পরি-দর্শন প্রতিটি দৃশ্যই সমান আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। যুগে যুগে দুর্জনের দুষ্কৃতি থেকে পবিত্র মানবাত্মা রক্ষা-মানসে দেবতার যে মানবরূপে আবি-র্ভাব ঘটে থাকে নবদ্বীপের পণ্ডিতের ঘরে সে দেবতারই আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর অলোকসামান্য দিব্যবিভায় সাধু-সজ্জনের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতির বিনাশ সাধিত হয়—তার সংকীর্তন ধ্বনিতে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে—তাঁর পদস্পর্শে তাঁর লীলাখেলার বাঙলার অপবিত্র ধূলিকণা পবিত্র হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরেছেন সন্তানস্নেহবৎসলা স্নেহান্ধ মাতৃদেবী, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী পতিপ্রাণা তরুণী ভার্যা, অসংখ্য অকৃত্রিম সুহৃদ সহপাঠী, সকলের মায়াবন্ধন থেকে দূরে সরে যান। সংকীর্তনোন্মাদ এই মানবটি লক্ষ লক্ষ মানবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ান পাপী মানুষের উদ্ধারকল্পে। মানব-মনের গভীরতম আন্তরাত্মার অভিব্যক্তিতে নাটকটি আপ্লুত।

অনিন্দ্যসুন্দর অপরূপ তরুণ পণ্ডিতের ধ্যানমূর্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি-মালায় নির্ঝরিত অমৃতধারা। 'আমি সন্ন্যাসী হয়ে সকলকে হরি নাম দিতে বলব।' অসহায় নিখিলমানবের বেদনায় তাঁর চিত্তে হাহাকার ফুটে ওঠে। ভক্তের কাতর আহ্বানে সোনার মূর্তি ধরে আবির্ভূত হন ভগবান। তিনি বেদনার্ত অসহায় মানুষকে সত্যের সন্ধান দেন।

নাটকে নিমাই চরিত্রের এই মহামন্ত্রময়তার সঙ্গে সঙ্গে, ফুটে ওঠে সকল মানবকে পরিত্রাণের জন্য অন্ধকারের মধ্যে আলোর স্বর্ণধারায় নিমজ্জনের কথা। 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'—বাঙালীর প্রাণের কথা, বাঙালীর জীবন-সংগীত। এখানেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। নিতাই ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে সুললিত সুমধুর কণ্ঠে যখন গানটি গেয়ে ওঠেন—তখন নিমাই উত্তর দেন 'জীবনান্তেই আপনাকে আপনি ভজন করে থাকে।'

নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। নিশীথের নির্জনতার অন্তরাল হতে বেজে ওঠে বিদায় লগ্নের বাঁশি। নেপথ্যে মোহন সুরে ভেসে আসে "ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবম্।" মায়াভিভূত পরাণ-প্রিয় বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রামগ্ন। মাতৃসেবী শচীমাতার অসীম সতর্কতা আর স্নেহ, ভক্তবৃন্দের আকুল নিবেদন ভেসে যায় কৃষ্ণানুরাগে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অজ্ঞাতসারে নিমাই-এর কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে—হায় বিষ্ণুপ্রিয়া! মুহূর্তের আত্মহারায় হারিয়ে গেল অসীম আলোকে নবীন সন্ন্যাসী। অনন্ত নিঃসীমবেদনায় জগৎ গ্রাস করে নেয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তাঁর কাতর আবেদনে উৎকণ্ঠিতা জননী শচীমাতা দেখেন তাঁর পরাণমণি নিমাই নেই। উন্মাদের মত নবদ্বীপের পথে পথে উচ্চারিত হয় নিমাই! নিমাই! নিমাই! কিন্তু যে বুঝেছে অনন্তের মাঝে যে পেয়েছে অসীমের সন্ধান শত স্নেহ ভালবাসা মান অভিমান তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। 'ওরে আমি আর তোকে সংকীর্তনে বাধা দেব না, নিমাই ফিরে আয়! কোথায় নিমাই! মাতৃ-হৃদয়ের সুগভীর বেদনার্তি অ কাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। ফিরে আসে আর্তনাদ! ঘুরে ফেরে কর্ণ হতে কর্ণে!

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। কাটোয়ার কেশবভারতীর আশ্রমে নিমাই পণ্ডিত এলেন দীক্ষা গ্রহণমানসে। যজ্ঞাগ্নিতে হবিষ্কৃত হল পূর্ব পরিচয়। জীবনের অতীতকে ভুলে গিয়ে জন্ম জন্মান্তরের পবিত্র আলোকধারায় ধৌত হলেন নিমাই। কৃষ্ণ-উন্মাদ নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ধ্যানমগ্ন কেশব-ভারতীর কাছে দীক্ষিত হয়ে অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়েন বৃন্দাবনের পথে। নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দসহ যখন মহাপ্রভুকে ফিরিয়ে নিতে এলেন, তখন হারিয়ে গেছে নিমাই—চিরপরিচিত রহস্যাপ্রিয় বিশ্বম্ভর। নবরূপী ভগবানকে দেখেন সকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে।

নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্তনধারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আলোর সন্ধান পেয়েছে। দেখেছে একই অঙ্গে, অন্তর-কৃষ্ণ ও বাহির-গৌর। সংকীর্তন প্রচারে বার বার বাধা এসেছে। নবদ্বীপের গোঁড়া ব্রাহ্মণ

নারদের ইবিনাম-প্রিয় ছিলেন না কিন্তু পরিণামে ইবিনাম-মহাত্মকে মুখর হয়ে ইবিনামে দীক্ষিত হন। নাটকের একটি অপূর্ব দৃশ্য 'বিলাসকাশি ও নারদের উদ্বাহ' (চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)।

নাটকের শেষ দৃশ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। অনাদরে পুনর্বাসিত বিল্বপ্রিয়া বধূ বেশে আসন গ্রহণ করেছেন মহাপ্রভুর পার্শ্বদেশে। যখন আচার্য গিরিশ হরি মহাপ্রভু বলছেন, 'ঈশ্বর ভক্তের বশ' তখন অহংচেতনায় ভূষিত অক্ষ্যোহিণী ভগবদ্বিমুখী বিল্বপ্রিয়া শিব অর্থে সকল শক্তি তোলাকেই জানি, শ্রীকৃষ্ণকে জানি না। তুমি আমাকে এখন 'মহ-দিয়ে' বাও, নাহ অন্যথা অর্থ চিরদিন অধীনে থাকি। সে প্রার্থনায় মহাপ্রভু মন ভরে তার পরমতত্ত্বস্বরূপ। সমস্ত দ্বৈত সমস্ত বাক্-বৈদগ্ধ ভুলে সব বিল্বপ্রিয়া। পরমতত্ত্বের কাছে তিনি বার বারে—'মুনাহে পাড়ে' এবং তাঁর নিত্য-বন্দনা লাভ করেন। তারপর থেকে তিনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত-রূপে বরণ করেন। এ পরিবর্তন যেন অবাক করে।

শ্রীশিশিরকুমার শেষের তিনটি দৃশ্য বিলাস এলো নবীনায়—এই দুটি বাক্যে নাটকটির শুরু এবং সমাপ্তি হলে তবি হবার নয়। কাহিনীবিন্যাস মধ্য দিয়ে। সমগ্র নাটকটি ২৫ খানি অনবদ্য কাহিনীজালে সমৃদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের বাণী নাটকটির মধ্যে উচ্চারিত। বহুজনীয় অন্তরের বাণী যে প্রেম তা প্রতিটি ভক্তের মধ্যে নিত্য উৎসারিত।

গত কয়েক বৎসর কলকাতায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব উৎসব পালিত হচ্ছে। সেখানে নাটকটির অভিনয়ই এ অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে সার্থক করেছে। নাটকারের সঙ্গীত সম্বন্ধে রূপসজ্জার ছোটোর শিশিরকুমার ঐতিহ্যটিকে নষ্ট হতে দেননি। সৌখীন শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা এটি অভিনয় করা কঠিন। ১৯৫৫ সালের ১১শে অক্টোবর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি মহাসমারোহে প্রথম করেন। পুরোভাগে নটির গ্রহণ করেছিলেন শ্রীঅমর মল্লিক। সঙ্গীত-পরিচালনা করেন পাতনমা সুরশিল্পী শ্রীবিমল মজুমদার ও নৃত্য-পরিকল্পনা করেন শ্রীনিতাই মুখোপাধ্যায়।

বহুজনাদরে কিছুদিন পরে ও পুনরায় নাটকটির অভিনয় সর্বসাধারণকে মুগ্ধ করেছে। মহাবিদ্যা ও রঙমহলের শ্রীনিমাই সন্ন্যাসের অভিনয় বাংলার ঘরে ঘরে।

মহৎ শিল্পের মূল্য অপরিসীম। সার্থক শিল্প চিরকালই রসপ্রাহী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। শিশির-কুমারের শিল্পপ্রতিভা ছিল পূর্ণের ছোঁয়া। তা না হলে এ রকম উৎকৃষ্ট নাট্যরচনা সম্ভব হত না। কৃষ্ণের মহা-নুভবতা, প্রেমোজ্জ্বল আন্তরিকতা এবং অপূর্ব সংগীতময় আবহাওয়া সৃষ্টির পরিবেশ অভিনেতাদের শিল্পপ্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে নানাভাবে। এবং এই সমস্ত কারণেই তাঁদের অভিনয় আন্তরিকতা অধিক মাত্রায় ফুটে উঠেছে—প্রেরণা দিয়েছে। নিমাই চরিত্রের অভিনয় সহজসাধ্য নয়। কিন্তু শিল্পী শ্রীমনোজ মিত্রের অভিনয় পরিপূর্ণতার মাঝে সংযম ও কৃতিত্বের সঙ্গে পরিণত হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গোপযুক্ত অভিনেতা নিতাইয়ের চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য। নৃত্যে ও গীতে তাঁর অভিনয় যেমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর, তেমনি নির্মল আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি। শ্রীগৌরগোপালের অকৃত্রিম হৃদয়সঙ্গত ভাবোল্লাসময় এই রস কণ্ঠ সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী হিসাবে শ্রীসত্য বসু খ্যাতিলাভ করেছেন। নারদের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। বেশবভারতীর ভূমিকায় শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ভূমিকায় ভূপতি ভট্টাচার্য, মুকুন্দের ভূমিকায় ও সঙ্গীতে শ্রীনরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবাসের ভূমিকায় শ্রীসুধীর মুস্তাফির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅসিতবরণ হোম প্রথমবার অভিনয় করেন কবি প্রমাণিকের ভূমিকায়। শচীমাতার চরিত্রে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণস্পর্শী অভিনয় প্রকৃত মাতৃসুলভ মনোভাবই প্রস্ফুট করে তোলে। নিমাইয়ের গৃহ-ত্যাগে বিলাপরতা, পাগলিনী শচীমাতার উন্মত্ত অবস্থা ও নিমাইয়ের সঙ্গে মিলনের দৃশ্যে তিনি সমস্ত পরিবেশকেই জীবন্ত করে তোলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় চরিত্রসুলভ স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। কখনও কখনও তাঁর অভিনয় হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের অভিনয়ে প্রত্যেকেই সংযতভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনভাষ্য 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি হরিনামসংকীর্তন মাহাত্ম্যে জীবন্ত। বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি মহাত্মা শিশিরকুমারের অসামান্য অবদান নাটকটি। অদ্ভুতপূর্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর হরিনাম-প্রেমিকতার মহাত্মাই ফুটে উঠেছে নাটকটিতে।

এজেন্সীর জন্য লিখুন আর. টি. এম. এণ্ড কোং ১২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অপরূপ কথা

গ্রন্থনা ও রচনা • কণাদ চৌধুরী

সুখের সঙ্গে শাড়ির যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন। বিশেষতঃ শাড়িটি যদি নয়নসুখকর হয়, তবে ত কথাই নেই। রমণী শরীরকে প্রস্ফুটিত উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে শাড়িকে উক্ত উদ্যানের শ্রেষ্ঠ বেড়া বলা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে যতরকম নারী-প্রচ্ছদ আবিষ্কৃত হয়েছে, শাড়ি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্যারিস-নিউইয়র্কের ফ্যাশানবিদরাও আজকাল শাড়ি-গানে উচ্চকণ্ঠ। শাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, শাড়িপরিণী হলে সবাইকেই ভাল দেখায়। পায়ের গড়ন ভালো না হলে চাইনিজ ফ্রক পরবার উপায় নেই; আসামের মেখলা পরতে গেলে তন্বী হওয়া আবশ্যিক; শালোয়ার-কামিজের জন্যে অন্ততঃ পাঁচ ফুটে মাথা রাখতে হবে—আবার পাঁচ-দশের ওদিকে শিরো-সঞ্চালনকারিণীর পক্ষে এই পোষাক গর্হিত, কারণ, একজন মহিলা রণ-পা পরে হেঁটে যাচ্ছেন এই কুচিন্তার হাত থেকে পঞ্চজনকে রক্ষা করা অন্যতম নাগরিক কর্তব্য। কিন্তু এবম্বিধ কূটনীতি শাড়ি প্রসঙ্গে আসে না। কারণ, শাড়ির টিবে খাঁটি ভারতীয় শাড়ির আবরণে সব শরীরই এক লেহে লীন হয়ে যেতে পারে আসলে প্রতীচ্য-প্রচ্ছদের মত শাড়িকে শরীরের রূপরেখা সাজতে হয় না সেজন্যই বলে, সংযমের শেকলে। দর্জির কাঁচির ছোঁয়াচ না রেখে, সকল অঙ্গ ভরে হাসতে প্রচ্ছদের মধ্যে একমাত্র শাড়িই পারে। শরীরের সঙ্গে শাড়ির সম্পর্ক একনিষ্ঠ। আকর্ণ প্রসারিত বেদনার স্তনগুলিকে সে কখনো রোদেপোড়ে ছেড়ে যায় না। শাড়ি জননীজনোচিত স্নেহে শরীরের সব-কুল স্বচ্ছন্দেই মাপ করে দেয়।

কিন্তু শাড়ির এত সব গুণাবলী আমরা কবে থেকে জানলাম? বিদেশী ভারতবর্ষ প্রথম শাড়ি ধরল কবে? এর উত্তরে পেছন ফিরতে হবে মধ্যযুগে। মধ্যযুগের জনৈক রাজশেখরের "কাব্য মীমাংসায়" উৎকীর্ণ ভারতের প্রচ্ছদ-রীতির উচ্ছ্বল উদাহরণগুলি রয়েছে। নূপুরনিহিত বুদ্ধ-জন্মের গান্ধার ভাস্কর্যের নিবিড় পটে যুগোপযোগী শাড়ি-সজ্জিত। কুষাণ যুগের প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলি বস্ত্র দিয়ে শাড়ি পড়েছে। মধ্যযুগের পূর্বে কিন্তু শাড়ি-পরিহিতা স্ত্রী-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় প্রচ্ছদ-রীতির রূপবিবর্তন ধারার প্রায় শেষ অঙ্কে শাড়ির জন্ম এবং শাড়ি-বার সব কথা এই বিবর্তনেই নিহিত।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় পরিচ্ছদ-ধারা চারটি পর্যায়ক্রমে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকে খৃঃ পূঃ ৩২০ শতক, খৃঃ পূঃ ৩২০ শতক থেকে ৩২০ খৃষ্টাব্দ, ৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ এবং

সুখ ও শাড়ি

১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক যুগ এই চার পর্যায়ে ভারতীয় পোষাকের বিবর্তন-ধারা বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে।

প্রাচীন যুগ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩২০ শতক:

এই যুগে তিনটি বিভিন্ন ধরণের আবরণ-রীতি প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষে।

(১) নীবিবদ্ধ খাটো কাপড়ের অধোবাস, কাঁচুলি আর ওধ্‌নি।

(২) দ্বিতীয় ধরণের পরিচ্ছদটি প্রায় শাড়ির মত। অধোবাসের একটা অংশ ('পল্লব') আঁচলের মত ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে দিত।

(৩) তৃতীয় প্রচ্ছদ-রীতিটি আদিবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। শুধু একখণ্ড বস্ত্র কাঁধের ওপর দিয়ে অথবা বাহুর তল দিয়ে বাঁধা থাকত।

এই যুগে স্ত্রী এবং পুরুষের পোষাকের তফাৎ বিশেষ ছিল না। এবং উর্ধ্বাবাসে বিশেষ কোনো পক্ষেরই আসক্তি ছিল না। শীত-গ্রীষ্মের শাসনেই শুধু উর্ধ্বাবাসের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নির্ভর করত।

খৃঃ পূঃ ৩২০ থেকে ৩২০ খৃষ্টাব্দ

এই যুগে ইতিহাস এবং বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবে ভারতীয় আবরণসজ্জা নানা ধরণে পরিবর্তিত হয়েছে। অন্ততঃ আট থেকে দশটি বিভিন্ন প্রচ্ছদ-রীতির পরিচয় এই যুগে পাওয়া যাবে। শাড়ি জাতীয় আবরণের প্রভাব এই যুগে আরো বেড়েছে। সূচীবন্ধ পোষাক-আশাকও আবিভূত হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সেলাই-করা পোষাকের জনপ্রিয়তা জলবায়ুর প্রভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য। 'সকাছা' পদ্ধতিতে বস্ত্র পরিধানের জন্মও এই যুগে হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বারহুত ভাস্কর্যের মোহিনী মূর্তির সকাছা পরিধেয় পণ্ডিত-বন্ধুবের অন্যতম প্রমাণ। কুষাণ যুগের রমণীটিও কাছা দিয়ে কাপড় পরেছে। মধ্যভারত এবং মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের কাছা দেয়া শাড়ি পরার পদ্ধতির শুরু সম্ভবতঃ এই যুগেই।

৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ :

নারী-পরিচ্ছদের স্বাতন্ত্র্য এই যুগের কাছে অপরিসীম ঋণী। কারণ, এই যুগেই স্ত্রী এবং পুরুষের পরিধেয়ের পার্থক্য প্রথম সূচিত হয়; সকাছা পদ্ধতির অধোবাস পুরুষদের ধুতি হল এবং শাড়ি কেবল মহিলা-শোভনরূপেই গণ্য হল।

১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল :

এই যুগের ভারতীয় পোষাকের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিও অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই যুগের মধ্যেই তুর্কীরা ভারতে এসেছে, মুঘলরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজদণ্ড চালিয়েছে, ইংরেজরা এসেছে। রাজদরবারের আস্থাভাজন হবার জন্যে পুরুষদের পোষাকে রাজ-রুচিও আমদানী হবার ফলে পুরুষের পোষাকে খলিফা, মাস্টার টেইলার প্রভৃতির কাঁচি অমোঘ হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু ভারত-ললনারা মৌল পরিধেয় শাড়িকে কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি। পুরুষরাও যাঁরা বিদেশী পোষাক পরেন না, তাঁদেরো বিদেশে গমনকালে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ প্রিন্স কোট মারফৎ মাঝমাঝি একটা রফা করতেই হয়। কিন্তু গর্বের সঙ্গে বলতে হয়—পোষাক যুদ্ধে ভারতীয় মহিলারাই একমাত্র আপোষ-হীন সাফল্য-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন চিরকাল। উৎকট জাত্যাভিমানী জাপানী মেয়েরাও আজকাল ক্রমশঃ কিমোনোকে সিন্দুকে তুলে ফ্রকে গা গলিয়েছে, বিদেশে বার্মিজ মেয়েরা আজকাল ইয়োরোপীয় পোষাক পরতে আপত্তি করে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইতিহাস কথিত প্রবাদটি "Unity in the deversity" শাড়ির প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে অনায়াসে। ভারতীয় মহিলারা সকলেই প্রায় শাড়ি পরেন বটে, কিন্তু এক-ভাবে পরেন না। দাক্ষিণাত্যে সকাছা শাড়ি পরার ধরণের সঙ্গে বাঙালী শাড়ি পরার অমিল যথেষ্টই। গুরুজনের সামনে উত্তর ভারতের বধূ মাথায় ঘোমটা তোলেন, কিন্তু কুর্গের গিন্নী কোনো

অবশ্যতেই মাথায় ঘোমটা দিয়ে খোঁপার ফুলগুলোকে গোপন করা চলে না। বালুচরী, মালওয়া এবং সৌরাষ্ট্রী শাড়িকে কুঁচি দিয়ে দিয়ে প্লীট করেই পরা হয়, তবে আজকাল বাংগালী ধরণের শাড়ি পরাই সমস্ত দেশে অনুসৃত হচ্ছে ক্রমশঃ।

শুধু কি পরিধান পদ্ধতি, বস্ত্র-কৌলিন্যেও শাড়ি এদেশের বিভিন্ন স্থান-মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। টাপাইল থেকে নিশ্চয়ই শাড়ি চালান আসে না ভারতবর্ষে, কিন্তু 'টাপাইল' নামটা কি মুছে ফেলবার শাড়িবিলাসিনী হৃদয় থেকে? আওরাঙ্গাবাদী শাড়ি আজকে বম্বের প্রিন্স অফ ওয়েলস যাদু-ঘরে শোভা পাচ্ছে এবং আওরাঙ্গাবাদে আজকাল চোলির 'হিমরু' ছাড়া আর কিছু আসে না। তবুও ত বেনারসের জরি-কাজ ভাতান শাড়িকে অনেক সময় আওরাঙ্গাবাদী বলে পরে মেয়েরা। আবার প্রায় একই ধরণের শাড়ি, তাদের

বয়ন-প্রণালীও প্রায় এক, তবু তাদের পার্থক্যও চিরকালের। যেমন, ইন্দোরী শাড়ির আঁচলা এবং পাড় প্রায় গোয়া-লিয়রের চান্দেরী শাড়ির মতই। শুধু লতাপাতা নক্সা ইন্দোরীতে নেই, জমিতে ডুরে, তাতেই কত, কত তফাৎ। 'আমেদাবাদী পটোলা', উড়িষ্যার 'ইকত', এবং দাক্ষিণাত্যের 'পচেনপল্লি' কাপড়ের বয়ন-প্রণালী একই, শুধু আমেদাবাদীর তাঁতিরা জ্যামিতিক নক্সায় বেশী আসক্ত—এইটুকু তফাৎই নির্বাচকমণ্ডলীর মনে জাতিস্মর হয়ে থাকে।

বালুচরের কিছু কিছু শাড়ির জন্যে আজও পুরবাসিনীরা শোক-দিবস যাপন করেন। বাংলাদেশের বালুচর শাড়ি স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার মত। বালুচর শাড়ির আঁচলাটিকে আজো সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা গেল না। পৈথন বস্ত্রের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছে শুধু। 'করমকারী' শাড়ি কি আর উদ্ধার করতে পারবেন নিখিল ভারত তাঁত শিল্প সমিতি? পুরোনো ঐতিহ্যের শাড়ি পুনঃপ্রচলনের জন্যে কলাক্ষেত্রের শ্রীমতী রুক্মিণী অরুনডেল-এর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পরিশেষে নিবেদন, শাড়ির ইতিকথার ইতি টানা অসম্ভব। কারণ শাড়ি যদি দর্জির দোকান থেকে আসত, তবে ছাঁট-কাটের মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান দেওয়া যেত। প্রতি বছরই নতুন শাড়ির জন্ম হচ্ছে। এ বছরের মানে-না-মানা শাড়ির সব আগামী বছরে হয়ত শুধু মফস্বলেই দেখা হবে, শহরের দোকানের কাঁচে তখন 'সপ্তপর্ণী'। তাছাড়া শাড়ির খোল, পাড়, আঁচল এবং পরার ধরণের অদ্ভুত বিচিত্রতায় শাড়ি নিরবধি নতুন।

অর্থাৎ সোজা কথা বলতে গেলে, শাড়ি মানেই দ্রৌপদীর শাড়ি—এই শুরু হয়ত আছে—কিন্তু শেষ নেই নেই ই।

CENTRAL LIBRARY

পাতায় পাতায় রে

বছরের বিশেষ বিশেষ সময় কাগজ খুললেই বন-মহোৎসবের খবর চোখে পড়ে। কিন্তু যাঁরা কিন্তু গোয়ালাদ গলিতে থাকেন তাঁদের কাছে খবরটা পর দিনই বাসী হয়ে যায়। হরত হরিপদবাবু, গলি থেকে রাজপথে এসে ফুটপাতের বকুল গাছটার দিকে একাধিকবার তাকান কিন্তু তাতে সবুজের সঞ্চয় কতটুকুই বা হয়। ছোট দুটো ঘর, দাওয়া নেই, বারান্দা নেই যে, দুটো টব এনে বসাবেন। ঘরের সাদা দেয়াল দেখতে দেখতে মনে হয় কলকাতায় নয়, হিমঘরের চিরতুষারের প্রদেশে কে তাঁকে ফেলে দিয়ে গেছে। করপোরেশনকে মাঝে মাঝে গালাগাল দেন, 'দু-চারটে বকুল গাছও ত গলিতে লাগাতে পারতিস বাপু।' পাড়ার লোকে শুনে হাসে। সেই লাম্পপোস্ট—যেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে আজ চারবছর সেটাই সরানো হচ্ছে না, একটু বৃষ্টি হলেই যে গলিতে ছেলে ভাসে সেই গলিতে বকুলোদ্যান! কিন্তু মনুষ্যান ও মনুষ্যমিতেই হয়।

—কিছু না হোক নিদেন দু-চারটে ক্যাকটাস!

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হরিপদবাবু একমাথা পাকা চুল নিয়েও মরবানের দিকের সীটে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করেন, শুধু আকাশ দেখবেন বলে, জল দেখবেন বলে, সবুজ দেখবেন বলে: উত্তর মেরুর কনুকেও নিরুত্তর চোখে ফেরেন না। কোন বারান্দার কোন টবে কটি পাতাবাহার, তাই মুখস্থ করতে করতে বাসে-ট্রামে ঘরে ফেরার কাল কাটে। আবার সোতলা বাস দৈবাৎ বাঁ-ফুটপাতের দিকটা যদি একটু বেশী ঘেঁষে যায় তবুপাছন দু-একটি সবুজ পাতার ডাল স্টটবাসের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। চাখতে দু-একটা পাতা ছিঁড়ে নেন কেউ কেউ, নাকে তুলে ধরেন, নিজের ছেলেমানুষী নিজের কাছেই অলৌকিক মনে হয়।

কিন্তু ঘরে ঢুকলেই সিদ্ধু মনও বন্ধু হয়ে আসে। দেয়ালের কালো-ভাবে আঁকা বাগানের দিকে তাকিয়েই প্রাণ-পাখী পাখা ঝাপটায়। বিশাল তক্তোপোশ, কেরোসিন কাঠের তাকে বোবফুডের কৌটো, স্থানাভাবে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়তে কাঁথা, ঝুলে-পড়া আলো, দেয়ালে দশ বছর আগের চুনকাম! পারলে হরিপদ-বাবু যথাসম্ভব দেরী করেই বাড়ি ফেরেন। একদা শৈশব প্রতি শিশুদেহেই দেখার পৃথিবীর অনাতম বর্ণ সবুজ। বড় হয়েও সেই স্মৃতি ইচ্ছা হয়ে হাওয়া বদর সময় সময়—ঘাস-মাতার সবুজ শরীরের সুগন্ধি অন্ধকার থেকে নেমে—ঘাসের মধ্যে যেন ঘাস হয়ে জন্মাই।

সবুজের এক অর্থ বাঁচা। পুরোনো বাড়ির গলিত পাঁচিল থেকে, সেই সবুজ বাঁচাটা অশথ-চারা হয়ে আশ্বাসই যদি দিতে পারে, তবে কেন সে হরিপদবাবুর সকাল নটার রোদ আসা জানালায় এসে দাঁড়াবে না? এবং হরিপদবাবু একদিন সকালে বাজারের হিসেব করতে করতে হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে বলেও ফেলতে পারেন, 'ওগো, দেখে যাও, তোমার গাছে একটা নতুন পাতা বেরিয়েছে!' তাতে ফোড়ন দেয়া খানিকক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে ছুটে আসবেন গিন্নী এবং তখন

ভাঙ্গা বাড়িতে থেকেও অশথ গাছটা ক্রমশঃ বাড়িটাকে আরো ভেঙ্গে ফেলছে জেনেও মনে হবে আকবর বাদশার সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ নেই।

তাহলে কি হরিপদ-গিন্নী শিশু-পালন, রন্ধন, তৈজসপত্র-মর্দন ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু পত্রপুষ্পচর্চাই করে যাবেন! কিন্তু পুষ্প কোথায় কলকাতার! নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, উঠোনে ঘর তুলে ভাড়া বসছে, পৌনে এক কাঠা জমির দাম লাখের কাছাকাছি যাচ্ছে, কলকাতার সাজান বাগান আমাদের পিতা পিতা-মহরাই ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে দেখে-ছেন। সেদিন কি শখ হয়েছিল মাথায় বেলফুলের একটা গোড় দেবেন বলে হরিপদ-গিন্নী 'বেলফুল'য়ালাকে ডেকে-ছিলেন। মরচের মত লাল ধরে গেছে ফুলে; সেই মালাটিরই দাম নাকি চার আনা। 'নেবে ত নাও মা নইলে চলি, ভিক্টোরিয়াতে এই মালাই পড়তে পাবে না' বলে মালাওয়ালা আর ভাববারও অব-কাশ দেয়নি। সোজা হাঁকতে হাঁকতে চলে গেছে। সেই থেকে ফুলের জলসায় হরি-পদ-গিন্নী নীরব হয়ে আছেন। আর পুষ্পের পর পত্র? কলকাতার বুকচাপা

নিঃশ্বাসে মানুষের বুকেই ঢুকে ধরে—গাছ ও ছাড়। এখানে পাতার জন্মহারের চেয়ে মানুষের জন্মহার বেশী, বোধহয় সংজ্ঞাত। কাজেই কিনু গোয়ালার গলির মত গলিতে বাস করলে, পত্র-চর্যার জন্যে বাড়ীর অথবা ফ্ল্যাটবাসীর মূল্যবান ঘণ্টা পড়ে সময় নষ্ট না করলেও চলবে।

বস্তুতঃপক্ষে কলকাতার বাড়ীই বা উদ্যান-ঘেরা। একটা দু-ঘরের 'ফ্ল্যাটে' যে আমাদের অনেকের বাসা! তবে একথাও ঠিক, আপনার বাসাটিকে যদি আপনি ভালবাসেন তাহলে আপনার সহজে ভালবাসা দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দেই আপনার বাসাটিকে ভালো রাখা বানাতে পারেন। কিন্তু তার আগে নীচের কটি 'মনে রাখুন' মনে মনে রাখুন।

।। মনে রাখুন ।।

ঘরে রাখার গাছ আলাদা। নানারকম ক্যাকটাস (ফণীমনসা), মানিপ্ল্যান্ট, পাতাবাহার আপনার সহায়। সবরকমের পাতাই কলকাতায় পাওয়া যায় সহজে, রথের মেলাতে ও গাছের দোকানে ছপ্পরই হয়ে যায়। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মানিপ্ল্যান্ট ও কলকাতায় বহুতই হয়।

১। যে পাত্রে গাছ রাখবেন তার তলায় জল-নিকাশের ফুটো রাখবেন। নয়তোলের ছোবড়ার একটা আসবার রাখুন। তার পর ঝুরো মাটির সঙ্গে পরিমাণ মত সার মিশিয়ে পাত্রটি ভর্তি করুন। গাছ পুঁতবার আগে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিয়ে ভিতরে গর্ত করে গাছটি বসিয়ে দিন।

২। মানিপ্ল্যান্ট শুধু জলেই বাঁচে। ঘরের যেখানে একটু আলোহাওয়া বেশি সেখানেই কাচের পাত্রে, শিশিতে ওকে রেখে দিলে সে আপনাকে সহজেই প্রচুর পত্রসম্ভার উপহার দেবে। ক্যাকটাসে মাটির সঙ্গে নুড়ি মিশিয়ে নিতে পারেন। গাছেরই জল্য বেশি সময় যায় না করতে পারলে আপনি বরং ঘরে ক্যাকটাসই সাজান।

৩। পোর্টুলোকা বা নাইন ও' ক্লকে পাতার সৌন্দর্যের সঙ্গে মাড়াও পাবেন আশ্চর্য রঙের ফুল। তবে ফুল ও পাতা একসঙ্গে চাইলে আপনাকে পোর্টুলোকার পাটোকে দু-বার করতে হবে। অর্থাৎ রোদে দিতে হবে প্রতিদিন।

৪। যে পাত্রে গাছ রাখবেন সে পাত্র কিনতে বাজারে যাবার দরকার নেই। টিন-কাটারি দিয়ে টালকাম পালিশারের পেট কেটে তাকে তার দিয়ে সমান্তরাল-ভাবে ঝুলিয়ে দিলে শান্তিনিকেতনি বাঁশের পুষ্পপাত্রের চেয়ে কিছু মাত্র খারাপ লাগবে না। এই সস্তা সাধনার কথাই—এক টাকার মধ্যেই দুটি পাত্র রং করার মত তেলরং পাওয়া যায়। ছোট ঘর হলে দেয়ালের বা রং পাত্রের রং তাই হলেই মানাবে। এ ছাড়া কাচের যে কোনো পাত্র ঘুরো-ওলা জলপানী বাটি, মাটির পাত্র বিশেষ করে কাজলা পোড়ানো মাটির কুঁড়ে ভুঁড়ো সবুজকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর পশ্চাদ্‌পট দেবে।

৫। যদি জীবন্ত গাছের পরও মনে হয় আরো কিছু সাজালে হত, তাহলে বলব উৎসবে ফুল, নিত্য দিনের জন্য পাতা অভাবে সুখের গড়নের শুকনো ডাল সন্ধান। কোথাও বেড়াতে গেলে ডাল সংগ্রহ করে আনবেন। সে ডাল অনেক দূরে রাখবেন—অর্থাৎ উঁচুতে বেয়ালে।

জহরৎ ব্রত

ঊষ্ণ-প্রধাবিত এবং বিত্তবন সমাজে সোনার চেয়ে দামী যদি কিছু থাকে, তা হল জড়োয়ার গয়না। মধ্যবিত্ত সমাজেও এক-আধটা দামী হীরের আংটি, কানের ফুল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় না, তা নয়। কিন্তু অলংকার হিসেবে জহরতের ব্যবহার শুধু শৌখিনতা বা বিলাসিতার জন্যেই করা হয় না। দুর্ভাগাকে ফিরিয়ে আনা, রোগমুক্তি, এমনকি সুপরিবেশের জন্যও জহরতের আংটি প্রভৃতি ধারণ করেন অনেকে। বয় মেয়েদের রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। অবশ্য যে চেহারার যাকে যে রত্ন মানায় তাকে তাই। উপেক্ষা সুপারিশ এই জহরৎ ধারণকে স্বচ্ছন্দেই 'জহরৎ-ব্রত' বলা চলে পারে। কারণ ব্রতপালনকালে কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালনেই ত আমরা ব্রত গ্রহণ বলি। তবে এই ধরণের জহরৎ ধারণ কালে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ত করেই থাকে। কিন্তু যে ধারণের আগে এদের সম্বন্ধে একটু মোটা-মুটি জ্ঞান থাকা দরকার। নীচে রূপবিদকে দরকারী সমস্ত কথাটি জোগাবে-আন্তরীয় বিশ্বাস প্রস্তুত হল।

নবরত্ন : নবরত্নের নটি রত্ন হল, মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, হীরা, নিষ্কল, পুষ্পরাগ, মরকত এবং নীলকান্ত।

মুক্তা : মুক্তার মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ আছে যা মানসিক প্রফুল্লতা বাড়ায়। স্নায়ুতন্ত্রের মুক্তার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। গায়ের রং কালো হলেও তাতে লক্ষ্মী বা শ্রী আনতে মুক্তার বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে-সব মহিলা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছেন মুক্তা ধারণ করলে মেদবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৃদ-সংক্রান্ত রোগেও মুক্তা ফলপ্রসূ।

চুনী : চুনীর প্রভাব অনেকটা মুক্তার মতই।

প্রবাল : প্রবালকে সাধারণ ভাষায় 'পলা' বলে। রক্তবর্ণ, পলাশ বর্ণ, পদ্মবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের পলা পাওয়া যায়। পলা শরীরে তেজ বৃদ্ধি করে, রক্ত চলাচলে সরলতা আনে। দেহের শীর্ণতা পলার সঙ্গে মুক্তা ব্যবহারে দূর হতে দেখা গিয়েছে। যে-সব মেয়ে বেশী রোগা, সর্দি-কাশিতে ভোগে তাদের পক্ষে পলার সঙ্গে মুক্তা উপকারী।

পান্না : কাঁচ ঘাসের মত এবং সবুজ রঙে পান্না পাওয়া যায়। পান্না ক্যাকাশে সাদা রঙে লালিমা আনে।

গোমেদ : মেধাবৃদ্ধি বাহিত করে।

মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর

দুষ্ট দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে অবাধ মেলামেশা করা যায় না। কাজেই ইহা অনেকের জীবন দুঃসহ করে। প্রতিদিন সাধনা মঞ্জন ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত হয় ও দন্তরাজি সুন্দর, সবল ও সুশ্বেত হয়।

সাধনা দশন

সাধনা ঔষধালয় – ঢাকা

৯০এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সাধনা ঔষধালয় রোড শাখা বন্দর

কলিকাতা-৩৯

আসাম—ইয়েদেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. বার-এট-ল
এস. সি. এস. (আমেরিকা) এফ. সি. এস. (আমেরিকা)
সমস্ত ভারতের ইলাম শাখার মুখ্যপূর্ণ কার্যালয়।

ভারতের কেন্দ্র—কাঁচরাপাড়া ঘোষ,
এস. সি. সি. এস. (লন্ডন) আন্তর্জাতিক।

CENTRAL LIBRARY

যোগাযোগ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৯৬২ সনের ৫ই মে হাওড়া থেকে যে পুরী এক্সপ্রেস রওনা হয় তার একটি আনরিজার্ভড্ থার্ড ক্লাস কামরাতে গাড়ি ছাড়ার আগে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, একটি লোক এসে উঠেছিল। গাড়িতে পেরাপেরি ভিড়, তার ওপর কয়েকটি কলেজের ছেলে যাচ্ছিল দল বেঁধে, তারা যথারীতি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে—সুতরাং উঠতে পারার কথা নয়। যারা জোর জবরদস্তি তর্ক বিতর্ক করেছিল তারা কেউ উঠতে পারেওনি। কিন্তু এ লোকটি সে সব কিছু না করে নীরবে বিনা প্রতিবাদে গাড়ির পাদানীতে দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝুলে যেতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর ছেলেগুলিই তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।

নিতান্তই সাধারণ গোছ, হতদরিদ্র-গোছের আকৃতি। সঙ্গে টিকিট ছিল কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভব ছিল না, কারণ যারা পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কাটে তারা এমন করে সহযাত্রীদের জুলুম আর তম্বি সহ্য করে না। গাড়িতে উঠে বসবার জায়গা আশা করে—না পেলে বচসা করে, ঝগড়া করে, হাতাহাতিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একেবারে কোথাও কোন স্থান না থাকলে অন্তত বিলাপ করে, অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ লোকটি কিন্তু কিছুই করেনি, গাড়িতে উঠে অমায়িকের ভাকারওনি বোধ হয় -একেবারে দোরের কাছে, জানলার ধরে ধারে আধুনিক কামরায় যে একটি করে বসবার সীট, থাকে—তারই পিছনে সামান্য খাঁজমতো জায়গাতে একটি ভাঁইকরা বিবর্ণ তুলোর বস্তা পেতে বসে পড়েছিল। তার সঙ্গে মালও ছিল সামান্য, ঐ ছেঁড়া কম্বলটা বার দিলে একটা গামছায় জড়ানো বোধহয় একখানা ধুতি এবং পানের বাটয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। লোকটির গায়ে জামাও ছিল না।

লোকটি বসেই কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বুজেছিল। হয়ত অসুস্থ ছিল তখনই—কিম্বা ক্লান্ত। ঠাসা এক কামরা লোক, তার অনেকেই বসবার জায়গা পায়নি—ফলে হকাহকি চেঁচামেচির অন্ত ছিল না। কলেজের ছেলেগুলো অবিরাম হৈ-হুল্লা করে যাচ্ছে কিন্তু এত চিৎকারেও লোকটি চোখ খোলেনি। যেমন উঠেই অবসন্নভাবে বসে পড়েছিল, তেমনিই বসে রইল, চোখও খুলল না, কথাও বলল না।

ও কাউকে লক্ষ্য না করলেও ওকে অনেকে লক্ষ্য করছিল। ছেলেরা তো বিশেষ করে। কেউ কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা নিয়ে কটু মন্তব্য করছিল, কেউ কেউ বা এই ধরণের ভালমানুষ চেহারার দীনহীন লোকই যে গাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে সে সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছিল বাকী যাত্রীদের।

লক্ষ্য করছিল বলেই ওর প্রথম নড়ে-চড়ে ওঠা থেকে সব ঘটনাটাই চোখে পড়েছিল অনেকের। তখন বোধহয় রাত চারটে হবে, হঠাৎ যেন চমকে ঘুম ভেঙে যাবার মতো করে নড়ে উঠল লোকটি, যেন হঠাৎ দম-আটকে আসার মতো হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল বার কতক—তারপরই আবার সব স্থির হয়ে গেল। মাথাটা তেমনিই পিছনে হেলে সেই গাড়ি আর সীটের খাঁজে গিয়ে আটকাল। তফাতের মধ্যে এবার আর চোখ দুটো পুরো বুজল না, মুখটাও একটু ফাঁক হয়ে রইল। শেষনিঃশ্বাসটা নেবার জন্য মুখটা যা ফাঁক হয়ে ছিল সেটা আর বন্ধ হল না।

ছেলেরা তখনও বুঝতে পারেনি। বাঙ্কের পাশে বাঙ্কের ওপর যে মধ্য-বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তিনিই প্রথম বলে উঠলেন, 'আই গড্: লোকটা মরে গেল নাকি?...হার্ট ফেল করল?'

তখন অনেকেই সচকিত হলেন। ওদিকের লোকেরা ভিড় করে এলেন দেখতে। ছেলেরাও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। সীতা সীতাই একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে, বিনা নোটিসে একটা লোক এমন করে মুখের খাবি খেয়েই মরে যাবে এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

বিশ্বাস হলও না প্রথমটা। 'এই—!' 'অরে, শুনতা হ্যায়?' 'কী হয়েছে হে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?' ইত্যাদি প্রশ্ন ও উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে তার মনো-যোগ আকর্ষণের চেষ্টা চলল খানিকটা। একজন তাঁর জলের বোতল থেকে খানিকটা জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন মুখে। আর একজনকে বললেন বাতাস করতে। দুজন আরও জল নিতেন কিন্তু অনেকেই প্রতি-বাদ করে ওঠতে নিরস্ত হলেন। বহু-মূল্য ও বহু মানুষ আকৃষ্ণাশেই মেলের পড়ে—একটু বেশী জল হলেই গাড়িয়ে

আসবে, যদি মড়াই হয় তো মড়ার জন্য, সেটা ভালো অভিপ্রেত নয় কারও।

গাড়ির এক কোণে কার একটা ছাতা ছিল, ছেলেদের একজন ছাতাটা টেনে নিয়ে বারদুই খোঁচা দিয়েও দেখল। কিন্তু কোনোক্রমে সে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ নিজল না, যাঁর ছাতা তিনি হৈ-হৈ করে উঠলেন। ছেলেটি তাড়াতাড়ি ছাতা ফেরৎ দিতেও তার জের মিটল না। ছাতার মালিক যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন বহুক্ষণ পর্যন্ত, ছেলেটিও দু-একটা গরম গরম জবাব দিল শেষের দিকে। ফলে হয়ত বেশ একটা বড় রকমের তামাসা জমে উঠত—যদিনা গাড়ির অপর দু-চার জন মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিতেন।

এদিকের গণ্ডগোলটা মিটতে ছেলেদের মনোযোগটা আবার ঐ লোকটার উপরই এসে পড়ল। তাদের তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সহিাই এভাবে অকস্মাৎ বিনা কারণে বা বিনা আয়োজনে একটা লোক নিঃশব্দে মরে যেতে পারে—এটা বিশ্বাস করার বয়স নয় তাদের। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক বাধিয়ে তুলল।

একজন বলল, 'আরে এই হল হিয়েন ফুর্ব্বাসিস। বুঝতে পাচ্ছিস না?'

আর একজন বলল, 'দূর, এরে লোকের কখনও ফুর্ব্বাসিস হয়! যারা ঘরে বসে কাজ করে, শুধু মাথা ঘামায় আর ভাল ভাল কিচ ফুড খায়—সেই সব সিডেন্টারী হ্যাবিটের লোকরাই ফুর্ব্বাসিসে মরে। এ যদি মরেও থাকে—হুইচ মাই ফুটট ছোঁর মাচ—হার্ট ফেল করে মরেছে হঠাৎ।'

'ধুরে বাবা ও-ই হল। যার নাম জানা চাক তার নামই মুড়ি। আগে ফুর্ব্বাসিস নামটা জানতে না, বলত হার্টফেল। এখন সবই ঐ ফুর্ব্বাসিস।'

'কিন্তু ও বাবা মরেনি—আমি বাজী রেখে বলতে পারি। হয় ভোচ্‌কানী খেয়েছে হয়ত অনেকদিন খাওয়া টাওয়া হয়নি—নয়তো নেশা ঘুমু। ঐ রকম পোজ করেছে, আমরা মরে গেছে মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হলেই কিছু একটা কেড়ে নিয়ে পালাবে।'

'হাঁ—এই এত বেলায় চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে—এখন চুরি করবে! তুইও যেমন! ও গেছে, গন্।'

'একটু দেখলেই তো হয়—দাঁড়া আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি।' একটি ছেলে উঠে কাছে এসে দাঁড়াল, 'কিছুক্ষণ যদি আমরা হাত দিয়ে থাকে বাতাসের গন্ধে উঠে বসবে ঠিক। একটু খাবার দিয়ে সাধ বরং—'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস মাইরি। লুচি, লুচি ইজ দা ধিং—লুচির গন্ধে মরা-মানুষ জেগে ওঠে। লুচি আছে কার কাছে? বার করো।'

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ থেকে খাবারের কৌটো বার করল একজন। অল্প বয়সের কৌতূহল ও নিষ্ঠুরতায় সবাই ঝুঁকে পড়ল আবার, অনেকেই হাসতে লাগল একটা বড় রকমের তামাসার আভাসে, সকলেরই চোখে মুখে কৌতুকমাখানো উত্তেজনা: তারই মধ্যে একজন একখানা লুচি ছুঁড়ে দিলে তার মুখের দিক ভাগ করে। লুচিখানা তার মুখে লেগে কোলের ওপর গুলে পড়ল—এবং পড়েই রইল। কিন্তু ততক্ষণ আর এক মুঠো বোঁদে এসে পড়েছে। কে একজন ব্রান্ড চীনেবাদাম গোটা দুই ছুঁড়ল ওপাশ থেকে।

এবার ওদেরই মধ্যে থেকে একটি ছেলে ধিক্কার দিয়ে উঠল, 'এই—কী হচ্ছে কি, অসভ্যতা করছিস কেন? একটা ডেড্ মানুষকে নিয়ে এসব বিশ্রী রসিকতা আমার ভাল লাগে না।'

'সহিাই বাবারা' ভরসা পেয়ে ওধার থেকে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মৃত্যুর একটা স্যাংটিটি আছে, মৃত-ব্যক্তিকে অমন খোঁচাখুঁচি করা ঠিক নয়।'

অপ্রস্তুত হয়ে সরে এল সবাই। অবশ্য কতটাই বা সরা সম্ভব। তবু, কিছুক্ষণের মতো ওদের সেই অবিশ্রান্ত হৈ-চৈতেও ছেদ পড়ল। মিনিট দুই তিন স্তব্ধ থেকে যেন মৃতের আত্মাকে সম্মান দেখাল ওরা।

তার একটু পরেই অবশ্য আবার শুরু হয়ে গেল তাদের আলোচনা। প্রথম দিকে সেটা ঐ মৃত ব্যক্তিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল কিছুক্ষণ। কী হয়েছিল লোকটার, কেন মারা গেল, কী করে বা কী করত, কোথায় বাড়ি—এই সম্পর্কে নানা বিচিত্র অনুমান তর্ক ও বাজী রাখারাখি। প্রসঙ্গটা ফুরিয়ে যেতে আবার যথারীতি আলোচনাটা রাজনীতি, কলেজ ও চলচ্চিত্রে এসে পড়ল।

সে লোকটি তেমনিই পড়ে রইল। সেই কোণে ঠেস দিয়ে—লুচি, বোঁদে ও চীনেবাদাম কোলে নিয়ে।

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাড়ি শ্রীরামপুর স্টেশনে এসে পড়ল।

সে একজন বলল, 'গার্ডকে তো ব্যাপারটা জানানো দরকার, এমন একটা ঘটনা ঘটল—'

সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'অমন কাজও করবেন না। অমন কাজও করবেন না। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? খবর পেলেই পুলিশ আসবে—কী হয়েছিল কী বৃত্তান্ত, কে চেনে ওকে—হাজারো রকমের জেরা আর জবানবন্দী শুরু হয়ে যাবে। দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা হয়ত ডিটেন্‌ড্ হয়ে যাবে গাড়ি তার ফলে। তারপর হয়ত বলে বসবে আপনারা নেমে যান গাড়ি কাটব। এই ভিড়ে আবার কোথায় গিয়ে উঠব মশাই মোট-ঘাট নিয়ে? আপনি তো এক কথা বলে খালাস।.....তার চাইতে চলুন—যেমন এতক্ষণ এলেন, তেমনি চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিন, কতটুকুই বা বাকী? পুরীতে পৌঁছে সবাই নেমে যাব যখন—যাদের চোখে পড়বার ঠিক পড়বে। তখন থানাপুলিশ যা হয় হোক, আমাদের তো হয়রান করতে পারবে না!'

বুদ্ধিমানের মতো কথা তাতে সন্দেহ নেই।

যিনি গার্ডকে খবর দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু ট্রেন সেদিন অনেক দেরিতেই পৌঁছল পুরী। ছাকা একটি ঘণ্টা লেট্ হয়ে গেল। নটায় পৌঁছবার কথা—ঠিক দশটায় পৌঁছল।

ওদিকে ঠিকমতো এসে সাক্ষীগোপালে দেরি ক'রে ফেলল এক ঘণ্টা।

সাক্ষীগোপাল স্টেশনে ঢোকবার মুখেই ঘটল ঘটনাটা।

যারা বাইরের দিকে ছিল—এ কামরার ছেলেরা দুদিকের দরজা খুলে নিজের নিজের বেডিং পেতে সামনেই বসে ছিল—তারা সবাই দেখেছে।

ওদিকের পাকা রাস্তাটা দিয়ে তীর-বেগে আসছিল ছেলেটা, কুড়ি বাইশ কি পঁচিশ হবে তার বয়স—মালকোছামারা ধুতি পরনে, গায়ে ধোপদস্ত ছিটের শার্ট, সুশ্রী ভদ্র চেহারা। যে সাইকেলটা করে আসছিল সেটাও ঝকঝকে নতুন। একেবারে লাইনের ধারে পড়ে রাস্তাটা যেখানে ঘুরে গেছে, সেইখানে নেমেই সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ছুটো বগির মাঝখানে গলা দিয়ে শুয়ে পড়ল। [illegible] ঠেকাবার কিছু কোন বাধা দেবার সময় তো পেলাই না,

ঘটনাটা কি ঘটছে তা বোঝবার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে ছেলেটির গলা থেকে মুণ্ডটা কেটে বেরিয়ে গেল।

তারপর যথারীতি হৈ-চৈ, চেঁচামেচি, ভিড়। রিপোর্ট, চেঁচামেচি। এবং অনাবশ্যক দেরি।

তারপর এক সময়ে গাড়ি আবার ছাড়ল। পুরীতে পৌঁছলও। যাত্রীরা নেমে গেলেন পাণ্ডাদের কচকচি ও রিক্সওয়ালাদের কোলাহলের মধ্য দিয়ে। এক গাড়ি অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তির এক-রাত্রি-বাসের চিহ্ন বহন করে পড়ে রইল শুধু রাশীকৃত জঞ্জাল—খাবারের টুকরো, শালপাতা, দগ্ধাবশিষ্ট বিড়ি, দেশলাইয়ের কাঠি, চীনাবাদাম ও কলার খোসা—এবং আরও বহু বিচিত্র আবর্জনা।

আর পড়ে রইল ঐ মৃতদেহটা, সেই একক আসনের খাঁজে মাথা হেলিয়ে অর্ধ-নিমীলিত স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে, মানুষের নিষ্ঠুর-কৌতুকের চিহ্নস্বরূপ রুচি বোধে ও চীনেবাদাম কোলে ক'রে।

পড়ে রইল সাক্ষীগোপালের প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার মুখে দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহটাও। কোথা থেকে যেন রেল পুলিশের দারোগা আসবেন, সরেজমিন তদন্ত হবে, তবে ডোম এসে লাশটা সরাবে। আপাতত পড়ে রইল ঐ ভাবেই—ধড়টা থেকে মাথাটা হাত-চারেক দূরে, তারও স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি অনন্ত শূন্যে মেলে দিয়ে।

এ দুটো ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। সে গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, ঐ দুই স্টেশনের স্টেশন-স্টাফ এবং আরও অনেকে। কিন্তু জানেন দুটো ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে। এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা জানেন না। হয়ত কোন দিন কথাটা ভেবেও দেখেননি। হয়ত ঐ হার্টফেল ক'রে মরা লোকটির কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়নি কোন দিক থেকে।

তাঁরা জানেন না তার কারণ তাঁদের জ্ঞান পরিমিত, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। শুধু তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয় তাঁদের। লেখকের দৃষ্টি মুক্ত এবং সত্য। তিনি বহুদূর দেখতে পান। তাঁর কল্পনা অনেক সময় এমন সত্যে পৌঁছয় যেখানে পৃথিবীর কোন তথ্য কোনদিন নাগাল পাবে না।

আমি দেখতে পাচ্ছি দুটি মৃত্যুর মধ্যে এক রহস্য-নিবিড় যোগাযোগ।

আমি পরিচয় পেয়েছি ঐ লোকটির। ওর নাম শত্রুঘ্ন দাস। এই সাক্ষীগোপালের কাছেই ওর বাড়ি।

ছেলেটিকেও চিনি। ওর নাম বিশ্বনাথ। ছেলেবেলায় নাম ছিল মাগন দাস। শত্রুঘ্নর ছেলে ও। একমাত্র ছেলে।

আরও ভাল ক'রে এর রহস্যটা জানতে হ'লে আমায় সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে বহু বছর আগের একটা সময়ে।

এই বিশ্বনাথের ছেলেবেলায়।

শত্রুঘ্ন লেখাপড়া জানত না। যেমন আর পাঁচজন ওদের দেশ থেকে যায় শুধু-মাত্র দুটো হাতের ওপর ভরসা ক'রে কলকাতায়—সেইভাবে সেও এসেছিল একদিন। এখান-ওখান ঘুরে চাটার্জী বাবু পিলাম্বরে'র কাছে এসে ঠেকেছিল। ভাল মিস্ত্রী, কাজ ভাল শিখেছিল বলে ঐখানেই হেড মিস্ত্রীর কাজ পেয়ে গিয়েছিল। পয়সা ভালই কামাত, বাবুর বিশ্বাসভাজন—আর এখান ওখান করার কোন প্রশ্ন ছিল না।

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক আগেই শত্রুঘ্নর বিয়ে হয়েছিল। তখনও সে কাজ খুঁজতে বেরোয়নি কলকাতাতে। বাপের সামান্য জমি ভরসা, পোষা অনেক। খুবই দুর্দশায় দিন কাটত ওদের। কিন্তু তাতে ওরা অভ্যস্তও ছিল, খুব দুর্দশা বলে কোনদিন কেউ ভাবতে শেখেনি সে অবস্থাটাকে।

প্রথম ভাবল শত্রুঘ্নই। কলকাতায় এসে নাগরিক জীবন দেখে প্রথম তার মনে হ'ল যে এ-ই তো জীবন। এরাই তো বেঁচে আছে। তাদের জীবনের মূল্য কি? প্রয়োজনই বা কি?

সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করল সে যে যদি কোনদিন তার ছেলে হয় তো তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবে—এমন ক'রে ওদের মতো গরু-ভেড়া-ছাগলের জীবন যাপন করতে দেবে না।

ছেলে হ'লও ওর প্রথমেই। আগে মনে হয়েছিল কিছুই হবে না—ওর বৌ একটু রুগ্ন গোছের ছিল, সময় পেরিয়ে বেশী বয়সেই হ'ল। তারপর ওর বৌ আর বাঁচেনিও বেশীদিন, বছর খানেক সূতিকার ভুগে মারা গিয়েছিল। তখন শত্রুঘ্নর বয়স সামান্যই—পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়—সকলেই আশা করেছিল যে ও আবার বিয়ে করবে। না করবার কোন আপাত-কারণও ছিল না, কলকাতায় 'কাম্-অ' করে, টাকা কামায়—সে তো একটা ছেড়ে তিনটে বিয়ে করতে পারে। আত্মীয়-স্বজনরা চেপে ধরেও ছিল খুব। কিন্তু শত্রুঘ্ন আর রাজী হয় নি।

সুখের চেয়ে তার কাছে উচ্চাশাটাই বড় হয়ে উঠেছে তখন, সে বুঝেছে যে এখন বিয়ে করলে আরও বহু ছেলেমেয়ে হবে তার, আর তাদের সবকটাকে ভাল-ভাবে মানুষ করা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, যত পয়সাই সে কামাক না কেন! একটি মাত্র ছেলে প্রসব করেই যে ওর স্ত্রী মারা গেল, এটাকেও সে বিধাতার স্পষ্ট নির্দেশ বলে ধরে নিল। এই ছেলেই মানুষ হোক ওর—আর সে কিছু চায় না।

শত্রুঘ্ন করলেও অসাধ্য-সাধন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছেলেকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে লাগল। অনেক খরচা, সে সহরটা যুদ্ধের বাজারে কাজ-কারবার কম। মালই পাওয়া যায় না, যা মেরামতী কাজ। মিলিটারীতে নাম লেখালে অনেক টাকা পাওয়া যেত হয়ত কিন্তু শত্রুঘ্নর ভরসা হ'ল না। তাতে স্বাধীনতা থাকবে না। হয়ত কোন সুদূর দেশে ঠেলবে, মরণের মুলুকেই ঠেলবে হয়ত, সেখানে বোমা কি গুলিগোলার মধ্যে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এখানে তার ছেলেটা বরোমাস বোর্ডিং-এ থাকে—তাকে কে দেখে? মরে গেলেই বা তার কি হবে। অনেক ভেবে সে বেশী মাইনের লোভ সম্বরণ করল।

কিন্তু পুরনো কাজেও টিঁকে থাকতে পারল না। পুরনো মনিব পুরনো কর্মচারীর মাইনে হিসেব করেন আগের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই হিসেব-মাফিক বাড়ান একটু একটু করে। এধারে যুদ্ধের বাজারে নতুন নতুন কারখানা হচ্ছে তখন, তাতে মোটা মাইনের ব্যবস্থা। তাঁরই একটাতে ঢুকে পড়ল সে।

কিন্তু তাতেও কুলোয় না। নিজের খরচ যেমন-তেমনই হোক—একটা ঘরে তারা দশ-বারোজন থাকে, শুধু ভাত-ডাল ফুটিয়ে খায়—কিন্তু তার দায়-ধাক্কা অনেক। দেশে তখনও বুড়ো মা-বাবা আছে, ভাইটা লড়াইয়ে চলে গেছে—কিছুই পাঠায় না প্রায়, তার সংসারও দেখতে হয় ওকে। এদিকে ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়ে—তার এক গাদা খরচ। মাগন দাস নাম দিয়েছিল ওর ঠাকুমা, বহু ঠাকুরের দোরে মেগে ছেলে হয়েছিল বলে, ইস্কুলে ভর্তি করার সময় শত্রুঘ্ন পালটে বিশ্বনাথ ক'রে দিলে। মাগন অর্থাৎ ভিক্ষা শব্দটা দারিদ্র্যের প্রতীক, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে ছেলের কোন দিন। ভদ্রলোকের ছেলের

মতোই যেন সে মানুষ হয়—এই চেষ্টাই করেছে শত্রুঘ্ন বরাবর। বই-খাতা অনেকেই চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে, ওরও হয়ত তা হ'ত কিন্তু সে দিক দিয়েই যায়নি কোনদিন।

এর মধ্যে বহু দুঃখ করতে হয়েছে তাকে। কারখানার চাকরি ছাড়াও অনেক কিছুতো কাজ করত সে। যে অঞ্চলে ওদের বাসা—সেখানে তখনও সব বাড়িতে জলের ব্যবস্থা হয়নি—ভারীর চাহিদা আছে। শত্রুঘ্ন ভোরে উঠে দু-তিন বাড়ি জল জোগাত। রাত্রে ফিরেও জোগাতে হ'ত। যেদিন ওভার-টাইম থাকত—সেদিন অন্য ভারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে জোগানটা ঠিক রাখত। এ ছাড়া একজনের বাড়িতে মালীর কাজ করত, রবিবার বা ছুটি-ছাটায়। পাম্বারের বস্তুপাতি কিছু কিছু ছিল ওর কাছে—আশপাশের বাড়িতে কারও কোন দরকার পড়লে টুকটাক কাজ সেরে দিয়ে আসত। তাতেও দু-চার টাকা পাওয়া যেত। এক কথায় বারোমাস এবং প্রতি মাসে ত্রিশ দিন ভূতের মতো খেটেছে সে। ভোর হওয়ার বহু আগে থেকে আরম্ভ করত—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত সে খাটুনি। সূর্য কখন ওঠে বা কখন অস্ত যায় তা কোন দিন চেয়ে দেখেনি সে।

তার ফলে, যে-ছেলের জন্যে এত, সেই ছেলের সঙ্গেই দেখা হ'ত দৈবাৎ, কালে-ভদ্রে। ছুটি পাওনা হ'ত কিন্তু ছুটি মানেই তো লোকসান। কখনও-সখনও দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে দেশে আসত ছেলেকে দেখতে—ছেলের ছুটির সময়, তাও যেতে-আসতেই দুটো রাত চলে যেত, একদিনের বেশী ছেলের কাছে থাকা হ'ত না। ওর ইস্কুলে কখনও যেত না শত্রুঘ্ন, পড়ে তার বোনঝুরা কি কথা-বার্তায় তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে—ছেলে লজ্জা পায়।

ইস্কুলের পড়া শেষ হ'তে বিশ্বনাথ বলল, 'এবার আমি একটা কাজটাজ খুঁজি—তুমি দিনকতক বিশ্রাম নাও। যা হোক একটা চাকরি কি আর জুটিয়ে নিতে পারব না?'

কথাটা শুনে শত্রুঘ্ন শিউরে উঠল।

যারে! এই জন্যে কি সে এত কষ্ট করল। ছেলেকে কলেজে না পড়িয়ে, তিনটে পাস না করিয়ে সে ছেড়ে দেবে? কী হয়েছে তার শরীরে যে এখন থেকে ছেলেকে দিয়ে রোজগার কাঁড়িয়ে বসে বসে খাবে সে?

'যা যা, তোর কাজে যা। কী করবি না করবি সে আমি বুঝব।'

এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল সে ছেলেকে।

না, যালেশ্বর কলেজে নয়, পুরীর ছোট কলেজেও নয়—ওদের গ্রামের পোস্ট-মাস্টারবাবুকে খরচ দিয়ে পাঠিয়ে সে কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজেই ভর্তি করিয়ে দিলে। ছেলে তবু একবার আপত্তি করতে গিয়েছিল, পুরীতে হলে ফ্রী হ'তে পারত, যালেশ্বরেও চেনা লোক আছে, অন্তত হাফ্-ফ্রী হ'ত—আর কিছু না হোক, হোস্টেলের খরচ অনেক কম ওসব জায়গায়, এ শত্রুঘ্ন কী করলে! মিছিমিছি এ নবাবীতে দরকার কি?

এর মধ্যে একদিন ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ দিতে সে কলকাতায় এসেছিল, তার বাবা কী অবস্থায় থেকে তার খরচা জোগায় তা নিজের চোখেই দেখে গেছে।

কিন্তু শত্রুঘ্ন এবারও কোন কথা শুনল না। তার এখন দায়-ধান্ধা অনেক কম। মা বাবা গেছে—ভাই ফিরে এসেছে, তার সংসার সে বুঝবে—এখন তার দায় বলতে ঐ ছেলে। পাঁচটা নয় দশটা নয়—একটাই ছেলে। তার জন্যে খরচ করবে না তো কার জন্যে করবে? যদি পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে থাকত ওর, কি বিশ্বর মা বেঁচে থাকত—তা হ'লে কি আর পারত? তার ভাবনা না বিশ্বনাথ ভাবে—মন দিয়ে লেখাপড়া করুক সে, তা হ'লেই শত্রুঘ্নর এ কষ্ট সার্থক।

তাছাড়া এখন আরও অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে, স্বদেশী সরকারের আমলে বেশ ভালই রোজগার করছে সে, শরীরও অপটু হয়ে পড়েনি কিছুমাত্র। এখনই বা কাজ ছাড়বে কেন সে? আর তার বয়সই বা এমন কি একটা হয়েছে? এখনও তো পঞ্চাশ হয়নি। আরও ঢের কম। ঠিক হিসেব নেই—কিন্তু তার যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখনই বিশু এসেছে তার ঘরে—আর বিশুরই বা কী এমন বয়স। হিসেব করে নিক না বিশু। এত তো লেখাপড়া শিখছে। তার কি বসে খাবার বয়স এটা?

এরপর আর কথা চলেনি। শত্রুঘ্নর বহুকষ্টার্জিত অর্থ বেশ অবস্থাপন্ন ছেলের মতোই কটকের সরকারী কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়েছে বিশু।

কিন্তু শত্রুঘ্নর উচ্চাশা এইখানেই থেমে থাকেনি। ছেলেকে যেমন মানুষ করছে, তার উপযুক্ত ঘরবাড়িও যে করে দিতে হবে সে কথাটাও সে ভোলেনি। ওদের গ্রামে পাকাবাড়ি কারও নেই, বাড়ি করার সাজ-সরঞ্জাম বহুদূর থেকে আনাতে হয়—সুতরাং খরচ অনেক বেশী তবু তিল তিল ক'রে পয়সা জমিয়ে ওর হিসাবে একখানা পাকাঘরও তুলে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে। ছাদটা হ'ল না এ যাত্রায়—আপাতত অ্যাসবেস্টাসের চাল দিয়েই রাখতে হ'ল কিন্তু অন্যান্য মাল-মসলায় কোন কার্পণ্য করেনি। দরজা জানলাও সদর বাজার থেকে ভাল দেখে আনিয়েছে। এরকম কখনও এ গ্রামের লোকে দেখেনি—গ্রামে রটে গেল—লড়াইয়ের বাজারে বিস্তর টাকা কামিয়েছে শত্রুঘ্ন দাস, টাকার কুমির হয়ে গেছে।

আরও একটি আশা তার ইদানীং একটু একটু ক'রে মনের মধ্যে বেশ ভালমতো একটা আকার ধারণ করেছে।

একটি মনের মতো বৌ আনবে সে ছেলের জন্যে।

আবার লক্ষ্মীছাড়ার সংসারে শ্রী ফিরবে, সুখের সংসার হয়ে উঠবে। মা-হারা ছেলেটা চিরকাল হোস্টেলে হোস্টেলে কাটাল—এবার যখন কাজকর্ম করবে তখন যেন অন্তত একটু গৃহসুখ পায়।

সে বৌ-ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সে।

ওদের পাশের গ্রামের দামো—ওর সঙ্গে এক কারখানাতেই কাজ করে, এক বাসাতেই থাকে দীর্ঘকাল। দামোই বলে-কয়ে ওকে এ কারখানাতে ঢুকিয়েছিল, তার জন্য একটা কৃতজ্ঞতাও আছে। এতাবৎ এই দীর্ঘকাল উপকার ছাড়া অপকার কখনও করেনি।

দামো ওদের সজাতিও বটে।

এই দামোরই একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। বয়স—তাদের তুলনায় একটু বেশীই হয়ে গেছে, খুব কম ক'রেও, শত্রুঘ্নর যা আন্দাজ—চৌদ্দ-পনেরো হবে। দেখতে যে খুব একটা ভালো তা নয়—অবশ্য কুৎসিতও নয়। তা তাদের ঘরে তাদের গ্রামে সুন্দরী মেয়ে আর কটা আছে। কৈ, নজরে তো পড়ে না। তবু এ মেয়েটির একটা আলাদা শ্রী আছে বেশ। লক্ষ্মী নাম—আচারে-আচরণে, চলায়-বলায়ও চমৎকার একটা লক্ষ্মী-লক্ষ্মীভাব। সবচেয়ে বেটা শত্রুঘ্নকে আকৃষ্ট করেছে—স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। একবার দামোর খুব অসুখ করে—খবর পেয়ে বাড়ি থেকে স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিল সেবা করবার জন্যে, সেই সময়ই লক্ষ্মীকে প্রথম দেখে ও। শুধু শত্রুঘ্ন কেন বাসার সকলেই লক্ষ্মীর ব্যবহারে ও মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে

গিয়েছিল। বাপের সেবাও করেছিল তেমনি, ঐটুকু মেয়ে দিনরাত খুটখাট কাজ করে যেত—মার সাহায্য করত।

তারপর—ঐ মেয়েটিকে আরও ভাল করে দেখতেই—একবার দামোর বাড়িতে গিয়েছিল শত্রুঘ্ন, দামোর সঙ্গে। আরও ভাল লেগেছে তার। এই মেয়েই তো সে চাইছিল, যাকে দেখেই মা-জননী বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

সেই বারেই মনস্থির করে ফেলে সে। কলকাতায় ফিরে, দামো পাছে অপর কোন জায়গায় কথা দিয়ে ফেলে (খোঁজ-খবর তো করছেই বহুদিন ধরে) এই ভয়ে, দামোকেও অভিলাষটা জানিয়েছে সে। তবে একটা কথা, যতদিন না ছেলে তিনটে পাস দিয়ে কোন ভাল চাকরী নিচ্ছে, ততদিন সে বিয়ে দেবে না ছেলের—ছেলেও রাজী হবে না। ভাল করে নিজের পায়ে ভর দেবার আগেই একটা বোঝা ঘাড়ে করতে চায় না আজকালকার কোন ছেলেই। শত্রুঘ্নরও সেটা পছন্দ নয়।

বলা বাহুল্য দামো হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিল একেবারে। তারের ঘরে তিনটে পাস করা চাকরে বাবু পাত্র এখনও দুর্লভ। এমন অদৃষ্ট কি তার লক্ষ্মীর হবে?

তার মনের এই গোপন কথাটি অবশ্য ছেলেকে জানায়নি শত্রুঘ্ন। জানাবার কোন প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার ছেলে বাধ্য—ভাল ছেলে। বাপকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বাবা তার সুখের জন্য যে ব্যবস্থা করছে সে ব্যবস্থা সে মাথা পেতে সসম্মানেই নেবে নিশ্চয়। আর সুখীও সে হবে, নিশ্চয়ই হবে। শত্রুঘ্ন ভুল করেনি। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বহু দুঃখ করেছে সে। সব-চেয়ে, বলতে গেলে ভরা-যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়েছে। ওর যে বয়সে বিপুর মা মরেছে সে বয়সে এখন প্রথম বিয়েই হয় না। ছেলের কথা ভেবেই তো সে আর বিয়ে করেনি। নিজে একদিনও ভাল একখানা কাপড় পরেনি, একদিনও—এই কলকাতার বাজারে কত ভাল ভাল খাবার—জীবনধারণের মতো ভাত-ডাল ছাড়া কোন খাবার কিনে খায়নি। সবই ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলের সুখের ব্যাপারে হিসেবে ভুল হলে চলবে না।

বিশ্বনাথ বি-এ পাস করলে ভালভাবেই। তারপর পরীক্ষা দিয়ে প্রতি-সিয়াল অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ঢুকে পড়ল। কোন ধরপাকড় করতে হল না, সে রকম মুরুব্বী ছিলও না কেউ। নিজের জোরেই বেঁচে থেকে। তার কৃতিত্বের আরও একটা স্বীকৃতি পেল সে। প্রথমে সবডেপুটি হবার কথা, কিন্তু সরকার থেকে ট্রেনিং নিয়ে একেবারে ডেভলপমেন্ট-এ বড় একটা পদে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল।

এ ছেলে শহর বাজারেও সুপাত্র। পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই, এ রকম পাত্র সেখানে সুদূর কল্পনারও অতীত। সুতরাং চারিদিক থেকে বহু পাত্রীর বাবা ঠিকানা যোগাড় করে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হতে লাগলেন শত্রুঘ্নর বাসায়। শেষে ওদের পাশের গ্রামের জমিদার—রাজা উপাধি তাঁর—লোক পাঠালেন ওর কাছে।

এ শত্রুঘ্নরও কল্পনাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু শত্রুঘ্নর সৌভাগ্যের ধারণা একটু অন্য রকম। বৃদ্ধ বয়সে নাতি কোলে স্নেহপরায়ণ হাতের সেবা, একটি কল্যাণী মেয়ের সস্নেহ সম্ভাষণ, সংসারের শ্রী—এই তার কাম্য। তার ছেলেকে রাজার জামাই করে চিরদিনের মতো আত্মীয়ের বাইরে পাঠাবার জন্য সে এমনভাবে মনস্থ করেনি।

সে রাজার লোককে 'না' বলে দিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই বুঝল যে আর দেরি করাও উচিত নয়। লোভ বলবান। চারিদিক থেকে বড় বেশী টাকার প্রলোভন আসছে। তার মতো দরিদ্র লোক কতদিন এ লোভ সামলাতে পারবে তার ঠিক কি? সামান্য কটা টাকার জন্য হয়ত ছেলের সুখসৌভাগ্য বিঘ্নিত করে বসে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

রাজার লোককে বিদায় করেই শত্রুঘ্ন সুবিধেমত ছুটির দরখাস্ত করল। ছেলের নতুন চাকরী, সে ফসকাতে পারবে না। তবে কলকাতা ডাক সার্কাস-পালের কাছেই—ঐখানে যেখান থেকে ছোটে গিয়ে দেখা করে আসা যায়। একেবারে ছেলের কাছে গিয়ে ওঠা ঠিক হবে না, ছেলে হয়ত লজ্জা পাবে।.....

বিপু ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলেও লজ্জা পেল না। দুটি সপ্তাহই অফিসের কর্মচারীদের সমানে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল, অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালে

সৌন্দর্য্যকামী ----
সৌন্দর্য্য লাভের জন্য **রেমী** প্রসাধন
সামগ্রী ব্যবহার করুন ----

যথাযথ ক্রমে অভাবে ত্বকের প্রাণ-কোষগুলি যখন নির্জীব হয়ে পড়ে তখন ত্বকের স্বাভাবিক লাবণ্য চাপা পড়ে।

রেমী প্রসাধনী

আপনার ত্বকের নির্জীব প্রাণ-কোষ সজীব করে স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে এবং দীর্ঘস্থায়ী করে।

রেমী দাম ফেস পাউডার কেশতৈল ইত্যাদি

একমাত্র পরিবেশক : এ, ডি, আর, এ এজেন্সি কোং, বোম্বে-২, মাদ্রাজ-১ এবং কলিকাতা-১

তারপর দুপুরে খাওয়ার ছুটি হ'তে বাসায় নিয়ে গিয়ে শত্রুঘ্নরও স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। আলাদা কোয়ার্টার এখনও পায়নি, বিয়ে না হ'লে পাবে না। তবে—অন্য অফিসারদের সঙ্গে থাকলেও —আলাদা ঘর পেয়েছে একখানা। কথা-বার্তার কোন অসুবিধা নেই।

খেতে খেতেই কথাটা পাড়ল শত্রুঘ্ন। ছেলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে—প্রথমটায় তো ওকে অমনভাবে আসতে দেখে উদ্বিগ্নই বোধ করেছিল। আর অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। বিশুর বিয়ের বয়স হয়েছে, অবস্থাও হয়েছে—গোড়ায় সেই কথাই বলল। বহু সম্বন্ধ আসছে চারিদিক থেকে, শত্রুঘ্ন আর সামলাতে পারছে না। রাজামশাই সুদ্ধ লোক পাঠিয়েছেন তার কাছে—কথাটা জানিয়ে আনন্দিত গর্বে ছেলের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটির কথাও জানাল। মামাকে কথা-দেওয়া হয়ে গেছে—তাও। মামা বেশী কিছু দিতে পারবে না—কিন্তু তার দরকারও নেই। বিশু যদি বেঁচে থাকে তো ঢের টাকা রোজগার করবে। আসলে মানুষের যেটা দরকার—সুখ-শান্তি, সেটা দিতে পারবে মামার মেয়ে। বিশু সুখী হবে তাকে বিয়ে ক'রে।

নিজের বলার ঝোঁকে আপন মনে বলে যাচ্ছিল শত্রুঘ্ন, বলতে বলতে নিজেরই মানসচোখে ভেসে উঠছিল ভবিষ্যতের একটি স্বপ্নচিত্র—সেখানে শান্তি ও শ্রী'র একটি ক্ষুদ্র নীড়ে সুখী একটি পরিবার, আর তার মধ্যে সেও—তৃপ্ত, চরিতার্থ। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্ষণকালের জন্য চোখ ধেঁধে দিয়েছিল বলেই শত্রুঘ্ন লক্ষ্য করল না যে বিশুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় বিহ্বলতা।—

দুটো বাজার ঘণ্টা পড়তে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে পড়ল বিশু। এখনই আবার অফিস শুরু হবে, পাঁচটা পর্যন্ত চলবে অফিস। বাবা এখন বিশ্রাম করুক, সে ফিরে আসছে ছুটি হলেই।

শত্রুঘ্ন বললে, 'কিন্তু আমি তো এখনই ফিরে যাব ভাবছিলুম রে, এতটা পথ যাওয়া—সময় তো লাগবে।'

'না না, আজ কোথায় যাবেন—কাল গেলেই চলবে। তাছাড়া হাঁটতেই বা হবে কেন, জীপ আছে, পৌঁছে দেবে এখন—'

ব্যস্ত হয়েই চলে গেল বিশ্বনাথ। কিন্তু শত্রুঘ্নর হঠাৎ কেমন মনে হল সে কোথায় কী একটা গোলমাল বেধেছে। ছেলের আচরণ ঠিক সহজ বা স্বাভাবিক নয়। ছেলের যে সহজ সম্মতি আশা করেছিল বা সম্মতিসূচক নীরবতা—তা যেন ওর এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নেই।

ছেলেরই বিছানায় শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু ঘুম এল না। বিশু মুখে কিছু বলেনি এটা ঠিক, তবু শত্রুঘ্ন স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। গোলমাল কেন, কিসের গোলমাল—না বোঝা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেও না। তাই বিকেলে ছেলে এসে চা নিয়ে বসতেই একেবারে সরাসরি আক্রমণ করল সে, 'তাহলে কবে লাগাদ ছুটি নিতে পারবি বল, সেই মতো দিন ঠিক করব। ওদেরও তো একটু সময় দিতে হবে!'

গত তিন ঘণ্টাতেই বিশ্বনাথের মুখে বহু পরিবর্তন হয়েছে। মসৃণ ললাটে জেগেছে কুঞ্চন, অমলিন যৌবনদীপ্ত মুখে কে কালি লেপে দিয়েছে। সেটাও চোখ এড়ায়নি শত্রুঘ্নর। খেটেখুটে এল ঠিকই—কিন্তু এই বয়সে, চেয়ার টেবিলে বসা কাজে, মুখে এমন কালি পড়ে না। এত দ্রুত আক্রমণের বোধহয় সেও একটা কারণ।

বিশুর কপালে আবারও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে অসহায়ভাবে একবার বাবার মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এখন থাক না বাবা, এই তো সবে চাকরীতে ঢুকেছি। এত তাড়া কি?'

'তোর তাড়া নেই আমার তাড়া আছে। আমি ঢের দিন কষ্ট করেছি—আর না। বৌয়ের সেবা চাই।' শত্রুঘ্নর গলায় অস্বাভাবিক জোর।

তবুও বিশ্বনাথ ওর মুখের দিকে চাইতে পারে না। তেমনি ওদিকে চেয়েই জবাব দেয়, 'কিন্তু তুমি তো এখনই চাকরী ছেড়ে বৌয়ের সেবা খেতে আসছ না। যখন সে সময় হবে তখনই না হয় তাড়া করো।'

শত্রুঘ্ন আর কথার মারপ্যাঁচে গেল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সোজা-সুজি প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বল দেখি বিশু—ঠিক ঠিক বল। আমাকে লুকোবার চেষ্টা করিসনি কিছু। আমি বুঝেছি কী একটা গোলমাল আছে তোর কথার মধ্যে।'

তবু খানিকটা সময় নিল বিশু। ঢেঁমে নেয়ে উঠল সে। গলাটা ধরে আসতে লাগল কথা কইতে গিয়ে, বহুক্ষণ পর্যন্ত স্বরই ফুটল না যেন। শত্রুঘ্ন অবশ্য তাড়া দিল না, স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলের বলবার ওঠবার। স্থির হয়ে গেছে যেন তার বুকের মধ্যটাও—সমস্তটা যেন হিম আড়ষ্ট হয়ে গেছে কী এক অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায়।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেলল বিশু।

তার কলেজের সহপাঠিনী মালতী। সে-ই তার স্বপ্নকল্পনা। সেই তার আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম। তাকে ঘিরেই যত কিছু সুখস্বপ্ন তার। যদি সুখী হয় তো তাকে পে'লই হবে। সেও রাজী আছে। সেও চাকরী পেয়েছে। এই চাকরীই। চেষ্টা করছে এই বুকে আসবার। এলে বিয়ে করা সহজ হবে। সে সম্ভাবনা হ'লে বিশু বাবাকে বলবে বলে স্থির করে রেখেছিল। বাবা যে এত শিগ্‌গির তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তা ভাবেনি। তাহ'লে আগেই বলত। বাবা যেভাবে তাকে মানুষ করেছে, তাতে কোন শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে ছাড়া যে তার বিয়ে করা সম্ভব নয়—শত্রুঘ্নর সেটুকু জানা উচিত। তা ছাড়া ছেলের সুখের প্রশ্নই যদি বড় হয়—বিশুর এই নির্বাচনে ওর অমত করা উচিত নয়।

স্থির হয়ে শুনল শত্রুঘ্ন, পাথরের মতোই স্থির হয়ে বসে শুনল। বাধা দিল না, চেঁচামেচি করল না—মাঝে কোন প্রশ্নও করল না। বিশুর বলতে অনেক সময় লাগল কিন্তু ধৈর্য ধরেই শুনল সে। সব বলা শেষ হ'তে শুধু বলল, 'তুমি তাকে কথা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ—একরকম দেওয়াই। মানে আমিই তার কাছে কথা পেড়েছি।'

'অ। তাহলে আর এর নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়?'

'কিন্তু তার কোন দরকার হবে না বাবা, তুমি একে দ্যাখো, তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। খুব ভাল মেয়ে।'

হাসল শত্রুঘ্ন। বলল, 'বিয়ে করবি তুই, আমি দেখে কী করব বল। আমার পছন্দরই বা কী দাম। তোর ভাল হ'লেই ভাল।...তা তাহলে আর দেরি করার দরকার কী? বিয়েটা সেরেই ফ্যাল—'

এই সরল হাসি ও সহজ কথা সত্ত্বেও বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'না বাবা, তবু তুমি একটু দ্যাখো। বলছি, তোমার ভাল লাগবে।'

'বেশ তো। ভালই তো। তাহলে তুই-ই বা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। তাই যদি জানিস তো দেখাতে চাইছিস কেন মিছিমিছি।'

'তবু, তুমি দ্যাখোই না একবার।' জেদ করার মতোই বলে বিশ্বনাথ।

শত্রুঘ্ন আবারও হেসে বলে, 'আমরা বুড়ো লোক জোড়া পিঠে খাই। আমাদের পছন্দ এক রকমের। এর ওপর অত

ভরসা কারসানি। তাছাড়া—যদিই ধর আমার অপছন্দ হয়—তুই কি বিয়ে বন্ধ করতে পারবি? অন্য মেয়ে বিয়ে করবি আমার পছন্দমতো?'

'তোমার যদি অমত হয় তো—নিশ্চয় ও বিয়ে বন্ধ করব. এ তুমি কি বলছ। তবে অন্য মেয়ে হয়ত বিয়ে করতে পারব না। হয়ত আর বিয়েই করব না। তবে তোমার অমতে তোমার পুত্রবধূ এনে তোমার ঘরে বসাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'আর তা জেনেও আমি তোর মনের মতো বৌ অপছন্দ করব ভাবছিস! ও বাজে কথা থাক. তুই শুধু একটু তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফাল!'

'কিন্তু—কিন্তু সে আমার সজাতি নয় বাবা। ওরা ব্রাহ্মণ। বিয়ে এমনি হয়তো হবে না। রেজেস্ট্রী করতে হবে।'

'তা বেশ তো। কিন্তু লোকজন খাওয়াতে তো বাধা নেই? যেদিন থেকে রোজগার করছি সেইদিন থেকেই শখ. গ্রামের বোল আনা সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব। বাবা-মা'র শ্রাদ্ধের সময় হয়ে ওঠেনি, কারণ তখন পয়সা ছিল না হাতে প্রায় কিছুই. যা করেছি দেনা করে করেছি। তোর বিয়েতেও যদি না খাওয়াতে পারি—'

'হ্যাঁ. তা পারবে বাবা, নিশ্চয় পারবে। আর কটা মাস অপেক্ষা করলে আমিও কিছু দিতে পারব।'

'না. তার আর দরকার হবে না. তুই বরং তাড়াতাড়ি যাতে হয়—সেই চেষ্টা কর্!'

মাস দুই পরেই বিয়ে হয়ে গেল ওদের। এর জন্যে অনেক কান্ড করতে হ'ল বিশ্বনাথকে, অনেক তদ্বির। প্রথম তদ্বির মালতীর বদলির, দ্বিতীয় তদ্বির কোয়ার্টারের। ওর সৌভাগ্যক্রমে দুটোই হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। সুতরাং পাত্র-পাত্রী কোন পক্ষেই আপত্তির কোন কারণ রইল না।

শত্রুঘ্নও খুশী শেষ পর্যন্ত। গ্রাম-সুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পেরেছে সে ভালভাবেই। বৌটিও ভাল হয়েছে। দেখতে যেমন-তেমন কিন্তু স্বভাব বড় মিষ্টি। যথার্থ শিক্ষার পালিশ আছে ব্যবহারে। উদ্ধত বা উন্নাসিক নয়। শ্বশুরের কেমন করে সবট সে জানে, তবু শ্বশুরের প্রাপ্য সম্মানে এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দেয়নি। এই কদিনেই সেবা যত্ন যথেষ্ট করেছে। শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে বলে যত না হোক—সরকারী চাকরীকরা মেয়ে ওর বৌ হয়েছে বলেই গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট ঈর্ষিত শত্রুঘ্ন সম্বন্ধে। আরও ঈর্ষা—সেই চাকরে বৌও তার অশিক্ষিত অল্প-বিত্ত শ্বশুরকে শ্বশুরের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে বলে।

বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছুটির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। এবার কর্মস্থলে ফিরতে হবে। মালতী বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

'নিশ্চয়ই যাব। তোমাদের ঘর-সংসার গুছিয়ে না দিলে চলবে?'

তবু সংশয় থেকে যায় মালতীর মনে। বলে, 'আর কলকাতাতে ফিরবেন না তো?'

'ও হরি, তা না ফিরলে চলে! আমারও তো ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল।'

'কিন্তু আর দরকার কী বাবা আপনার সেই খাটুনির মধ্যে গিয়ে?'

'দূর পাগলী, এখনও পঞ্চাশ বছর বয়স হয়নি আমার. এরই মধ্যে বসে বসে খাব! আর কিছুদিন চাকরী করি তারপর বসবার কথা ভাবা যাবে।'

'কিন্তু—' কী যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় মালতী।

'কিন্তু কি মা? বল না, ভয় কি?'

'বলছি যে—আপনার ছেলে এখন বড় অফিসার হয়েছে, আমিও—, এখন আপনার আর ও চাকরী করা ভাল দেখায় না। লোকে এ নিয়ে হয়ত মুখের সামনেই ঠাট্টা তামাসা করবে—। জানেন তো আমাদের এ দেশের লোকের স্বভাব. খোঁচা দিতে পারলে আমরা ছেড়ে দিই না। আগে করতেন সে আলাদা কথা ছিল—এখন আরও একটা কথা উঠবে লোকে বলবে ব্যাটা-বৌ খেতে দেয় না।'

শত্রুঘ্ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, এটা আমার ভাবা উচিত ছিল মা। কিন্তু বিশু তো বলেনি কখনও—. তাই মনে পড়েনি। তা তার যদি অসুবিধা হয় ও চাকরি ছেড়ে দেব বৈকি। কিন্তু এক-কথায় এখান থেকে ছাড়ি কি করে এতদিনের চাকরি. পাওনাও আছে অনেক. তাছাড়া তাদের বলে করে আসাও তো উচিত. নইলে বেইমানী করা হয় তাদের সঙ্গে—'

কেমন অসহায় ও অনুনয়ের ভাবে চায় সে পুত্রবধূর মুখের দিকে।

লজ্জিত হয়ে পড়ে মালতী। তাড়াতাড়ি বলে, 'না না এখনই ওখান থেকে ছাড়তে বলছি না আপনাকে। একথা বলেছি জানলেও আপনার ছেলে রাগ করবেন।...আপনি যান—। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আমরা থাকব তার ভরসায়—আপনি কলকাতায় বসে থাকবেন?'

শত্রুঘ্ন হাসল একটু। এরা লেখা-পড়া জানা মেয়ে—কিন্তু বলে-ফেলা কথা এখনও সুকৌশলে ঢাকতে পারে না। গুছিয়ে কোন কথা পাড়তেও পারে না। বিশুর মা হ'লে এর চেয়ে অনেক গুছিয়ে বলতে পারত।

শত্রুঘ্ন ওদের সঙ্গে ওদের কোয়ার্টার পর্যন্ত এল।

দুটো তিনটে দিন থাকলও। কিছু কিছু গোছগাছ করে দিল। তবে সে শুধু সংসারের হাঁড়ি-হেঁসেলের দিকটাই. শৌখীন সাজসজ্জার কিছুই বোঝে না সে. সেদিকে গেলও না। নতুন কোয়ার্টার. বহু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা—লোভ হয় বৈকি। মনে হয় অনেক খেটেছে—দিন কতক আরাম করতে দোষ কি? কিন্তু সে লোভ সে সামলে নেয়। এর মধ্যে সে বড়ই বেমানান। চাকরবাকররাও জেনে গেছে সে সে এদের গুরুজন হ'লেও সে মূর্খ. সে এদের চেয়ে অনেক ছোট।

বিদায়ের দিনও জীপে তুলে দিয়ে পুত্রবধূ প্রশ্ন করল. 'তাড়াতাড়ি চলে আসছেন তো?'

'দেখি—।' বলে হাসল শুধু।

মালতী বলল, 'এখানে যদি খুব অসুবিধা মনে করেন, দেশেও তো এসে

সত্যিই ভাল সিন্দুর বলেই তো সবাই চায়—
শোধিত সিন্দুর
"বিজয়িনী"
কালীঘাট মার্কা
পি এন্ড বি ইন্ডাস্ট্রিজের
তৈয়ারী
কলিকাতা-১৯

দেশী ও বিদেশী যাবতীয় কলম সেরামত ও বিক্রয়ের জন্য
কলেজ পেন ফোরাম-এ আসুন
৫৪/১ কলেজ স্ট্রীট (মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থল) কলিকাতা-১২

থাকতে পারেন। নতুন বাড়িঘর করেছেন, পরের ভরসায় ফেলে রেখেই বা লাভ কি? দেশে থাকলে জীপ পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে পারি মধ্যে মধ্যে, আমরাও যেতে পারি। কিছুদিন এখানে রইলেন—কিছুদিন ওখানে রইলেন—। কিন্তু চাকরি আর না।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শত্রুঘ্ন, হঠাৎ যেন প্রবল উৎসাহভরে মাথা নাড়ল, 'সে তো বটেই। আচ্ছা আসি তাহ'লে। সাবধানে থেকো তোমরা।'

জীপ ছেড়ে দিল। মালতী কী একটা বলতে গেল সেটা আর শোনা হ'ল না।

যত তাড়াতাড়িই সে চলে আসুক, মাসখানেকের আগে যে আসতে পারবে না তা এরা জানত। তাই চিঠিপত্র না পেলেও কোন উদ্বেগ বোধ করেনি, খবর নেবারও প্রয়োজন বোধেনি। কখন যে মাসখানেক কেটে গেছে তাও বুঝতে পারেনি।

মাসখানেক পরেই খবর পাওয়া গেল অবশ্য। কিন্তু সেটা শত্রুঘ্ন মারফৎ নয়। দামোর মারফৎ। দামো এসে খবর দিলে।

একবস্ত্রে চলে এসেছে। স্টেশনে নেমে এক মিনিটও কোথাও দাঁড়ায়নি, মুখে জল দেয়নি। এতটা পথ প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে। এভাবে এসেছে তার কারণ তার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে —পরোক্ষ হ'লেও—তার একটা বড় রকমের দায়িত্ব আছে।

খবর সংক্ষেপে একটিই—শত্রুঘ্নর বোধহয় মাথার কিছু গোলমাল ঘটেছে।

দামোর মেয়েটির জন্যে সে-ই উদ্যোগী হয়ে একটি ভাল সম্বন্ধ ঠিক করেছিল, গত সপ্তাহে অনেক খরচপত্র ক'রে বিয়ে দিয়েছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তখন দামো বোঝেনি যে কোথা থেকে অত টাকা পেল শত্রুঘ্ন। ভালই জেনেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সে কদিন আগেই। আফিসের প্রাপ্য টাকা চুকিয়ে নিয়ে সেই টাকাই খরচ করেছে। সামান্য কিছু বাকী ছিল, ক'দিনের মাইনে না কি ওভারটাইম, সেইটে নিয়েছে কাল, তা থেকে পুরীর একখানা আর্ড ক্লাস টিকিট কেটে যা ছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছে দামোর মেয়েকে—মনিঅর্ডার ক'রে। কাপড় জামা সুটকেস ওখানে যা ছিল—সামান্যই অবশ্য, একখানি কাপড় আর একটি গামছা রেখে সব বিলিয়ে দিয়েছে গরীব দুঃখী ভিখিরী ছেকে।

অফিসের খবরটা জানতে পেরেছে দামো দিন দুই আগে। তারপরই এই ঘটনা। সে ছেপে ধরেছে শত্রুঘ্নকে। কী মতলব তার, কী করতে চায় সে। এতদিন ভেবেছে যে দেশে যাবে কিম্বা ছেলের কাছে—কিন্তু জামাটা পর্যন্ত সিলিয়ে নিল—তার মানে কি? সে কি আত্মহত্যা করতে চায়?

'না রে,—আত্মহত্যা করব কেন? ছিঃ। এবার দিনকতক বিশ্রাম করব।' হেসে জবাব দেয় শত্রুঘ্ন।

'তার জন্যে কি এমন ক'রে কেউ সব বিলিয়ে দেয়। এ তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ।'

দামো দুহাত চেপে ধরে ওর, 'ঠিক ক'রে বলো দিকি কী মতলব তোমার!'

'না রে, সত্যিই ছুটি নিলুম এবার। কাজ থেকেও—সংসার থেকেও। একদম স্বাধীন জীবন এখন থেকে। আর কোন পরোয়া রইল না কারও। ভগবানকে তো ডাকিনি এতদিন, ডাকার সময় পাইনি।—এবার তাঁকে ডাকব। পুরীতে যাব, বাসা রাখব না কোথাও, যেখানে সেখানে পড়ে থাকব। যদি কোন মঠে কাজ পাই, যাসন মাজার কি ঝাড়ু দেবার তো তাই নেব। নইলে আনন্দবাজারে প্রসাদ মেগে খাব। প্রভুকে দর্শন করব তাঁর নাম করব—তোফা আনন্দে দিন কেটে যাবে। খুব আনন্দে থাকব রে, বিশ্বাস কর, খুব আনন্দ।'

আর কিছু বলেনি দামো। ছুটে চলে এসেছে এখানে। আজকেরই টিকিট কাটা আছে। আজকের এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হবে শত্রুঘ্ন। এখন তো আর সেখানে আটকানোর সময় নেই। বিশু যদি পারে তো কাল এই ভোরে সাক্ষী-গোপালেই নামিয়ে নিক, নইলে যদি খুঁজে না পায় তো—যেন পুরী পর্যন্ত চলে যায় ঐ ট্রেনে, সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসে।

চুপ করে বসে শুনেছিল কিঙ্করনাথ। স্বপ্নাবিষ্টের মতো। মুখে কোন ভাবই ফোটেনি এর মধ্যে একবারও। দামোর কথা শেষ হতে শুধু বললে, 'তাই যাব। ভোরেই স্টেশনে চলে যাব।'

তারপর মালতীকে বলেছিল দামোর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে, আর ওরই একখানা ধুতি বার ক'রে দিতে।

তারপর থেকে আর একটি কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। অফিসেও যায়নি সেদিন। সিলপ লিখে ছুটি নিয়েছিল।

শান্ত, স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। প্রশান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সে মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না, মনে যদি কোন ঝড় উঠে থাকে, তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি সেখানে।

এতখানি স্তব্ধতা ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই মালতী প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাওয়ার সময়ে যখনিয়মে এসে খেতে বসাতে ততটা ভয় আর থাকেনি। সেও চুপ ক'রে ছিল, এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস হয়নি তার। হয়তো মনের মধ্যে গোপন একটা বিবেকের দংশনও অনুভব করছিল —কে জানে!

চুপ ক'রেই রইল বিশু—বাকী সমস্ত দিন। রাত্রেও বহুক্ষণ পর্যন্ত। একভাবে একটা চেয়ারে বসে রইল সে। শেষে মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে এসে অনুযোগ করতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসেনি বহুকাল। সেটা মালতীরও না জানবার কথা নয়। কারণ সেও জেগে ছিল। তার ঘুম হচ্ছে না নানা রকম এলোমেলো চিন্তার জন্য। সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। বিশুর ঘুম আসা দরকার। নীরবে নিঃশব্দে কী প্রচণ্ড ঝড় বহন করছে সে বুকের মধ্যে, তা'—পূর্বেইতিহাস সবটা জানা না থাকলেও—কিছু কিছু বুঝতে পারে বৈকি মালতী।

শেষে একসময় ভরসা ক'রে প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'ঘুমের ওষুধ খাবে কিছু? দেব?'

খুব সহজভাবে উত্তর দিলে বিশু, 'না, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

'ভোরে যে যাবে—জীপ বলে রেখেছ? মহান্তীবাবুকে না বললে কি গাড়ি আনবেন?'

'দরকার হবে না। সাইকেলে যাব।'

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সহজ উত্তর। স্বাভাবিকও।

'এতটা পথ সাইকেলে যাবে—কষ্ট হবে খুব।'

মৃদু অনুযোগ একটু করল মালতী, বেশী কিছু বলতে পারল না। আজ যেন সে বিশুর নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই, বড় দূরে বড় পর মনে হচ্ছে নিজেকে।

আর একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিল সে খানিক পরে, অনেকক্ষণের অনেক সংকোচ কাটিয়ে, 'ওঁকে এখানেই আনবে তো?'

বিশুও একটি মাত্রই কথা বলেছিল তার উত্তরে, 'না।'

আর কোন কথা হয়নি।

আর কোন কথা হ'লও না কোনদিন। কারণ বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাত্রের দিকে মালতী ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিশু যে কখন উঠে রওনা হয়ে গেছে, তা সে টের পায়নি।

সেকালের সাহিত্য মেলে

✲ ✲ হেমেন্দ্রকুমার রায় ✲ ✲

কয়েকটি ঘটনা, অন্তত পঞ্চাশ-ছাপ্পান্নো বৎসর আগেকার। সেকালের সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমাজের সঙ্গে একালের অনেক কিছুই মেলে না। বিশেষ ক'রে বেমিল দেখা যায় সেকালের ও একালের সাহিত্যিকদের মন নিয়ে তুলনা করলে—অবশ্য আজ আর আমি তা করব না। তবে এইটুকু কেবল বলতে পারি, নিম্নশ্রেণি অবলম্বন করেছে একালের সাহিত্যিক-মনোবৃত্তি। পরে এ বিষয় নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

সেকালকার অধিকাংশ পত্রিকার কার্যালয় থাকতেন জোট বেঁধে কয়েকজন সাহিত্যিক। পত্রিকার প্রবীণ লেখক ছিলেন তাঁরাই। তাঁরা কেবল কলম চালাবার জন্যে জোট বাঁধতেন না, নিয়মিত বৈঠক বসিয়ে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করতেন। এই শ্রেণীর বৈঠকে যোগ দেবার আমি প্রথম সুযোগ পাই "অর্চনা" কার্যালয়েই। যত-দূর মনে হয় তখন "অর্চনা"র দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। সেটা স্বদেশীর যুগ বটে, কিন্তু বাংলাদেশে তখনও বোমার নাম ও শব্দ শোনা যায় নি।

"অর্চনা"র সম্পাদক ও সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও স্বর্গত কৃষ্ণদাস চন্দ্র। প্রধান লেখক ছিলেন কেশবচন্দ্র, কবি ফণীন্দ্র-নাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় ও দার্শনিক রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি। ওঁদের মধ্যে মরজগতে বিদ্যমান থেকে লেখনী-চালনা করছি কেবল কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমি। নিতান্ত তরুণ বয়সে মারা না গেলে ভূপেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আজ একজন প্রখ্যাত সমালোচক ও প্রবন্ধকার ব'লে গণ্য হতে পারতেন।

অর্চনার বৈঠকে এসে উঠতেন-বসতেন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁর আলোচনায় প্রায়ই প্রকাশ পেত রবীন্দ্র-নাথের কবিতার দোষের দিকটা। রবীন্দ্র-নাথের লেখনী রাশি রাশি কবিতা প্রসব করছে বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই মূল্যহীন—এইটেই তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা পাচ্ছিলেন পরোক্ষভাবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার এটুকুও জানিয়ে দিতে ভুলতেন না যে, তিনি মূল্যহীন কবিতা লেখেন না, কারণ, অনেক দিন ধরে ভেবে-চিন্তে তবে এক-একটি কবিতা রচনা করেন। কেউ যদি তাঁকে রবীন্দ্র-নাথের চেয়ে উচ্চতর স্তরের কবি বলত, তাহ'লে তাঁর মুখ যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠত। একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই দুর্বলতা ও আত্মশ্লাঘা আমার ভালো লাগত না।

আমরা একটি সাহিত্য-সমিতি গঠন ক'রে তার নাম রেখেছিলুম "সাধনা সমিতি"। দীনেশচন্দ্র সেন ও সুধীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। সেখানকার প্রধান সভ্য ছিলুম আমরা এই কয়েকজন—সত্যানন্দ রায় (যাঁর নামে বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে), অমরেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো কয়েকজন সাহিত্যরসিক। অর্চনা কার্যালয়েই সমিতির অধিবেশন বসত এবং সেখানে বক্তৃতা ক'রে গিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দীনেশচন্দ্র সেনের মত স্বনামধন্য ব্যক্তিরাও। ভূপেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায় ও আমি প্রবন্ধ পাঠ করতুম। পাঠের শেষে বয়োজ্যেষ্ঠ কেশব-চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মতামত প্রকাশ করতেন।

তারপরই "সাধনা-সমিতি"র অস্তিত্ব লোপ। বোমা ফাটল, ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হ'লেন, প্রফুল্ল চাকী স্বহস্তে মৃত্যুবরণ ক'রে ব্রিটিশরাজকে ফাঁকি দিলেন এবং পুলিসও নানা সমিতির উপরে হানা দিতে লাগল।

দীনেশচন্দ্র সেন ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভীত ও ব্যস্তভাবে তাড়া-তাড়ি এসে জানিয়ে গিয়ে গেলেন যে, সাধনা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকদের দল থেকে তাঁদের নাম কেটে দিতে হবে।

কিসের সাধনা? নৈতিক শক্তির সাধনা? সে যুগে 'সাধনা' নামটাই অতিশয় সন্দেহজনক হ'য়ে উঠেছিল—সাহিত্য-সমিতিও আর চলল না।

তারপর স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকায় কয়েকটি রচনা প্রকাশ ক'রে আমার নাম যখন কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, সেই সময়ে কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী আমাকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গিয়ে "মানসী" পরিকার দলে ভর্তি ক'রে দিলেন, মাসিক চাঁদা নিতে হবে তিন টাকা ক'রে। সেটা "মানসী"র দ্বিতীয় বৎসর। সেখানকার বৈঠকে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও প্রায় প্রতিদিন হাজিরা দিতেন। সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ।

কিছুকাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কাব্যে দুর্নীতির ধুয়ো তুলে রবীন্দ্র-নাথের উপরে বারবার হামলা দিতে লাগলেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে একমাত্র "মানসী"ই করেছিল দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রতি-আক্রমণ। সত্যেন্দ্র-নাথের সাহায্য গ্রহণ ক'রে যতীন্দ্র যখন সাগচী বৃহৎ প্রবন্ধ লিখে যে তীব্র ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালকে আক্রমণ করে-ছিলেন, তিনি জীবনে আর কখনো তেমনভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষত হন নি। এই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ তখনকার সাহিত্য-জগৎকে রীতিমত সন্তপ্ত ক'রে দিয়েছিল।

সাহিত্য-জগৎ থেকে ব্যাপারটা চলে উঠল নাট্য-জগতে গিয়ে।

রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিত ও ভীষণভাবে ব্যঙ্গ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল "আনন্দ-বিদায়" নামে এক প্রহসন রচনা করলেন কোন প্রশস্ত দিবসে। তার অভিনয় বিজ্ঞাপিত হ'ল ষ্টার থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়-রাত্রেই ব্যাপার যা হ'ল তা আর বহুতব্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মপ্রহরও কোন কাজে লাগল না, রবীন্দ্রনাথের অপমানে সমস্ত দর্শক ক্ষেপে গিয়ে এমন মারমুখো হয়ে উঠল যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃ-পক্ষ আত্মরক্ষা করবার জন্যে তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলে দিলেন এবং দ্বিজেন্দ্র-লালও চুপিচুপি 'বক্স' থেকে নেমে রঙ্গালয়ের খিড়কীর দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন।

সেইখানেই থেমে গেল সব ঝড়। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল আর কখনো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাচনিক বোমা ফাটাবার চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই জড়িয়ে পড়েন নি এই যুদ্ধব্যাপার দুই দলের অযোচিত যুদ্ধরঙ্গের সঙ্গে। ব্যারিস্টার এ চৌধুরীর ভবনে দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন এমন সময়ে নৈকাতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই সময়েই সেখানে সামাজিকতা রক্ষা করতে এলেন। বাড়ীর লোকরা সকলেই স্তম্ভিত—কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের 'যুদ্ধং দেহি' রব তখন সাহিত্য-সমাজের সর্বত্র গিয়ে পৌঁচেছিল—সবাই ভাবলে এখনি বুঝি কোন অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হবে।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ সহজভাবেই সহাস্যে দ্বিজেন্দ্রলালকে

সম্বোধন ক'রে মিষ্ট ভাষায় বাক্যালাপ করতে লাগলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কেন এই রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব? হিংসা এবং ক্রোধ। হিংসার কারণ বোঝা কঠিন নয়। এবং ক্রোধের কারণ হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার পাঠকের ঔৎসুক্যসিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর হিস্টোরিক নাটকগুলি পাঠ ক'রে অবলম্বন করেছিলেন মৌনব্রত। প্রবাদ বলে বোবার শত্রু নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

"মানসী"র বৈঠকের পরেই আমি ঠিক নিজের মনের মত একটি আসর খুঁজে পেলুম। সেখানে যে কয়েকজন তরুণে টাকা-আনা-পয়সার হিসাব ভুলে নিত্য আনাগোনা করতেন তাঁদের চক্ষে ছিল কবিত্বের স্বপ্নকাজল এবং মনে ছিল অরূপের রূপকল্পনা। সাহিত্যের নৌতাতে একেবারে মশগুল হয়ে দুনিয়ার আর কিছুই নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না।

ছোট্ট আসর। সেখানে এসে নিত্য যাঁরা দেখা দিতেন তাঁদের নামের ফর্দ দীর্ঘ নয়: কথা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীচারুচন্দ্র রায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত। তাঁদের অধিকাংশই তখন ছাত্রজীবন যাপন করছেন।

নীলনীরঞ্জন পণ্ডিত "জাহ্নবী" নামে একখানি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম দিকে আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলুম ঘনিষ্ঠভাবেই। তারপর কিছুকাল চলে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর পরে আবার নব-পর্যায়ে "জাহ্নবী" প্রকাশিত হ'ল এবং যাঁর নাম সম্পাদক ব'লে ছাপানো হল, আসলে তিনি ছিলেন কার্যাধ্যক্ষ, কারণ বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন পূর্বোক্ত তরুণের দলই। আমিও মনে-প্রাণে তাঁদের সঙ্গে মিলে-মিশে গিয়ে নিয়মিত লেখক হয়ে পড়লুম। সাহিত্য-সেবা করতে করতে আমি যে সেই বন্ধুত্বকবন্ধনে আবদ্ধ হলুম, প্রায় চার যুগ পরে আজও তা আলগা হয়নি।

সময়টা আমার ঠিক স্মরণে আসছে না, তবে এইটুকু বলতে পারি লোক-সাধারণ তখনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয় নি।

সেই দলের মাত্র একজন (নরেশচন্দ্র) সাংবাদিকরূপে আশাপ্রদ জীবন আরম্ভ ক'রেও এ পথ থেকে স'রে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু বাকি সকলেই রীতিমত খ্যাতি অর্জন করেছেন—যেমন প্রভাতচন্দ্র অধুনালুপ্ত দৈনিক "ভারতে"র সম্পাদকরূপে, অমলচন্দ্র "মিউনিসিপাল গেজেট" ও সরকারের প্রচার-সচিব ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারূপে, সুধীরচন্দ্র "মৌচাক" সম্পাদক ও বাংলা দেশের একজন প্রবীণ পুস্তক-প্রকাশকরূপে, প্রেমাঙ্কুর গল্পকার ও চিত্রপরিচালকরূপে এবং চারুচন্দ্র চিত্রশিল্পী ও চিত্র-পরিচালকরূপে সকলের কাছেই সুপরিচিত। নশ্বর জীবন নাকি পদ্মপত্রে জলের মত চঞ্চল, কিন্তু আমরা যে এখনো পদ্মপত্রের উপর থেকে টুপ টুপ ক'রে ঝ'রে পড়িনি, এই সত্যটা আমার কাছে আজ বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়।

তারপর আমাদের এই ছোট দলটি কেমন ক'রে ক্রমেই বহুতর হয়ে "যমুনা" ও "মর্মবাণী"র দলের সঙ্গে মিলে অবশেষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ "ভারতী"র সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত দলে পরিণত হ'ল, সে কাহিনী অন্যত্র বর্ণনা করেছি। তারা পরিণত হয় দুয়ে।

"ভারতী"র বৈঠকের অনেক কাহিনী আছে, এখানে তারই ভিতর থেকে একটি কৌতুকের কাহিনী বেছে নিয়ে আপনাদের শোনাচ্ছি। কাহিনীটি এক সুপরিচিত কবির কাহিনী। বহু পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এখন স্বর্গত হ'লেও তাঁর নাম আমরা করব না, কবি বলেই ডাকব। আর একটি কথাও বলে রাখা ভালো। কবি ছিলেন অত্যন্ত প্রেমী—প্রতিদিন নব নব প্রেম-সম্ভোগের জন্যে অবগাহন করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না এবং সারা জীবনে তিনি কেবল প্রেমের কবিতাই রচনা ক'রে কাটিয়ে গিয়েছেন। এই কথা নিয়ে তিনি প্রায়ই গর্ব প্রকাশ করতেন। আর সব দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন ভালো লোক, তাই আমরা সকলেই তাঁকে ভালোবাসতুম এবং তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথকে বাইরের লোক মনে করত সুগম্ভীর বাক্তি, কিন্তু "ভারতী"র মজলিসে যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন তাঁরা জানতেন তিনি একজন কৌতুকপ্রিয় মানুষ। এই কাহিনীতেই তাঁর কৌতুকমূর্তির একটা দিক প্রস্ফুট হবে।

সেবার যশোহর সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসেছে নৈহাটিতে এবং সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন স্বর্গত সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। সম্মেলনে পঠিত একটি সুদীর্ঘ কবিতার কথা আজও ভুলতে পারিনি—অপূর্ব কবিতা, মহান কবিতা। রচক অক্ষয়কুমার বড়াল—কবিতাটি পরে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাম বোধ হয় "মানব"।

আমরা সকলদলে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলুম—বলা বাহুল্য, সঙ্গে ছিলেন প্রেমিক কবিও। অল্পক্ষণ সভার উপস্থিতি থেকে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এ-সব সভার ভিতরকার প্রতিবেশ কোন-কালেই বেশীক্ষণ আমরা সহ্য করতে পারতুম না—মনে হত সবই যেন কৃত্রিম, কেবল লোক দেখাবার জন্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাড়া করা হয়েছে, প্রায় রঙ্গমঞ্চের মত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলন, মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মেলন—সে সব স্থানেও ঐ একই ব্যাপার। কোথাও একদিনের বেশী টিকতে পারি নি।

নৈহাটিতে তো পুরো একদিনও ছিলুম না। বেরিয়ে এসে দেখি, আমাদের সঙ্গে কবি নেই। তাঁর খোঁজে মণ্ডপের ভিতরে উঁকি মেরে দেখা গেল, কবি দিব্য খুশী মুখে মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে আসরে আসীন। সভা তাঁর খুব ভালো লেগেছে বলেই মনে হ'ল। কাজেই ডাকাডাকি ক'রে তাঁকে আর উত্যক্ত করা হ'ল না।

সভার বাইরে এসে প্রথম কোথায় যাওয়া হ'ল, স্মরণে আসছে না—বোধ করি সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে। গঙ্গার ধারে যেন খানিকক্ষণ পায়চারি ক'রে শহরের কোন কোন অলি-গলিও ঘুরে আসা গেল।

একটা খুব ছোট কানাগলির ভিতরে দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "মণিলাল, তোমার কাছে দাদা কাগজ আছে?"

হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ
আমরা সকল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আধুনিকতম বিজ্ঞান সম্মত এবং টাটকা ঔষধ পোটেন্সি দিয়া প্রস্তুত করি।
কুণ্ডু পাল এণ্ড কোং
১৭১এ, বাসবিহারী এভিনিউ, (গড়িয়াহাট মার্কেটের সম্মুখে) কলিকাতা-১৯।
ফোন ৪৬-১৩৩৭
ব্রাঞ্চ—৮৫, নেতাজী সুভাষ রোড, (চিনাবাজার) কলিকাতা-১

মণিলাল ("ভারতী" সম্পাদক) বললেন, "আছে। কি হবে?"

সত্যেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যরঞ্জিত মুখে বললেন, "দাও তো, প্রেমপত্র লিখতে হবে।"

আমরা সকলেই কৌতূহলী হয়ে দেখলুম, একটা বাড়ীর সামনের রোয়াকের উপরে ব'সে সত্যেন্দ্রনাথ বাম হস্তে কলম ধ'রে এই মর্মে লিখলেন :

"আমার প্রিয়তম কবি,

তোমার কবিতা পাঠ ক'রে তোমাকে স্বচক্ষে দেখবার ও তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে হৃদয় আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। উপরে ঠিকানা দিলুম, দয়া ক'রে সন্ধ্যাকালে একটিবার দেখা দিও। আমার মাথার দিব্য রইল। ইতি

তোমা-গত-প্রাণ

একজন অভাগিনী নারী"

তারপর, যে বাড়ীর রোয়াকের উপরে তিনি বসেছিলেন সেই বাড়ীর নম্বর ও গলির নাম লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে তার উপরে কবির নাম লিখে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "চল, আবার সম্মেলনের মণ্ডপের কাছে যাওয়া যাক। পত্রখানা দিয়ে আসবার জন্যে একটি দূত খুঁজতে হবে তো?"

দূত অবিলম্বে পাওয়া গেল। এক চৌদ্দ-পনেরো বছরের নগ্নপদ ছোকরা। সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডপের ভিতরে কবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তাকে শুধোলেন, "এই কাগজখানা যদি ঐ বাবুর হাতে দিয়ে আসতে পারো, তাহলে চার আনা পয়সা বখশিশ পাবে।"

সে রাজী।

—"কিন্তু বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়েই চ'লে আসবে। খবরদার, আমাদের কথা বলবে না।"

দেখলুম, যথাসময়ে দূতের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে কবি পাঠ করলেন, তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চঞ্চলভাবে গাত্রোত্থান ক'রে বাইরে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "আসছে ট্রেনেই আমরা কলকাতায় ফিরব, তুমিও তো আমাদের সঙ্গেই যাবে?"

কবি ঘাড় নেড়ে বললেন, "না ভাই, নৈহাটিতে সন্ধ্যার সময়ে আমার একটু জরুরি কাজ আছে। আমি পরে যাব।"

আমরা আর সবাই কলকাতায় ফিরে এলুম।

সেই দিনেরই কথা। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিশনের পার্শ্বে আমাদের একটি মজলিসে বহু সাহিত্যিক এসে জুটতেন, গালগল্প করতেন। সেইখানে প্রেমাঙ্কুর ও আমি এবং আরো কেউ কেউ ব'সে রাত্রিবেলায় আলাপ করছিলুম—হঠাৎ কবি এসে উপস্থিত। তখন বোধ করি রাত এগারোটা বাজতে মিনিটকয় দেরি।

কবির মুখ জলভরা মেঘের মত গুরুগম্ভীর।

তিনি কি নৈহাটির অপরিচিত গলির ভিতরে কোন বাড়ীর সামনে সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও তাঁর দর্শন-পিয়াসী কোন সুন্দরীর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন? না তাঁকে সন্দেহজনক কোন লোক ভেবে সে-পাড়ার বাসিন্দারা কিছু অশিষ্ট আর অমিষ্ট ব্যবহার ক'রে তাঁর প্রেম-দরদী প্রাণে দারুণ বাথা দিয়েছে?

সে সব কিছুই কবি ভাঙলেন না। শ্রান্তভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ট্রেন ফেল করেছিলুম!"

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রামাণিক গ্রন্থ :
শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের জন্য

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা—অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি বসু প্রণীত। [পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ]
—মূল্য দশ টাকা—

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক পাঠিকার জন্য এবং গ্রন্থাগারে রাখিবার মত বই :

মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ
(প্রথম প্রকাশ : ষোল পূর্ণিমা ১৩৬৮ সাল)
খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ প্রণীত। দাম ৫·৫০ নঃ পঃ

মনোবিদ্যার রূপ রেখা
অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি বসু ও সুনন্দা গুহে প্রণীত। ১০·৫০
[দ্বি-বার্ষিকী স্নাতক শ্রেণীর উপযোগী মনোবিজ্ঞানের একমাত্র সম্পূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ।

অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র সরকার
ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৮·৫০

শ্রীমতী অনীতা বসু প্রণীত :
ছায়া মিছিল
—অনবদ্য ও সুচিন্তিত গল্প সংগ্রহ ২·৫০

বিভূরঞ্জন গুহ ও সুনন্দা ঘোষ প্রণীত :
যষ্টিমধু
(বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় রচিত সার্থক গল্পসংকলন।) ২·২৫ নঃ পঃ

পৌষ ফাগুনের পালা
(রসঘন বিভিন্ন গল্পের সংকলন) ৩·০০

শ্রীরাজেন্দ্র দেশবন্ধুয়া প্রণীত :
জনপদের ছন্দ
(ভারতের বিভিন্ন জনপদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অনবদ্য রসরচনা) ৩·৫০ নঃ পঃ

শত পুষ্প
(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে শত কবিতার প্রস্থাঞ্জলি) ৪·০০

শ্রীঅরুণাচরণ গুপ্ত, এম-এস-সি প্রণীত
ভারত সরকার কর্তৃক "সন্তরু শিশু সাহিত্য" (১৯৬১) প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
ছোট হলেও ছোট নয়
মনোরম প্রচ্ছদপটে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে : কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত—সর্বহারা—১·৫০, অনামিকা—২·৫০, জুলফিকার—২·০০, চক্রবাক—২·২৫, কুহেলিকা—১·৫০, সঞ্চয়ন—১·৫০।

॥ নবলোক হোম ॥ ৫৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

CENTRAL LIBRARY

হীরের আংটি

শোভালী চট্টোপাধ্যায়

ছোট বোন রঞ্জনার মেয়ের অন্নপ্রাশন। বিমলার নিমন্ত্রণ। নামকরা ব্যারিষ্টারের বৌ রঞ্জনা, নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গেছে তার দিদিকে। এ বৃষ্টি বিমলার আশাতীত। বলে গেছে, "দিদি, তোমার যাওয়া চাই-ই কিন্তু।"

"যাব"—কথা দিতে হলো বিমলাকে। হাসতে হাসতে দাঁড়াতে উঠে গেল রঞ্জনা। ওর হাতের দামী স্যানিটি ব্যাগের ডৌলসের দিকে তখনও চেয়েছিল পর্ণা। বিমলার বড় মেয়ে।

কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবনায় পড়ল বিমলা। সেই ছোট্ট রঞ্জনা আজ কত বড় হয়েছে, যাকে নিজে হাতে মানুষ করেছে বিমলা। সেই দু' মাসের রঞ্জনাকে রেখে মা যখন মারা গেলেন, তখন রাতের পর রাত জেগে ওকে নিয়ে বসে থেকেছে, দিনের পর দিন বোনকে নিয়ে কেটেছে, খাওয়ার সময় হয়নি। নিজের লেখাপড়া পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছিল ঐ ছোট বোনটির জন্য। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী এলো বিমলা, দিদিকে ছেড়ে কত কেঁদেছিল রঞ্জনা। সে কান্নার রেশ আজও কানে বাজে তার। আর মনে হয় শ্বশুরবাড়ী এসে ঐ ছোট বোনটির জন্য লুকিয়ে কত কেঁদেছে বিমলা, স্বামী সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন, মাঝে মাঝে নিজেও আসতেন রঞ্জনাকে।

তার পর বড় হলো রঞ্জনা, বাবা ওকে লেখাপড়া শেখালেন। ও বি-এ পাশ করেই জানালো সদা ব্যারিষ্টার হয়ে আসা নির্মল বোসকে বিয়ে করবে।

কিছুতেই রাজী হোলেন না বাবা। মনোমত পাত্র আগেই স্থির করে রেখেছেন তিনি। তাঁর মত ছিল বিয়ে করার চেয়ে বিয়ে দেওয়াটাই সুখের হয় বেশী। বাবা আর রঞ্জনার মতদ্বৈতের মধ্যে এসে পড়ে গেল বিমলা, বাবাকে বুঝিয়ে বললে, "মনে প্রাণে যা চাওয়া যায় সেটা পেলেই মানুষ সুখী হয় সবচেয়ে বেশী।"

"বেশ," রাজী হোলেন বাবা, সেই চার বছর আগে হাসতে হাসতে রঞ্জনা চলে গেল স্বামীর ঘরে। সত্যিই তো কত সুখী হয়েছে রঞ্জনা। প্রথম মেয়েটির মুখে ভাত দেবে সমারোহ করে। বাবা আর নেই। তার এ সৌভাগ্য দেখে সুখী হবে তার দিদি ছাড়া আর কে?

বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরলেন বিমলার স্বামী। সামান্য মাইনের কেরানী। ছেলেমেয়ে চারটি নিয়ে কোন রকমে দিন কাটে। চিন্তা আর অভাবে হাসতে ভুলে গেছে বিমলা। তবুও অন্য দুপুরে ফেরার এসেছে সব মুখে হাসি ফুটানো মুখে এসে দাঁড়ালো, রঞ্জনা অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে। ডাগরচোখে চেয়ে রইলেন বিমলার স্বামী। সে চাহনির অর্থ ভাল করেই জানে বিমলা। বললে, "ডাকছ কেন? সে বারণ আমি করেছি।" বলেই একটা খাম যাওয়া বড় আংটি স্বামীর হাতে দিয়ে বললো, "ভাল দেখে একটা আংটি গড়িয়ে দিতে বলা সাবরাকে। একটা সাদা পাথর যেন বসিয়ে দেয়। রঞ্জনা যেন মনে না করে তার মেয়েকে দিদি খারাপ জিনিস দিয়েছে।"

"শেষ সম্বল"—কথাটা বলেই বুঝি হাসলেন একটু বিমলার স্বামী। বিমলার স্নেহভরন হাসির স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেটুকু। দুদিন পরে নির্দিষ্ট দিনে ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে রঞ্জনার বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরী হলো বিমলা। বহুদিনের তুলে রাখা পাট-ভাঙ্গা শাড়ীখানা পরে জীবনের প্রথম পাশের ভাড়াটের গলার হারটা চেয়ে নিয়ে গলায় পরলে। অবশ্য তার স্বামীর তরফ থেকে বাধা এলো, তিনি বললেন,

"পরের গলার হার কিন্তু অহরহ তোমার সাপ হয়ে দংশন করতে চাইবে।"

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে ও চোখ নামিয়ে নিয়ে বিমলা বলেছিল,

"রঞ্জনার মাথাটা নিচু হয় আমার জন্য এ আমি চাই না, তাই তোমার অবাধ্য হতে হলো।" বাবার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ষোল বছরের মেয়ে পর্ণা।

সামনের পথে অগুনতি গাড়ীর সারির মধ্যের সামান্য পথটুকুতে গিয়ে দাঁড়াল বিমলা আর তার ছেলেমেয়েরা।

একটু দূরে দেখতে পেল অতিথি-দের স্বাগত জানাচ্ছে নির্মল। "তোদের মেসোমশাই।" প্রশান্ত-মুখে প্রসন্ন-মনে এগিয়ে গেল বিমলা। কিন্তু ওকি; ওদের দিকে একবার চেয়ে কিছু না বলেই সদা গাড়ী থেকে নেমে আসা এক মহিলাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল নির্মল। হঠাৎ মনে হলো কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিলো বিমলার মুখে। কোন রকমে নিজেকে আয়ত্তে নিয়ে অসহায় ছেলেমেয়েদের বললে,

"ওরে তোরা এগিয়ে আয়, কাজের বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত।" আর একটু এগিয়ে সামনে দেখা রঞ্জনার সাথে—ভিতর বাড়ীতে অভ্যর্থনা করছে সে, ওদের দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়ার বদলে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে বললে, "দোতলায় যাও।"

বিমলার কিছু বলতে যাওয়ার মুহূর্তে অন্যের সঙ্গে কথা বলার বাস্ত হলো রঞ্জনা। "চল" ছেলেমেয়েদের দিকে চাইতেই বুঝি লজ্জা হলো বিমলার। কেমন অন্যমনে চাইতে চাইতে সোফাসার উঠে গেল বিমলা। পিছনে ছেলেমেয়েরা। কার্পেট বিছানো বড় ঘরখানার ঐশ্বর্যের প্রমাণ নিয়ে বসে আছেন অসংখ্য অভ্যাগত। তাঁদের মাঝখানে রূপোর এক ট্রে পান—ইঙ্গিতময় মুখে ভরছেন দামী জর্দার গন্ধে ঘর মুখর, তবু সঙ্গে আছে উচ্ছ্বসিত হাসি। এত হাসি আজও জগতে আছে একথা নূতন করে স্মরণে আনল বিমলা। এরই মাঝে সামান্য সময় যেন সমাহিত হয়ে ছিল সে।

হঠাৎ সচেতন সহজ হয়ে উঠলো বিমলা। এবার এগিয়ে গেল সেখানে। সেখানে আয়ার কোলে বসে আছে পম্পা। বুকের ভিতর বাঁধা রুমালে বাঁধা আংটিটা খুলে পরম তৃপ্তি নিয়ে পম্পার আঙ্গুলে পরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে হাঁ হাঁ করে এসে দাঁড়াল রঞ্জনার ননদ, "না-না ওর হাতে ও আংটি পরাবেন না—বৌদি বলছে হীরের আংটিটাই ওর হাতে থাকবে।"

হাতখানা সেইখানে স্থির হয়ে গেল। বিমলা পম্পার আঙ্গুল তখনও ছাড়তে পারেনি। পিছন ফিরে চোখ পড়লো পর্ণার দিকে। দেখলো শুধু সেই নয়, ঘরসমেত প্রতিটি নারীর কৌতূহলী চোখ তার উপর। কৌটো সমেত আংটিটা আবার সে রুমালে বেঁধে কোন রকমে রেখে দিল বুকের মধ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে খাওয়ার টেবিলে ডাক এলো। রঞ্জনা নিজে অভ্যাগতদের ডাকতে এলো। নূই অপরিচিতার মাঝে নিজে দাঁড়িয়ে পরিচয় করালো একে একে। "এই আমার সেজ ননদ আর এই আমার স্বামীর সিনিয়র ডি, গুপ্তের স্ত্রী মিসেস্ গুপ্তা, ইনি আমাদের ক্লাবের সদস্যা। ইনি রিটায়ার জাস্টিস্ বি, এন, চ্যাটার্জির মেয়ে ললিতা, আমার বন্ধু। এই যে সুধাদি অর্থাৎ ডাঃ এম, এন, মল্লিক ওর স্বামী, ইনি নিভাদি, এবারে এম-এল-এ হয়েছেন, আমার বন্ধুর দিদি, আমারও।" রঞ্জনার সঙ্গে হেসে উঠলেন ঘরের সবাই, এমনি করে কত বড় বড় পরিবারের সঙ্গে রঞ্জনার পরিচয় তারই খানিকটা প্রকাশ করে নিলে সে। বোনের গর্বে গর্বিতা হওয়ার আগে কেমন যেন বোকা বনে গেছে বিমলা, বার বার তার মনে হোল কোথায় এসেছে, কেন এসেছে সে। অভ্যাগতাদের নিয়ে চলে যাওয়ার অবকাশে মাত্র একঝলক বিমলার দিকে

শারদীয়া উৎসবে

অল্প খরচে আপনার সখের জিনিস নিয়ে যান

এই সব জিনিসগুলি সহজ কিস্তিতে পাবেন

মাত্র ৮০, টাকায় চার ট্রানজিস্টার

- মার্ফি, এইচ, জি, ই, সি, নিপ্পন এবং সকল ধরণের ট্রানজিস্টার রেডিও মাসিক ১৫, টাকা হইতে ২৫, টাকা হারে।
- বিবিধ ডিজাইনের ট্রানজিস্টার (টর্চ সেল ব্যাটারী চালিত কিস্টাল সেট) লোকাল রেডিও মাসিক ৭, টাকা হারে।
- বিবিধ ডিজাইনের এসি ডিসি ব্যাটারী লোকাল সেট মাসিক ৬, টাকা হারে।
- ঊষা সেলাই কল মাসিক ১০, টাকা হারে।
- ডোয়ার্কিন এবং রেণল্ডের বাদ্যযন্ত্র।
- ফেবার লিউবা, রোলেক্স, ওয়েস্ট এন্ড, এ্যাংলো সুইসের ঘড়ি।
- সকল প্রকার আসবাবপত্র, পাম্প, মোটর, প্রেসার কুকার, টাইপ-রাইটার এবং বহুপ্রকার অন্যান্য দ্রব্যাদি।
- ঊষা, ক্যাসেলস, ওরিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এবং জি, ই, সি পাখার নূতন সম্ভার।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী

শো-রুম সকাল ৯-০০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা
২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (দ্বিতীয় তল)
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-র উপরে
ফোন নং : ২২-৩০৯৬, ২২-৩৯০৮। কলিকাতা—১
বিনামূল্যে সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

চেয়ে গেল রঞ্জনা। রঞ্জনা কি জানে না যে দূরে যাওয়ার বাস্তবতা তারই সবচেয়ে বেশী। সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই। এসেছে সে টালা থেকে বালিগঞ্জে। ছোট ছেলেটি ক্ষিদের অস্থির। সবকিছু মিলিয়ে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো বিমলা। বেবা একটা অপমান তাকে জড়িয়ে ধরলো। অথর্ব অসাড় করে দিল তার দেহটা। এক পা উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেললো সে। তখনি ভেবে নিল পরের ঘরে ভাববে নিশ্চয়ই। প্রায় জনশূন্য ঘরে সন্তান কটিকে নিয়ে বসে রইলো বিমলা। পম্পাকে নিয়ে তখন বাইরে মেয়ে আয়া। নিচের ক'জন সম্ভ্রান্ত মানুষ দোতলায় উঠতে পারছেন না, তাঁদের হার্ট দুর্বল। তাঁদের দামী উপহারগুলো করে নিয়ে আসতে হবেই তো হবেই। কিন্তু হঠাৎ কি হলো ওদিকে। সারা বাড়ীখানা যেন হৈ হৈ শব্দে মুখর। পম্পার হাতের হীরের আংটি হারিয়ে গেছে। কে নিল, কি হলো চারিদিকে চাপা গুঞ্জন। নিয়ে এখনও পালাতে পারেনি। বিস্মিত চোখে চাইছে বিমলা; তার মেয়েটির চোখে ভয়ার্ত অনুতাপ—ওদের দিকে চেয়ে যেন কথা বলছে সবাই; না-না এ ওদের মনের ভুল, কেউ স্বপ্নেও কি ও কথা ভাবতে পারে, হাজার হোক নিজের বোন ত, মনের অলক্ষ্যে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে নিলে বিমলা। হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে এলো রঞ্জনা, ইসারায় দিদিকে পাশের ঘরে ডেকে আবার তেমনি ভাবে চলে গেল। ততক্ষণে আবার একঘর মানুষ পূর্ণ হয়ে গেছে বিমলার আসে-পাশে। তার মধ্য দিয়ে সে একবার পর্ণার অপমানের গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে থাকা মুখের দিকে চেয়ে নিল। উঠতে তাকে হলোই।

পায়ে পায়ে বিমলা এসে দাঁড়াল পাশের ঘরের দরজায়। বাইরে থেকে শুনলো নির্মলের রুক্ষ স্বর "তখনই বলেছিলাম ও-সব আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করতে যেও না, যাদের পরিচয় দিতে লজ্জা হয় তাদের ডাকা কেন?" রঞ্জনার চাপা স্বর কাঁটার মত বিঁধল বিমলার বুকে, "জানতুম কি অভাবে দিদির স্বভাবটাও হারিয়ে গেছে। তাছাড়া ভেবেছিলুম নিমন্ত্রণ করলেও অত দূর থেকে কেউ আসবে না। এখন দেখছি গুষ্টিসুদ্ধ এসে হাজির হয়েছে।" পা-দুটো বিমলার দরজায় আটকে গেল। গলাটাও শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। প্রতিবাদ করবার ভাষা হারালো জিভ। তবুও পর্দা সরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো রঞ্জনার ঘরে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট মেয়ের পাংশু মুখ এখন ওর চিন্তার বাইরে। বিমলার উপস্থিতি লক্ষ্য করেই বেরিয়ে গেল নির্মল। বিনা ভূমিকাতেই বিমলার দিকে চেয়ে রঞ্জনা বললে—"তুমি এত ছোট হয়ে গেছ দিদি, যে স্বচ্ছন্দে পম্পার হাতের হীরের আংটিটা খুলে নিলে?"

"রঞ্জনা"—আর্তনাদ করে উঠলো বিমলা,—"এ কথা বলতে তোর মুখে আটকালো না এতটুকু? বাড়ীর এই অসংখ্য মানুষের মধ্যে চোর হিসাবে শুধু আমিই পড়লাম, কে আমাকে চুরি করতে দেখেছে বলতে পারিস?"

"হ্যাঁ—অনেকে, অনেকে দেখেছে"—তবুও জুলুম করে রঞ্জনা,—"তুমি বুকের ভিতর থেকে একটা রুমাল নিয়ে তাতে বেঁধে রেখেছ পম্পার আংটি। জীবনের প্রথম দিন যা দিয়ে আমি তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম, এখনও বলছি তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও দিদি।"

উঃ অস্ফুট এক চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো বিমলার বুক ভেঙ্গে। সে কোন কথা না বলেই বার করলে বুকের ভিতরের সেই রুমালটা। চারিদিকে যে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ তখন বিমলা-রঞ্জনার দিকে চেয়ে আছে সে খেয়ালও ওদের কারও নেই। এবার বিমলা রুমালের কোণ থেকে খুতে রাখলে একটা ছোট আংটি, যা পম্পার হাতে একবার পরাতে গেয়ে হতাশ হয়েছিলো।

"ভেবেছিলাম যাওয়ার বেলা ওর কচি আঙুলে পরিয়ে দিয়ে যাব নিজ হাতে।" হাতে রাখা সেই আংটিটার উপর বিমলার অপমান, দুঃখ, বেদনা মেশানো অনেক ফোঁটা জল কোন বাধা না মেনে নেমে এলো। ভাষা নেই রঞ্জনার মুখে। হঠাৎ সেইখানে ছুটে এলো পম্পার আয়া।

"এই যে বৌদি, এই তো খুকুমণির সেই আংটি। ফুলদানির পাশে কার্পেটের উপর পড়ে ছিলো।" বিমলার পাশে রঞ্জনার হাতে ঝিকমিকিয়ে উঠলো সেই আংটি। ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকা বিমলার হাত-থেকে সেই আংটিটা টপ করে পড়ে গড়িয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ঘরের উৎসুক মানুষের মাঝে। রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জনা, পাশ থেকে কয়েকজনের ফুসফাস—"মিসেস্ রায়ের দিদি বুঝি, নিজের বোন নয় নিশ্চয়ই। ভদ্রমহিলা কি অপমানিতই না হলেন শেষ পর্যন্ত!"

বিমলা-রঞ্জনার চারিটি চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে এক জায়গায়। হয়তো অতীতকে স্মরণ করবার সুযোগ পেয়েছে দুজনে। বিমলার অবশ দেহটা এক্ষুণি বুঝি পড়ে যাবে। এমনি মুহূর্তে পর্দা ডাকলো "চলে এসো মা।" "কোথায়?" "বাড়ী।" "হ্যাঁ চল।" ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাইরে এলো বিমলা।

রঞ্জনার হাতের উপর তখন হীরের আংটিটা একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা হয়ে উঠছে। এখুনি বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওর সারা দেহটা।

বিবাহের
শ্রেষ্ঠদ্রব্য
পাবেন কোথায়?
অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং
১৬১/১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩
ফোন ২৪-৪৩২৮

বিচারিণী

শচীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

"—গুণের মধ্যে ত শুধু ছবি তোলা আর বড় বড় বোলচাল ছাড়া! হবু বরকর্তা যদি ছবি আঁকতে পারতেন—ফটোগ্রাফার আবার শিল্পী—আরশুলা আবার....."

স্বামীর প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে ধূপদানীতে ধূপগুলো জ্বালিয়ে নিতে নিতে এই কথাগুলো অস্ফুটে বললে সুপর্ণা—ওরফে মিসেস চৌধুরী।

সকাল থেকে শোকোৎসব সুরু হয়েছে। সকালবেলা ঘরের মেঝেতে আলপনা দিয়ে গেছে মেয়েরা—নানা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠান রজনীগন্ধা আর পদ্মের স্তূপ হয়ে উঠেছে। অফিসরদের মেস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে সাদা ফুলের জড়োয়ায় জড়ানো সবুজ পাতার রিং। ফ্লাইট লেফ্‌টন্যান্ট সমর চৌধুরীর দেওয়াল ভর্তি বিভিন্ন ছবির গলায় সেগুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক রথীমহারথীদের বাণী এসেছে—এসেছে তার, অনেক গণ্যমান্য লোক সকাল থেকে দেখা করে গেছেন।

সুপর্ণার প্রস্তুতিই কি কম! গতকাল চুলে শ্যাম্পু করেছে। ভোরে সকলের অলক্ষ্যে খুব পাতলা করে চোখের কোলে সুরমা দিয়ে তার দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর বেদনা ফুটিয়ে তুলেছে, লেস দেওয়া বকের পালকের মত সাদা সিল্কনের স্বচ্ছ শাড়ী পরেছে—তার নিচে লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউস নিটোল বক্ষবাসের আভাস দিচ্ছে। তারপর সকাল থেকেই চলেছে ম্লান হাসি, নমস্কার আর প্রতিনমস্কারের পালা।

এই ত কিছুক্ষণ হল ফিরেছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে। বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন। জনৈক দেশনেতা পৌরোহিত্য করেছেন—যাঁরা ফ্লাইট লেফ্‌টন্যান্ট সমর চৌধুরীর অসীম বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা আর আত্মদানের কথা আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেছেন তাঁরাও কেউ কম কেউ-কেটা নন। আর মঞ্চের একপাশে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখবঞ্চিতা সমরবধূ সুপর্ণা।

আজ পাঁচ বছর ধরে একই উৎসবের পুনরাবৃত্তি। শুধু মঞ্চের উপরের লোকদের মুখ কিছু কিছু বদলে গেছে, শুধু সমর চৌধুরীর বীরত্বের আর অসীম সাহসিকতার কাহিনীর সঙ্গে কিছু উপকথা জড়িয়ে গেছে, শুধু আগের মত তেমন ভিড় জমে না, অবশ্য নামকরা আর্টিস্ট থাকলে সে অন্য কথা। গোলদীঘির চারপাশে যারা ঘোরে অথচ ক্লান্ত হলে বসবার জায়গা পায় না—তাদেরও কেউ কেউ আসে। তবু খানিকটা সময় কাটে—মন্দ কি!

এবার সন্ধ্যার প্রস্তুতি পর্ব। কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কয়েকটি ভক্তিমূলক গান গাইবার জন্য কয়েকজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে—তাঁদের এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য একটু হাল্কা ধরণের জলখাবারের ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে। এই সবের প্রাথমিক পর্বে ধূপদানীর ধূপকাঠিতে ধূপ লাগাতে গিয়ে হঠাৎ একথা তার মুখ দিয়ে বেরোলো কেন? কাকে বললে এ-কথা?—সমর চৌধুরী ত নয়ই—তবে? ধূপ আর ধনোর অস্পষ্ট ধোঁয়ায় বীর সমর চৌধুরী, মৃত্যুর পর যাঁকে ভারত সরকার বিশিষ্ট বীরের সম্মানে ভূষিত করেছেন—সেই সময় চৌধুরীকে আবরণ করে ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট অন্য কিছু—

হ্যাঁ অঙ্কুর, অঙ্কুর গুপ্ত—ফিফ্‌থ ফটোগ্রাফার, মুহূর্মুহু ক্লোরে কেন কলকের যেন প্রেস ফটোগ্রাফার হয়েছ—আর তাদেরই আনকুলো আজ দিন-সাতেক হল ইউরোপ রওনা হয়ে গেছে .....আর্টিস্ট। আর্টিস্ট কাকে বলে সুপর্ণা জানে।

স্বামীর ছবি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে পাশের দেওয়ালে তার নিজের ফটোগ্রাফের দিকে চাইলে সুপর্ণা। ফুল-সাইজ এনলার্জ করা রঙীন ফটোগ্রাফ। ছবি তুলেছিল, য়ং করেছিল অঙ্কুর—সে একটা বিশ্রী ব্যাপার।

বছর দশেক আগেকার কথা। তখন সুপর্ণার বিয়ে হয়নি। কলেজ থেকে দল করে ওরা বোটানিকস্ গিয়েছিল পিক্‌নিক্ করতে। সারাদিন রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোড়। বিকেলের দিকে ওরা ছোট ছোট উপদলে বেরিয়ে পড়েছিল—ওর সঙ্গে ছিল রেবা। রেবার মাথার একটা পিন খুঁজে পাচ্ছিল না—তাই সেও আসছি বলে ফিরে গেছে।

সামনে একটা গাছে থোকো থোকো লাল ফুল। লোভ সামলাতে পারেনি সুপর্ণা। এক থোলো তুলে নিয়ে নিজের চুলের খোঁপায় পরে নিয়েছিল। একটু উঁচু ডালে আর এক থোকো—রেবার জন্য ত চাই।

পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে হাত তুলেছে সুপর্ণা ফুলের থোকাটা নেবার জন্য—পশ্চিমের একফালি রোদ পড়েছে তার মুখে, দেহভঙ্গে, যৌবন-বৃন্তে—ঠিক এমনি সময়—

বাঃ চমৎকার! —পাশের দিকে ফিরে চাইতেই ক্লিক। ক্যামেরা গলায় হাসছে অঙ্কুর গুপ্ত। নাম অবশ্য তখন জানত না। জেনেছে অনেক পরে। সুপর্ণা রেগে গেল, চ্যালেঞ্জের সুরে বললে, "আপনি আমার ছবি নিয়েছেন?"

বেহায়া লোকটা ঘাড় কাৎ করে বললে—"নিশ্চয়ই—"

—"নিশ্চয়ই", বাধা করে পুনরুক্তি করলে সুপর্ণা—"লজ্জা করলো না বলতে।"

"লজ্জা"—যেন আকাশ থেকে পড়ল অঙ্কুর—"মিছে কথা বললেই ত লজ্জা হত।"

—"খুব হয়েছে, ভব্যতাবোধ নেই—অসভ্য কোথাকার। আমি যদি পুলিশকে বলে দিই কেমন হয়।"

—"খুব ভাল অবশ্য হয় না। মিথ্যে খানিকটা ঝামেলা বাড়বে। তাছাড়া আমাকেও সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ভদ্রমহিলা বেআইনী করে ফুল তুলছিলেন, আমি একটা প্রমাণ রাখবার জন্য ছবি নিয়েছি"। সুপর্ণার দিকে না চেয়েই স্পুল ঘোরাতে লাগল।

"বেআইনী করে।" একটু থতমত খেয়েছিল সুপর্ণা।

"—তা না ত কি। হোম্পানীবাগানে যে ফুল তোলা নিষেধ একথা বাংলা ইংরেজী হিন্দি সব ভাষায় লেখা আছে—আর সেটা না বোঝবার মত খুকী আপনি নন।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন—" রুখে এসেছিল সুপর্ণা।

হেসে ফেলেছিল অঙ্কুর। ছোট ছেলেমেয়ে যখন রেগে গিয়ে বড়দের মারতে যায়, বড়রা যেমন হাসে তেমনি।

"—যাক গে ছেড়ে দিন—অন্যায় আপনিও করেছেন, আমিও হয়ত করেছি। আপনি করেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সরকারের আইনের বিরুদ্ধে—আমি হয়ত করেছি একটা প্রচলিত অর্থহীন এটিকেটের বিরুদ্ধে—আসুন আমরা বন্ধুভাবে বিদায় নিই।"

"—কি হয়েছে রে সুপর্ণা।" রেবা এসে পড়ায় সুপর্ণার সাহস বেড়ে গেল।

"—দেখনা রেবা—এই লোকটা আমাকে না বলে আমার ফটো তুলেছে—অভদ্র কোথাকার—আবার বন্ধুভাবে বিদায় নিই...যতসব...আপনি আমাদের সামনে ছবির স্পুল খুলে ফেলুন।"

"—মাপ করবেন", হেসে ফেললে অঙ্কুর—"সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে একটা মাত্র ছবির সাবজেক্ট পেয়েছি—কত ঘুরে ঘুরে আছি—না আবার খারাপ হয়ে যায়..."

"—আমরা আপনার লেকচার শুনতে আসিনি, চলুন আমাদের ডাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাছে।"

অঙ্কুর হেসে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে তার হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্য।

তার এই বেপরোয়া ইয়ার্কিতে সুপর্ণা ফেটে পড়ছিল, রেবা তাকে সামলে নিলে। ভারিক্কী চালে রায় দিলে—

—"যাক, যা হবার হয়ে গেছে—আপনাকে এবার ছেড়ে দিলুম—কিন্তু ওর যখন ছবি নিয়েছেন তখন আমাকে এক কপি দেবেন।"

সুপর্ণার প্রবল বাধা সত্ত্বেও রেবা মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছিল।

সুপর্ণা দলের মধ্যে যখন রেবাকে নিয়ে ফিরে এলো তখন আর সে সুপর্ণা নয়। ওর হাসিখুশী সব চুপসে গেছে—সারা দেহে-মনে পরাজয়ের লজ্জা।

ঠিক দিনে ঠিক সময় ওকে একরকম জোর করে সঙ্গে নিয়ে রেবা কলেজের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। রেবার ভয় তাকে একলা দেখলে অঙ্কুর ছবি নাও দিতে পারে।

মাটির পরে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুপর্ণা। ওই লোকটা ত ছবি দিতে আসছে না, আসছে ওর কান মলে দিতে। মুখের দিকে চেয়ে হয়ত একটু হাসবে? কি কেমন!

রেবা অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছিল। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্রকাণ্ড একটা পিজবোর্ড নিয়ে একটা ছেলে সুপর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল।

"—এই নিন, এটা আপনাকে দিতে বললে।"

"—কে?" রেবা প্রশ্ন করলে। সুপর্ণা চকিতে চোখ তুললে।

"—ওই যে ওই বাবুটা, ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সেদিকে অঙ্কুরের ছায়াও নেই। সুপর্ণা বেঁচে গেল!—না, সুপর্ণা অস্বীকার করবে না—সুপর্ণা মরমে মরে গেল। বুকের মধ্যে একটা গুরুভার—একটা অব্যক্ত বিশ্রী অনুভূতি, তার কারণ খোঁজবার সাহসই হয়নি সেদিন।

তার ছবি! ফুলসাইজ মাউন্ট করা রঙীন ছবি! জীবনে অনেক ছবি তোলা হয়েছে তার—এই অনবদ্য তন্বীমার অমেয় সুষমায় ভরা এমন ছবি তার হয়নি। অথচ যে লোকটা এই অনুপম ঐশ্বর্য তাকে একরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দিয়ে গেল, তার নাম-ঠিকানা জানল না, কৃতজ্ঞতা জানাবার, প্রশংসা করবার, ক্ষমা চাইবার সুযোগ পেল না। শুধু রইল একটা বিকেলের তিক্ত অভিজ্ঞতা—খানিকটা অশোভন গালাগালি আর একটা লোকের সম্পূর্ণ উপেক্ষা-করা হাসি।

অঙ্কুর গুপ্তকে নিয়ে বেশী দিন ভাবেনি সুপর্ণা। কুমারী মন—অনেক আলোছায়া লীলারহস্যের মাঝে ধরে রাখবার মত কিছু পায়নি। বরং কিছুদিন পরে বোটানিক্স-এর কাহিনীটা অনেকটা মজার ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। ছবিটা দেখে কেউ সপ্রশংস বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেই শুরু করত—'সে ভাই এক মজার ব্যাপার.....'

বছর দুই পরে সুপর্ণার বিয়ে হয়। সমরকে বলেছিল গল্পটা বেশ ঝালিয়ে। সমর ও হেসেই খুন। "—খুব দিয়েছেন ত ভদ্রলোক।"

"—যাও যাও, আমিও দিতে পারতুম, নেহাৎ রেবাটা একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসল—না হলে লোকটাকে আমি রাস্তার উপর নাকে খৎ দেওয়াতুম।"

"সে যাই হোক এমন ছবি হয় না, আর হবে না। লোকটার পরিচয় জানা থাকলে বিয়ের পর তাকে দিয়ে আমাদের ছবি তোলাতুম।"

মেয়েরা যা চায় সমরের মাঝে সবই পেয়েছিল সুপর্ণা। শ্বশুরবাড়ীর বনেদী আভিজাত্য—অথচ বর্তমান যুগকে গ্রহণ করবার অপূর্ব ক্ষমতা। সমর ওকে নিয়ে গিয়েছিল নিজের কর্মস্থলে, ক্লাবে, খেলা, বেড়ান—জীবনকে নানা দিক থেকে বিচিত্র করে পাওয়া। মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসত—টলমল করছে সুপর্ণা কানায় কানায়, যাকে বলে টইটুম্বুর!

কিন্তু জীবনটা যে তুষড়ীর মত—সহস্রধারায় ফুল ফেটে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে নিতে যেতে পারে একথা ভাবেনি সুপর্ণা।

হঠাৎ বেসক্যাম্পে কি একটা খবর কেন্দ্র করে চাপা গুঞ্জন—ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিতে হবে—সীমান্তে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে সমর ও আরো কয়েকজনকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ। এক দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে ফ্লাইট-লেফটেনান্ট সমর চৌধুরী শত্রু প্লেন ক্র্যাশ করে মারা গেছেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগে একটা ফুল স্কোয়াড্রন শুধু রক্ষা পায়নি, সীমান্তের অবস্থা সম্পূর্ণ ভারতের অনুকূলে এসে গেছে। তাঁর মৃতদেহ আগামীকাল বিশেষ বিমানে দমদমে আনা হচ্ছে—সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সঙ্গে দাহ করা হবে।

সুপর্ণা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরের দিনটি কী অপার বিস্ময় নিয়ে তার সামনে অপেক্ষা করছিল তা জানত না সুপর্ণা। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে শবদেহের অনুযাত্রা। হাজার হাজার লোক পথের দুপাশে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে

মৃতের প্রতি শেষসম্মান দেখাতে এসেছে। অজস্র ফুল পড়ছে—অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অবাধারে মাল্যদান চলছে। সুপর্ণার প্রতিটি বা সকলের কী শ্রদ্ধাবনত বেদনাময় দৃষ্টি। কে লকাতার প্রত্যেকটা খবরের কাগজে প্রথম পাতা জুড়ে সংবাদ—তরুণ বীরের কীর্তি-কাহিনীর নিখুঁত পঞ্জী—আর তার সঙ্গে সুপর্ণার নাম জড়িয়ে আছে। সমর, সমরের বিরহী আত্মা কি দেখতে পাচ্ছে এই সমারোহ, যে সমর প্রায়ই এক খ্যাতি কবির ইংরেজী কবিতা থেকে দুটি লাইন বারবার আবৃত্তি করত—যার অর্থ—"আমি মরব না, আমরা মরব না—আমরা অস্ত যাব ভাস্কর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য সমারোহে"—এই ত সে খ্যাতির ভাস্কর আকাশপটে তার মহাপ্রয়াণ!

তার কিছুদিন পরে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে সমরকে ভূষিত করল। ২৬শে জানুয়ারী ডাক পড়ল সুপর্ণার দিল্লীর দরবারে। সিফনের শাড়ীপরা মূর্তিমতী শোক সুপর্ণা নতনেত্রে দাঁড়াল রাষ্ট্রপতির সামনে—তিনি হাতে তুলে দিলেন সনদ। ক্যামেরা ফ্লাস্ করে উঠল।

কোলকাতায় ফিরে এলো সুপর্ণা। ফিরে এলো পঁচিশ বছরের মহাঘাণী স্বামীর পূর্ণ গৌরবের উত্তরাধিকারীণী হয়ে। দেশের রাষ্ট্রনেতারা আর বিদগ্ধ-সমাজ তার সঙ্গে দেখা করে এলো, শ্রদ্ধাভরে চাইল দেওয়াল-বিলম্বী ইউনিফর্ম পরা সমর চৌধুরীর ছবির দিকে।

দিনসাতেক পরে এসেছিল অঙ্কুর। রাষ্ট্রপতি-ভবনে তোলা ছবিগুলি দিতে। কার্ড পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল। ডাক পড়ল। ভেতরে গিয়ে ছবির খামটা ওর হাতে দিতে গিয়ে দেওয়ালে ঝোলান সুপর্ণার ছবির দিকে অঙ্কুরের চোখ পড়ল।

—"আপনি?"— বলেই চোখের বিস্ময়কে একটু হাসিতে রূপান্তরিত করল। সুপর্ণা ওর মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললে—"আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

"—আপনাকে? —না।"

—"না মানে, আপনার কথা শুনে ত তা মনে হল না।"

—"সত্যিই আপনাকে চিনি না—শুধু আপনার ছবিটা চেনা মনে হয়েছিল।"

—"এর অর্থ!"

"—বিশেষ কিছু নেই—এমনি অর্থ-হীন অনেক কিছুই ত অনেকের মনে হয়। এও তেমনি।"

ঠিক তেমনি ভাবে ধরুন। পাঁচ বছর আগে বটানিকস-এর এক অপরাহ্ণ মনে পড়ে গেল সুপর্ণার। কার্ডের নামটার দিকে চেয়ে সুপর্ণা বললে—

—"আপনি অঙ্কুর গুপ্ত?"

—"কেন, পরের কার্ড দিয়ে কেউ কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করেছে নাকি?"

ওর কথার ধরনে সুপর্ণা হেসে ফেলেছিল—না লোকটা একটুও বদলায়নি।

—"যদি কিছু মনে না করেন মিঃ গুপ্ত, আমার ঐ ছবিটা কি আপনার তোলা?"

—"সেই রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু যেভাবে কাঁচের উপর ধোঁয়া লেগেছে.....

সুপর্ণা হাসলে। একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বললে—"আপনাকে মনে রেখেছি একথা বললে মিছে কথা বলা হবে। কিন্তু একদিন যে আপনার সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন ও রূঢ় ব্যবহার করেছি—এ কথাটা কোনদিন ভুলতে পারিনি"—একটু থেমে বললে, "মাঝে মাঝে আসুন না অঙ্কুরবাবু।"

"কেন, তাহলে আবার বেশ কিছু-দিন ধরে ভাল ব্যবহার করে পূর্ব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।"

সুপর্ণা চেয়ে দেখেছিল—আর কথা বাড়ায়নি। তবুও অঙ্কুর নিজে থেকে কোনদিন আসেনি। সুপর্ণাকে আজকাল অনেক সভাসমিতিতে প্রায়ই যেতে হয়—সেখানে প্রেস ফটোগ্রাফারদের আনাগোনা, অঙ্কুরের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত—জোর করে কোন কোন দিন ধরে আনত। ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আর পরিচয়ের সেই একই ভাষা—"আমার ছবিখানা ওঁরই তোলা।"

সুপর্ণা অনেক চেষ্টা করেছিল অঙ্কুরকে একটু নিকট করবার। কিন্তু তার মুখের প্রচ্ছন্ন কৌতুক আর শ্লেষ দিয়ে যেন সবসময় তার নিজের সামনে একটা পরিখা খুঁড়ে রেখেছিল—একই শোফার পাশাপাশি বসেও সে পরিখা পার হতে পারা যায় না।

একদিন সুপর্ণা বললে: "দেখুন অঙ্কুরবাবু, আপনি বিশ্বাস করেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্র কতকগুলি সমরকেন্দ্রিক বৃত্তের মত—কোন একটা পরিধির মধ্যে এসে 'আপনি' আজ বোধহয় অশোভন শোনায়।"

—"তাই নাকি? আমি কি এই বাড়ীতে সেইরকম কোন পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়েছি নাকি?" কণ্ঠস্বর ভয়ের সঙ্গে যেন কথাটা বললে অঙ্কুর।

সুপর্ণা হাসলে। বললে—"না তেমন কথা আপনার পরম শত্রুও বলবে না—কিন্তু এমন ত হতে পারে আমি সেইরকম কোন পরিধির মধ্যে যেতে চাইছি। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে ঠাকুরপো বলি..."

—"আমি আপত্তি করব!"

বিস্মিত হয়েছিল সুপর্ণা। স্বর্গত সমর চৌধুরীর স্ত্রী একজন প্রেস ফটো-গ্রাফারকে ঠাকুরপো বলে সম্বোধন করতে চাইছে—ফটোগ্রাফার আপত্তি করছে।

—"আপত্তি করব এই জন্য যে আপনার স্বনামধন্য স্বামীর সঙ্গে আমার চাক্ষুস পরিচয়টুকু পর্যন্ত ছিল না, সত্যি বলতে কি মৃত্যু দিয়েই তাঁকে চিনেছি—এমন হঠাৎ যেমন্তা তাঁর ভাই সাজা....."

তার কথার ধরণে সুপর্ণা হেসে ফেলল।—"আচ্ছা তা না হয় বুঝলুম—আপনি যখন আমার চেয়ে বয়সে বড় তখন যদি আপনাকে দাদা বলি।"

"—কিছু মনে না করেন ত বলি, এমনি নিঃসম্পর্কীয় মানুষের মাঝে পাতান আত্মীয়তা আমার কেমন ভিয়েটার ভিয়েটার মনে হয়—লেট করো আপন নয় অথচ স্টেজের উপর কত রং কত ঢং।....."

সুপর্ণা আহত হয়েছে। তা লক্ষ্য করেই হয়ত অঙ্কুর বলল—"আচ্ছা বলতে পারেন এর অন্তর্নিহিত অর্থই বা কি? দুজন নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর মধ্যে একটু নিরাপত্তার কবচ সৃষ্টি করা—তাই না?"

সুপর্ণা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল। —"না তা নয়, অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু এদেশে আমরা যারা পুতুল খেলি ছোটবেলায়, সই গঙ্গাজল পাতাই—যারা ক্লাবে যাই না, যাদের মেলামেশার গণ্ডিরা নিয়েনেওই ভাগ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—সেখানে জীবনে যা পছাড়া কিছু ঘটলে, তাকে পারিবারিক সীমানার মধ্যে আপন করে না পেলে আমাদের পাওয়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যায় অঙ্কুরবাবু।"

"—সে ত গেল আপনার কথা, আমারও ত কিছু বলার থাকতে পারে। আমারই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা নিজেরা ঘর বাঁধলে না, কিন্তু যেখানেই স্নেহ ভালবাসার একটু নরম মাটি পেয়েছে—সেখানেই শিকড় গাড়তে চেয়েছে। দাদা বৌদি কাকা কাকী পিসীমা মাসীমা—এমনি যা হয় কিছু না কিছু একটা পাতিয়ে বসেছে—এমন কি বাইরের লোকের কাছে পরিচয় করাতে হলেও সত্যি কথা বলতে মুখে বাধে। এই

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে ভাই" এর কবি-বন্দিত লোকদের আপনারা যত ভাল আর যত বড়ই বলুন না কেন—সোজা কথায় আমি অনুকম্পা করি।"

এই অঙ্কুর! সময়ের সঙ্গে চরিত্রগত মিল তার কোথাও বোধহয় নেই। তবু একজনের কথা মনে হলে আর একজনের কথা অমনি মনে আসে সুপর্ণার। যেন দুটো লোক একই চরকির জন্য তার কাছে ইনটারভিউ দিচ্ছে। সময়ের ছন্দে আশ্চর্য তারতম্যের ধারা—আবেগ আর সংবেদনে অবিচল—স্নেহে প্রেমে কর্তব্যবোধে তার তুলনাই হয় না। যেন কথা একসঙ্গে বলতে পারত না—কেমন যেন থতিয়ে যেতো। তিন বছরের বিবাহিত জীবনের কথা শুধু নয়—সুপর্ণার ভাবী জীবনটাকে যে আশ্চর্যরকম সহজ নিয়ে সোজাসুজি রাশিয়ে নিয়ে গেছে। তবু-ও কোথাও যেন কি একটা পাওয়া যাচ্ছে না—একটা লক্ষ্যহীনভাব কেন আশ্চর্য! একটা জ্যোতিষ্ক ঘেরে উল্কার প্রতি নিষ্ফল আকর্ষণ।

অথচ লোকটা সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করে, বাধা করে বেরবার। উপন্যাসিকার মত নানাভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার চেষ্টা করেছে। ক্লান্ত বিধবার বেদনাহত মূর্তি.....লিপস্টিক হাকিয়ে যাওয়া উদাসীন ধ্যানমূর্তি.....চঞ্চল মেয়ের হ্যাদিনী মূর্তি—পারেনি। যেন ওই লোকটার কাছে হারবার জন্যই তার জন্ম। মনে পড়ে—এমনি একদিন মনের চঞ্চলতা বোধ হয় নেমে এসেছিল চোখের দৃষ্টিতে, অঙ্কুরের হাত ধরেছিল হঠাৎ। কেমন ঠাণ্ডাভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল অঙ্কুর। বলেছিল—"বৈধব্য ব্যাপারটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ। মানুষ প্রাচীন-কাল থেকে তার আপন স্বার্থের জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ তৈরী করেছে—সমস্ত অগ্রসর দেশের লোক সেগুলো মাঝে মাঝে বাচাই করে নিয়ে পরিবর্তন করেছে—হিন্দুরা এতদিন পারেনি। অথচ সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের দিকে চেয়ে দেখলে এর কারণ পাওয়া খুবই শক্ত মনে হয়। সহজ! রাসেল বলেন—সংযমকে আমরা একটু বাড়াবাড়ি করেছি—প্রতিদিন আমাদের চারপাশে যত লোভ যত আকর্ষণ—সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং মানুষ সাধারণভাবে যা করে তাই করছে।"

সুপর্ণার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আপনি রাসেলের উপদেশ নিজে মেনে চলেন। কিন্তু সে কথা না বলে বলেছে—"কোন বিধবা যদি বিয়ে করতে রাজী হয়—আপনি নিজে সে বিয়েতে সম্মত আছেন।"

অত্যন্ত নগ্ন এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সুপর্ণা। কি ভাবলে অঙ্কুর। অঙ্কুরও বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে কৌতুক করে বললে—"নীতিগত নয়, স্বার্থগত বাধা আছে—কারণ আমার বিধবা মা সেক্ষেত্রে বিয়ে করতে চাইলে আমি ভয়ানক অসুবিধেয় পড়ব।"

সুপর্ণা হেসে বলেছিল—"অচ্ছা লোক যা হোক আপনি, আপনার মুখে কি কিছু আটকায় না।"

সুপর্ণা নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হয়ত অঙ্কুরের খোঁজ করেনি, অথচ এই যে খোঁজ করেনি এইটাই সবচেয়ে বেশী মনে রেখেছে। সভা-সমিতিতে দেখা হলে না চেনবার ভান করেছে। ব্রত উপবাস করে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে—রোজ পুজোর ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে অঙ্কশুদ্ধি করবার চেষ্টা করেছে—ধ্যান করতে চেয়েছে সমরেশ—তিন বছরের সাহচর্যের বহু খুঁটিনাটি স্নেহ-সোহাগ স্মরণ করবার চেষ্টা করেছে—কত ভাল কত বড় সমর। আশ্চর্য! একটু অসতর্ক মুহূর্তে ঘসা কাঁচের মধ্যে দেখা মূর্তির মত সমর কাপসা হয়ে গেছে—স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অঙ্কুর।

তা না হলে, আজকের এই গৌরবোজ্জ্বল স্মরণ-উৎসবে যখন দেশের মানুষ এসে নত হয়ে রেখে গেল তাদের শ্রদ্ধাঅর্ঘভার—সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন মহোত্তর প্রেরণা কেন পাচ্ছে না সুপর্ণা—কেন স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তারই পবিত্র স্মৃতিতে ধূপ জ্বেলে দিতে গিয়ে গাল দিয়ে বসল অঙ্কুরকে।

দি

ন্যাশনাল সুগার মিলস

লিমিটেড

মিল :
অহমদপুর, বীরভূম,
পশ্চিম বাঙলা

রেজিঃ অফিস :
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনু,
কলিকাতা—১৩

বিশেষ কয়েকটি তথ্য

চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৬০/৬১	৭৮,৮২৩ মণ
১৯৬১/৬২	১,০৩,৪১৮ মণ
১৯৬২/৬৩তে সম্ভাব্য উৎপাদন ...	১,৫০,০০০ মণ
মিল প্রথম স্যুটি সাধারণ উৎপাদন পর্যায়ে আসা কুরু করায় ইক্ষু উৎপাদনকারীদের বাবদ	৩০·০০ লক্ষ টাকা
এ যাবৎ উৎপাদিত চিনির মোট মূল্য ...	৭৫·০০ লক্ষ টাকা
কেন্দ্রীয় শুল্ক কর এবং রেলওয়ে মাশুল বাবদ ছাড়াও রাজস্ব হিসাবে মিলের প্রদত্ত রাজস্ব	১৪·৪৭ লক্ষ টাকা

তারিখ, কলিকাতা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

এম, এন, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

CENTRAL LIBRARY

পাশের মুখোমুখি দুই বাড়ী, চোখাচোখি হতেই পরিচয় হল, পরিচয় শেষে অন্তরিকতা।

মৃণ্ময়ীর বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। এখনও তার চেহারাতে ফুল-চন্দন আর রঙের বাহার, সবিতার বিয়ে হয়েছে বছর দশেক তবে নামেই বিয়ে। বাপের বাড়ীর মস্ত সংসারের ঝক্কি মাথায় নিয়ে বয়েস পেরিয়ে যাওয়া আইবুড়ো মেয়ের মত তার এক বর্ণহীন জীবনযাত্রা।

সন্ধ্যার সময় সবিতা যখন গা ধুয়ে বারান্দার রেলিঙে কাপড় মেলতে আসে, মৃণ্ময়ী হয়ত তখন তার শোবার ঘরটি পরিপাটি করে গোছাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে রেডিওতে গীটারে বাজছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মৃণ্ময়ীর স্বামী রমেশ আপিস থেকে ফিরবে।

সবিতা জানে মৃণ্ময়ী এখন চোখ-চোখি হলেও দাঁড়াবে না, প্রাণপণ তাড়া করে কাজ সেরে গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসবে। হয়ত নীল শাড়ী নয়ত টিয়াপাখী রঙের নাহয় লাল, বেগনে, আসমান যত রঙ আছে তার কোন একটি পরে ঘরটায় ফিকে নীল বাতি জ্বালিয়ে দেবে। সেই রহস্যঘন ঘরটার কেমন একটা আকর্ষণে সবিতা হয়ত একটু বাদেই ঘুরেফিরে আবার এসে দাঁড়াবে। দেখবে রমেশ একটা কাম্প চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আর তার মুখোমুখি চেয়ারে চায়ের পেয়ালা নিয়ে মৃণ্ময়ী।

অশেষ মন্থরতায় গড়িয়ে গড়িয়ে একটা উপন্যাস মৃণ্ময়ী শেষ করেছে কোনকালে। সবিতার বাপু বড় বাড়া-বাড়ি, একবারও কি আসতে নেই ইদিকে? শেষে সবিতার দেখা যদি-বা মিলল, ও তখন ডায়ী বাস্ত, বালি নিয়ে দোতলায় যাচ্ছে মেজখুড়ীকে খাওয়াতে। মৃণ্ময়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে একবার শুধু থমকে দাঁড়াল।

—কি বলবে বল, দেখছ না হাতে এখন কত কাজ, মরবারও ফুরসত নেই আমার।

ঠোঁট উল্টে মৃণ্ময়ী তার দেরালের দিকে ফিরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আর আমরা সবাই বুঝি নিষ্কর্মার দল?

—তাই বলেছি?

কথাটাকে আমল না দিয়ে হাসতে হাসতে সে ওপরে যায়। তারপর চেঁচিয়ে বলে—বলি অ মেজখুড়ী, চট-পট বালিটা খেয়ে নাও দিকি। জানালায় আর একজন হাঁড়িমুখ করে বসে আছেন যে।

—কে লা হাঁড়িমুখো, ও মিনুর কথা বলছিস? তা যা বাপু তার সামনে।

মেয়েটা কোথায় এই বয়সে নিজের ছেলেপিলে ঘর-সংসার নিয়ে থাকবে তা নয়, বুড়ীদের সেবা করেই আজন্ম কাল কাটল! আশ্চর্য বুড়ীর ঘটা ও বাড়ীতে।

আর সবিতাই বা কী? না হয় নিজের ঘর-সংসারই হ'ল না তাই বলে কি অমনি সাদা-মাটা শুকনো হয়ে থাকতে হবে? এতটুকু রঙ নেই মেয়েটার কোথাও, না সাজ-সজ্জায় না মনে, এর চেয়ে গেরুয়া পরে বৈরিগী হয়ে যাওয়াও যে ছিল ভাল। ফাঁকা পেয়ে সেদিন বলেই বসে মৃণ্ময়ী।

—শরীরে কোথাও ত রঙ নেই দেখি, তবে অত ঘটা করে সিঁথের রঙ পরা কেন বাপু?

সিঁদুর পরা নিয়ে এর আগেও মৃণ্ময়ী খোঁটা দিয়েছে তাই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সবিতা বলে—

—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার জানালার বাহারি পর্দার মত কাপড়ে সারা অঙ্গ জড়িয়ে রাখব।

কথাটা যে মৃণ্ময়ীর মনঃপূত হল না তা সে বোঝে।

সিঁদুরটা ও আজও পরে কেমন একটা অভ্যাসের দোষে—নিজের বিবর্ণ বেবড়া ছবিতে জোর করে রঙের আঁচড় কাটবার মত।

মৃণ্ময়ীর মনের রঙ সকাল, সন্ধ্যায় এক-এক রকম। সকাল বেলা ক্ষণে ক্ষণে মুখোমুখি বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে একটি বর্ণহীন মনে যদি একটু রঙের তৃষ্ণা জাগে, গতানুগতিক এই

জরাগ্রস্ত জীবনের মোহ যদি ওর একটুও কাটে।

সন্ধ্যায় ছায়া ঘনাতেই সেই চিন্তা লেশমাত্র ওর মনে থাকে না, নিজের সেই ফিকে নীল বাতি-জ্বালানো ঘরে আর একটি মানুষকে ঘিরে আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন বেদনার রেশই খুঁজে পায় না।

ঠিক সময়ে সবিতাও এসে ছাতের কোল ঘেঁষে দাঁড়াবে—সিঁথির সিঁদুরের মত সেও ওর এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চোখে পড়বে মুখোমুখি বসা রমেশ আর মৃন্ময়ীকে। হাওয়ায় জানালার ফুল-কাটা নেটের পর্দা উড়ছে—আগুন-রাঙা শাড়ী পরেছে মৃন্ময়ী। টুকরো টুকরো কথা তারপর উঁচু পর্দায় বাঁধা মৃন্ময়ীর হাসির আওয়াজ যেন ছিটকে এসে পড়ছে এ বাড়ীর ছাতে। ধূপের ধোঁওয়া পাক খাচ্ছে টেবিলের এক ঝাড় রজনীগন্ধার গায়ে।

সেই সময়ে বিরক্তিকর ঠেকে এ বাড়ীর বাতে-পঙ্গু বড়খুড়ীর একঘেয়ে কাত-রানির আওয়াজ, মনে হয় একটু পরে রমেশ আর মৃন্ময়ী বেড়াতে বেরুবে। পাশাপাশি চলতে চলতে আড়চোখে চেয়ে যেন ইচ্ছে করেই মৃন্ময়ী রমেশের এক-বারে গা ঘেঁষে চলবে, মনে হবে বড় বাড়াবাড়ি করছে মৃন্ময়ী। শনি আর রবি এ দুটো দিন যেন একবারও ফুরসত হয় না মৃন্ময়ীর, একবারও সে আসে না জানালার পাশে। যদি বা আসে, সবিতাকে খুঁজে বেড়ায় না সেই একজোড়া চোখ এ সে হলপ করে বলতে পারে।

একটানা বর্ষা চলছে কদিন ধরে এক নাগাড়ে।

উত্তরের জানালার গায়ে খাট-বিছানা। বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে একসা হয় তাই কদিন ধরে জানালা বন্ধ রেখেছিল মৃন্ময়ী।

আজ বেলার দিকে বৃষ্টি ছেড়েছে—এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে সামনের দেবদারু গাছটার পাতায়। দুটো বাড়ীর সামনের গলি-পথটা ধুয়ে পুঁছে কেমন ঝকঝকে লাগছে। ফুটপাথের এদিকটার ডাস্টবিনে আবর্জনা সব ডাঁই হয়ে রইত অনাদিন। আজ এরই মধ্যে সব আবর্জনা সাফ হয়ে গেছে।

সবিতার দেখা পাওয়া ত সে বেশ কদিন।

কৌতূহল চাপতে না পেরে এ বাড়ীতে এসেই পড়ল মৃন্ময়ী। ছোট-খুড়ী তখন পান সাজতে বসেছেন। ওকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

—মিনু এলে নাকি মা? পানগুলো চটপট জড়িয়ে ফেলত বাছা। আমারও হয়েছে এমন অভ্যাসের দোষ কেউ সঙ্গে না রইলে মোটে কাজ এগোয় না।

সাহস করে সবিতার কথা জিজ্ঞেস করতেও বাধে। তবে কি সে রাগ করে চলে গেছে! আশঙ্কায় পান মুড়তে যেয়ে দু-চারটি ছিঁড়েও যায়।

সবিতার তবু দেখা নেই। কেন একা একা কি এত সামলাতে পারে ছোট-খুড়ী? বুড়ো হয়েছে, হয়ত দু-চার কথা বলেও থাকবে বা, তাতেই এত রাগ?

তখন বিরক্ত হয়ে বলে—কেন সবিতা গেল কোথায়?

হাঁ করে কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ছোটখুড়ী।

—ওমা, সত্যিই তুমি জান না, বন্ধুকে কিছুই বলেনি সে? বলছি, তার আগে যাও দিকি মা চট করে দেখ ত ওপরে যেয়ে মেজখুড়ী বালিটা ঠিক দেল কিনা, না পড়ে আছে অমনি?

ডিগিং মেরে মেরে ওপরে আসে মৃন্ময়ী।

ছোটখুড়ীর কথা যেন কেমন রহস্যময়। তবে কি অন্যায় কিছু করে বসল নাকি সবিতা? নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে নইলে অমন রসিয়ে রসিয়ে বলারই বা কি মানে।

মেজখুড়ী একগাল হেসে বলেন—মিনু এসেছ বুঝি মা? পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভেবেছি সবিতা, তাই ভয়ে ভয়ে খাচ্ছি। না গো না আমারই ভীমরতি ধরেছে। সে এখন আসবে কি করে বাছা?

—কেন তার আবার সময় অসময় কি, আপিসের বড়সাহেব নাকি? সময়মত মুগীমানুষটাকে একটু পথ্যিও দিতে পারে না? বিরক্তি আরও বাড়তে থাকে। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে সবিতা এরই মধ্যে!

তিনতলা থেকে মানদাকি ঘন ঘন ডাকতে থাকে। বাধা হয়ে কথাটা না শুনেই তিনতলায় উঠে আসে মৃন্ময়ী।

সেখানে বাতে পঙ্গু বড়খুড়ী শুয়ে আছেন—পাহাড়ের মত একতাল মাংস-পিণ্ড। এপাশ থেকে ওপাশ ফিরিয়ে শোয়াবার জন্য হাঁকাহাঁকি করছে মানদা।

—দেখ দিকি নির্নিমণি, এই তিনমণি দেহটাকে সে একাই ঘোরাত-ফেরাত যেন পেটের ছেলেকে কোলে কাঁখে নিচ্ছে। সেই তিনমণি দেহটাই নড়েচড়ে মৃন্ময়ীকে বসতে ইসারা করে তারপর তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

ফুলো ফুলো হাতের মধ্যে মৃন্ময়ীর হাতটা কাঁপতে থাকে। মমতা জন্তুর মত চোখ বড়খুড়ীর ঘোলাটে দৃষ্টিহীনের মত চাহনি। সবিতার কথাই বলেন বড়খুড়ী—

বড়খুড়ীর ভাইপোর হাতেই ছিল চাকথিটা; ভারী মানী লোক তাঁরা। মেয়েদের কি একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের দোকানে মাল বেচবার কাজটা সবিতা পেয়েছে, যাতে পঙ্গু বড়খুড়ীই ভাইপোকে ডেকে মাথার দিব্যে দিয়ে কাজটা ওর জুটিয়েছেন। চোখ বুজেই বলেন বড়খুড়ী—এখন বয়স আছে, গতর আছে। এ সংসারে ওর গতরটা শুধু শুধু শেষ করি কোন ধর্মে? বলতে বলতে বড়খুড়ী হাঁপাতে সুরু করেন। এইবার বাথাটা বাড়ল, আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে সুরু করবেন বড়খুড়ী।

শনিবারের সন্ধ্যা—সেই ফিকে নীল বাতি-জ্বালা ঘর, রেডিওতে সেতারের ঝঙ্কার, ফুলের গন্ধ, ধূপের ধোঁওয়া তার ওপর স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে অসময়েই উলটো দিকের বড় বাড়ীটায় এসে ঢোকে মৃন্ময়ী।

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে মুখোমুখি পড়ে সবিতার সঙ্গে। তখন তাকে যেন আজ প্রথম চোখে পড়ল মৃন্ময়ীর। এ ত সেই সামনের বাড়ীর মুখগোঁজা আটপৌরে ভীরু মেয়েটি আর নয়। এর যেন কোথায় রঙ ধরেছে। এ-রঙের পরিচয় মৃন্ময়ী জানে না। তার অনেক অনেক রঙীন শাড়ীতে, ঘরের নীল বাতিতে কিংবা হৃদয়ভরা উত্তাপে কোথাও এই রঙের রেশ নেই।

সবিতার সিঁথি আজ শূন্য, শরীরের কোথাও রঙের লেশমাত্র নেই তবু কোথায় যেন ঘোর লেগেছে। সেই ঘোর কেমন উজ্জ্বল হয়ে রয়াত দেখাচ্ছে তিনতলায় ঐ পঙ্গু অথর্ব বড়খুড়ীকেও।

এই বর্ণহীন জরাগ্রস্ত বাড়ীটায় রঙের ঘটায় চোখে যেন ধাঁধা লেগে যায় মৃন্ময়ীর।

বিকার

দীপক চৌধুরী

রণদাপ্রসাদ গুহ নতুন গাড়ি কিনেছে। ছোটখাট চাপ্টা ধরনের গাড়িটা। এক এক সময় মনে হয় দুই হাতের চেটোর মধ্যে তুলে এনে বার-কয়েক উল্টেপাল্টে দিলে বডিটা সেঁকা মুটির মতো লেপ্টে যাবে বুঝি। বেঁটে মানুষেরও পা ছড়িয়ে বসে গাড়ি চালাতে কষ্ট হয়। বপুটি লম্বা নয়। সাধারণ বাঙালীদের যা দৈর্ঘ্য তার চেয়েও ইঞ্চি দুই ছোট। বিলেতী ফার্মে বড় চাকরি করে।

আমি ইন্ডিয়ান মিরার ছাড়ি। লাঞ্চ খাওয়ার জন্য অফিস থেকে ধরে নিয়ে এসেছে আমায়। অফিসের ড্রয়ারে স্যান্ডউইচের তৈরী তিন রকম টিফিনের বাক্স পড়ে রয়েছে। নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে আর আলুবোল খেতে পারতাম। আমার অনেকদিনে বন্ধু যারা বলতে গেলে তারাই আমার বন্ধু। তাদের সুখদুঃখের গল্প শুনতে শুনতে বাড়ি আর আলুবোল খেতে ভালো লাগে অনেক। বড় হোটেলে এসে রণদাপ্রসাদ এ-সব কিছুই শোনাচ্ছে কি? আর কেনই বা শোনাচ্ছে? সমাজের উচ্চস্তরে উঠে গেছে। সেখানে কি বন্ধুবান্ধবের অভাব নাকি? ওর নিজের যদি বন্ধু না থাকে মিসেস পাবে তো অনেক। স্বার্থান্বেষী বন্ধু এবং স্বজনের একগুচ্ছের টাকা ফুরোলে বাড়ির পরে তাঁকে সবাই মিসেস রায়ের বাড়ি ভাড়ার জোগান। তারপর ওর প্রমোশনের মরসুমে হঠাৎ একদিন ডিভোর্স চেয়ে তাঁকে মিসেস রায় বলে ডেকে ফেলবেন।

কিন্তু আমাকে কেন লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে এসে এ-সব উচ্চস্তরের গল্প শোনাতে চায় সে? রণদার সংসারে কি অশান্তি ঢুকেছে? এমন একটি নিশ্ছিদ্র ফ্ল্যাটের মধ্যে অশান্তি ঢুকল কোন্ পথ দিয়ে? সংসারে তো শুধু স্বামী-স্ত্রী। একটি মাত্র ছেলে এই সেদিন ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে দুর্গাপুরে গিয়েছে ইস্পাত তৈরির কাজ শিখতে। তারপর বিয়েথা হবে। অতএব ছোটকী আর পোনামণির সব কিছু আমার কি লভ্য? সুপ খাওয়ার পর প্লেট বাদাম অভ্যাসমত দিয়ে উঠে পড়ব ভাবছিলাম। তখনও ফ্যান্টাসের মধ্যে মন পড়ে রয়েছে আমার। তিনটি ছেলেমেয়েকে ধরিত্রীর বাইরে কলেজ-ইস্কুলে পাঠাবার আগে কয়েক মাস করে আমার জন্য ছুটিছাটার তৈরী করে নেয় তারা।

রণদাকে বললাম, 'আমার একটু তাড়াতাড়ি ফেরা হবে।'

'তা হয় না। পুরো কোর্স খেয়ে ফেরা হবে। একঘন্টা পরে গেলে কারিক অফিস ফেল পড়বে না।'

'রূপদাস্থলান মুখে বেঁটে নয়, চেহারাও অসুন্দর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পরেই বিয়ে করেছিল। তখন স্ত্রীর নাম ছিল ইলা। মিসেস মুখ কিংবা মিসেস গোহো ফুলে কেউ ওকে ডাকত বলে মনে পড়ে না। ভাবভালোবাসা খুবই ছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে আলাপপরিচয়ও হয়েছিল। যারা দেখতে সুন্দর নয় তাদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করতেন তিনি। নিজে কিন্তু সুন্দরী। আলাপালা বললেও চলে। আমি তো সারা জীবনেও ঐ রকমের একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক পথেঘাটে, সিনেমার পর্দায় কিংবা মাসিক্যিক চিত্রনক্ষত্রে কোথাও দেখতে পাইনি। রূপদাস্থলানের কাছেই শুনেছিলাম যে, হাজার দুই রকমের জায় পায় দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই ওকে নির্বাচন করেছিলেন।

গোঁফ রাখবার পর রূপদাকে ভালো সেদিন অসুন্দর দেখায়। গোঁফের ওপর হাত রেখে চিন্তামগ্ন হয়ে ছিল সে।

একটু পরে সে বলল, গাড়িটা নতুন কিনেছি, একটু আগেই ডেলিভারি

॥ বর্তমানের মাসিকিক রবীন্দ্রনাথ-এর ॥
বহু আলোচিত বহু প্রশংসিত সুরভীয় ৩ খানি উপন্যাস

১। হারানো ছন্দ ৩৲
(২য় সংস্করণ)
২। বাঁকাপথ ২৲
(১ম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত)
৩। জীবন জিজ্ঞাসা ২৲
(১ম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত)
॥ পড়া না থাকলে পড়ে ফেলুন ॥
॥ সমস্ত বই-এর দোকানেই পাবেন ॥

মাছের প্রত্যাশায়—

নিলাম। চল্ একটা লম্বা ড্রাইভে যাই—'

'তা হয় না ভাই।'

'কেন? অফিসে গিয়ে আর কি করবি, চল সোজা চলে যাই ডায়মণ্ড-হারবার। এখান থেকে টেলিফোন ক'রে স্টের বড়সাহেবের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নে।'

'কি বলে ছুটি নেব?'

'বলবি পথে ব্রেক-ডাউন হ'য়ে গেল।'

'নতুন গাড়ি!!'

'ব্রেক-ডাউন যখন হয় তখন নতুন আর পুরনো দুই-ই সমান। আগে থেকে বলা যায় না কিছু।'

ছেলেবেলা থেকে আমরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছি। গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের মধ্যে। রূপদা চাকরি পেল বি-এ পাস করবার পরে। আমি গেলাম বিজ্ঞান কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। এই বিদ্যা আমার কোনো কাজে লাগল না। রূপদার চেষ্টায় আমিও বণিক অফিসে চাকরি পেয়ে গেলাম। অফিস দুটো আমাদের আলাদা আলাদা, কিন্তু এক রাস্তায়, একেবারে পাশাপাশি। কোম্পানির এতো কাছে ব'লেই ভয়ে ভয়ে আমরা দূরে সরে যেতে লাগলাম। যখন দেখা হতো তখন কোনো সামাজিক উপলক্ষ থাকত। কোনো বন্ধুর বিয়ে। নয়তো কোনো বন্ধুর বোনের জন্ম-দিন। দু'চারবার ফুটবল খেলার মাঠেও দেখা হয়েছে। রূপদার বিয়ের পর থেকেই ভাপসন ধরতে আরম্ভ করে-ছিল। অতো সুন্দরী স্ত্রী কপালে জুটে গেল ব'লে কেউ কেউ ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। ভাবভালোবাসা বন্ধ ক'রে দিল।

আজ সে হঠাৎ আমার অফিসে এসেছিল লাঞ্চ টাইমের অনেক আগে। অতো বড় একটা বিলেতী কোম্পানীর হেডক্লার্কসাহেব সে, কিন্তু আমার মতো একটি সাড়ে চারশো টাকার ছোকরার টেলিফোন ওপর ভর দিয়ে মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওকে।

যাহোক রাস্তায় বেরোলাম আমরা। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, সাদা-পাটিন কাপড়ের হাফপ্যান্ট পরেছে রূপদা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দুই হাফপ্যান্ট পরিস কেন? দুই তো আর রাস্তাঘাট কিংবা বারান্দা পরিষ্কার করিস না।'

'পরলে ক্ষতি কি?' উদাসভাবে প্রশ্ন করল রূপদা।

'ক্ষতি আছে। ভোডে আরও বেশি বেঁটে দেখায়।'

'সেই জন্যই তো মিসেস গোহো দু' জোড়া হাফপ্যান্ট অর্ডার দিয়ে তৈরী

করিয়ে এনেছেন। মজবুত কাপড়। বছর পাঁচেক ধরে ব্যবহার করছি—নিয়মিত ধোপাবাড়ি পাঠাই, তবু—' থেমে গেল রমলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তবু কি?'

'ছেঁড়ে না। আমার ধোপাটাতো একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। চেঙ্গীস খাঁ-র মতো দুর্ধর্ষ। যা পায় সবই প্রায় কেটেকুটে শেষ করে দেয়। কিন্তু আমার হাফপ্যান্টগুলোয় সঙ্গে পেরে ওঠে না। মনে মনে খুশী হন মিসেস গোহো।'

'যাই বলো ভাই, তোমার কিন্তু যাদুঘরের মতো দেখায়।'

'মিসেস গোহো তো তাই চান। নাকের তলায় এই যে জিনিসটি দেখছিস—' গোঁফের গায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে রমলা বলল 'এটার মূলেও তিনি। রাখতে বাধ্য করলেন।'

'আরনায় মুখ দেখিস না?'

'তেইশ বছর আগে দেখতাম। তখন বিয়ে হয় নি। পরে আর দেখবার দরকার হয় নি। মিসেস গোহো বলতেন, আমার মতো সুন্দর পুরুষ জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখেন নি। দুহাজার ফোটো আর পাস্ত দেখে আমায় নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর ভালবাসায় সমুদ্রে ডেইশটা বছর গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। এখন দেখছি আসলে ওটা সমুদ্র নয়, পঙ্ককুণ্ড।'

'কিসের কুণ্ড বললি?'

'বিকারের। মনোবিকার। গল্পটা তোকে শোনাব। সেই জন্যই তোকে লাঞ্চ খেতে ডেকে নিয়ে এলাম। নইলে কাটলেটের মতো চাপ্টা একটা গাড়ি দেখাবার জন্য ডাকতাম না নিশ্চয়ই। চল্ এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।

'বড়বাবুকে তা হলে টেলিফোন করি একবার?'

'হ্যাঁ। তিনি আমায় খুব ভাল-ভাবেই চেনেন। তাঁকে বল, আমায় গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সীতা কথাই বলবি। বলবি যে, নতুন গাড়ি। এক মাইলও চলেনি। ব্র্যান্ড নিউ কার। তবু ধাপার কাছে এসে ব্রেক-ডাউন হল।'

'ধাপা, না ভায়মণ্ডহারবার?'

'দুই-ই সমান।'

দক্ষিণ কলকাতার সেই দেকটা। বহুদিন এদিকে আসি নি। বছর পাঁচেক আগেকার ছবিটার সঙ্গে অনেক অমিল-বদল হয়েছে। চারদিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল রমলা। দক্ষিণ দিকের সেই নির্বিকৃতায় বড় বড় গুলোকে কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। তবে দক্ষিণে না থাকলেও হয়তো পূব-পশ্চিমে কোথাও নতুন ফ্ল্যাটের জন্য হয়েছে। মানুষ যতোদিন মানুষ থাকবে, ফ্ল্যাটগুলোকে ততদিন পুরো-পুরি উচ্ছেদ করা যাবে না।

চাঁছাছোলা একটা শহরের পরে ফ্ল্যাটগুলোকে সাদা-কালো ছবির মতো লাগত। আজ দেখছি চারদিকেই কংক্রিটের পরিমাণ বেড়েছে। ভূদৃশ্যটা ফ্ল্যাট।

সীতার ক্লাবের মুখোমুখি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল রমলা। জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়িতে বসবি, না বেঞ্চিতে?'

রুচি বদলের সঙ্গে সঙ্গে
পালটায় খোঁপা বাঁধার ঢঙ-ঢঙ
কিন্তু কেশ পরিচর্য্যায়
ধারা একই থাকে
বংশানুক্রমে।
সুচারু কেশচর্চায় ঐতিহ্যের
ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে—
কবিরাজ এন, এল, সেনের
কেশরঞ্জন
তৈল

কবিরাজ এন. এল. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
১১, মেছুয়া হিন্দু রোড, কলিকাতা-৯

'আড়াল-আবডাল তো কোথাও নেই। এখনেই ভাল।'

রণদা সিগারেটের টিনটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'ইলার আর ভাইবোন নেই। ছেলেবেলা থেকে আদর আর নাই পেয়ে পেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে রইল বছর দুই। তারপর লেখা-পড়া খতম করল। অবস্থা ভাল, কাজ-কর্ম কিছু করতে হয় না। যেখানে যায় আর যায় সঙ্গেই দেখা হয় সবত্র ও সবার কাছ থেকেই শুধু রূপের প্রশংসা শোনে। ক্রমে ক্রমে ওর গোটা মানসিক জগতটা একটা অসার আত্ম-শ্লাঘার জগত হ'য়ে উঠল। কি ক'রে যেন ইলা বুঝতে পারল, সাদা-কালো ছবির মতো একটা তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য না ঘটলে রূপের জ্যোতি নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। প্রতি ব্যাপারেই এই বৈসাদৃশ্য ঘটাবার চেষ্টা করছে সে। পাশের লোকটি কুৎসিত না হলে সকলেরা ওর রূপের যথার্থ মর্যাদা দেবে না, এই রকমের একটা ভয় ঢুকে গেল ওর মনে। এই ভয়টা শেষ পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়াল বিকার। ভালবাসার যে স্বাভাবিক বীজ থাকে মানুষের মনে সেটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

'এমন চরিত্রের একমাত্র গুণ হচ্ছে দাম্ভিকতা। আমার মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সামাজিক মর্যাদাও বাড়ল। নিউ মার্কেট থেকে শাড়ি কিনে উপহার দিতে যায় আমার সহকারী কর্মী বাগচির স্ত্রী রমলাকে। ওর জন্ম-দিন। একশো তিন টাকা দিয়ে যে সে কাতান সিল্কের শাড়িটা কিনল তা' যদি রমলা বুঝতে না পারে, সেই ভয়ে ফাংশনেটাতে সবার অলক্ষ্যে যেলে রাখে এল সেন্টার টেবিলের ওপর। আর রমলা যদি ওর চেয়ে বেশি সুন্দর হতো তা হ'লে জন্মদিনের তারিখটিতে

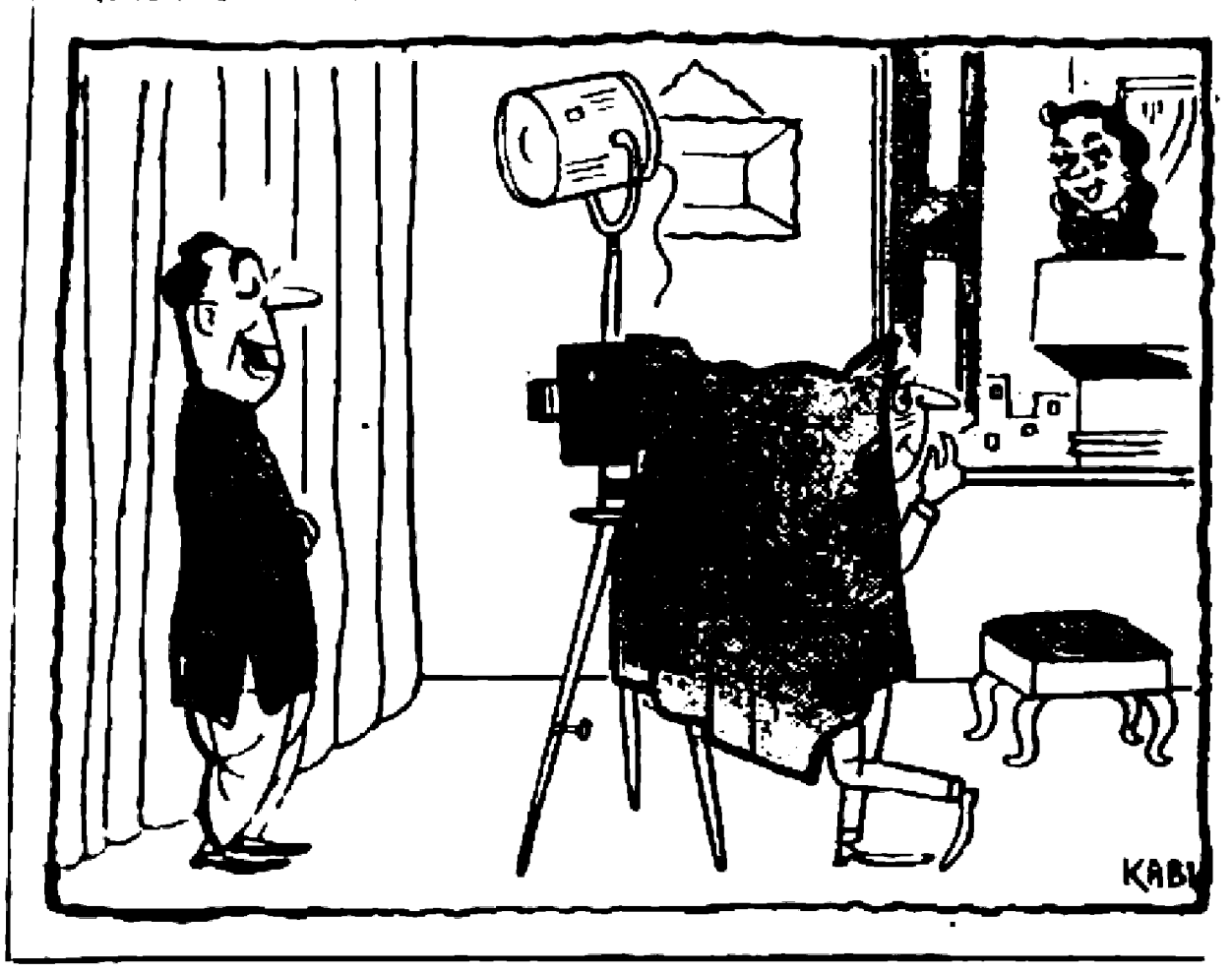

পেট ব্যথা শুরু হ'য়ে যেত ইলার। সেই অনেবিকারটিকে পুষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করছে দিনরাত। গানবাজনার ধার ধারে না সে। কিন্তু নিউ এম্পায়ারে বিখ্যাত লোকের যখন কনসার্ট হয় তখন সবচেয়ে বেশি দামের টিকিট কাটে ইলা। টিকিট কেটে বাড়ি ফেরবার মুখে ভায়ার কোম্পানীর দত্তসাহেবের বাড়ি গিয়ে মিসেস দত্তর সঙ্গে মিনিট-পাঁচেক গল্প করে। কনসার্ট দেখতে যাওয়ার খবরটা দেয়। কিন্তু কতো টাকার টিকিট কেটেছে সেই খবরটা শোনাতে লজ্জা পায় ব'লে মিসেস দত্তের অলক্ষ্যে টিকিটখানা মেঝের ওপর ফেলে রেখে আসে। বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে, ছটফট করে। মিসেস দত্তের চোখে যদি টিকিটটা না প'ড়ে থাকে? টেলিফোন তুলে নিয়ে তাকে ডেকে বলে, "ভুল ক'রে টিকিট-খানা কি তোমার বাড়িতে ফেলে এসেছি ভাই?" জবাব দেন মিসেস দত্ত, "হ্যাঁ। বেয়ারাকে দিয়ে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

'গত তেইশটা বছর সবার প্রশংসা কুড়োতেই ব্যস্ত ছিল সে। এর বাইরে কোনো ব্যাপারের প্রতি আগ্রহ ছিল না ওর। এমনকি সবচেয়ে বেশি দামের টিকিট কেটে কনসার্ট শুনতেও যেত না। বরং ওর পাশের কিংবা পেছনের কোনো স্ত্রীলোক ইলার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়? ক্লাবে কিংবা হোটেলে ডিনার খেতে গিয়ে যে দু'-একবার তেমনটা হয় নি তা নয়। হয়েছে। টেবিলের লোকেরা ওর দিকে না চেয়ে হয় তো সেই অন্য মহিলাটির দিকে বার কয়েক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। বিশ্বাস করো, বাড়ি ফিরে এসে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে সে। পরের দিন সকালে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। রীতিমতো অসুখে ভুগে উঠল ইলা। বাড়িয়ে বলছি না মোহিত, এ রকম বার-কয়েকই হয়েছে।

'আমার ছেলে অমলেশ বিলেত যাচ্ছে মাস আসছে বছর। তার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে ইলা। এ পর্যন্ত হাজার-দুই পাত্রী আর পাত্রীর ফোটো দেখেছে সে। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। অমলেশ নিদারুণ মাতৃভক্ত। মায়ের পছন্দ-মতো মেয়েকেই সে বিয়ে করতে

চায়। কাল আমায় একটি অতি সুন্দরী মেয়ের ফোটো দেখিয়ে বলছিল, "খোকার বউ করে আনব একে। আমার কাছেই তো থাকবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কতদূরে অবধি লেখাপড়া করেছে? উঁচু সমাজে মেলামেশা করতে হবে তো তাকে।" জবাব দিল, "ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে সেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ শিখছে। বাপটি বড় ভাল লোক। পোস্ট অফিসের ইনস্পেক্টার।" কাল থেকে আমার মনে আর একবিন্দু শান্তি নেই। অমলেশের জীবনটাও নষ্ট করতে বসেছে। অথচ চিকিৎসারও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। অমলেশকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য নয়, মোহিত?'

'সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই।'

'উপায়টা বাৎলে দে না?'

'সত্যি বলছিস?'

'তেইশ বছরের ইতিহাস তো খুলে বললাম তোকে।'

সাঁতার ক্লাবে আলো জ্বলে উঠেছে। ফ্লারেসেন্ট আলোয় আশপাশের অস্পষ্টতা কেটে গিয়েছে। মনোবিকারের গল্পটা অদ্ভুতই বটে। মিসেস গোস্বামীর মতন অন্ধকার ঘরে করতে হলে সাঁতার ক্লাবের ঐ ফ্লারেসেন্ট আলোর মতো একটা আলোর দরকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালাবার সাহস পাচ্ছি না বলেই।

একটু ভেবেচিন্তে বললাম, 'একটি সুন্দরী এবং গুণবতী মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে অমলেশের। ঐ হচ্ছে ওর চিকিৎসা।'

ফেরার মুখে গাড়িবারান্দার পথ ধরে চলল সে। আমায় যেতে হবে উত্তর দিকে।

রণদা বলল, 'আমিও ভাবছিলাম, একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেব অমলেশের। তুই কি খোকাকে দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'কতোদিন আগে?'

হিসেব করবার কি স্মরণ করবার চেষ্টা করতে হল না। বললাম, 'গত শনিবার।'

'আশ্চর্য! কি করে দেখলি?' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে রণদাই নতুন প্রশ্ন করল, 'তোর বড় মেয়ে রুবার বয়স কতো হল?'

'সতেরো।'

'দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর হয়েছে।'

'তবে দেখলি ওকে?'

'বোধ হয় গত রবিবার, সকালের দিকে। আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।'

'যাচ্ছিল, না করে জন্য অপেক্ষা করছিল?'

আমার কথা শুনে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো রণদা।

আমি বললাম, 'এইখানেই আমার দাঁড়িয়ে দে। দু নম্বর বাস ধরব।' গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল আমি। দরজা বন্ধ করলও নাহল। আমার ঘাড় ছেড়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'রুবার সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে?'

'আগামী শনিবার অবশ্য যাব। আসিস।' বাসে উঠে পড়লাম আমি। পাশ থেকে আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা কি তের ওখানে যায়?'

জবাব দিতে পারলাম না। বাসটা স্টপেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল।

উৎকৃষ্টতায় সর্বোৎকৃষ্ট আকর্ষণীয় আহার্যবস্তু

গ্রেট ইষ্টার্ণের

বেকারী বিভাগের

অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার

নানা রকম রুটী, কেক্, পেস্ট্রীস, প্যাটীস, স্যাণ্ডউইচ, ভেজিটেবল চপ, মাটন চপ, চিকেণ এবং প্রণ কাটলেট, চকোলেট, বিস্কুট এবং অন্যান্য রুচিকর খাদ্য অর্ডার মত সরবরাহ করা হয়। আমাদের নিম্নলিখিত ষ্টলে এসে সন্ধান করুন। আমাদের কুপন প্রথার নিয়মাবলীও আছে।

ষ্টলসমূহ:

ওয়াটারলু স্ট্রীট (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) | হগ্ মার্কেট এস্প্লানেড ষ্টোর্স

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল লিমিটেড

কলিকাতা—১

CENTRAL LIBRARY

পাহাড়ের রং

সুমথনাথ ঘোষ

এধারে-ওধারে পাইনবার্চের জটলা। ছোট ছোট কত ফুলের গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। আর দূরে, আকাশের গায়ে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরতুষার ধবল চিত্র আঁকা! এমন জায়গায় বসে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া সৌভাগ্য বৈকি। অন্তত ভবতোষের মনের তাই বিশ্বাস।

ঠিক ছাতাটার নীচে তখনো তিনটে সিট ছিল। ছাতার আবরণটুকু যারা সহ্য করতে নারাজ, তারা ছিটকে ছড়িয়ে বসেছিল ছোট ছোট টেবিলে, জোড়ে জোড়ে মুখোমুখি—পুরুষ ও নারী। যেন কাছে থেকেও আরো কাছে পেতে চায় নিজেদের। তাই কারো সামনে চায়ের পেয়ালায় চা জুড়োয় নিঃশব্দে, কারো বা সিগারেট দু আঙুলের মধ্যে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়, খেয়াল থাকে না। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, মৃদু অস্ফুট গুঞ্জন করে—কাছাকাছি টেবিলে বসেও কেউ বুঝি তা শুনতে পায় না। যেন একটা অন্তরঙ্গতা মুহূর্তে আচ্ছন্ন।

কেবল ভবতোষ একা যেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। একটা শূন্য চেয়ার দখল করে কাটলেটের শক্ত মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চা খাচ্ছিল। ঠিক ওর সামনে আর দুটো শূন্য আসন পড়েছিল। একটু পরে সেখানে এসে বসলো দুজন। একটি সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবক আর এক তরুণী যুবতী, ওর স্ত্রী হলেও কিন্তু জাতে পাঞ্জাবী নয়—বাঙালী। যদিও বাঙালীর মত চলনেবলনে, ভাবে-ভঙ্গীতে সর্বত্র কিন্তু যেমন ঢ্যাঙ্গা, তেমনি সুসম ছন্দোময় দেহটি যেন লতানে অপরাজিতার মত ঘন পল্লবে ও পুষ্পে সুশোভিত। যুবকের চুল, ঠোঁটে রং, চোখে কাজল হলেও কোথায় যেন একটা রুচির শাসন ছিল, কোন উগ্রতা দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না।

ভবতোষের একেবারে সামনে ওরা বসেছিল। বোধহয় আর কোন 'সিট্' খালি ছিল না বলেই একেবারে ওর মুখোমুখি বসতে বাধ্য হয়েছিল।

কাটলেটের টুকরোটা চিবতে চিবতে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে, আড়চোখে একবার চট করে মেয়েটিকে দেখে নিলে ভবতোষ। কিন্তু দৃষ্টিটা দ্রুত সরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, এই ধরণের চোখের চাউনী এর আগে যেন কোথায় দেখেছে! ঠিক এমনি না হলেও, যেন এর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে! চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় আর ভাবে। না। অসম্ভব! যার মুখটা মনে আসে, হায় হায় কিসে আর কিসে। পদ্মের সঙ্গে ঘেঁটুফুলের তুলনা?

কুমকুম? সেই রোগা কাঠের মত দেহ। যেন শুকনো একটা খেজুর গাছ? আঠারো বছর যে ওর বয়েস কে বলবে। তার সঙ্গে চোখের সামান্য আদল আসে, এই পর্যন্ত! মন থেকে তৎক্ষণাৎ কুমকুমের স্মৃতি মুছে ফেলে ভবতোষ। ওর নামটা এর সঙ্গে মনে পড়তে গা যেন ঘিন্-ঘিন্ করে ওঠে।

অপাঙ্গে একবার তাকালো ভবতোষ সামনের সুন্দরী তরুণীটির দিকে, চোখটা যেন জুড়িয়ে গেল। রংকরা মুখ! কি স্নিগ্ধ! কি মধুর!

যার জন্যে ভবতোষের মনে এত তোলাপাড়া তার কিন্তু কোন কিছুই খেয়াল ছিল না। খাওয়াটা যেন গৌণ। হাসিতে চোখমুখ উদ্ভাসিত করে কখনো যুবকটির কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বলছিল, আবার কখনো তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকে শাসন করে, নো ডার্লিং, ডোন্ট বি সিলি!

মেয়েটির মুখের ওই ইংরিজী কথাগুলো যেন ভবতোষের কানে অমৃত-বর্ষণ করে। সত্যি ভারতীয় কোন মেয়ের মুখে এত মিষ্টি ইংরিজী উচ্চারণ ইতিপূর্বে শোনেনি ভবতোষ। সেই তরুণী যুবতীর কণ্ঠের মাধুর্য যেন ইংরিজী শব্দগুলোকে অবলম্বন করে সরস হয়ে ওঠে জিহ্বাগ্রে তারপর ওই রক্তাভ ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে পাকা আঙুরের দানার মত ঝরে পড়ে। ইংরেজের মুখের এই ইংরিজী কথাগুলো মনে হয় যেন কর্ণ-পটাহে আঘাত করে সজোরে কান মলে দিয়ে যায়, ওই তরুণীর কণ্ঠে তা যেন সঙ্গীত হয়ে বাজে।

লুকানো মধু ভরে নিয়ে উঠে যায় একসময় ভবতোষ। আর সহ্য করতে পারে না। চোখের সামনে আর এক-জনের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। সে অবিবাহিত। বিবাহের বয়েস অনেককাল উত্তীর্ণ

হয়ে গেছে। অবশ্য এতদিন পাত্রী জোটেনি বলে যে বিয়ে করেনি তা নয়, যেমনটি সে চায়, তেমনটি পায়নি। অথচ ঠিক সে কেমন চায়, তাও বুঝিয়ে বলতে পারে না। আজ এই মেয়েটিকে দেখে তার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে চীৎকার করে বলে ওঠে, ঠিক এমনি একজনকেই সে চেয়েছিল জীবনসঙ্গিনী করতে।

ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ভবতোষ সেইখানে, ঠিক তেমনিভাবে। ওর দুই কানের ভেতরে তখনো জ্বলছিল তপ্ত বালুকণার মত সেই ইংরিজী কথাটা—'ননসেন্স'। তরুণীর কণ্ঠের সেই জ্বালা নিমেষে ভবতোষের জীবনের এক ঘটনাবহুল ও বিস্মৃত অধ্যায়ের মধ্যে যেন তার মনকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

হাঁ, ঠিক এমনি ভাবেই গর্জে উঠেছিল কুমকুম একদিন। তার কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে হঠাৎ মিল দেখে কেবল যে বিস্মিত হয় ভবতোষ তাই নয়, মনে মনে ভাবে, সকল নারীর কণ্ঠ বুঝি এক হয়ে মিলে যায়, ওই একটি ক্ষেত্রে, যখন বিষ উদ্গীরণ করে।

ভবতোষ আর কুমকুমরা একই বাড়ীর দুটি ফ্ল্যাটে পাশাপাশি ভাড়া থাকতো। সে দশ-বারো বছর আগের কথা। ভবতোষের তখন সবে গল্পলেখক বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কুমকুম ছিল ওর গল্পের নিয়মিত পাঠিকা। যে পত্র-পত্রিকায় ওর গল্প প্রকাশিত হতো আগ্রহে কুমকুম তা পড়ে দেখতো তাকে নায়িকা করে ভবতোষ এবারের গল্পটা লিখেছে কিনা। কেমন করে তার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ভবতোষ গোপনে তাকে ভালবাসে। তাই যখন তখন ওর লেখার ঘরে এসে সোহাগ-উছলানো স্বরে বলতো, কি, আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখলেন না! কবে লিখবেন? কেবলই ত বলেন, মধ্যসময়ে লিখবেন। এমনি করে ত তিন বছর কেটে গেল! তারপর একটু থেমে অভিমানক্ষুরিত কণ্ঠে বললে, আমি মরে গেলে বোধহয় লিখবেন!

চটে ওঠে ভবতোষ। দেখো কুমকুম, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই! ঘষে ঘষে চুল ছাঁটলে, আর মুখে রঙ মেখে চোখে কাজল দিয়ে নিত্য-নতুন 'ম্যাক্সফেক্টরের' সঙ্গে সিনেমাতে, রেস্টুরেন্টএ কিংবা সেকেণ্ড হাওয়া খেতে গেলেই আধুনিকা হওয়া যায় না! এর চেয়ে ওই যারা মুখে রঙ মেখে সন্ধ্যা-বেলায় গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তারাও ঢের ভালো। তাদের তবু বুঝতে পারি। তারা উপার্জন করে পেটের দায়ে।

অগ্নিশিখার ওপর যেন ঘৃতাহুতি হলো। অপমানে কুমকুমের সর্বদেহ কাঁপতে থাকে। বলে, ছিঃ আমার সম্বন্ধে তাহলে আপনার মনের ধারণা এই!

হাঁ। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভবতোষ। যদি সাহস থাকে ত জবাব দাও আমার কথার। বলো, সত্যি। এই তিন বছরে অন্তত তোমাকে মিশতে দেখেছি তিন জন যুবকের সঙ্গে! বলো তাদের সঙ্গে সাজ-গোজ ক'রে তুমি কোথায় যাও। তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক। তারা কি তোমায় নিয়ে গিয়ে গীতাপাঠ করে? কতক্ষণ তোমার সঙ্গ মানুষের ভাল লাগতে পারে? কি তুমি জানো! আজ তিন বছর ধরে দেখছি আই-এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছো। বই নিয়ে শুধু কলেজে যাও আর আসো। না পড়েছো কোন বাংলা সাহিত্যের ভাল বই, না জানো ভালো করে কথা কইতে। না রেওয়াজ গান-বাজনা—না জান ললিত-কলা। একমাত্র সম্ভার হিন্দী আর বাংলা সিনেমা দেখো, তাও শুধু তার গানগুলোর জন্যে? সেখানে গল্পের মধ্যে যেটুকু সাহিত্যরস তা গ্রহণ করারও ক্ষমতা নেই তোমার! সেইজন্যে একমাত্র দেহ ছাড়া আর তোমার কোন সম্বল নেই। কিন্তু দান করতে করতে সে-দেহ আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছো?

মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কুমকুম আর পারলে না চুপ করে থাকতে। হঠাৎ মাথায়-লাঠিমারা কুকুরের মত চীৎকার করে উঠলো, ননসেন্স! আমার চেহারায় কিছু থাক বা না থাক, আপনাকে কেউ তার সমালোচনা করতে ডাকেনি! বলে একটু থেমে ভবতোষের মুখের ওপর যেন একমুঠো উদ্যত বালি ছুঁড়ে মারলে। আপনার নিজের চেহারাটা কি, একবার দেখেছেন কি? কোন মেয়ে আপনাকে ভালবাসতে পারে না, কোনদিন। নিশ্চিত জানবেন।

বলতে বলতে ছুটে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই কুমকুমের সঙ্গে শেষ দেখা ভবতোষের। কারণ ভবতোষরা সেই রাতেই সে বাড়ী ছেড়ে দেয় এবং দক্ষিণ কলকাতা থেকে একেবারে চলে যায় পাইকপাড়ায়। এগারো বছর হয়ে গেল এখনো সেখানেই রয়েছে।

সেদিন রাত্রে 'শিঞ্জনারী' হোটেলে খেতে গিয়ে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো ভবতোষের। বাজনার তালে তালে জোড়ে জোড়ে যে-সব পুরুষ ও রমণী নৈশ-নৃত্য করছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে সেই পাঞ্জাবী যুবক ও সেই তরুণী যুবতী। দুজনে দুজনের কখনো হাত ধরে কখনো কোমর ধরে, পায়ে পায়ে, তালে তালে, বাজনার ছন্দে যেন ভেসে চলেছে। ভবতোষের চোখ দুটো বন্দুকের মত আটকে গেল সেই নৃত্যরতা মেয়েটির দেহে। বন্দুকের টানে ওর চোখ দুটো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ সে নাচলো ততক্ষণ খাওয়া ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলো ভবতোষ তার

শ্রেষ্ঠ নাটক দেখুন

"বৈশাখী" অভিনীত

○ লবণাক্ত ○
(২য় সংস্করণ) পঙ্কজীশ সরকার

○ অন্তরীক্ষ ○
(৫৪ শ্রেষ্ঠ নাটক) জোছন বন্দিতদার

○ আষাঢ়ে কেলেঙ্কারী ○
(সামাজিক নাটক) কৃষ্ণলাল মজুমদার

○ রায় ○
(রহস্য নাটক) শুম্ভসত্ত্ব বসু

○ এর শেষ নেই ○
(সামাজিক নাটক) অমরেন্দ্র ঘোষ

শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

○ শাশ্বতিক ○
কমল চট্টোপাধ্যায়

○ মরীচিকা ○
বিধায়ক ভট্টাচার্য

○ আজুর শেষ নাহি যেথায় ○
পঙ্কজীশ সরকার

○ জলমিছি ○
কৃষ্ণলাল মজুমদার

○ স্টাণ্ট ○
ঐ

○ নির্বাক প্রহরী ○
লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

○ কে থাকে কে যায় ○
ভবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়

○ একটি চায়ের কাপ ○
নীতীশ সেন

কয়লাখনি ও তুমি শুধু ছবি
শ্রীঅগ্নিমিত্রম্

পরিবেশক :—
অ ম র লা ই ব্রে রী
৪৪।৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-বারো

দিকে। আশ্চর্য, অদ্ভুত এই রমণী! ভূলের মধ্যে ঘুরে-ফিরে, কেবল এই ভুলটাই পাক খেতে থাকে।

এর কয়েকদিন পরে, জলাপাহাড় থেকে নামছে ভবতোষ, এমন সময় নিকটেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে থতমত খেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায়, দেখলো সেই তরুণীটি ঘোড়ায় পিঠে চাবুক মারছে আর ঘোড়াটা আকাশে লাফাতে লাফাতে ঈগলবেগে ছুটছে। ঘোড়ার সহিসটা অনেক পিছনে পড়ে আছে। প্রাণপণে ছুটেও সে তার নাগাল পাচ্ছে না। মেয়েটি ছুটে ভবতোষের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় পথে, এক-বার আড়-চোখে তাকালো তার মুখের দিকে। সে-দৃষ্টির অর্থ ধিক্কার! ভবতোষের পৌরুষকে যেন ধিক্কার দিয়ে চলে গেল সে।

'মাউন্ট ভেলারী' হোটেলে উঠেছিল ভবতোষ। হোটেলটা কেবল নির্বিবিলি নয়, যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি শুদ্ধ ও শান্ত পরিবেশ।

সেদিন বেশ রাত হয়েছে। ঘরে ঘরে আলো গেছে নিভে। মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়ীটা যেন সুষুপ্তি। হঠাৎ মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনি ভবতোষের কানে ভেসে এলো, একেবারে তার পাশের ঘর থেকে। লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে, মাথাটা উঁচু করে উৎকর্ণ হয়ে রইলো। হাঁ। ঠিক তার পাশের কক্ষ থেকেই আসছে। ইংরিজী গানের একটা কলি গুনগুন করে গাইছে 'ওঃ ডার্লিং ইউ আর নট টু বি ট্রুস মি।' কাঁপা-কাঁপা গলায়, স্পষ্ট মধুর কথা ও সুর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো ভবতোষ। একি, এ যে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! তবে কি? না না। এই হোটেলে ত আজ পনেরো দিন আছে ভবতোষ, কখনো কি তাকে দেখা হতো না?

পাশের ঘরে একেবারে একই দেওয়ালের ওপাশে সেই অসামান্যা তরুণীটি রয়েছে, ভাবতে ভাবতে সারা রাত আর তার চোখে ঘুম এলো না। পরের দিন ভোর হলে, বেড-টি দিতে এলো যে বেয়ারাটা তাকে জিজ্ঞেস করে ভবতোষ জানলে, তার অনুমানই ঠিক। মিসেস্ কাউর। কাল এসেছেন এই হোটেলে। তার স্বামী তিন দিনের জন্যে বিশেষ কাজে কলকাতায় চলে গিয়েছেন তাঁকে এই হোটেলে রেখে।

ব্রেক-ফাস্টের পর কালকের স্টেটস-ম্যান' কাগজটা নেবার ছল করে ভবতোষ 'গুড্ মর্নিং' বলে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তরুণীটি। তার রংকরা নখ ও দুটো আঙ্গুলের ফাঁকে যে সিগারেটটা ছিল, তাতে একটা টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভবতোষকে বসতে বলল।

সেদিন রাত্রি যখন সাড়ে বারোটা, হঠাৎ তরুণীটি ভবতোষের দরজায় কড়া নাড়লে।

'ইয়েস্ ম্যাডাম্' হোয়াট কেন আই ডু ফর ইউ!' বলতে বলতে দরজান্তে ভবতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তরুণীটি তখন মুখটা বিকৃত করে ইংরিজীতে বললে, তোমার কাছে কি 'এ্যাসপেরিন' জাতীয় কোন 'ট্যাবলেট' আছে। আমার মাথার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

সরি। আমার কাছে 'এ্যাসপেরিন' নেই তবে 'এনাসিন' আছে। যদি মনে করেন ওতে কাজ হবে, তাহলে—

—হাঁ —ওতে হবে। আমার স্বামীর ব্যাগে ওষুধ ছিল—সে ব্যাগটা নিয়ে চলে গেছে বইলে আপনাকে কষ্ট দিতুম না এত রাত্রে। ধন্যবাদ, বলে 'এনা-সিন'-এর প্যাকেটটা নিয়ে চলে এলো।

ভবতোষ বললে, যদি রাত্রে যন্ত্রণা বাড়ে, তাহলে আমাকে নিশ্চিত ডাকবেন আমি আপনার ওষুধ এনে দেবো।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে ঘরে গিয়ে শুলো তরুণীটি।

ঘণ্টা খানেক সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎ 'ওঃ' বলে যন্ত্রণার একটা অস্ফুট আওয়াজ করলে তরুণীটি। সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, মিসেস কাউর—কি কষ্ট হচ্ছে!

তরুণীটি দরজা খুলে বললে, একটা রুমাল দিয়ে আমার মাথাটা বেশ করে বেঁধে দিন ত। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভবতোষ ওর বিছানার ওপর বসে রুমাল দিয়ে বেশ করে মাথাটা বেঁধে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যেন নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো তরুণীটি। পাছে খাট থেকে নামতে গেলে বিছানাটা নড়ে উঠে ঘুম ভেঙ্গে যায়, সেইজন্যে অপেক্ষা করলো ভবতোষ বিছানায়।

একটু পরে যখন নেমে আসবে মনে করছে, এমন সময় আবার উঃ বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি। ভবতোষ রুমালটা দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে গেলে, ওর হাতটা কপালের ওপর টিপে ধরলে তরুণীটি। ভবতোষ তখন ওর বিছানার দুটো পাশ টিপে নিঃশব্দে বসে রইলো।

রাত তখন বোধহয় সাড়ে তিনটে হবে। তরুণীটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে বসলো সে। দেখে ভবতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে ওরি বিছানায়। তার যে হাত দিয়ে ওর কপালটা টিপে ধরে-ছিল, সেটা ওর বুকের ওপর।

নন্‌সেন্স্। বলে ওর হাতটা ঘুমন্ত ঠেলে দিতেই অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়লো ভবতোষ। বললে, এক্সকিউজ মি স্লিজ।' হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সামলাতে পারিনি নিজেকে।

'দিস্ ইজ এ ডাম্ লাই!' তুমি ইচ্ছে করে আমার ঘুমের সুযোগ নিয়েছো। আমি এখনি লোকজন ডেকে আনছি। তুমি আমারে 'এস্যাল্ট' করতে চেয়েছিলে।

ভবতোষের সর্বশরীর তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। 'নো - নো - প্লিজ্ ম্যাডাম্ —এক্সকিউজ মি। আই আস্‌ক্ ইয়োর পার্ডন।' বলে যেমন দুটো হাত তার সামনে জোড় করলে, অমনি মেয়েটির মুখের কঠিন রেখা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে উঠলো। তবু কণ্ঠে কৃত্রিম রোষভরে সরল বাংলায় বললে, বলুন ক্ষমা করুন। বলুন? নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আপনাকে।

ক্ষমা করুন। কাঁপা-কাঁপা গলায় কোন রকমে বললে ভবতোষ।

শুধু ওই কথা মুখে বললেই চলবে না। কাজে দেখাতে হবে।

বলুন, কি করতে হবে।

আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে। আজকের রাতের এই কাহিনী। যার নায়ক আপনি, আর নায়িকা আমি। বলুন লিখবেন? প্রতিজ্ঞা করুন আমার ছুঁয়ে। শেষের কথাটা জোরে বলবার সময় আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না। খিল খিল করে যেন হাসির বন্যা বইয়ে দিলে। কি এখনো কি আমার নিয়ে গল্প লেখা চলে না?

আপনি — তুমি .....হাঁ..... তাহলে বাঙ্গালীর মেয়ে.....সেই..... কুমকুম?

না। কুমকুম নই। সে মরে গেছে। আমি মিসেস কুমকুম কাউর!

এম্‌ক পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুচিত্রা সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ভবানীপুর—৩ হইতে মুদ্রিত ও ৩বেতুক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

পুণ্য উৎসব দিন নন্দনের এনেছে সংবাদ

আজকে এই বড় প্রতীক্ষিত দিন আগের চেয়ে
অনেক বেশী আনন্দের বার্তা বহন করে
এনেছে, কারণ এর আগে
কখনো এই মহান উৎসব
দেশের এমন বৈপ্লবিক উন্নয়নের
পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত হয় নি।

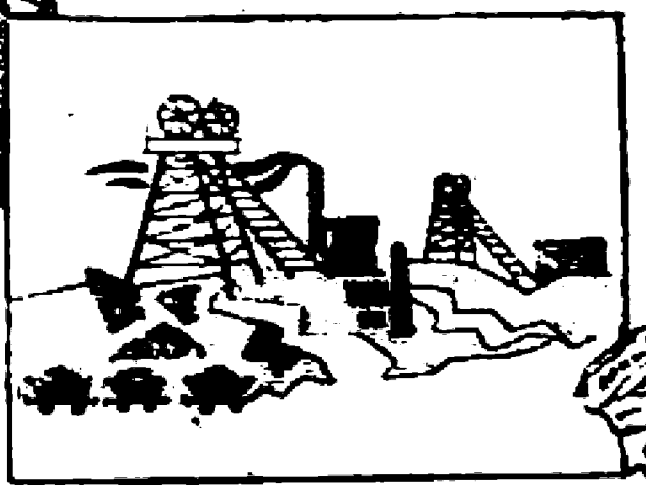

দেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৃহত্তম
সংস্থা রেলপথ সব শক্তি নিয়োগ করে জাতির
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় ও গতিশীল
করে তোলার প্রয়াসে নিরত রয়েছে।
তা ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ও
তাঁদের ভাবসম্পদের আদান প্রদানের মাধ্যমে
জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিকে ত্বরান্বিত করাতেও
রেলপথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

পূজার প্রীতি সম্ভাষণ

খাস জনতা

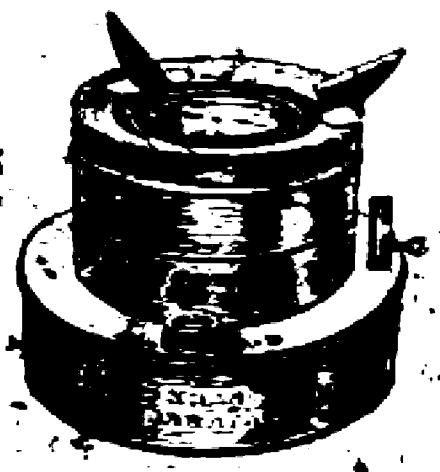

দীপ্তি ষ্টোভ

শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত কাশফুল, নানা বর্ণের ফুলের সৌরভে ভরা শিরশিরে বাতাস, পাখীর গান আর মিষ্টি রোদের স্নেহস্পর্শ, বাঙালীর প্রাণের গভীরতম কোনটিকেও আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয়। উৎসবের দিনগুলি গানে গন্ধে রূপে রসে ভরে উঠুক—সার্থক হোক মাতৃ পূজা।

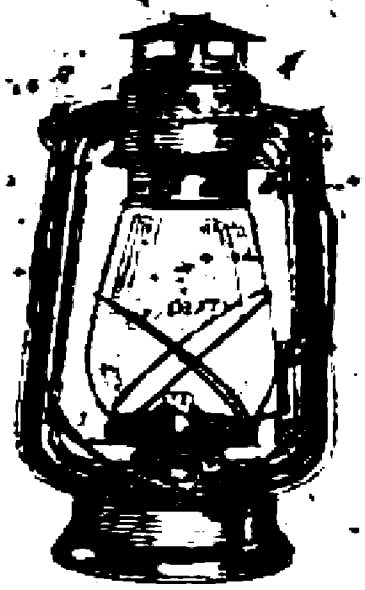

দীপ্তি লণ্ঠন

এনামেলের বাসন

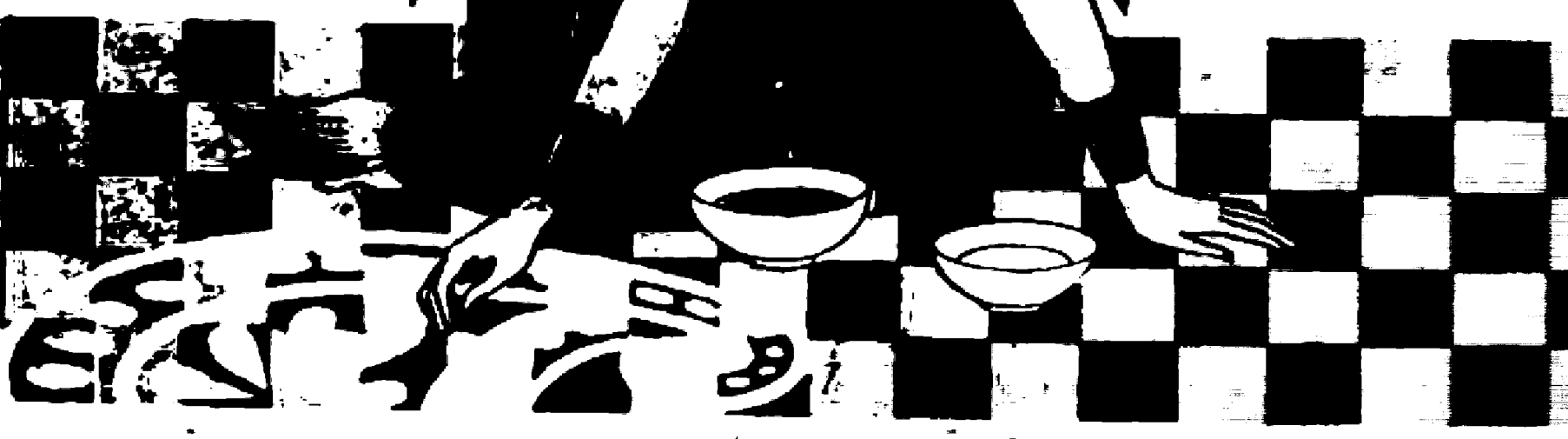

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২